পঞ্চরাত্র-প্রদীপ

শ্রীবিগ্রহ অর্চন পদ্ধতি



কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পঞ্চরাত্র-প্রদীপ

শ্রীবিগ্রহ অর্চন পদ্ধতি
(নিত্য-সেবা)

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য

কর্তৃক বিশ্বব্যাপী প্রবর্তিত

জিবিসি শ্রীবিগ্রহ অর্চন গবেষক-মণ্ডলী
দ্বারা সংকলিত

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট

ইস্‌কনের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দ্বারা রচিত গ্রন্থাবলী :

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ
শ্রীমদ্ভাগবত (১ম-১০ম স্কন্ধ)
শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত (৪ খণ্ড)
লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু
শ্রীউপদেশামৃত
ঈশোপনিষদ
পরলোকে সুগম যাত্রা
আত্মজ্ঞান লাভের পন্থা
আদর্শ প্রশ্ন আদর্শ উত্তর
দেবহূতিনন্দন কপিলদেবের শিক্ষা
প্রহ্লাদ মহারাজের দিব্য উপদেশ
কুন্তীদেবীর শিক্ষা
যোগসিদ্ধি
জীবন আসে জীবন থেকে
জন্ম-মৃত্যুর পরপারে
শ্রীকৃষ্ণের সন্ধানে
কৃষ্ণভাবনামৃত এক অনুপম উপহার
গীতার গান
ব্যাক্ টু গড্‌হেড্ পত্রিকা (প্রতিষ্ঠাতা)

অনুরোধের ভিত্তিতে একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থ-তালিকা নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাওয়া যাবে :
ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, ইস্‌কন মন্দির, হরেকৃষ্ণ ল্যাণ্ড, জুহু, মুম্বই ৪০০০৪৯, ভারত

উপরে উল্লিখিত গ্রন্থগুলি ইস্‌কনের কেন্দ্রগুলিতে পাওয়া যায়। অনুগ্রহ করে আপনার নিকটবর্তী একটি কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

উৎসর্গ

এই গ্রন্থটি কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদকে উৎসর্গ করা হল, যিনি তাঁর আরাধ্য শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞাকে নিজ জীবনব্রত রূপে গ্রহণ করে শ্রীল সনাতন গোস্বামী এবং শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীর দ্বারা উপদিষ্ট শ্রীবিগ্রহ অর্চনের পদ্ধতি সহ ষড় গোস্বামীগণের শিক্ষা-নির্দেশ সমগ্র বিশ্বে অনবদ্য সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করেছেন।

এই গ্রন্থের বিষয়ে আগ্রহী পাঠকদের ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের পক্ষ থেকে সম্পাদকের সঙ্গে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে :

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
বৃহৎ-মৃদঙ্গ ভবন
শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দির
শ্রীমায়াপুর ধাম,
জিলা : নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪১৩১৩

Website / E-mail :
www.indiabbt.com
admin@indiabbt.com

Pancharatra Prodip (Bengali)

1st to 4th printings : 21,000 copies (BBT Mayapur Press)
5th printing, January 2018 : 7000 copies (BBT Mumbai)

ISBN : 978-93-86956-37-8

গ্রন্থনা ও প্রকাশনা :
ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
হরেকৃষ্ণ ল্যাণ্ড
জুহু, মুম্বই ৪০০০৪৯, ভারত

C8AB

বিষয়সূচী

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সংযোজন সূচীপত্র

জিবিসি শ্রীবিগ্রহ অর্চন গবেষক-মণ্ডলী

১) শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী
২) শ্রীমৎ ভানু স্বামী
৩) শ্রীমৎ ভক্তিবিদ্যাপূর্ণ স্বামী
৪) শ্রীপাদ জননিবাস দাস
৫) শ্রীপাদ আত্মতত্ত্ব দাস
৬) শ্রীপাদ অষ্টরথ দাস
৭) শ্রীপাদ কৃষ্ণক্ষেত্র দাস

শ্রীগুরু-পরম্পরা প্রণাম

শ্রীগুরু প্রণাম

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

অজ্ঞতার গভীর অন্ধকারে আমার জন্ম হয়েছিল, এবং আমার গুরুদেব জ্ঞানের আলোকবর্তিকা দিয়ে আমার চক্ষু উন্মীলিত করলেন। তাঁকে জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি।

শ্রীরূপ প্রণাম

শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
স্বয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্ব-পদান্তিকম্ ॥

শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুপাদ, যিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অভিলাষ পূর্ণ করবার জন্য এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন, আমি কবে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভ করতে পারব?

মঙ্গলাচরণ

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥

আমি শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে, এবং পরম্পরা ধারায় গুরুবর্গ, সমস্ত বৈষ্ণব, রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, সগণ রঘুনাথ দাস গোস্বামী ও শ্রীজীব গোস্বামী, অদ্বৈত প্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু এবং পরিজন সহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু, শ্রীবাস ঠাকুর প্রমুখ ভক্তবৃন্দ সহিত ললিতা বিশাখাদি যুক্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণকে বন্দনা করি।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রণতি

নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিবেদান্ত স্বামীনিতি নামিনে ॥

নমস্তে সারস্বতে দেবে গৌরবাণী প্রচারিণে।
নির্বিশেষ-শূন্যবাদী পাশ্চাত্যদেশ তারিণে ॥

শ্রীকৃষ্ণের চরণাশ্রিত ও একান্ত প্রিয়ভক্ত কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে প্রভুপাদ, হে সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রিয় শিষ্য, কৃপাপূর্বক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচারের দ্বারা নির্বিশেষবাদ ও শূন্যবাদপূর্ণ পাশ্চাত্যদেশে উদ্ধারকারী, আপনাকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রণতি

নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীতি নামিনে ॥
শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ ॥
মাধুর্যোজ্জ্বল-প্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগভক্তিদ।
শ্রীগৌরকরুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোঽস্তু তে ॥
নমস্তে গৌরবাণীশ্রীমূর্তয়ে দীনতারিণে।
শ্রীরূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণাশ্রিত ও একান্ত প্রিয়ভক্ত শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

যিনি শ্রীমতী রাধারাণীর কৃপাধন্য, অপ্রাকৃত কৃপাসিন্ধু এবং কৃষ্ণবিজ্ঞান বিতরণকারী, সেই শ্রীবার্ষ-ভানবীদেবী-দয়িত-দাসকে (শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের অপর নাম) আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্রীল রূপ গোস্বামীর ধারায় আগত, রাধাকৃষ্ণের মাধুর্য প্রেমের দ্বারা সমৃদ্ধ ভগবৎ-ভক্তি দানকারী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর করুণাশক্তি বিগ্রহ, আপনাকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্রীচৈতন্যবাণীর মূর্তবিগ্রহ আপনাকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আপনি হচ্ছেন পতিত জীবদের উদ্ধারকারী। শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রকাশিত ভগবৎ-ভক্তির কোনও বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত আপনি সহ্য করেন না।

শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী প্রণতি

নমো গৌরকিশোরায় সাক্ষাদ্-বৈরাগ্যমূর্তয়ে।
বিপ্রলম্ভরসাম্ভোধে পাদাম্বুজায় তে নমঃ ॥

সাক্ষাৎ বৈরাগ্যমূর্তি শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজকে (শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীগুরুদেব) আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। তিনি সর্বদাই বিরহের অনুভূতিতে এবং প্রগাঢ় কৃষ্ণপ্রেমে নিমগ্ন থাকেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণতি

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ-নামিনে।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত শক্তিস্বরূপ সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। তিনি হচ্ছেন শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রমুখ গোস্বামীদের একনিষ্ঠ অনুগামী।

শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী প্রণতি

শ্রীগৌরাবির্ভাবভূমেস্ত্বং নির্দেষ্টা সজ্জনপ্রিয়ঃ।
বৈষ্ণব-সার্বভৌমঃ শ্রীজগন্নাথায় তে নমঃ ॥

সমগ্র বৈষ্ণব সমাজে সমাদৃত এবং ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থল আবিষ্কারক বৈষ্ণব সার্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্রীবৈষ্ণব প্রণাম

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

সমস্ত বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দ, যাঁরা বাঞ্ছাকল্পতরুর মতো সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে পারেন, যাঁরা কৃপার সাগর এবং পতিত পাবন, তাঁদের চরণকমলে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রণাম

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥

আমি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই, যিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্যান্য অবতার অপেক্ষা উদার, তিনি অত্যন্ত দুর্লভ কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করেছেন, তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাই।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রণাম

সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী গর্ভোদশায়ী চ পয়োব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যানন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু ॥

সঙ্কর্ষণ, কারণোদকশায়ী বিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু, ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু ও অনন্তদেব যাঁর অংশ ও কলা, সেই নিত্যানন্দ নামক বলরাম আমার আশ্রয় হোন।

শ্রীপঞ্চতত্ত্ব প্রণাম

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্ ॥

ভক্তরূপ, ভক্তস্বরূপ, ভক্ত অবতার, ভক্ত এবং ভক্ত শক্তি এই পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণকমলে আমি প্রণতি নিবেদন করি।

ভক্তরূপ—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু; ভক্তস্বরূপ—নিত্যানন্দ প্রভু; ভক্তাবতার—অদ্বৈত আচার্য প্রভু; ভক্ত—শ্রীবাস ঠাকুর; এবং ভক্তশক্তি—শ্রীগদাধর পণ্ডিত।

শ্রীবলদেব প্রণাম

নমস্তে তু হলগ্রাম! নমস্তে মুষলায়ুধ!
নমস্তে রেবতীকান্ত! নমস্তে ভক্ত-বৎসল!
নমস্তে বলিনাং শ্রেষ্ঠ! নমস্তে ধরণীধর!
প্রলম্বারে! নমস্তে তু ত্রাহি মাং কৃষ্ণ-পূর্বজ ॥

হে হলধর, হে মুষলধারী তোমাকে প্রণাম, হে রেবতীকান্ত, হে ভক্তবৎসল তোমাকে প্রণতি নিবেদন করি। হে সর্বশ্রেষ্ঠ বলবান, হে ধরণীধর, হে প্রলম্বারি তোমাকে বারংবার প্রণতি নিবেদন করি। হে কৃষ্ণ-পূর্বজ আমাকে রক্ষা কর।

শ্রীকৃষ্ণ প্রণাম

হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে।
গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোঽস্তু তে ॥

হে আমার প্রিয় কৃষ্ণ, তুমি করুণার সিন্ধু, তুমি দীনের বন্ধু, তুমি সমস্ত জগতের পতি, তুমি গোপিকাদের ঈশ্বর এবং শ্রীমতী রাধারাণীর প্রেমাস্পদ, আমি তোমার শ্রীপাদপদ্মে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্রীরাধারাণী প্রণাম

তপ্তকাঞ্চন-গৌরাঙ্গি রাধে বৃন্দাবনেশ্বরি।
বৃষভানুসুতে দেবি প্রণমামি হরিপ্রিয়ে॥

শ্রীমতী রাধারাণী, যাঁর অঙ্গকান্তি তপ্ত কাঞ্চনের মতো এবং যিনি বৃন্দাবনের ঈশ্বরী, যিনি মহারাজ বৃষভানুর দুহিতা এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী, তাঁর চরণকমলে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাই।

শ্রীজগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রাদেবীর প্রণাম

নীলাচলনিবাসায় নিত্যায় পরমাত্মনে।
বলভদ্র-সুভদ্রাভ্যাং-জগন্নাথায় তে নমঃ॥

পরমাত্মা স্বরূপ যাঁরা নিত্যকাল নীলাচলে বসবাস করেন, সেই বলদেব, সুভদ্রা ও জগন্নাথদেবকে প্রণতি নিবেদন করি।

সম্বন্ধাধিদেব প্রণাম

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী।
মৎসর্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ॥

আমি পঙ্গু ও মন্দমতি, যাঁরা আমার একমাত্র গতি, যাঁদের পাদপদ্ম আমার সর্বস্বধন, সেই পরম কৃপালু রাধামদনমোহন জয়যুক্ত হোন।

অভিধেয়াধিদেব প্রণাম

দীব্যদ্‌বৃন্দারণ্যকল্প-দ্রুমাধঃ শ্রীমদ্‌রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীশ্রীরাধা-শ্রীলগোবিন্দদেবৌ প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি॥

জ্যোতির্ময়-শোভাবিশিষ্ট বৃন্দাবনের অরণ্যে কল্পবৃক্ষতলে রত্ন-মন্দিরস্থ সিংহাসনের উপরে উপবিষ্ট শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দ তাঁদের অন্তরঙ্গ পার্ষদবৃন্দ (সখীগণ) কর্তৃক সেবিত হচ্ছেন। আমি তাঁদের স্মরণ করি।

প্রয়োজনাধিদেব প্রণাম

শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ॥

রাসনৃত্য রসের প্রবর্তক বংশীবট-তটস্থিত পরম সুন্দর শ্রীগোপীনাথ বেণুধ্বনি দ্বারা গোপীগণকে আকর্ষণ করেন। তিনি আমাদের মঙ্গল বিধান করুন।

পঞ্চতত্ত্ব মহামন্ত্র

(জয়) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, প্রভু নিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য, শ্রীগদাধর এবং শ্রীবাস আদি গৌরভক্তবৃন্দের জয় হোক।

হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

হরে—ভগবানের হ্লাদিনী শক্তি শ্রীমতী রাধারাণীর নাম 'হরা', সম্বোধনে হরে। **কৃষ্ণ**—সর্বাকর্ষক পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। **রাম**—সর্ব আনন্দের আধার পরমেশ্বর ভগবানের মুখ্য নাম।

হে ভগবানের-হ্লাদিনী শক্তি শ্রীমতী রাধারাণী, হে সর্বাকর্ষক পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, হে সর্বানন্দদায়ক ভগবান, আপনারা আমাকে কৃপাপূর্বক আপনাদের প্রেমময়ী সেবায় নিয়োজিত করুন।

মুখবন্ধ

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সূচনা করার অব্যবহিত পরেই শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর ক্রমপ্রসারমান সংঘের এক অপরিহার্য অঙ্গরূপে শ্রীবিগ্রহ উপাসনার বিধিনিয়ম প্রবর্তন করেন। ঠিক যেমন শ্রীকৃষ্ণের বাণীকে তিনি অবিকৃত, যথাযথরূপে উপস্থাপন করেন, তেমনিভাবেই তিনি শ্রীবিগ্রহ পূজার পন্থাকেও অবিকৃতভাবে চিরাচরিত বিধিনিয়ম অনুসারে প্রবর্তন করেছিলেন; তিনি শ্রীবিগ্রহপূজাকে কৃষ্ণভাবনামৃতের মূল নীতি—প্রত্যেককে কৃষ্ণভক্তি দান-এর নীতিটি প্রয়োগের একটি মাধ্যম হিসাবে দেখেছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ চেয়েছিলেন, শ্রীবিগ্রহ অর্চনের ক্ষেত্রে ইসকন যেন নির্দিষ্ট কিছু আদর্শ বিধিনিয়ম অনুসরণ করে :

এছাড়াও আমি শীঘ্রই তোমাকে বিগ্রহ-অর্চনের উপর সমগ্র নির্দেশিকা পাঠাব, তুমি সেটা ইংরেজীতে প্রকাশ করে বিতরণ করতে পারো। এই গ্রন্থের নাম হবে 'মেথড অব ওরশিপ' (শ্রীবিগ্রহ অর্চন পদ্ধতি)। (শ্রীল প্রভুপাদের পত্র, ১৩ই মার্চ, ১৯৭১)

তাছাড়াও, শ্রীল প্রভুপাদ চেয়েছিলেন ইসকনে বিগ্রহ পূজার ক্ষেত্রে যেন অত্যন্ত উচ্চমান রক্ষা করে, ইসকনে বিগ্রহ যেন কখনই ভারতের সেই সব বহু মন্দিরের মতো না হয়, যেখানে বিগ্রহ পূজার মান অনেকটাই অবনত করা হয়েছে। শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছিলেন—

বিগ্রহ পূজার প্রসঙ্গ আমাদের সকল ইসকন কেন্দ্রগুলিতে অবশ্যই শ্রীবিগ্রহ অর্চনের উচ্চমান বজায় রাখতে হবে। হ্রাস করার কোন প্রশ্নই উঠবে না; পূজার্চনার গুণগত মান ও উপচারাদির উৎকর্ষতাকে কেবল ক্রমাগত বৃদ্ধি করতে হবে। (১৯৭১-এর ১৮ নভেম্বরে লেখা শ্রীল প্রভুপাদের পত্র)

এইভাবে ভক্তগণ তাদের খেয়াল খুশিমত নয়, শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে শ্রীবিগ্রহের অর্চনা করবেন। এইভাবেই কেবল শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হবেন, এবং কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন বর্ধিত হতে থাকবে। তা না হলে, ফলশ্রুতি হবে বিপর্যয় :

আমাদের আন্দোলনে সবচেয়ে বড় বিপদ আসবে তখনই, যখন আমরা বিগ্রহ পূজার ক্ষেত্রে আমাদের নিজস্ব পন্থা-পদ্ধতি উদ্ভাবন করব। (১৯৭৩-এর ৪ঠা জানুয়ারীতে লেখা শ্রীল প্রভুপাদের পত্র)

আমার উপস্থিতিতে মন্দিরে যেমন বিগ্রহ পূজার্চনা সম্পাদন করা হয়েছিল, ঠিক সেইভাবে বিগ্রহ উপাসনা অনুসরণ করতে হবে। তোমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যেন একই রকম উচ্চমান বজায় থাকে, এবং সেখানে যেন কোন অনিয়ম না হয়। অনিয়মের অর্থ হচ্ছে নির্দিষ্ট বিধি ভঙ্গ করা। (১৯৭০ এর ১৩ই নভেম্বর লেখা শ্রীল প্রভুপাদের পত্র)।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভক্তগণ তাঁর শিক্ষা নির্দেশ যথাযথভাবে অনুসরণ করছিলেন দেখে শ্রীল প্রভুপাদ সন্তুষ্ট ছিলেন মনে হয়। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তগণকে তাঁর সেবা করার জন্য উপযুক্ত বুদ্ধি দান করেছিলেন।

আমি কৃষ্ণকে আমন্ত্রণ করেছি, আর অশ্রদ্ধাসূচক আচরণের দ্বারা কখনই তাঁর অবমাননা করা যেতে পারে না। আমি অবিশ্বাসী, নাস্তিক, ম্লেচ্ছ আর যবনদের মধ্যে বিগ্রহ আরাধনার এই পদ্ধতি প্রবর্তন করেছি, শ্রীকৃষ্ণের কাছে এই প্রার্থনা করি যে, আমি আপনাকে আসতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি, সুতরাং অনুগ্রহ করে আসুন; যেহেতু আপনি তাঁদের হৃদয়ে বিরাজ করছেন, তাই কৃপা করে তাঁদের উপযুক্ত বুদ্ধি দান করুন, তারা যেন এমনভাবে আপনার সেবা করতে পারে, যাতে আপনার কোন অসুবিধা সৃষ্টি না হয়। আমি এই পদ্ধতি ম্লেচ্ছ, যবন, পতিত, নরাধমদের মধ্যে প্রবর্তন করেছি, তবুও এটা সফল হয়েছে। (১০ই নভেম্বর, ১৯৭৫-এ লেখা শ্রীল প্রভুপাদের পত্র)

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং ষড় গোস্বামীগণ বিগ্রহ পূজার উপদেশ দেন, শ্রীল প্রভুপাদ সেটি ইসকনে প্রবর্তন করেন। এটি পাঞ্চরাত্রিক পূজাবিধি নামে খ্যাত। তিনি প্রদর্শন করেছেন যে এই পঞ্চরাত্র বিধি জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল বৈষ্ণবগণের প্রতি প্রযোজ্য।

অপ্রাকৃত ভগবৎ-সেবার জন্য সবচেয়ে প্রামাণিক বিধি হচ্ছে পঞ্চরাত্রিক বিধি। এই পঞ্চরাত্রিক বিধি একই সাথে বাস্তবানুগ এবং এই কলহের যুগের জন্য উপযোগী। এই আধুনিক যুগের জন্য বেদান্তের চেয়ে পঞ্চরাত্র অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১/৫/৩৮ তাৎপর্য)

বৈষ্ণবগণ দীক্ষা, নিত্যকর্ম, বিগ্রহপূজা, আচার-আচরণ, ভক্তদের চরিত্র, বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা এবং মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে পঞ্চরাত্রের ১০৮টি প্রাসঙ্গিক শ্লোককে প্রামাণিক হিসাবে গ্রহণ করে থাকেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আজ্ঞা অনুসারে শ্রীল সনাতন গোস্বামী এবং শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী *হরিভক্তিবিলাস* নামক

এক বৈষ্ণব-সংবিধান গ্রন্থ রচনা করেন—পঞ্চরাত্র এবং অন্যান্য প্রামাণিক পত্রের ভিত্তিতে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সকল নিষ্ঠাবান অনুগামীবর্গ অর্চনা বা বিগ্রহ পূজার ক্ষেত্রে *হরিভক্তিবিলাসকে* প্রমাণ গ্রন্থ হিসাবে গণ্য করেন।

> *যে সমস্ত ভক্ত শ্রদ্ধা এবং প্রীতি সহকারে বস্তুতই ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তাঁরা ভগবানের দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। বৈষ্ণবেরা কখনও স্মার্ত ব্রাহ্মণদের কর্মকাণ্ডীয় কার্যকলাপের গুরুত্ব দেন না। বৈষ্ণবেরা স্মার্তবিধি কখনও অনুসরণ করেন না, তাই বৈষ্ণবদের পথপ্রদর্শনের জন্য শ্রীল সনাতন গোস্বামী হরিভক্তিবিলাস প্রণয়ন করেছেন। (শ্রীমদ্ভগবত ৮/২০/১৪ তাৎপর্য)*

শ্রীল প্রভুপাদ কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের একটি অপরিহার্য অঙ্গরূপে সারা বিশ্বে বিগ্রহ-আরাধনার রীতি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় এই আন্দোলন যেহেতু ক্রমেই পরিব্যাপ্ত হচ্ছে, সেইজন্য আশা করা যায় যে এই গ্রহটি একদিন অপ্রাকৃত ভগবদ্ধাম বৈকুণ্ঠে রূপান্তরিত হবে—সেখানে প্রতি নগরে ও গ্রামে ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ আরাধনা করবেন এবং তাঁর দিব্য নাম কীর্তন করবেন।

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের গভর্ণিং বডি কমিশন অনুমোদিত এই পঞ্চরাত্র প্রদীপ গ্রন্থটি সংঘের সদস্যদের উদ্দেশ্যে সংকলিত।

প্রস্তাবনা

বিগ্রহ অর্চনের অনুষ্ঠান করি কেন?

ভগবানের সেবায় কোনও ভক্ত বৈধী-সাধন-ভক্তি অনুশীলনের প্রারম্ভিক পর্যায়ে যাতে তার সমগ্র ইন্দ্রিয়াদি নিয়োগ করতে পারে, তার জন্য শ্রীল রূপ গোস্বামী চৌষট্টি ধরনের ভক্ত্যঙ্গ তথা ভক্তিমূলক ক্রিয়াকলাপের বিধি রচনা করে গিয়েছেন। সেইগুলির মধ্যে তিনি পাঁচটিকে প্রধান ভক্ত্যঙ্গ রূপে মনোনীত করেছেন—

১) *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণ

২) প্রবীণ ভক্তসঙ্গ

৩) মথুরাদি পুণ্যভূমিতে বাস

৪) ভগবানের পবিত্র নাম জপ

৫) গভীর বিশ্বাস সহকারে ভগবানের বিগ্রহরূপের সেবা

এই শ্রেষ্ঠ সাধনাঙ্গগুলি অনুশীলন করলে ভগবদ্ভক্তিমূলক সেবাকার্যে দ্রুত উন্নতি সুনিশ্চিত হয় এবং তার মাধ্যমে শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম লাভের লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায়।

> *'এই পাঁচটি সাধনাঙ্গ তথা ক্রিয়াকলাপের নীতিসূত্র অতীব অদ্ভুত এবং দুরূহ। এইগুলির প্রতি শ্রদ্ধার কথা দূরে থাকুক, কেউ যদি নিরপরাধে তাতে কেবলমাত্র স্বল্প সম্বন্ধও রক্ষা করতে পারে, তা হলে তার সুপ্ত কৃষ্ণপ্রেম জাগরিত হয়।' (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১/২/২৩৮ থেকে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা ২২/১৩৩ গ্রন্থে উদ্ধৃত)*

বাকি ঊনষাটটি সাধনাঙ্গের মধ্যে অন্তত পঁয়ত্রিশটি ভগবানের অর্চা-বিগ্রহের অর্চনায় প্রত্যক্ষভাবে প্রযোজ্য। সুতরাং বিগ্রহ অর্চনের শেষোক্ত পাঁচটি সাধনাঙ্গ বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ ভক্তগণ প্রত্যহ যে সকল বিভিন্ন ধরনের সাধনাঙ্গ চর্চা করে থাকেন, এইগুলির মধ্যে সেই সমস্তই রয়েছে। বস্তুত, এই একটি মাত্র বিষয়, অর্চন, তাকেই চৌষট্টি রকমের ভক্ত্যঙ্গ তথা সাধনাঙ্গে বিস্তারিত করা রয়েছে, সেইগুলির মধ্যে আবার অনেকগুলি ভগবদ্ভক্তিমূলক সেবা অনুশীলনের চৌষট্টি অঙ্গের মধ্যেও সহযোগী ক্রিয়াকলাপ রূপে অভ্যাস করতে হয়।

ভগবানের অর্চা-বিগ্রহে ভগবান বিরাজমান

শ্রীল রূপ গোস্বামী শ্রদ্ধা তথা "পূর্ণ বিশ্বাস" সহকারে বিগ্রহ অর্চনের জন্য ভক্তদের বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন—

শ্রদ্ধা বিশেষতঃ প্রীতিঃ শ্রীমূর্তেরঙ্ঘ্রিসেবনে।

'ভগবানের শ্রীবিগ্রহের শ্রীপাদপদ্মের সেবায় বিশেষভাবে শ্রদ্ধা এবং প্রীতিপরায়ণ হওয়া উচিত।' *(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ১/২/৯০ থেকে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য ২২/১৩০ গ্রন্থে উদ্ধৃত)*

বিগ্রহের স্বরূপ যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারলে তবেই এই শ্রদ্ধা ও প্রীতি জাগে—

'প্রতিমা নহ তুমি,—সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।' *(চৈঃ চঃ মধ্য ৫/৯৬)*

"হে প্রভু, আপনি প্রতিমা নন। আপনি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।"

ভগবান তাঁর অহৈতুকী কৃপায় অর্চাবিগ্রহ রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন যাতে বদ্ধ জীবেরা তাঁকে দর্শন এবং আরাধনা করতে পারে। অর্চাবিগ্রহের আরাধনার মাধ্যমে বদ্ধ জীবেরা ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনে তাদের ইন্দ্রিয়াদি নিয়োগ করবার সুযোগ পাবে। পরমোৎসাহে সাধনভক্তি সংক্রান্ত অনুষ্ঠানাদি উদ্‌যাপনের মাধ্যমে এবং অর্চন বিষয়ক সকল বিধিনিয়মাদি যথাযথভাবে পালন করে, ভক্তগণ প্রত্যক্ষভাবে অর্চাবিগ্রহের মধ্যে বিরাজমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ উপলব্ধির দুরূহ ব্রত অনুশীলন করে থাকে।

শ্রীল প্রভুপাদ এই বিষয়ে *শ্রীমদ্ভাগবতের* (৪/১২/১৭) তাৎপর্যে বলেছেন—

ভগবানের অর্চাবিগ্রহের আরাধনা মূর্তিপূজা নয়। ভক্তের উপলব্ধির জন্য অর্চাবিগ্রহ ভগবানের অবতার। তাই ভক্ত মন্দিরে অর্চাবিগ্রহরূপে প্রকাশিত ভগবানের সেবায় যুক্ত হন। পাথর, ধাতু, কাঠ, মণি, আলেখ্য ইত্যাদি স্থূল পদার্থের দ্বারা এই রূপ রচিত হয়। এই সমস্ত পদার্থ স্থূল অথবা জড় পদার্থের প্রতীক। ভক্তরা যেহেতু পূজার বিধি-বিধান পালন করেন, তাই ভগবান যদিও জড় পদার্থ রূপে প্রকাশিত, তবুও তিনি তাঁর আদি চিন্ময় রূপ থেকে অভিন্ন। এইভাবে ভক্ত নিরন্তর ভগবানের চিন্তায় মগ্ন হয়ে, জীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধন করেন।

অর্চনের সংজ্ঞা ও লক্ষ্য

শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে প্রহ্লাদ মহারাজের উক্তি অনুসারে নবধা ভক্তি অনুশীলনের একটি অঙ্গরূপে অর্চাবিগ্রহের মাধ্যমে বিধিবদ্ধ আরাধনার উল্লেখ রয়েছে। শ্রীল রূপ গোস্বামী 'অর্চন' প্রসঙ্গে বিশেষ সংজ্ঞা প্রদান করে *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* (১/২/১৩৭) গ্রন্থে লিখেছেন—

শুদ্ধিন্যাসাদি পূর্বাঙ্গ কর্মনির্বাহপূর্বকম্ ।
অর্চনং ত্বুপচারাণাং স্যান্মন্ত্রেণোপপাদনম্ ॥

> ভূতশুদ্ধি ও ন্যাসাদি রূপ পূর্বাঙ্গ-কর্মাদি অর্থাৎ প্রারম্ভিক শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়াদি সমাপনান্তে মন্ত্রোচ্চারণসহ উপচারাদি অর্থাৎ পূজার উপকরণসমূহ অর্পণের নাম অর্চন।

শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রদত্ত অর্চনের সংজ্ঞা অনুযায়ী, বিগ্রহ অর্চনের মধ্যে বিবিধ প্রকার ক্রিয়াকলাপ থাকে, যেগুলির মধ্যে কতকগুলি নিতান্তই নিয়মতান্ত্রিক কিংবা "শাস্ত্রবিধি অনুসারী"। কিন্তু মানুষ যদি বিগ্রহ অর্চনের লক্ষ্য মনের মধ্যে সুপরিস্ফুট রাখতে পারে, তা হলে অর্চনের বিভিন্ন অঙ্গগুলির বিবিধ নিয়মতান্ত্রিক বিধিবিধানসমূহ যথার্থ উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হয়, যে-উদ্দেশ্যটি হল পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রীতিসাধন। যদি আমরা অর্চনের অর্থ উপলব্ধি করতে পারি—যা হল, পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় নিয়মনিষ্ঠ ও বিধিবদ্ধভাবে শ্রদ্ধাভক্তি ও প্রীতি নিবেদন—তা হলে তখনই শুদ্ধিকরণের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতি-প্রক্রিয়াদি পরমোৎসাহে পালনের মাধ্যমে, অর্চনের বিভিন্ন উপচার-উপকরণাদি স্থাপনের মাধ্যমে এবং পূজা আরাধনা নিবেদনের মাধ্যমে, আমরা শ্রদ্ধা সহকারে অর্চন পদ্ধতি পালন করতে পারি। তখনই আমরা পূজা অর্চনের যে লক্ষ্য—ভগবৎ-প্রেম অর্জন—সেই লক্ষ্যে উপনীত হতে পারি।

শ্রীল রূপ গোস্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে, শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর রচনাবলী এবং তাঁর শিষ্যসমূহের কাছে ব্যক্তিগত উপদেশ নির্দেশাদির মাধ্যমেও অর্চন পদ্ধতির পূর্ণাঙ্গ পরামর্শ দিয়ে গেছেন। ভক্তগণ যেভাবে বিগ্রহ অর্চনা অনুসরণ করবে বলে তিনি অভিলাষ করেছিলেন, সেই বিষয়েও তিনি বহু বিশদ পরামর্শ দিয়ে গেছেন। ভগবদ্ভক্তির প্রারম্ভিক বিধিবিধানে ভক্তরা যাতে দৃঢ়প্রত্যয় হতে পারেন, সেই বিষয়ে তাঁদের সাহায্যের উদ্দেশ্যেই এই সব বিশদ বিধিবিধান। এইগুলি সম্পর্কে *পদ্মপুরাণে* বলা হয়েছে—

স্মর্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্তব্যো ন জাতুচিৎ ।
সর্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেবকিঙ্করাঃ ॥

"ভগবান বিষ্ণু (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ) স্মরণ সতত করা আবশ্যক এবং কদাচ তাঁর বিস্মৃতি অনুচিত। শাস্ত্রে উল্লিখিত সর্ববিধ বিধিবিধান ও অনুশাসনাদি এই দুটি নীতির দাসরূপে বিবেচিত হবে।"

পঞ্চরাত্রিক বিধি ও ভাগবত বিধি

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উপদেশ দিয়েছেন, কলিযুগে ভগবৎ-উপলব্ধির প্রাথমিক উপায় হল ভগবানের পবিত্র নাম শ্রবণ ও কীর্তন। সুতরাং হরিনাম সংকীর্তনই হল সকল নিয়ম-প্রকরণাদির সারাৎসার, যার সাহায্যে মানুষ সদাসর্বদা কৃষ্ণস্মরণে নিয়োজিত থাকতে পারে। ভক্তগণ যদিও কেবলমাত্র পবিত্র হরিনামের আশ্রয়ের মাধ্যমে সিদ্ধিলাভের স্তরে উপনীত হতে পারেন, তা সত্ত্বেও, নাম-কীর্তনের সহযোগ সাধনাঙ্গ স্বরূপ বিগ্রহ-অর্চনায় নিয়োজিত থাকতেও মহাজনেরা আমাদের পরামর্শ দিয়েছেন, কারণ জড়জাগতিক কলুষতা ও অভক্তসুলভ ভগবদ্ভক্তিবিমুখ প্রবণতা লাঘবে বিশেষভাবে সাহায্য করে থাকে এই অর্চন পদ্ধতি। এই অর্চন পদ্ধতি জড়জাগতিক পরিবেশে বিক্ষুব্ধ মনে স্থৈর্য আনে, কারণ এই পদ্ধতির মাধ্যমে আমাদের ইন্দ্রিয়াদি প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের সর্বাকর্ষক বিগ্রহের রূপে নিবিষ্ট হতে বাধ্য হয়। শ্রীল প্রভুপাদ এই সম্পর্কে লিখেছেন—

"কখনো কখনো নবীন ভক্তরা মনে করে, তারা ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনা ছাড়াই শ্রবণ-কীর্তনের পন্থা অনুশীলন করতে পারবে। কিন্তু ভগবানের বিগ্রহের আরাধনা না করে কেবল শ্রবণ-কীর্তনের পন্থা অনুসরণ শুধুমাত্র হরিদাস ঠাকুরের মতো অতি উন্নত ভক্তদের পক্ষেই সম্ভব। হরিদাস ঠাকুরের অনুকরণ করে, কেবল শ্রবণ-কীর্তন করার জন্য, ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনা পরিত্যাগ করা উচিত নয়।" (চৈঃ চঃ মধ্য ১৯/১৫২, তাৎপর্য)

"শ্রবণ ও কীর্তনের সাথে সাথেই বিগ্রহ অর্চনা চালিয়ে যাওয়া দরকার। সমস্ত মন্ত্রাদির মধ্যেই বিশেষ শক্তি রয়েছে, যে গুলির উপকারিতা গৃহস্থ ভক্তদের গ্রহণ করা উচিত।....যদি কেউ ভগবানের পবিত্র নাম জপ করে, তা হলে সে বহুবার বিগ্রহ অর্চনের মন্ত্র উচ্চারণের সময়ে 'নমঃ' উচ্চারণের সুফল অর্জন করে থাকে। ভগবানের পবিত্র নাম জপকীর্তনের মাধ্যমে মানুষ ভগবৎ-প্রেমের স্তরে উন্নীত হতে পারে।....তাই কেউ হয়ত প্রশ্ন তুলতে পারে তা হলে দীক্ষা গ্রহণ করার (যার মাধ্যমে শিষ্য বিগ্রহ

মন্ত্রাদি গ্রহণ করে থাকে) কি প্রয়োজন আছে। তার উত্তর হল এই যে, ভগবৎ প্রেমের পর্যায়ে পারমার্থিক জীবনে উন্নতির পথে মানুষের প্রগতির ক্ষেত্রে পবিত্র নাম কীর্তন যথেষ্ট সহায়ক হলেও, জড় দেহধারণের হেতু মানুষ নানাপ্রকারে কলুষতার অধীন হতেও পারে। সেই বিবেচনাতেই, অর্চন-বিধি সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে। সুতরাং ভাগবত পদ্ধতি ও পঞ্চরাত্রিকী পদ্ধতি—এই দুটির নিয়মিত সুযোগ গ্রহণ করাই প্রত্যেকের বিধেয়।" (ভাগবত, ৭/৫/২৮ তাৎপর্য)

পঞ্চরাত্রিক-বিধিসমূহের ভিত্তিস্বরূপ যে সমস্ত কঠোর বিধিনিয়ম পালন করতে হয়, সেগুলি বৈধীভক্তিরই অঙ্গ এবং মন্দিরে বিগ্রহ অর্চনের ক্ষেত্রে সেইগুলিতেই দৃঢ়ভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে। পঞ্চরাত্রিক-বিধি এবং ভাগবত-বিধি সমান্তরালভাবেই আমাদের একই লক্ষ্যের অভিমুখী করে, যেহেতু উভয় ক্ষেত্রেই পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা কীর্তন ও তাঁর পবিত্র নাম সংকীর্তনই প্রাধান্য লাভ করে থাকে। ভগবানের সেবার প্রতি এবং পবিত্র নামের প্রতি যখন ভক্তের স্বাভাবিক আকর্ষণ বিকাশ লাভ করে, তখনই পঞ্চরাত্রিক-বিধির নিয়মনিষ্ঠার প্রতি তাঁর উপলব্ধি পরিণত হয়ে ওঠে। তখন, তিনি রাগানুগ ভক্তির পর্যায়ে অবস্থান করে থাকলেও প্রকাশ্যে মন্দির প্রাঙ্গণে ভগবানের আরাধনার মাঝে পঞ্চরাত্রিক-বিধির নিয়মাদি মেনে চলবেন—কারণ সেখানে ভগবানকে পরম পুরুষোত্তম ভগবান রূপে আরাধনা করা হচ্ছে। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর *শ্রীমদ্ভাগবত* গ্রন্থের তাৎপর্যে পঞ্চরাত্রিক-বিধি ও ভাগবত-বিধির মধ্যে সম্পর্কটি ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন—

"ভগবান নারায়ণের আরাধনা হয় পঞ্চরাত্রিক-বিধির দ্বারা আর শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা হয় ভাগবত-বিধির দ্বারা। পঞ্চরাত্রিক-বিধির দ্বারা ভগবানের পূজা না করে, কেউ ভাগবত-বিধির দ্বারা ভগবানের পূজা করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে নবীন ভক্তরা পঞ্চরাত্রিক-বিধির দ্বারা নারদ-পঞ্চরাত্রে যে সমস্ত বিধি-বিধান দেওয়া হয়েছে, তার দ্বারা ভগবানের পূজা করেন। নবীন ভক্তরা রাধাকৃষ্ণের আরাধনা করতে পারে না; তাই মন্দিরে বিধি-বিধানের দ্বারা লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা করা হয়।...পঞ্চরাত্রিক-বিধি অনুসারে আরাধনাকে বলা হয় বিধিমার্গ, আর ভাগবত-বিধি অনুসারে আরাধনাকে বলা হয় রাগমার্গ। আমরা যদি বিধিমার্গ অনুসরণ না করে, অপরাধের ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন না হই, তা হলে ভগবদ্ভক্তির পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হবে না।" (ভাগবত, ৪/২৪/৪৫-৪৬, তাৎপর্য)

সুতরাং, একদিকে আমাদের সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে কেবলমাত্র শ্রবণ ও কীর্তনে নিয়োজিত থাকতে গিয়ে অর্চন ব্রতের অবহেলা যেন না করি, এবং অন্য দিকে শ্রীল রূপ গোস্বামী আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, শ্রবণ ও কীর্তন হল সাধনাঙ্গের মূল পন্থা। কারও পক্ষেই নিয়মিতভাবে পবিত্র নাম জপে অবহেলা করা চলবে না, এবং সেই সাথে অর্চন পদ্ধতির মাধ্যমে অগ্রসর হওয়ার আশা পোষণ করা চাই। ভক্তির কোনও অঙ্গই ভগবানের নাম কীর্তনকে বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ হতে পারে না, ঠিক যেমন দেহের কোনও অঙ্গপ্রত্যঙ্গই আত্মার উপস্থিতি ব্যতিরেকে সক্রিয় থাকতে পারেই না। নাম কীর্তন হল সব রকমের ভগবদ্ভক্তি অঙ্গের প্রাণকেন্দ্র। ঠিক এই কারণেই, বিগ্রহ অর্চনা করতে যিনি চান, তাঁকে তাঁর গুরুদেবের নির্দেশমতো কঠোরভাবে প্রত্যহ নির্ধারিত সংখ্যায় মালা জপ করতেই হবে। নাম জপের সাধনায় যার শিথিলতা থাকবে, বিগ্রহ অর্চনাতেও মনোযোগী হতে তার শিথিলতা আসবেই। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর একটি প্রবচনে এই বিষয়ে বলেছিলেন—

> *"তবে আমরা যদি শ্রবণে এবং প্রবচনে আগ্রহী না হই, তা হলে সেই একই ব্যাপার ঘটবে—শুধুই তত্ত্বকথা, ব্যস, আর ক্রমে ক্রমে তা থেমে যাবে। শ্রবণ-কীর্তনের প্রাণচাঞ্চল্য যদি না থাকে, তবে এই সমস্ত বড় বড় অট্টালিকা—মন্দিরাদি—সব বোঝা হয়ে পড়ে থাকবে। তাই যদি আমরা ভবিষ্যতের বোঝা বাড়িয়ে তুলতে চাই, তা হলে এই সমস্ত শ্রবণ আর কীর্তন বর্জন করতে পারি এবং খুব ভাল করে ঘুম লাগাতে পারি! এই সব তখন বোঝা হয়ে দাঁড়াবে—গলগ্রহ হয়ে উঠবে। শ্রীবিগ্রহ আর থাকবেন না তখন, গলগ্রহ হয়ে থাকবে। শ্রীবিগ্রহ মানে অর্চাবিগ্রহ, তাই আমরা যদি এই সমস্ত শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ রীতি বর্জন করি, তা হলে ভাবতে হবে যে, আমাদের গুরু মহারাজ গলায় বোঝা ঝুলিয়ে দিয়েছেন, যাকে বলে গলগ্রহ। এটাই হল বিপদ। সুতরাং এই শ্রবণং কীর্তনম্ বিষয়ে আমাদের অত্যন্ত সচেতন থাকতে হবে, তা না হলে এই সমস্ত পরিশ্রম পণ্ড হবে। এই বাড়িতে তখন শুধুই ঘুঘু চরে বেড়াবে। এই হল বিপদ।" (শ্রীল প্রভুপাদ প্রবচন, মায়াপুর ১০ জানুয়ারি ১৯৭৪)*

কেউ যদি পবিত্র নাম কীর্তনের সেবায় যথার্থ মনোযোগী হন, তা হলে অর্চনকালে তাঁর দ্বারা উচ্চারিত বিবিধ মন্ত্রাবলী শ্রবণ-কীর্তন প্রক্রিয়ার সার্থক অঙ্গ হয়ে উঠবে, কারণ মন্ত্রগুলির মধ্যেই ভগবান ও তাঁর পার্ষদগণের নাম, মাহাত্ম্য, লীলা ও পরিকরাদির কীর্তন রয়েছে। শ্রীল প্রভুপাদ একখানি পত্রের মাধ্যমে নাম কীর্তন ও অর্চনের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে সংক্ষেপে লিখেছিলেন—

"আমি জেনে ভারি খুশি হয়েছি যে, তোমরা বিগ্রহ অর্চনায় খুবই আগ্রহী হয়ে উঠেছ এবং যত্ন নিচ্ছ, আর জানবে, ঐ সমস্ত ক্রিয়াকলাপের মধ্যে নিয়মিতভাবে ভগবানের পবিত্র নাম সংকীর্তনের আনুষঙ্গিক আয়োজন অবশ্যই থাকা চাই। বাস্তবিকই ভগবানের পবিত্র নাম জপ কীর্তনই আমাদের প্রাণস্পন্দন, আর ঐ ধরনের কার্যকলাপের ভিত্তিতেই অন্য সকল রকম ভক্তিসেবার অনুশীলন সার্থক হয়ে ওঠে।" (শ্রীল প্রভুপাদের চিঠি, ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭০)

আমাদের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে ভাগবত-বিধি অপেক্ষা পঞ্চরাত্রিক-বিধি সম্পর্কেই অধিকতর গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। এই গুরুত্ব লক্ষ্য করে কেউ যেন ভুল না করেন যে, ভাগবত-বিধির মূল্য হ্রাস করা হয়েছে, কারণ ভাগবত বিধিই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষাধারার মূল অভিব্যক্তি।

অর্চনের যোগ্যতাবলী

'পঞ্চরাত্র-শাস্ত্র' সুস্পষ্টভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছে, অর্চন অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করার জন্য মানুষের কি কি প্রাথমিক যোগ্যতাবলী থাকা চাই। বংশোদ্ভব এবং সামাজিক মর্যাদা নিয়ে এক্ষেত্রে কোনও বিচার-বিবেচনা করা হয় না; সর্বতোভাবে যে বিষয়টি অত্যাবশ্যক, তা হল বিষ্ণু, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে দৃঢ় বিশ্বাস। *পঞ্চরাত্র* শাস্ত্রাদির প্রামাণ্য সূত্র অনুসারে, যখন দীক্ষাগুরু তাঁর শিষ্যকে আন্তরিক বিশ্বাসগুণে গুণান্বিত বলে বিচার করেন, তখন তিনি তাঁকে বৈষ্ণব দীক্ষা প্রদান করেন, যাকে 'পঞ্চসংস্কার' বিধি বলাও হয়ে থাকে, যার মাধ্যমে শিষ্য একটি বৈষ্ণব-নাম ধারণ করে, বৈষ্ণব-তিলক সেবা করে, বৈষ্ণব-লক্ষণ চিহ্নাদি পরিধান করে, বৈষ্ণব মন্ত্র (বিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কিত গুহ্য মন্ত্র) গ্রহণ করে, এবং বিগ্রহ অর্চনাদি সম্পর্কিত গুরু নির্দেশিত পদ্ধতি শিক্ষালাভ করে। তখন ঐ শিষ্য শ্রীবিগ্রহ অর্চনাদি সুসম্পন্ন করবার যোগ্য বলে স্বীকৃত হয়।

অবশ্য, কোনও ভক্ত পঞ্চরাত্রিক মন্ত্রাদির মাধ্যমে দীক্ষিত হয়ে থাকলে, তাঁর পক্ষে ভগবদ্ভক্তি মার্গের জীবনে সুদৃঢ় প্রগতি অর্জন করবার বিশেষ আশা থাকে। আর সেই ধরনের ভক্তিপথে অগ্রগতি লাভের বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ উদ্দীপনা জাগে বিগ্রহ অর্চন সম্পন্ন করার সুযোগ পাওয়ার মাধ্যমে। মন্দিরে ভগবানের একান্ত দাস রূপে সেবায় নিয়োজিত হলে, বিপুল দায়িত্ব এসে পড়ে—সেই দায়িত্ব কেবলমাত্র শ্রীবিগ্রহাদির সেবা বিষয়েই নয়,—মন্দিরে যেসব ভক্তগণ আছেন এবং যে সকল দর্শনার্থী মন্দির দর্শনে এসে থাকেন, তাঁদের সকলেরই প্রতি পূজারীর অনেক দায়িত্ব থাকে। মন্দিরের সেবাকার্যে পূজারী কোনও ত্রুটি

করলে ভগবান তাতে অসন্তুষ্ট হন, ফলে মন্দিরে প্রভুত ক্ষতি হতে পারে। যদি পূজারী যথার্থই কৃষ্ণভাবনাময় এবং কর্তব্যনিষ্ঠ হতে পারেন, তা হলে তাঁর কৃষ্ণভাবনা জাগবে। প্রভুপাদ একখানি পত্রে লিখেছিলেন—

বহু লোক আসছেন দিল্লী মন্দিরে, যেহেতু এখানে মনোরমভাবে বিগ্রহ অর্চন করা হচ্ছে। এটা বেশ ভাল। বিগ্রহ অর্চনের মান অক্ষুণ্ণ রাখবে। (১১ জুলাই ১৯৭৬)

মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের সেবা যথাযথভাবে হতে থাকলে, ভক্তমণ্ডলী হরিনাম সংকীর্তনে, গ্রন্থ বিতরণে এবং নাম প্রচার কার্যের অন্যান্য বিষয়ে আরও অনুপ্রাণিত হয়ে বদ্ধ জীবদের মন্দির অভিমুখে আকর্ষণ করে নিয়ে আসতে পারবেন, যাতে সকলে পরমেশ্বর ভগবানের দর্শন লাভের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। আর দর্শনার্থী অতিথিবর্গ যখন মন্দিরে আসেন, তখন শ্রীবিগ্রহের সেবক মণ্ডলীই সাগ্রহে সাদরে তাঁদের অভ্যর্থনা জানিয়ে পরমেশ্বর ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন করাতে পারবেন; সেই কারণেই পূজারীদের ব্যক্তিগত স্বভাব ও শিষ্টাচার অবশ্যই বিশেষভাবে আদর্শ স্থানীয় হতে হবে। শ্রীকপিলদেব আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন যেন মন্দিরে শ্রীবিগ্রহের অর্চন ব্যবস্থাটি কনিষ্ঠ ভক্তের মনোবৃত্তির ভিত্তিতে গড়ে না ওঠে। তিনি বলেছেন—

"যে ব্যক্তি মন্দিরে ভগবানের বিগ্রহের পূজা করে, কিন্তু জানে না যে, পরমেশ্বর ভগবান পরমাত্মারূপে সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিরাজমান, সে অবশ্যই অজ্ঞানাচ্ছন্ন, এবং তার সেই পূজা ভস্মে ঘৃতাহুতির মতোই অর্থহীন।...হে মাতঃ! যারা সমস্ত জীবের অন্তরে আমার উপস্থিতি সম্বন্ধে অজ্ঞ, তারা যদি যথাযথ অনুষ্ঠানের দ্বারা মন্দিরে আমার বিগ্রহের পূজাও করে, তবু সেই পূজায় আমি প্রসন্ন হই না।"

(শ্রীমদ্ভাগবত ৩/২৯/২২, ২৪)

একমাত্র দীক্ষাগুরুর মাধ্যমেই আমরা কৃষ্ণাভিমুখী হতে পারি

কনিষ্ঠ ভক্তের পর্যায় থেকে উন্নত হতে হলে, আমাদের অবশ্যই বিনয় নম্রতার অনুশীলন করতে হবে। এর অর্থ এই যে, শ্রীবিগ্রহ-সেবার সময়ে, আমাদের সম্পূর্ণভাবে সজাগ থাকতে হবে যে, আমরা আমাদের গুরুদেবের বিনীত সেবক মাত্র। অন্যভাবে বলতে গেলে, শ্রীগুরুদেবই শ্রীবিগ্রহের পূজা আরাধনার অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করছেন, এবং তাঁরই কৃপায় আমরা তাঁকে সহযোগিতা করবার অধিকারী হয়েছি মাত্র। যে কোনও অনুষ্ঠানই আমরা সম্পন্ন

করি না কেন—শ্রীবিগ্রহের শৃঙ্গার সজ্জা কিংবা ভোগ রন্ধন অথবা আরতি নিবেদন—তা সবই আমরা করছি আমাদের শ্রীগুরুদেবেরই পক্ষে, তাঁরই হয়ে। আর তিনিই ঐ কাজে আমাদের প্রেরণা দিচ্ছেন আর প্রয়োজনীয় জ্ঞানসম্পদ অর্পণ করছেন যাতে পরমেশ্বর ভগবানের প্রীতিবিধানের উদ্দেশ্যে আমাদের সেবাকার্য যথাযথভাবে সুসম্পন্ন করতে পারি। এই ভাবধারাটি প্রাঞ্জলভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের *গুর্বষ্টক* রচনার মাধ্যমে—

> *শ্রীগুরুদেব সর্বদাই শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবায় মন্দিরে পূজা-অর্চনায় নিয়োজিত রয়েছেন। তিনি সেই পূজা-অর্চনায় তাঁর শিষ্যসমূহকেও নিয়োজিত করেন। তাঁরা নিত্যই নানাভাবে শ্রীবিগ্রহের মনোরম শৃঙ্গার সজ্জাদি রচনা করেন, মন্দির মার্জনা করেন এবং ভগবানের পূজার অনুকূলে অন্যান্য প্রকার নানাবিধ কর্তব্যকর্মে ব্যাপৃত থাকেন। আমি বিনীতভাবে আমার সেই শ্রীগুরুদেবের চরণপদ্মে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। (গুর্বষ্টক ৩)*

অর্চন পদ্ধতির বৈচিত্র্য এবং পূজার নির্দিষ্ট মান

শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে পূজা পদ্ধতির নমনীয়তা সম্পর্কে শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন—

> *ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়। এটি শ্রীকৃষ্ণের আরাধনার দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র। ভগবানের শ্রীবিগ্রহ স্থাপিত করে এবং মন্ত্র উচ্চারণ করে ফুল, ফল ও বিবিধ খাদ্যদ্রব্য প্রামাণিক বিধি সহকারে ভগবানকে নিবেদন করা উচিত। তবে তা দেশ, কাল এবং সুবিধা ও অসুবিধা বিবেচনা করে করা উচিত।*
> **তাৎপর্য :** *মন্ত্রজপ, এবং ভগবানের শ্রীবিগ্রহ নির্মাণ আদি অর্চনবিধি কোন বাঁধাধরা নিয়মে করার দরকার হয় না, এমন কি তা সর্বত্রই একভাবেও করতে হয় না। এই শ্লোকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্থান, কাল এবং সুযোগ-সুবিধা অনুসারে তা করা যায়। (ভাগবত ৪/৮/৫৪)*

শ্রীগুরুদেব দৃষ্টান্ত ও ধর্মানুশাসনের মাধ্যমে শিষ্যকে তাঁর সেবাকার্যের সাথে সাথে শিক্ষাদান করতে থাকেন এবং তাঁকে সংশোধন করে দেন। ভক্ত যতই বৈষ্ণবজনোচিত বৈশিষ্ট্যাদির অভিব্যক্তি সহকারে পরিশুদ্ধ হয়ে উঠতে থাকেন এবং অনর্থমুক্ত হয়ে ওঠেন, শ্রীগুরুদেব ততই তাঁকে ক্রমবর্ধমান দায়দায়িত্বের মাধ্যমে পরিস্থিতি অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ, তথা ভগবানের উত্তমোত্তম সেবা নিবেদনের কর্তব্যে নিয়োজিত করতে থাকেন।

ভক্তের কর্তব্য কেবল আচার-অনুষ্ঠানের অনুকরণ না করে সদ্‌গুরুর পরিচালনায় ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করা। সর্বদা দেখা উচিত সদ্‌গুরুর নির্দেশে কতখানি ভক্তি সম্পাদন হচ্ছে, আচার অনুষ্ঠান নয়। (ভাগবত ২/৮/২১তাৎপর্য)

পূজারীর পরিবর্তনশীল পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে অর্চন পদ্ধতি ও নির্দিষ্ট মান বিভিন্ন হতেই পারে। যেমন, কেউ হয়ত বাড়িতে এক আকৃতির ভগবানের পূজা করে, তার পক্ষে মন্দিরে অর্চিত শ্রীবিগ্রহের রূপ আকৃতি ভিন্ন হতে পারে। শাস্ত্রে বর্ণনা করা আছে কিভাবে গৃহস্থকে প্রত্যহ বাড়িতে পূজা করতে হয়, কিন্তু মন্দিরে যেভাবে বিবিধ উপকরণ উপচার সহযোগে, বহুবিধ সামগ্রী নিবেদন করে, দৈনিক যতবার সেবা নিবেদনের মাধ্যমে, যতসংখ্যক সহযোগী পূজারীর সহায়তায় এবং যতখানি সময় নিয়োগ করে পূজা করা হয়, সেই তুলনায় বাড়িতে গৃহস্থের দ্বারা নিবেদিত অর্চন সাধারণতই হয়ে থাকে খুবই সাদাসিধে সরলভাবে। গৃহস্থ তাঁর সামর্থ্য মতো যখন যা সংগ্রহ করতে পারেন, তাই নিবেদন করে একাকী অথবা পরিবারবর্গের কয়েকজন বা সকলকে নিয়ে, যতখানি সময় দিতে পারেন তারই মধ্যে পূজা সম্পন্ন করে থাকেন। মন্দিরে জনগণের মন আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে এবং অতীব উচ্চমানের ঐশ্বর্য নিবেদনের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য সময় নিয়োগ ও উপকরণ উপচারাদির বৈশিষ্ট্য বিচারে বিশেষভাবে কঠোর নিয়মবিধি ও নির্দিষ্ট মান অক্ষুণ্ণ রাখতে হয়।

লোকবল, অর্থবল এবং অন্যান্য বিষয়কে নির্ভর করে মন্দিরে মন্দিরে পূজা পদ্ধতির মানও বিভিন্ন হতে পারে। তবে একটা সাধারণ মান নির্ধারণ করা আছে সকলের পথনির্দেশক হিসাবে, তা হল এই রকম—

ভোর চারটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত (মঙ্গল আরতি থেকে শয়নারতি), অন্তত পাঁচ-ছ'জন ব্রাহ্মণকে শ্রীবিগ্রহ সেবার ভার নিতে হবে। মন্দিরে ছ'বার আরতি হয় এবং শ্রীবিগ্রহের উদ্দেশ্যে ভোগ নিবেদন করা হয় ও প্রসাদ বিতরণ করা হয়। পূর্ববর্তী আচার্যগণ যে বিধিনিয়ম প্রবর্তন করে গেছেন, সেই অনুসারেই শ্রীবিগ্রহ অর্চনের এই পদ্ধতি প্রচলিত আছে। (চৈঃ চঃ মধ্য ৪/৮৭ তাৎপর্য)

অর্চন পদ্ধতির জটিলতা প্রসঙ্গে, শ্রীল প্রভুপাদ বিভিন্ন সময়ে তাঁর শিষ্যসমূহকে নির্দেশ দিতেন যাতে অর্চন সহজ সরলভাবে নিবেদিত হয়। আত্ম উপলব্ধি অর্জন ও পরম পুরুষোত্তম ভগবানের অভিমুখী হওয়ার মূলগত পন্থা হল ভগবানের পবিত্র নাম জপ কীর্তন করা। শ্রীবিগ্রহ আরাধনার বিশদ

বিস্তারিত আনুষ্ঠানিক উপচার বিধি অনুসরণ করা আর কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের মূল ব্রত থেকে বিপথগামী হয়ে যাওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। অবশ্য, তিনি বিভিন্ন উপলক্ষ্যে ভক্তদের কোনও কোনও মন্দিরের শ্রীবিগ্রহ আরাধনার পদ্ধতি থেকে, বিশেষ করে বৃন্দাবনের রাধারমণ মন্দির থেকে, এই বিষয়ে নির্দেশ গ্রহণ করতে পরামর্শ দিতেন। আমাদের সংঘে যখন এমন এক সময় আসবে যে, আরও অনেক ভক্ত সর্বসময়ের সেবাকার্য হিসাবে শ্রীবিগ্রহ অর্চনের জন্য সুশৃঙ্খলভাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে থাকবে, তখন কিছু কিছু মন্দিরে পূজা অর্চন পদ্ধতির আরও বিশদ বিস্তারিত পদ্ধতি প্রবর্তনের উপযোগিতা হয়ত স্বীকৃত হবে। তবে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, পূজা অর্চন পদ্ধতির জটিলতা বৃদ্ধি করলেই যে অর্চনের মান উন্নয়ন করা যাবে, তা ঠিক নয়; বরং যথাযথভাবে ভক্তিভরে তা নিবেদিত না হলে অর্চনের মানের অবনতি হতেও পারে। কোনও বিশেষ মন্দিরে পরিচ্ছন্নতা, বিধিবদ্ধতা, ঐশ্বর্যগরিমায় এবং বিশদীকরণের মাধ্যমে অর্চন পদ্ধতির মান উন্নয়ন করা সুসম্পন্ন হয়ে গেলে, তা আর কখনই খেয়াল খুশিমতো পরিবর্তন বা হ্রাস করা উচিত হবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একবার প্রাত্যহিক ভোগ নিবেদনের সংখ্যাগত মান নির্ধারিত হয়ে গেলে সেটি আর কখনও হ্রাস করা গুরুতর এক অপরাধ বলে গণ্য করতে হবে। সুতরাং মন্দিরে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার আগেই সযত্নে শ্রীবিগ্রহ অর্চনের মান নির্ধারণের জন্য অর্চন পদ্ধতি সংক্রান্ত নির্দেশাদি অবগত হওয়া প্রত্যেক মন্দির কর্তৃপক্ষেরই একান্ত কর্তব্য। অর্চন প্রক্রিয়ার সুদক্ষ ভক্তবৃন্দের সাথে আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্ত মান নির্ধারণ করা উচিত। সেইগুলি লিখিতভাবে বিধিবদ্ধ করে রাখাও উচিত, যাতে পূজারী তথা মন্দির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের পরিবর্তন হলেও অর্চনের মান পরিবর্তিত হবে না।*

পঞ্চাঙ্গ পূজা

পঞ্চরাত্র শাস্ত্রে শ্রীবিগ্রহ অর্চন পদ্ধতিকে পাঁচটি বিভিন্ন অঙ্গরূপে বিভিন্ন ধরনের কার্যকলাপে বিভক্ত করা হয়েছে। এই বিভাগগুলি পরস্পর সম্পৃক্ত এবং পরস্পরের অধীন, যার ফলে এক সর্বাঙ্গীণ সেবাসূচী গঠিত হয়েছে। যদিও চতুর্থ

---

* পূজা অর্চনা যিনিই করুন, বিশেষ কোনও শ্রীবিগ্রহের অর্চন পদ্ধতি, বিশেষ করে যে সকল উপচারাদি নিবেদিত হয়ে থাকে, সেগুলি একই ধরনের থাকা উচিত। তবে, পূজারী ইচ্ছা করলে অতিরিক্ত কিছু মন্ত্র উচ্চারণের অধিকার পেতে পারেন, বিশেষ করে স্তুতি বন্দনা, যা এই গ্রন্থের উপসংহার অংশে দেখা যাবে। তা ছাড়া, পূজারী সংস্কৃত ছাড়া তাঁর নিজের ভাষাতেও মন্ত্রগুলির অনুবাদ আবৃত্তি করতে পারেন। শ্রীল প্রভুপাদ তা অনুমোদন করেছিলেন।

বিষয়টি, ইজ্যা, পরমেশ্বর ভগবানের প্রত্যক্ষ আরাধনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, এই আরাধনা অন্য বাকি চারটি অঙ্গের কার্যকলাপগুলি ব্যতিরেকে সম্পূর্ণ হয় না। এখানে সংক্ষেপে পঞ্চাঙ্গ পূজার বিবরণ দেওয়া হল—

১) অভিগমন (মন্দিরাভিমুখে গমন)। এর মধ্যে আছে প্রাথমিক কার্যকলাপ, যেমন—স্নান, পরিচ্ছন্ন পোশাকাদি পরিধান, তিলক ও তুলসী কণ্ঠমালায় দেহসজ্জা, মন্দির মার্জন, বর্জ্য সামগ্রী পরিষ্কার, ও মন্দির সজ্জা। সাধারণত অতি প্রত্যুষে মঙ্গল আরতি পর্যন্ত এবং মঙ্গল আরতি সমেত সকল প্রকার কার্যকলাপকেই অভিগমন রূপে বিবেচিত হয়।

২) উপাদান (অর্চনের উপচার সংগ্রহ)। এইগুলির মধ্যে থাকে পুষ্প চয়ন ও সংগ্রহ, যথোপযুক্ত খাদ্যসামগ্রীর আয়োজন, এবং তুলসীপত্র সংগ্রহ, ভোগরন্ধন এবং অর্চনের উপযোগী যথাযথ বাসনপত্রের নির্বাচন। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে, ভগবানের মন্দির সংরক্ষণে বিবিধ সাহায্যের উদ্দেশ্যে তথা শ্রীবিগ্রহ অর্চনের উদ্দেশ্যে লক্ষ্মীকোষ পুষ্ট করে তোলাই এই অঙ্গের প্রতিপাদ্য বিষয়াদি।

৩) যোগ (নিজ আধ্যাত্মিক পরিচয় নির্ধারণ ও তার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা)। এর মধ্যে আছে জড় জাগতিক দেহাত্মবুদ্ধি থেকে শুদ্ধি লাভ, এবং ভগবানের সেবা নিবেদনের উপযোগী চিন্ময় শরীর লাভ, মন্ত্রোচ্চারণ, ভূতশুদ্ধি (শ্রীকৃষ্ণের দাসানুদাস রূপে আত্ম পরিচিতি উপলব্ধি), এবং অন্যান্য প্রক্রিয়াদি। এ ছাড়া পূজারী তাঁর শ্রীগুরুদেবের আরাধনা ও শ্রীচৈতন্যদেবের আরাধনার মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে মূল অর্চন নিবেদনের জন্য আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন। ধ্যান (ভগবানের রূপ চিন্তা) এবং মানস পূজা (মনে মনে ভগবানের পূজা) এইগুলিও যোগ প্রক্রিয়ার অংশরূপে বিবেচিত হতে পারে। শ্রীবিগ্রহ অর্চনের ঠিক আগেই এই সমস্ত শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়াগুলিকে বলা হয় *পূর্বাঙ্গ কর্ম*।

৪) ইজ্যা (ভগবানের পূজা)। এর দ্বারা বোঝায় পূজার চৌষট্টি কলা বা উপচার, যেমন—আসন, পাদ্য, ও স্নান।

৫) স্বাধ্যায় (ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন)। স্বাধ্যায় বলতে বিশেষভাবে বোঝায় দিব্য শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন, তবে পারমার্থিক সাধনার সম্পূর্ণ বিষয়টির মধ্যে এটির দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের নাম শ্রবণ ও কীর্তন, বৈষ্ণব সেবা, প্রসাদ সেবা, অতিথি আপ্যায়ন, তুলসী সেবা, এবং ধাম সেবা—এই সবই বুঝতে হবে। তাই কেউ যখন শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসরণ করে এই সমস্ত কার্যকলাপ সম্পন্ন করেন, তখন তাঁর শাস্ত্র অধ্যয়ন সম্পূর্ণ হয়।

এই বিশ্লেষণ থেকে যে কেউ বুঝতে পারবেন যে, অর্চন বলতে কেবলমাত্র ভগবানের শ্রীবিগ্রহের উদ্দেশ্যে বাহ্যিক উপচারাদি নিবেদন করলেই হয় না; বরং

এর মধ্যে বিভিন্ন রকমের প্রস্তুতিমূলক ও আনুষঙ্গিক কার্যকলাপেরও প্রয়োজন হয়ে থাকে, তা না হলে নিছক বাহ্যিক অর্চন নিবেদন শুধুমাত্র শুষ্ক শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানেই পর্যবসিত হয়। অভিগমন ও যোগ বিধিগুলি মনোযোগ সহকারে পালন করার মাধ্যমে শুদ্ধতার চর্চা করে শ্রীবিগ্রহ অর্চনায় অপরাধ পরিহার করা যায়। স্বাধ্যায় অনুশীলনের মাধ্যমে, ভক্ত যথার্থ সেবা মনোভাব বিকাশ ও সংরক্ষণ করতে সক্ষম হন। তেমনই, শ্রীবিগ্রহ অর্চনায় উপাদান সংক্রান্ত বিষয়ে বিশদভাবে মনোযোগ দিলে ভক্ত যথাসম্ভব উত্তমভাবে ভগবানের প্রীতিবিধানে অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারেন। শ্রীবিগ্রহ আরাধনা (ইজ্যা) অনুশীলনের সাথে সাথে বৈধী সাধন ভক্তির স্তরে অর্চন পদ্ধতিতে নিয়োজিত ভক্ত অবশ্যই প্রত্যহ এই চারটি অঙ্গভুক্ত কার্যকলাপ অনুশীলন করবেন।

ইসকনের মন্দিরগুলিতে পূজাপদ্ধতির নির্ধারিত মান অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে ভক্তমণ্ডলীকে পথনির্দেশ ও সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে শ্রীবিগ্রহ অর্চনের পদ্ধতি যথাযথভাবে উপলব্ধির জন্য এই নির্দেশিকা প্রণীত হয়েছে। ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশাবলীসহ *হরিভক্তিবিলাস* গ্রন্থের সমর্থনমূলক উদ্ধৃতিগুলি নিয়েই আমাদের বিষয়বস্তু সংকলিত হয়েছে। যেহেতু শ্রীল প্রভুপাদ এবং *হরিভক্তিবিলাস* উভয়ের মাধ্যমেই অর্চন পদ্ধতির কতকগুলি বিষয়ে বিশদ নির্দেশের পরিবর্তে কেবল সাধারণভাবেই নির্দেশ পরামর্শ পাওয়া গেছে, সেই কারণে অন্যান্য *পঞ্চরাত্রিক* ও *আগম* শাস্ত্রাদি থেকে বিস্তারিত সাহায্য নেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া, যে সমস্ত কার্যকলাপের বিস্তারিত বর্ণনা শাস্ত্রাদিতে নেই কিংবা শাস্ত্রে তার বিকল্প পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা যথাসম্ভব গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধারা মেনে নিয়েছি।

এই নির্দেশিকা প্রয়োগ সংক্রান্ত বক্তব্য

যেহেতু শুধুমাত্র গ্রন্থপাঠ করলেই আমরা ভগবদ্ভক্তি সেবার পদ্ধতি শিখে নিতে পারি না, তেমনি কেবল এই নির্দেশিকা অনুসরণ করলেই আমরা অর্চন প্রক্রিয়া শিখতে পারি না। সদ্গুরুর ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ নির্দেশনায় কিংবা তাঁর অনুমোদিত অভিজ্ঞ অর্চন প্রক্রিয়া বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানেই আমরা অর্চন পদ্ধতি যথাযথভাবে শিখতে পারি। এই বিষয়বস্তু ভক্তদের পক্ষে অর্চন প্রক্রিয়ায় সহায়তা দানের উদ্দেশ্যেই উপস্থাপিত হচ্ছে, তবে এগুলির প্রয়োগ—বিশেষত অবস্থা বিশেষে পদ্ধতির যথার্থ প্রয়োগ—শিখে নিতে হবে যথার্থ পথনির্দেশকের কাছ থেকে। বলতে গেলে, এই নির্দেশিকা 'নিজে করো' পুস্তিকার মতো নয়। যাঁরা অর্চন ক্ষেত্রে নবাগত, তাঁরা বিশেষভাবে এই কথাটি মনে রাখবেন, এবং

তাঁদের পক্ষে কোনও অভিজ্ঞজনের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে ভগবানের অর্চা বিগ্রহ সেবার কলাকৌশল আয়ত্ত করবার চেষ্টা করাই উচিত হবে।

আমরা আশা করি, অভিজ্ঞ পূজারীদের ক্ষেত্রে, শ্রীবিগ্রহ অর্চনের উপলব্ধি প্রসঙ্গে তাঁদের চিন্তাধারা প্রসারিত করতে এই নির্দেশিকা সহায়ক হবে এবং এটির মাধ্যমে তাঁরা অন্যদের প্রশিক্ষণ প্রদানের কাজে সুবিধা বোধ করবেন। যদিও এই নির্দেশিকা মূলত রচিত হয়েছে নিয়মিতভাবে শ্রীবিগ্রহ অর্চনায় নিয়োজিত ভক্তবৃন্দের জন্যই, তা হলেও কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত ভক্তই শ্রীল প্রভুপাদ বর্ণিত "ইসকনের আইনশাস্ত্র" তথা *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থখানির আনুষঙ্গিক রচনা হিসাবে এই নির্দেশিকা বিশেষ উপযোগী বলে স্বীকার করতে পারেন। *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থের নির্দেশাদি, বিশেষত ঐ গ্রন্থের 'বৈধীসাধনভক্তি' সংক্রান্ত অধ্যায়গুলিতে বিধৃত উপদেশাবলী প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভক্তমণ্ডলী এই নির্দেশিকা যাতে সহায়ক রূপে কাজে লাগাতে পারেন, কেবলমাত্র সেই উদ্দেশ্যেই এগুলি প্রণয়ন করা হয়েছে।

পঞ্চরাত্র প্রদীপ গ্রন্থে প্রাত্যহিক অর্চনের সাধারণ তথ্যাবলী দেওয়া আছে এবং ইসকনের মন্দিরগুলিতে ও ঘরে ঘরে পূজা পদ্ধতির নিয়মাবলী দেওয়া আছে। এই গ্রন্থের সংযোজন অংশে 'শালগ্রাম শিলা' অর্চনের আরও বিশদ পদ্ধতি প্রক্রিয়া ও তথ্যাবলী দেওয়া হয়েছে—যা ইসকনের বিভিন্ন মন্দিরে যথেষ্ট স্বচ্ছন্দভাবে অনুসরণ করা হয়ে থাকে। যদিও এই গ্রন্থটি যথার্থভাবেই স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থ এবং ইসকনে অনুসৃত শ্রীবিগ্রহ অর্চনের মান নির্ধারণে সহায়ক গ্রন্থরূপে স্বীকৃত হতে পারে, তা সত্ত্বেও এই গ্রন্থের সংযোজন অংশে বর্ণিত ঐ পদ্ধতিগুলি ঐচ্ছিক বিষয়রূপেই পরিগণিত হতে পারে।

ভগবদ্ভক্তি স্বভাবতই গতিময়—এর মাধ্যমে ভগবানের অভিলাষের কাছে আত্মসমর্পণের মহত্তর সুযোগ অনন্তভাবে উপস্থিত হয়—এবং সেই হেতু, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ অর্চনের মাধ্যমে যিনি তাঁর সেবা করেন, তিনি এই নির্দেশিকায় বর্ণিত অর্চন প্রক্রিয়াদি সম্পাদনে উদ্যমবিহীন হবেন না। আমরা আশা করব, এই নির্দেশিকা যথাযথভাবে অনুসরণের মাধ্যমে, আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের সদস্যগণ তথা সমগ্র সমাজ সর্বাঙ্গীণভাবে সবিশেষ উপকৃত হবেন, এবং সমগ্র বিশ্বে শ্রীবিগ্রহ আরাধনার এক সুউচ্চ মান স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে শ্রীল প্রভুপাদের অভিলাষ পরিপূর্ণ হবে।

—ভানু স্বামী

প্রথম অধ্যায়

শ্রীবিগ্রহ অর্চনের প্রস্তুতি

অভিগমন ও উপাদান

প্রথমেই প্রস্তাবনা অংশে উল্লেখ করা হয়েছে, বিগ্রহ অর্চনের মধ্যে ভগবানের উদ্দেশ্যে বিশেষ একটি ক্রমানুসারে বিভিন্ন রকমের সামগ্রী কিংবা উপচারাদি শুধুমাত্র নিবেদন করার থেকেও আরও অনেক কিছু থাকে। উপচারাদি নিবেদনের সময়ে ভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তিভাবস্রোতের স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ ধারা বিঘ্নিত না হয়ে যাতে শরীর ও মনকে সেই অভিমুখে সহায়তা করা যায়, তেমন কতকগুলি প্রক্রিয়াও অর্চনের অঙ্গীভূত হয়। শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন—

> *বিগ্রহ অর্চন মানে অতীব পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। তোমাকে দিনে দুবার স্নানের চেষ্টা করতে হবে। মলত্যাগাদি প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করে প্রথমে স্নান না সেরে এবং পরিচ্ছন্ন পোশাক না পরিধান করে কখনই শ্রীবিগ্রহের সান্নিধ্যে যাওয়া উচিত নয়। প্রত্যেকবার আহারের পরে দাঁত মেজে পরিষ্কার রাখ, নখ কেটে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হও। বেদিতে কিংবা শ্রীবিগ্রহের কোনও কিছুতে হাত দেওয়ার আগে ভালভাবে সুনিশ্চিত হয়ে নেবে যেন তোমার হাত দুখানি পরিষ্কার আছে। আর প্রতিদিন সম্পূর্ণভাবে শ্রীবিগ্রহের ঘরখানি, বেদি এবং মেঝে পরিষ্কার করবে। আরতির পরে আরতির বিভিন্ন বাসনপত্র মেঝেঘষে ঝকঝকে করে রাখবে।...ভাবনাটি এই যে, সর্বোত্তম পরিচ্ছন্নতা চাই—যা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধান করবে। (শ্রীল প্রভুপাদের চিঠি, ২০মার্চ ১৯৭০)*

এই অধ্যায়টিতে প্রথমেই বর্ণনা করা হচ্ছে উপচার নিবেদনের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানকে সন্তুষ্ট করার ব্রতে যাতে সাফল্য অর্জন করা যায়, তার জন্য দেহ ও মন কিভাবে শুদ্ধ করে তোলা যায়, তার পদ্ধতি। অধ্যায়টির শেষাংশে বর্ণিত হয়েছে নিবেদনের উদ্দেশ্যে উপচারাদি নির্বাচন ও প্রস্তুত করবার পদ্ধতি।

প্রাতঃস্মৃতি কৃত্য বা অভিগমন

পরমেশ্বর ভগবানকে শয়ন থেকে উত্থিত করার পূর্বে যে সকল বিভিন্ন কার্যকলাপ সম্পন্ন করা উচিত, সেই বিষয়ে শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে ব্যাখ্যা করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছিলেন—

সকালে দন্তধাবন করা উচিত, স্নান করা উচিত এবং পরমেশ্বর ভগবান ও গুরুদেবকে প্রণতি নিবেদন করে বন্দনা করা উচিত। গুরুদেবের সেবা করা উচিত এবং শরীরের দ্বাদশ অঙ্গে ঊর্ধ্বপুণ্ড্র বা তিলক ধারণ করা উচিত। দেহে ভগবানের নাম এবং শঙ্খ-চক্র আদি ভগবানের দিব্য অস্ত্র ধারণ করা উচিত। তারপর তুমি বর্ণনা কর, কিভাবে গোপীচন্দন দিয়ে দেহ অলঙ্কৃত করতে হয়, তুলসীমালা ধারণ করতে হয়, তুলসীপত্র আহরণ করতে হয়, বস্ত্রপীঠ-গৃহ পরিষ্কার করতে হয় এবং মন্দিরে প্রবেশ করার সময় ভগবানের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ঘণ্টা বাজাতে হয়। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২৪/৩৩২-৩৩৩)

নিদ্রা যদিও যথাযথ স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রয়োজন, তবুও তার তামসিক প্রভাবে দেহ ও মনের অশুদ্ধতা সৃষ্টি হয়, তাই সেই প্রভাব ক্ষুণ্ণ করার উদ্দেশ্যেই নিদ্রোত্থান, মুখ ও শরীর প্রক্ষালন, শিখাবন্ধন, স্নান সমাপন, পোশাক পরিধান ও দেহসজ্জার নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া বা বিধিগুলির লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। এইগুলি ধর্মীয় সংস্কার কিংবা নিয়মের জন্যই নিয়ম (নেতিবাচক স্মার্ত বিধি) নয়, তবে সকল মানুষ মাত্রেরই জীবনে সবিশেষ কার্যকর।

শয়ন-উত্থান ও ভগবানকে স্মরণ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং 'নিত্যক্রিয়া' নামে অভিহিত শয়ন থেকে উত্থান ও প্রাতঃকালীন বিধিবদ্ধ কার্যকলাপগুলির দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন—

ব্রাহ্মমুহূর্তের আবির্ভাব হওয়া মাত্রই শ্রীকৃষ্ণ শয্যাত্যাগ করতেন।... শয্যাত্যাগ করেই শ্রীকৃষ্ণ মুখ, হাত, পা ধুয়ে আসনে উপবেশন করে আত্মচিন্তায় মগ্ন হতেন। অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে, আমরাও উপবেশন করে আত্মচিন্তায় নিয়োজিত হব। আমাদের উচিত কৃষ্ণচিন্তা করা, আমাদের ধ্যান করা উচিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের। সেটাই প্রকৃত ধ্যান।... তাঁর এই ধ্যান সমাপন হলে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রতিদিন প্রত্যূষে শুদ্ধ ও পবিত্র জলে স্নান করতেন। তারপর তিনি নির্মল বস্ত্র পরিধান করে একখানি চাদরে আচ্ছাদিত হয়ে তাঁর প্রাত্যহিক ধর্মানুষ্ঠানে নিযুক্ত

হতেন। নানা ধর্মানুষ্ঠানের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যহ প্রথমে যজ্ঞে ঘৃতাহুতি দিতেন এবং নীরবে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ গৃহস্থ জীবনের সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠান অবিচল নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন। সূর্যোদয় হলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সূর্যদেবের উদ্দেশ্যে বিশেষ স্তব করতেন। (লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ, 'শ্রীকৃষ্ণের দৈনন্দিন জীবনলীলা', ৩য় খণ্ড)।

সুস্বাস্থ্য ও বিধিবদ্ধ জীবন যাপনের জন্য প্রত্যুষে নিদ্রোত্থান এবং অনতিবিলম্বে দেহ মন পরিশুদ্ধ করে তোলা প্রয়োজন। ছ'ঘন্টা যাবৎ নিজের দৈহিক ক্রিয়াকলাপ স্তিমিত করে রেখে তাকে পুনরুদ্ধার করতে হয় স্বাভাবিকভাবেই সূর্যোদয়ের পূর্বে। তারপর, আমাদের নিদ্রার মধ্যে জড় দেহ থেকে নিষ্কাশিত এবং জড় দেহের পুঞ্জীভূত ক্লেদাদি দূর করতে স্নানের মাধ্যমে শুদ্ধ হতে হয়। সূর্যোদয়ের পূর্বেই স্বভাবত মানুষের দেহ বিকাশলাভের লক্ষণগুলি সক্রিয় হয়। সেইজন্যই নিদ্রার মধ্যে আমাদের জড় দেহে যে ক্লেদ পুঞ্জীভূত হয়েছে, তা যেমন স্নানের মাধ্যমে পরিশুদ্ধ হয়ে ওঠে, তেমনি কামবাসনা, ভয়ভীতি এবং বিষয়ে আসক্তি জনিত সূক্ষ্ম যে সমস্ত অশুদ্ধতা স্বপ্নের মাধ্যমে আমাদের মনের মধ্যে জাগে, তা থেকে আমাদের মুক্ত হতেই হবে ভগবানের ধ্যান ও তাঁর মহিমা কীর্তন সহযোগে।

শয্যাত্যাগের সময়

শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন—

সূর্যোদয়ের দেড় ঘণ্টা পূর্বে প্রাতঃকালকে বলা হয় ব্রাহ্মমুহূর্ত। এই ব্রাহ্ম-মুহূর্তে পারমার্থিক কার্যকলাপের অনুষ্ঠান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রাতঃকালে আধ্যাত্মিক কার্যকলাপ অনুষ্ঠানের ফল দিনের অন্য যে কোন সময়ে অনুষ্ঠিত পারমার্থিক কার্যকলাপের ফল থেকে অনেক বেশি। (শ্রীমদ্ভাগবত ৩/২০/৪৬ তাৎপর্য)*

জাগরণ ও জপ

শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন—

* শ্রীবিগ্রহাদির শয়ন থেকে উত্থানের দায়িত্বে যে পূজারীরা থাকবেন, তাঁদের যথেষ্ট সময় আগে শয্যাত্যাগ করতে হবে, যাতে তাঁরা যথাযথভাবে নিজেদের পরিশুদ্ধ করে তুলতে পারেন। শেষ মুহূর্তে শশব্যস্ত হয়ে মন্দিরে প্রবেশ করে শ্রীবিগ্রহাদি উত্থানের প্রয়াস কোনমতেই ঐ সেবার অনুকূল মনোবৃত্তি গঠনের সহায়ক হয় না।

ব্রাহ্ম মুহূর্তে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' উচ্চারণ করতে করতে অথবা 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ' নাম উচ্চারণ করতে করতে গাত্রোত্থান করা উচিত। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করা উচিত। সেই সময় কোনও শ্লোক বা প্রার্থনাও উচ্চারণ করা কর্তব্য। ভগবানের নাম উচ্চারণের ফলে এবং তাঁর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানানোর ফলে জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব অতিক্রম করে পবিত্র হওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে, দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা, অথবা যতদূর সম্ভব শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করা উচিত। (চৈঃ চঃ মধ্য ২৪/৩৩১ তাৎপর্য)

শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য শয্যাত্যাগের পর মন্ত্র উচ্চারণের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন—

কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করতে করতে সার্বভৌম ভট্টাচার্য জেগে উঠলেন, এবং তাঁর মুখে কৃষ্ণনাম শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আনন্দ বর্ধিত হল। (চৈঃ চঃ মধ্য ৬/২২০)

গুরুপ্রণাম

শয্যাত্যাগ ও ভগবানের নাম জপের পরে, গুরুদেবের বন্দনা এবং ভগবানের গুণ কীর্তন করে প্রার্থনাসহ সশ্রদ্ধ প্রণতি জ্ঞাপন করা উচিত।

শয্যাত্যাগের পর সশ্রদ্ধ প্রণতি জ্ঞাপনের মাধ্যমে আমরা গুরুদেবের জীবনচর্যায় আত্মসমর্পণের লক্ষ্যে এবং শ্রীকৃষ্ণের সেবা অভিমুখে মনোনিবেশ করে থাকি। যথার্থ সদর্থক লক্ষ্যে মনোনিবেশ করলে দীর্ঘস্থায়ী নেতিবাচক চিন্তাভাবনা দূরীভূত হয়ে যায়।

মলমূত্র ত্যাগ এবং শৌচ ও দন্তধাবন

শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন—

'প্রাতঃকৃত্য' শব্দটির অর্থ—সকালে উঠে নিয়মিতভাবে মলত্যাগ করা এবং তারপর স্নান করে পরিষ্কার হওয়া। আচমন মন্ত্র উচ্চারণের পূর্বে নির্মল ও পবিত্র জল হাতে নিয়ে তিনবার আচমন করতে হয়। দন্তধাবন—গাছের ডাল অথবা টুথব্রাশ দিয়ে প্রতিদিন দাঁত মাজা কর্তব্য। তাতে মুখ শুদ্ধ হয়। ভক্ত তার পরে স্নান করবে। (চৈঃ চঃ মধ্য ২৪/৩৩১ তাৎপর্য)

এই পদ্ধতির বিস্তারিত নিয়মাবলীর জন্য পরিশেষে সংযোজন অধ্যায়টি দ্রষ্টব্য।

শিখা

বৈদিক সংস্কৃতি অনুসারে, কারও চূড়াকরণ সংস্কার (মস্তক মুণ্ডন উৎসব) এবং উপনয়ন (বৈদিক দীক্ষাপ্রদান উৎসব) অনুষ্ঠিত হলে, মস্তক মুণ্ডনের সময় এক গুচ্ছ কেশ শিখা রূপে ছেড়ে রাখতে হয়। যে কোন রকমের যজ্ঞানুষ্ঠান করতে গেলে শিখা ধারণ অবশ্যই প্রয়োজন। সুতরাং ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে সমস্ত ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব বা অনুরূপ ব্যক্তিদের শিখা ধারণ করতে হয়।

যদিও শিখার আকৃতি সম্পর্কে কোনও শাস্ত্রীয় বিধান নেই বলেই মনে হয়, তবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ঐতিহ্য অনুযায়ী তাঁরা শিখা রাখেন গোষ্পদ আকৃতির, প্রায় ১.৫ইঞ্চি (৫-৬সেমি)। শ্রীল প্রভুপাদ এই বিষয়ে মন্তব্য করেছিলেন হাওয়াইতে তাঁর কয়েকজন নতুন শিষ্যবর্গের কাছে। বলেছিলেন, "গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের শিখা দেড় ইঞ্চি হয়ে থাকে—তার চেয়ে বড় নয়। বৃহত্তর শিখা মানে অন্য একটি সম্প্রদায়—আর শিখা বেঁধে রাখা চাই।" (৬মে ১৯৭২, হাওয়াই, *শ্রীল প্রভুপাদ লীলামৃত* ৫ম, পৃঃ ৯৩)

শিখা যে কোনও দৈর্ঘ্যের হতে পারে, কিন্তু সেটি দৃঢ়ভাবে গ্রন্থিবন্ধন করে রাখা চাই এবং শুধুমাত্র স্নান, গা-ধোওয়া,* পরিচ্ছন্নতা বা তেল মাখবার সময় সেটি গ্রন্থিমুক্ত করা চলে। তা ছাড়া শয়নকালে, পারলৌকিক ব্রতে যোগদানে, বা শোকপালন পর্বে শিখা গ্রন্থিমুক্ত রাখতে হয়। যেহেতু গ্রন্থিমুক্ত শিখা হল পরিবারবর্গের কারও মৃত্যুর লক্ষণ, তাই গ্রন্থিমুক্ত শিখাসহ দৈনন্দিন কার্যক্রম অনুসরণ করা অশুভ। এ ছাড়া বলা হয় যে, কেউ তার শিখা গ্রন্থিমুক্ত রাখলে, শরীর দুর্বল হয়ে পড়তে পারে।

স্নানের পরে শিখা বন্ধনকালে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করা উচিত, অথবা নীরবে গায়ত্রী মন্ত্র, ব্রহ্মগায়ত্রী (গায়ত্রীর প্রথম পংক্তি) জপ করা উচিত। শিখায় কখনও বিনুনী করা উচিত নয় (প্রথামতো কেবলমাত্র মহিলারাই তাঁদের কেশপাশ বিনুনী করে থাকেন) কিংবা শিখা কখনই সুদীর্ঘ এবং অবিন্যস্ত রাখা উচিত নয়।**

---

* *হরিভক্তিবিলাস* গ্রন্থে বলা হয়েছে, উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তিরা স্নানের শেষদিকে মন্ত্রাদি উচ্চারণের সময়েও শিখা গ্রন্থিবন্ধন করেন। এটি বিশেষত নদী বা সরোবরে স্নানকালে বিশেষভাবে প্রযোজ্য, তখন স্নানের পূর্বে শিখাবন্ধন না করলে স্নানের পবিত্র বিধি সম্পর্কে শ্রদ্ধাহীন এবং নিম্নশ্রেণীর মানুষরূপে গণ্য করা হয়। স্নানের সময় শিখাটি সহজভাবে গ্রন্থিমুক্ত রাখা চলে, স্নানের পরে তা আরও সযত্নে আবার গ্রন্থিবন্ধনে রাখা উচিত।

** স্বাভাবিকভাবে, যদি শিখা গ্রন্থিযুক্ত করে রাখার পক্ষে খুবই ছোট হয়ে থাকে, তা হলে সেটি খুলে রাখাই ঠিক, কিন্তু অগোছালোভাবে রাখা উচিত নয়।

স্নান

শয্যা ত্যাগের পরে, প্রাতঃকৃত্যাদি সম্পন্ন করে এবং যথাযথভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে, দাঁত মেজে নিয়ে, তার পরে স্নান করতে হবে। দৈনন্দিন স্নানের কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে *হরিভক্তিবিলাস* গ্রন্থের মধ্যে *কাত্যায়ণীস্মৃতি*, *দক্ষস্মৃতি*, *কাশীখণ্ড*, *মহাভারত*, *পদ্মপুরাণ*, *বিষ্ণুপুরাণ*, *নারদ পঞ্চরাত্র*, এবং *গৌতমীয়তন্ত্র* গ্রন্থাদি থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে।

কূর্মপুরাণে বলা হয়েছে, সূর্যোদয়ের পূর্বেই প্রাতঃস্নান না করলে দেহমন অশুচি হয়ে থাকে এবং সভ্য মানুষের যে সমস্ত দৈনন্দিন কৃত্য, যেমন—জপ, হোম এবং শ্রীবিগ্রহ অর্চন কিছুই করা চলে না। স্নান না করে কেউ আহার গ্রহণ করলে বলা হয়, সে আবর্জনা ভক্ষণ করছে, কারণ স্নান না করার ফলে সে যেমন অশুচি অশুদ্ধ হয়ে আছে, তেমনি যা কিছু সে স্পর্শ করছে, তা সবই অশুচি অশুদ্ধ অপবিত্র হয়ে যাচ্ছে। *পদ্মপুরাণে* এই অভিমত ব্যক্ত হয়েছে যে, প্রাতঃকালে যে স্নান করে না, সে নরকবাসেরই যোগ্য। যারা অসুস্থ, তারা বাদে, আর সকলেরই প্রাতঃকালে স্নান অবশ্য করণীয়। বৈদিক সংস্কৃতি অনুযায়ী ভগবানের চিন্তা এবং প্রার্থনা উচ্চারণের সাথে পবিত্র কর্তব্যকর্ম রূপে অঙ্গাঙ্গীভাবে কৃত্য হল স্নান সমাপন।

অতি প্রত্যূষে স্নানের উপকারিতা

সকালে শীতল জলে স্নানের উপকারিতা শাস্ত্রাদিতে বর্ণনা করা আছে। এমন স্নানের ফলে পাপীও নির্মল জীবন লাভ করে, কারণ সমস্ত বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ কলুষতা ধুয়ে ফেলার ক্ষমতা আছে এই প্রাতঃস্নানের। উষ্ণ জলের স্নানে যেমন দেহের পরিচ্ছন্নতা হয়, তেমনি শীতল জলের স্নানে সূক্ষ্ম শরীরের উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়, নিদ্রা ও স্বপ্নঘটিত কুপ্রভাব কেটে যায় এবং মন্দস্বভাবাদি দূর হয়ে মন পরিচ্ছন্নতা লাভ করে। শীতল জলে স্নান দেহমনের শক্তি, সচেতনতা, দীর্ঘায়ু, লাবণ্য এবং পবিত্রতা এনে দেয়। অতি প্রত্যূষে শীতল জলে স্নান করলে জ্ঞান বুদ্ধি মনোবল বৃদ্ধি পায় এবং মনের শান্তি আনে। এর ফলে বিষণ্ণতা, শোক দুঃখ, হীনতাবোধ এবং কুচিন্তা অপসারিত হয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে, পাপকর্মাদির সমস্ত রকমের কুপ্রভাব এর মাধ্যমে প্রতিহত হয়।

রাত্রিকালে শরীরের ন'টি দ্বার বর্জ্য পদার্থে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এগুলি নিয়তই উৎপন্ন হয়ে থাকে। অতি ভোরে শীতল জলে স্নান করে নিলে এই সমস্ত আবর্জনা অতি সুনিশ্চিতভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়, যার ফলে

তাজা ঝরঝরে শরীর নিয়ে দিনের কাজকর্ম শুরু করতে পারা যায়। এইভাবে প্রাতঃস্নানের সুনিশ্চিত শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক তথা পারমার্থিক সুফল আছে, আর সেই কারণেই শাস্ত্রাদিতে এই অবশ্যকৃত্যটির অকুণ্ঠ মহিমা কীর্তিত হয়েছে।

বিভিন্ন প্রকারের স্নান

সাত রকমের স্নান পদ্ধতি আছে : *পার্থিব স্নান* (মাটি ব্যবহার করার সাহায্যে); *বারুণ স্নান* (জলের সাহায্যে); *আগ্নেয় স্নান* (যজ্ঞকুণ্ড থেকে সংগৃহীত ভস্মের সাহায্যে); *বায়ব্য স্নান* (গোধূলিপূর্ণ বায়ুর সংস্পর্শে); *দিব্য স্নান* (সূর্য যখন কিরণ দান করছে, তখন বৃষ্টির জলে দিব্য বারিধারায় স্নান); *মন্ত্র স্নান* (যথোপযুক্ত মন্ত্রাদি উচ্চারণের মাধ্যমে নিজ শরীরে জল সিঞ্চন); এবং *মানসিক স্নান* (শ্রীবিষ্ণুর চিন্তায় নিমগ্নতা)। বিবিধ উপকরণাদি প্রয়োগের মাধ্যমে, এই সকল প্রকারের স্নানবিধিই শরীরের কলুষতা পরিশুদ্ধ করে থাকে। অবশ্য, সচরাচর দৈনন্দিন স্নানবিধি হল বারুণ স্নান।

মানসিক স্নান

মানসিক স্নান হল ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ধ্যানচিন্তায় নিজেকে নিমজ্জিত করে রাখা। শ্রীমনু উল্লেখ করেছেন, সর্বশ্রেষ্ঠ স্নানবিধি হল মানসিক স্নান। শ্রীবিষ্ণুচিন্তাই হল সকল প্রকার পাপাদি বিমোচনের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী মাধ্যম, তাই *হরিভক্তিবিলাস* গ্রন্থে উক্ত হয়েছে—

ওঁ অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ ॥

শুদ্ধ বা অশুদ্ধ হলেও কিংবা জড়জাগতিক জীবনের সকল প্রকার পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে দিনযাপন করলেও, যদি মানুষ পদ্মপলাশলোচন শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে মগ্ন হতে পারে, তবে সে বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ শুচিতা অর্জন করে। (*হরিভক্তিবিলাস* ৩/৪৭, *গরুড় পুরাণ* থেকে উদ্ধৃত)

সুতরাং সব রকমের স্নানের সাথেই মানসিক স্নান প্রত্যেকেরই করা উচিত যাতে বাহ্যিক শুচিতা অর্জনের সাথে সাথে আভ্যন্তরীণ শুচিতাও লাভ করা যায়। আভ্যন্তরীণ শুচিতা অর্জনের সামগ্রীই হল পরম পুরুষোত্তম ভগবানের স্মরণ।

বারুণ স্নান

অতি প্রত্যূষে সচরাচর জলেই স্নান করা উচিত। শুচিতা অর্জনের জন্য এই স্নানই বিধেয়।

স্নানের জলের প্রাপ্তিস্থান

বিভিন্ন জায়গার জল শুচিতার বিভিন্ন প্রকার ক্ষমতা রাখে। তাই জলের প্রাপ্তিস্থান ভেদে জলের শ্রেণীবিভাগও রয়েছে। উৎকর্ষতার ক্রম অনুসারে, সর্বোৎকৃষ্ট জল দিয়ে শুরু করলে, প্রথমেই স্নান করা উচিত গঙ্গা অথবা যমুনার জলে, অন্য কোনও পবিত্র নদীর জলে, কোনও তীর্থস্থানে (যেমন, জগন্নাথ পুরীর সমুদ্রজলে), যে নদীর জল সরাসরি সাগর অভিমুখে বয়ে চলেছে (অর্থাৎ, উপনদী বা শাখানদী নয়), যে কোনও নদীতে, খালে, ডোবায়, হ্রদে, জলপ্রপাতে, কুয়ো থেকে তোলা জলে, কিংবা অন্য যে কোনও পরিস্রুত জলে। চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী, বাসস্থানগুলি মানুষের সুবিধা মতোই নদী বা হ্রদ-সরোবরের ঘাটের কাছেই হয়ে থাকে, কিংবা বাসস্থানের সংলগ্ন পুকুরে স্নানের ঘাট থাকে, কারণ দৈনন্দিন জীবনে স্নান অতি আবশ্যকীয় কৃত্য বলেই গণ্য হয়ে আসছে। তবে আজকাল আমরা সাধারণত যেখানে পরিস্রুত জলের সুবিধামতো সরবরাহ পাই, সেখানেই স্নান করে থাকি।

স্নানের নিয়মবিধি

● নগ্নভাবে স্নান অনুচিত। কৌপীন পরিধান করে কিংবা পিছনে কাছা এঁটে কাপড় বা গামছা পরে নেওয়া উচিত। এর দ্বারা জলের শুচিতাসম্পন্ন সত্তার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হয় এবং বোঝা যায় যে, স্নানকার্যটিকে পবিত্র কৃত্যরূপে পালন করা হচ্ছে। নদীতে কিংবা কোনও প্রকাশ্য স্থানে যখন স্নান করতে হয়, তখন বিশেষভাবে এই অনুশাসনটি পালন করার জন্য সতর্ক থাকা উচিত।

● গৃহস্থদের দু'খণ্ড কাপড় পরিধান করে স্নান করা উচিত। (কৌপীন ছাড়াও আরও একখানি বস্ত্র কোমরে জড়িয়ে পরতে হয়) ব্রহ্মচারী এবং সন্ন্যাসীরা স্নান করবার সময়ে অন্ততঃ একটি কৌপীন ধারণ অবশ্যই করবেন।

● অযথা স্নান করা অনুচিত। দিনে তিনবার এবং তা ছাড়া অন্য যে কোনও অশুচি উপলক্ষ্যে স্নান করলেই যথেষ্ট।

● অপবিত্র জলে স্নান অনুচিত।

● মলত্যাগ যদি করতেই হয়, স্নানের পূর্বেই তা করণীয়। নচেৎ হস্তীস্নানের মতোই স্নান সেরে আবার নিজের দেহে ধুলা ছড়ানোর অপবিত্রতাই লাভ করা হবে।*

● স্নানের পরে, চুল শুকানোর জন্য চুলে ঝাঁকানি দেওয়া অনুচিত এবং কাপড় বা পা থেকে জল ছিটানো নিষিদ্ধ।

● স্নানের পরে দেহে তৈল মর্দন অনুচিত। (দেহে তেল লেগে থাকলে অশুচি হয়, আর সেই জন্যই তেল মাখার দরকার হলে তা জলে স্নান করার আগেই করে নিতে হবে।)

● স্নানের কাপড়খানির জল নিংড়ে নিতে হয় এবং তার পরে অন্য একখানি শুকনো কাপড় দিয়ে শরীর মুছে ফেলতে হয়, স্নানের কাপড়খানি দিয়ে গা মুছলে দেহ আবার অশুচি হয়ে ওঠে। অবশ্য, যদি স্নানের কাপড়খানিকে কেচে নিংড়ে নেওয়া হয়, তখন তা দিয়ে গা মুছলে অশুচি হওয়ার কারণ থাকে না।

● স্নানের পরে, একখানি পরিচ্ছন্ন কাপড়ে গা মুছে নেওয়া উচিত, নিজের হাত দিয়ে, নোংরা কাপড় দিয়ে, কিংবা যে-কাপড় পরা আছে, তারই একটি কোনা দিয়ে গা মোছা অনুচিত। যে শুকনো কাপড়ে গা মোছা হয়, তা প্রত্যেকবারই ব্যবহারের পরে কেচে নেওয়া উচিত।

বিকল্প স্নান পদ্ধতি

শীতল জলে স্নানের বিকল্প এইগুলি—

● শীতল জলে (বারুণ) স্নান যদি অসুস্থতার জন্য কষ্টকর হয়, তা হলে উষ্ণ জলে স্নান করা যেতে পারে। যদিও প্রাতঃকালে অল্প গরম জলে স্নান করলেও শারীরিক শুচিতা লাভ হয়, তা সত্ত্বেও কেউ যখন কোনও ব্রতাদি পালন করেন, তখন প্রাতঃকালে শীতল জলে স্নানের মতো সমমর্যাদা উষ্ণজলে স্নানের মাধ্যমে পাওয়া যায় না। এই সম্পর্কে বলা চলে, পুত্রের জন্মদিবসে, সংক্রান্তির দিনে, কিংবা সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণের সময়ে গরম জলে স্নান পরিহার করাই কর্তব্য।

---

* মলত্যাগের পরে স্নান কোনও কোনও ক্ষেত্রে পরিহার করা যেতে পারে। যেমন, কেবলমাত্র খুব ঠাণ্ডা জল পাওয়া যাচ্ছে এবং (বিশেষত শীতকালে) অসুখ করতে পারে, বা পরিক্রমাকালে স্নানের যথাযথ সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে না। সেই সব ক্ষেত্রে যথাসম্ভব শৌচবিধি পালন এবং মানসিক স্নানই বিধেয়। তবে কোনও ক্ষেত্রেই মলত্যাগের পরে স্নান না সেরে রন্ধনশালে বা বিগ্রহকক্ষে প্রবেশ করা অনুচিত।

● যদি গরম জলে স্নান করাও অসম্ভব হয়, তবে মাথা না ভিজিয়ে স্নান করা যেতে পারে, কিংবা কেবল একখানি পরিষ্কার ভিজা কাপড়ে গা মুছে নিলেও চলে। তাও যদি সম্ভব না হয়, তবে অন্ততপক্ষে মন্ত্রস্নান ও মানসিক স্নান বিধেয়।

● মহিলাদের ক্ষেত্রে, দৈনন্দিন স্নানের সময়ে জলে মাথা ডোবানো এবং চুল ভেজানো না করলেও চলে। তবে মাসিক অশুচিতার পরে অবশ্যই পূর্ণস্নান বিধেয়।

স্নানের বিভিন্ন সময়

শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন—

বাস্তবিকই, গৃহস্থ এবং বানপ্রস্থ আশ্রমের সকলেরই দিনে দু'বার স্নান করা কর্তব্য (প্রাতর্মধ্যাহ্নয়োঃ স্নানং বানপ্রস্থগৃহস্থয়োঃ)। সন্ন্যাসীর দিনে তিনবার স্নান বিধেয়, এবং ব্রহ্মচারী দিনে একবার স্নান করতে পারে। যখনই কেউ জলে স্নান করতে না পারে, তখন সে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ মাধ্যমে মন্ত্রস্নান করে নিতে পারে। (চৈঃ চঃ মধ্য ২৪/৩৩১ তাৎপর্য)

যদি দিনে দু-তিনবার স্নান করতে না পারা যায়, তবে অন্তত দিনে একবার প্রাতঃস্নান করা অবশ্য কর্তব্য। সুতরাং, অতি প্রত্যূষে জলে স্নান করা সকলের পক্ষেই বাধ্যতামূলক।

বারুণ স্নানের অন্যান্য উপলক্ষ্য

সকালে, দুপুরে এবং বিকালে জলে স্নান করা ছাড়াও, নিম্নলিখিত কাজগুলির পরেও ঐ স্নান বিধেয়—দাঁত মাজা, চুল দাড়ি গোঁফ কামানো, হাত-পায়ের নখ কাটা, যৌন সংসর্গ, শ্মশান গমন, রজঃস্বলা অথবা সদ্যপ্রসবা নারীর সংস্পর্শ, কিংবা নগ্ন ব্যক্তি, শববাহক, বা পাপাচারী মানুষের সংস্পর্শ। এই সমস্ত ঘটনার পরে স্নান করলে আপাত শৌচকারী সুফল অর্জন করা ছাড়াও, ঐ ধরনের কার্যকলাপের মাধ্যমে শরীরের মধ্যে যে সমস্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রক্রিয়াগুলির সমূহ বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়, সেইগুলির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রেও জলস্নান বিশেষ কার্যকরী।

স্নানের নিষিদ্ধ সময়াদি

মধ্যরাত্রের ছ'ঘণ্টা (অনাবশ্যক শৈত্যবশত) বা আহার গ্রহণের পরে, পরিপাক ক্রিয়ার বিঘ্ন ঘটতে পারে বলে, স্নান করা নিষিদ্ধ।

সাধারণত পূজা অর্চনা, যজ্ঞাদি, উৎসবাদি, তীর্থদর্শন বা অনুরূপ পুণ্যকার্যের পরে, কিংবা বন্ধুবান্ধব সন্দর্শনের পরেই স্নান করা উচিত নয়। (যেমন, বিবাহ অনুষ্ঠানে, কোনও উৎসবে, বা যজ্ঞক্ষেত্রে, কিংবা কোনও মন্দিরের কাছে চণ্ডালকে স্পর্শ করলেও স্নান করার প্রয়োজন হয় না।)

বৈষ্ণব বস্ত্র পরিধান

বস্ত্র পরিধানের প্রাথমিক বিধি হল এই যে, বিবস্ত্র হয়ে থাকা চলে না। শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন—

নিম্নাঙ্গ বস্ত্রে আবৃত করে রাখা মানব-সভ্যতার নীতি এবং কোনও পুরুষ বা নারী যখন এই নীতি বিস্মৃত হয়, তখন সে অধঃপতিত হয়। ("লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ" গ্রন্থে 'নলকুবের ও মণিগ্রীব উদ্ধার' অধ্যায়ে)

পুরুষ ভক্ত কৌপীন ধারণ করবেন এবং তা ছাড়া একখণ্ড উত্তরীয় আর নিম্নবস্ত্র পরিধান করবেন, কেবলমাত্র নিম্নবস্ত্র পরিধান করা যুক্তিসঙ্গত নয়। যখন পূজা অর্চনা সম্পাদন করতে হয়, তখন দক্ষিণ হস্তটি (ডান হাতটি) অনাবৃত রাখতে হয়; সুতরাং ঊর্ধ্বাঙ্গের চাদরখানি গলা থেকে দুপাশে ঝুলিয়ে রাখতে হয়, ডান হাতের নিচে জড়িয়ে এবং বাঁ কাঁধের ওপরে ছড়িয়ে রেখে, কিংবা কোমরে জড়িয়ে বেঁধে রাখতে হয়। নামাবলী বা হরিনামাঙ্কিত চাদর পরিধান করাও চলে, তবে তা যেন কোমরের নিচে ঝুলে না পড়ে; তা না হলে কখনও-বা তার ওপরে বসে পড়লে নামাপরাধ ঘটতে পারে।*

পুরুষদের পক্ষে আরও একটি অনুশাসন বিধি আছে যে, মন্দিরে শ্রীবিগ্রহের সামনে যেতে হলে কোনও রকম ঊর্ধ্বাঙ্গ পোশাক পরিধান করা অনুচিত। এই বিষয়ে শ্রীল প্রভুপাদ তন্ত্রশাস্ত্রাদি থেকে সংক্ষেপে উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন—

কোনও পুরুষ শ্রীবিগ্রহের সামনে শ্রদ্ধা প্রণতি জানাবার সময়ে তার ঊর্ধ্বাঙ্গে কোনও পোশাক পরিধান করে থাকলে, সে সাত জন্ম কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হওয়ার অভিশাপ পায়। (চৈঃ চঃ অন্ত্য ১২/৩৭ তাৎপর্য)

---

* হরিনামাবলী (অর্থাৎ যে চাদরে পবিত্র হরিনাম ছাপা থাকে), কেবলমাত্র মন্দিরে বা বিগ্রহ কক্ষে বা পূজা, অর্চনা, যজ্ঞাদি কিংবা হরিনাম সংকীর্তনের সময়েই পরিধান করা উচিত। হরিনামাঙ্কিত চাদর কেটে তৈরি পোশাক ভক্তের পরিধান করা অনুচিত। ঊর্ধ্বাঙ্গের পোশাকে বিগ্রহ বা বৈষ্ণব মহাজনের প্রতিকৃতি ছাপা থাকলে ক্ষতি নেই, তবে ঐ ধরনের পোশাক শ্রদ্ধা সহকারে পরিধান করা উচিত, যাতে অপবিত্র জায়গায়, যেমন পায়খানায় যাওয়ার সময়ে পরা না হয়।

দক্ষিণ ভারতে এই বিধি এখনও প্রতিপালিত হয়ে থাকে। ত্রিবান্দ্রামে পদ্মনাভ মন্দিরে শ্রীবিগ্রহ দর্শনার্থী পুরুষদের প্রথমেই জামা শার্ট বাইরে খুলে রেখে ভেতরে যেতে হয়। পূজারীরা ঊর্ধ্বাঙ্গের বস্ত্র পরিধান করেন কোমরে জড়িয়ে। অবশ্য উত্তর ভারতে এই রীতি কঠোরভাবে প্রতিপালন করা হয় বলে মনে হয় না। যদিও এই বিধি সমস্ত পুরুষ ভক্তদের মেনে চলার দরকার না হতেও পারে, তবে পূজারীরা মন্দিরে বিগ্রহ কক্ষে তাঁদের অর্চনা সেবা সম্পাদনার আগে অবশ্যই এই রীতি মেনে চলবেন—বিগ্রহের সামনে প্রণতি জানাবার আগেই চাদর কিছুক্ষণ খুলে রাখবেন।

সাধারণ রীতি হল এই যে, অর্চনা বেদিতে আরোহণের আগে পুরুষ ভক্ত বা পূজারী কোনও ধরনের সেলাই-করা বস্ত্র পরবেন না। এই নিয়মটিও আবার উত্তর ভারতের অনেক মন্দিরে কঠোরভাবে মেনে চলা হয় না; সেখানে প্রায়ই দেখা যায়, পূজারীরা শীতকালে গেঞ্জি বা পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে পূজা করছেন। সেলাই-করা জামা পরা বাদ দেওয়ার উদ্দেশ্যে (কিংবা শীতের দিনে ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা পেতে) পুরুষ পূজারীরা আদৎ রেশম কিংবা মিহি পশমের তৈরি একাধিক চাদর জড়িয়ে পরতে পারেন।

বিগ্রহ অর্চন এবং ভোগ রন্ধনের সময়ে মহিলারা অবশ্যই মাথায় কাপড় দিয়ে শাড়ি পরবেন। তাঁরা কোনও রকমের প্রসাধন গ্রহণ করবেন না এবং মাথার মাঝে চুলে সিঁথি কাটবেন, বিনুনী বা খোঁপা বাঁধবেন।

অপরিচ্ছন্ন এবং অশুদ্ধ বস্ত্রাদি

বিশেষত রান্না এবং শ্রীবিগ্রহ অর্চনের সময়ে কোনও ভক্তেরই নোংরা কাপড় পরা উচিত নয়। যে কাপড় পরবার পরে কেচে ধুয়ে শুকানো হয়নি, তাকেই নোংরা বলা চলে। যে বস্ত্র পরিধান করে ঘুমোনো হয়েছে, মলমূত্র ত্যাগ করা হয়েছে, কিংবা যৌনসংসর্গ করা হয়েছে, তা অপরিচ্ছন্ন বলেই জানতে হবে। যে কাপড় পরা অবস্থায় মদ, মাংস, রক্ত, মৃতদেহ বা ঋতুমতী কোনও নারী স্পর্শ করা হয়েছে, তাও অশুদ্ধ। যে বস্ত্র বাজারের ধোবিখানা থেকে কাচিয়ে আনা হয়েছে এবং যে কাপড় কাচানো হলেও দুর্গন্ধময়, সেটিও অপরিচ্ছন্ন এবং তাই তা বিগ্রহ অর্চনাকালে পরিধানের অযোগ্য।

বিগ্রহ অর্চনের সময়ে নিম্নরূপ বস্ত্রাদি পরিধান করা অনুচিত—বর্ণোজ্জ্বল পোশাকাদি (পুরুষদের ক্ষেত্রে), ভিজে স্যাঁতসেঁতে কাপড়, খুব বেশি লম্বা বা খুব বেশি খাটো মাপের কাপড়, যা ঠিকভাবে পরা যায়নি, সেলাই করা

পোশাক (পুরুষদের ক্ষেত্রে), ছেঁড়া কাপড়, তেলচিটে দাগী কাপড়, কাদা নোংরা কাপড়, পোড়া কাপড় কিংবা জন্তু-জানোয়ারে চিবানো বা পোকা-মাকড়ে কাটা কাপড়। তবে, রেশমী কাপড় বারে বারে না কেচেও অনেকবার পরা চলে, অবশ্য তা যেন কোনও অপবিত্র অশুদ্ধ জিনিসে স্পর্শ না হয় কিংবা অপবিত্র জায়গায় তা পরিধান করে যাওয়া না হয়।

রং-না-করা আদৎ মট্‌কা (অহিংস) রেশমী কাপড় পূজা-অর্চনার সময়ে পরিধান করাই সব চেয়ে ভাল। ভেড়ার লোমের পশম সর্বদাই শুদ্ধ বলা হয়ে থাকে, কিন্তু তা হলেও কোনও সাধারণ পশমী পোশাক শ্রীবিগ্রহ অর্চনের সময়ে না পরাই উচিত। কারণ পশমের আঁশ বা শুঁয়ো শ্রীবিগ্রহের উপচারাদির ওপর খসে পড়তে পারে। যাই হোক, পশম যদি খুব হালকা সূক্ষ্ম ধরনের হয়, তা হলে তার পোশাক পরা যেতে পারে, যা থেকে পশমের টুকরো খসে না পড়ে; এই ধরনের পশমী পোশাক কেবলমাত্র পূজা অর্চনার সময়ে পরবার জন্যই বরাদ্দ করে রাখা উচিত। শ্রীবিগ্রহ অর্চনাকালে সিনথেটিক জামা-কাপড় পরা অনুচিত।

বস্ত্রের বর্ণ

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধারায়, ব্রহ্মচারী এবং সন্ন্যাসীরা, এবং যে সব বানপ্রস্থী তাঁদের স্ত্রীসঙ্গে বাস করেন না, তাঁরাও গৈরিক বস্ত্র ধারণ করে থাকেন। স্ত্রীসঙ্গে বসবাস করেন যে সকল গৃহস্থ এবং বানপ্রস্থী, তাঁরা শুভ্র কিংবা পীত বসন পরিধান করে থাকেন। তা ছাড়া, সচরাচর দীক্ষাগ্রহণের পূর্বে ব্রহ্মচারী এবং অবিবাহিত ভক্তরা শুভ্রবস্ত্র পরিধান করেন, যেহেতু গৈরিক বস্ত্র কেবলমাত্র ত্যাগী পুরুষদের জন্যই নির্ধারিত। উৎসবাদি উপলক্ষ্যে পূজারীরা বিশেষ বর্ণের ধূতি চাদর পরতে পারেন।

বিগ্রহ অর্চনের কক্ষে মোজা পরা অনুচিত। (ঠাণ্ডার দিনে, খানিকটা কুশাসন, মাদুর বা কাপড় পূজার সময়ে মেঝের ওপরে বিছিয়ে নেওয়া যেতে পারে।)

পোশাক পরা হয়ে গেলে সামান্য আচমন করে নিতে হয়।

বৈষ্ণব-চিহ্ন

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে (মধ্য ২৪/৩৩৩) উল্লেখ আছে—

"তারপর তুমি বর্ণনা কর, কিভাবে গোপীচন্দন দিয়ে দেহ অলঙ্কৃত করতে হয়, তুলসীমালা ধারণ করতে হয়......"

আর ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে আমরা এই অনুচ্ছেদটি পাই—

"যাঁরা গলায় তুলসী মালা ধারণ করেন, যাঁরা শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রতীকী লক্ষণাদি সহ বিষ্ণু মন্দির রূপ তাঁদের শরীরের দ্বাদশ অঙ্গে চিহ্নাদি ধারণ করেন, এবং যাঁরা তাঁদের কপালে বিষ্ণু-তিলক সেবা করে থাকেন, এই পৃথিবীতে তাঁদের ভগবান বিষ্ণুর ভক্তরূপে গণ্য করা হয়। তাঁদের উপস্থিতি এই জগৎকে পরিশুদ্ধ করে তোলে, এবং যে স্থানেই তাঁরা বিরাজ করেন, সেই স্থানটিকেই তাঁরা বৈকুণ্ঠধামের মতো পুণ্য পবিত্র করে তোলেন।" (পদ্মপুরাণ থেকে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থের ৯ম অধ্যায়ে উদ্ধৃত)

শরীরে উর্ধ্বপুণ্ড্র বিষ্ণুতিলক ধারণ

শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ তাঁর নিম্নলিখিত *শ্রীমদ্ভাগবত* তাৎপর্য অংশে তিলক ধারণের মাহাত্ম্য এইভাবে বিবৃত করেছেন—

কলিযুগে মানুষের পক্ষে স্বর্ণ ও রত্নালঙ্কার সংগ্রহ করা প্রায় সম্ভব নয় বললেই চলে, কিন্তু শরীরের দ্বাদশ অঙ্গে তিলক ধারণ করা দেহ পবিত্র করার পর্যাপ্ত শুভ অলঙ্করণ। (ভাগবত ৪/১২/২৮)

নিচে উদ্ধৃত পত্রগুলির মাধ্যমেও শ্রীল প্রভুপাদ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—

তোমাদের পোশাক সম্পর্কে যা বলবার, তা নগণ্য ব্যাপার। কিন্তু সৈন্য হিসাবে তোমরা জানো যে, প্রত্যেক সৈন্যকেই বাহিনীর আদবকায়দা অনুসারে একটা সমান ধরনের পোশাক পরতেই হয়। সুতরাং কৃষ্ণভাবনামৃত সেনাবাহিনীর অন্তত কপালে সকল ক্ষেত্রেই তিলক সেবা করা একান্ত প্রয়োজন। তোমার কর্মক্ষেত্রে তুমি নৌবাহিনীর সেবাসূচক ইউনিফর্ম পোশাক পরতে পার; তেমনই, কৃষ্ণভাবনাময় একজন সৈন্য হিসাবে তুমি যদি তোমার কপালে তিলক সেবা কর, তাতে তোমার তেমন কোনও আপত্তি হতে পারে না। (শ্রীল প্রভুপাদের লেখা চিঠি, ৩অগাস্ট ১৯৬৯)

কোনও সন্ন্যাসী ছাড়া তোমরা প্রত্যেকেই অতি আধুনিক ফিটফাট আমেরিকান ভদ্রলোকের পোশাক পরে থাকতে পার, কিন্তু সকলে

অবশ্যই তিলক ইত্যাদি অবশ্যই ধারণ করবে, যে বিষয়ে আমি আগেই উল্লেখ করেছি। (শ্রীল প্রভুপাদের লেখা চিঠি, ১১ অক্টোবর ১৯৬৭)*

পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান করার পরে, একটি শুদ্ধ আসনে (যথাসম্ভব কুশাসন মাদুরে) উপবেশন করতে হয় এবং *ঊর্ধ্বপুণ্ড্র*, অর্থাৎ *বিষ্ণুতিলক* দ্বাদশ অঙ্গে ধারণ করতে হয়।

তিলক বলতে বোঝায় বিবিধ উপাদান ব্যবহার করে শরীরে চিহ্নাদি ধারণ। *ঊর্ধ্বপুণ্ড্র* বলতে বোঝায় ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শরণাগত হওয়ার নিদর্শন স্বরূপ কপালে এবং শরীরে অন্যান্য অঙ্গে দুটি সমান্তরাল উল্লম্ব (খাড়া) রেখা চিহ্ন। *পদ্মপুরাণ* এবং *যজুর্বেদ* গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, *ঊর্ধ্বপুণ্ড্র* চিহ্ন শ্রীবিষ্ণুর চরণকমলের প্রতীক চিহ্ন। শরীরের যে দ্বাদশ অঙ্গে আমরা *ঊর্ধ্বপুণ্ড্র* চিহ্ন ধারণ করে থাকি, সেগুলিও কাল্পনিক স্থান নয়। সেগুলি হল অতি সংবেদনশীল স্থান যেখানে মনে মনে ভগবানের নামরূপ ও শ্রীবিষ্ণুর নাম স্মরণ মাধ্যমে চিহ্ন ধারণের সঙ্গে সঙ্গে অনায়াসেই তার পারমার্থিক শক্তি দেহের মধ্যে অভিষিক্ত হয়ে যায়।

পদ্মপুরাণে একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, যজ্ঞ, দান, কৃচ্ছ্রতা, বেদ অধ্যয়ন, সন্ধ্যাহ্নিক (যেমন, গায়ত্রী জপ), কিংবা যে কোনও পারমার্থিক কার্যকলাপ অনুষ্ঠানের আগে *ঊর্ধ্বপুণ্ড্র* ধারণ আবশ্যক কর্তব্য। *ঊর্ধ্বপুণ্ড্র* ধারণ ব্যতীত মানুষ মৃত ব্যক্তি ছাড়া আর কিছু নয়, এবং আনুভূমিক (আড়াআড়ি) রেখায় যে তা ধারণ করে—*ঊর্ধ্বপুণ্ড্র* চিহ্নের উল্লম্ব রেখার দ্বারা অঙ্কিত বিষ্ণু-মন্দিরকে ভেঙে দেয়—সে নরকগামী হয়। *পদ্মপুরাণে* পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, ঐ ধরনের কোনও মানুষকে দর্শন করলেই তৎক্ষণাৎ সবস্ত্র সূর্যদর্শন অথবা নদীতে কিংবা দীঘিতে অবগাহন স্নান করে যে কোনও উপায়ে পরিশুদ্ধ হতে হয়।

---

* মন্দিরকক্ষে ভক্তেরা এমন কোনও শার্ট, সোয়েটার কিংবা জ্যাকেট পরে আসা পরিহার করে চলেন, যাতে ভগবদ্ভক্তিবিমুখ, আজেবাজে অর্থহীন স্লোগান কিংবা বিজ্ঞাপন ছাপা থাকে, কারণ সেগুলি ভক্তিভাবে বিঘ্ন সৃষ্টি করে থাকে। তেমনি, বৈষ্ণবেরা, মন্দিরের মধ্যে প্যান্ট এবং পাশ্চাত্য পোশাকাদি পরে আসা যথাসম্ভব বর্জন করতেই চান। তা ছাড়া, শীতের ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা পাবার উদ্দেশ্যে যদি টুপি পরতেই হয়, তবে সেটা যেন সেই জন্যেই কেবল কাজে লাগানো হয়—সাজগোজ দেখাতে কিংবা লোকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে নয়। মন্দিরের বাইরে আমাদের সেবা কার্যের জন্যে প্রয়োজন যে কোনও ধরনের পোশাকই আমরা পরতে পারি। কিন্তু তবু আমাদের খেয়াল রাখা উচিত যেন আমাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভদ্রস্থ দেখায়। যে কোনও ক্ষেত্রেই, বৈষ্ণব তিলক ধারণের গুরুত্ব শ্রীল প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন। যেখানেই সম্ভব আমাদের বৈষ্ণবরূপে প্রকাশ্যে পরিচয় ঘোষণায় অভ্যস্ত হওয়া উচিত।

সেই পরিপ্রেক্ষিতে, তুলনীয়ভাবে বলতে গেলে, বৈষ্ণব তিলকধারী কোনও মানুষকে দর্শন করা অতীব মঙ্গলজনক। *পদ্মপুরাণে* পার্বতীর উদ্দেশ্যে দেবাদিদেব শিব বলেছেন, তিলকধারী বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ দর্শন হলে সর্বপাপমুক্ত হওয়া যায়, এবং ভক্তিভরে সেই বৈষ্ণবের নাম স্মরণ করলে নিজের সর্বস্ব দান করে দেওয়ার ফললাভ হয়ে থাকে। *ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে* ভগবান বলেছেন, "চণ্ডাল হলেও কেউ যদি মৃত্যুকালে বিষ্ণুতিলক ধারণ করে, তবে বৈকুণ্ঠ বিমান তাকে আমার পরম ধামে তুলে নিয়ে আসে। বৈষ্ণব তিলকধারী কোনও মানুষকে কেউ যদি গৃহে আমন্ত্রণ করে ভোজন করায়, তবে সেই ব্যক্তির বিংশ বংশানুক্রমে সমস্ত পূর্বপুরুষদের নরক থেকে উদ্ধার করে থাকি।"

ভক্ত যদি তাঁর শরীরে ভগবানের চিহ্ন ধারণ করে তাঁর নাম জপ করেন, তবে ভগবান প্রসন্ন হয়ে তাঁর সাথে বিরাজ করতে থাকেন। এইভাবে তাঁর জড়জাগতিক শরীরটি পরমেশ্বর ভগবানের পুণ্যপবিত্র মন্দিরে পরিণত হয়ে যায়। *ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে* উল্লেখ আছে যে, আয়নায় কিংবা জলে নিজের মুখের প্রতিবিম্ব দর্শন করে অতীব সযত্নে যে ভক্ত তিলক সেবা করে থাকেন, তিনি পরমেশ্বর ভগবানের পরমধাম লাভ করেন।

শরীরের দ্বাদশ অঙ্গে, যথা—কপালে, নাভিতে, বক্ষে, কণ্ঠদেশে, উদরের দু'পাশে, দুই বাহুতে, দুই কাঁধে, পিঠের উপরে এবং পিঠের নিচে—এই অঙ্গগুলিতে তিলক ধারণ এবং বিষ্ণুনাম উচ্চারণের মাধ্যমে শরীর পরিশুদ্ধ হয়ে ভগবানের সেবায় উৎসর্গ লাভ করে।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সম্প্রদায়ভেদে *ঊর্ধ্বপুণ্ড্র* তিলক চিহ্ন আকৃতি, বর্ণ এবং উপাদান অনুসারে ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু অন্যান্য লক্ষণগুলি প্রত্যেকেই মেনে চলেন। এই তিলক চিহ্ন আঁকাবাঁকা, অসমান, একপাশে, নোংরা অপরিচ্ছন্ন, কিংবা দুর্গন্ধময় হওয়া অনুচিত। কপালে ভ্রূযুগল থেকে মাথার চুল পর্যন্ত দুটি তিলক রেখার মধ্যবর্তী অংশ উন্মুক্ত (ফাঁকা) থাকা চাই, তবে নিচের অংশে সংযুক্ত করা থাকবে। নিচের ভরাট অংশটুকু নাসিকার ওপরে চারভাগের তিনভাগ অংশ নেমে যেতে পারে। শাস্ত্রে বলে, মধ্যভাগে শ্রীবিষ্ণুর অবস্থান, এবং বাঁদিকে ব্রহ্মা আর ডানদিকে শিবের অধিষ্ঠান হয়।

তিলকের উপাদান

ভস্ম যেহেতু তামসিক অজ্ঞানতার প্রতীক, এবং রক্তচন্দন হল রাজসিক প্রবৃত্তির প্রতিফলন, তাই তিলক সেবায় এইগুলির প্রয়োগ নিষিদ্ধ। মৃত্তিকা সত্ত্বগুণাশ্রিত, সুতরাং তা ব্যবহার যোগ্য। শাস্ত্রাদিতে বিশেষ করে দ্বারকা থেকে

সংগৃহীত বিশেষ মৃত্তিকা *গোপীচন্দনের* মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। এটি এমনই পবিত্র যে, গোহত্যাকারী কিংবা তেমন কোনও পাপীও গোপীচন্দন স্পর্শমাত্র পাপমুক্ত হতে পারে। *স্কন্দপুরাণে* ঘোষণা করা হয়েছে যে, যিনি তুলসী, শঙ্খ, শালগ্রাম শিলা, দ্বারকাচক্র এবং গোপীচন্দন তাঁর গৃহে রাখেন, তাঁর নরক গমনের আশঙ্কা থাকে না। *গরুড়পুরাণ* সুনিশ্চিতভাবে আশ্বাস দিয়েছে যে, কেউ যদি যথাযথভাবে মন্ত্র উচ্চারণ না করেও শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করতে থাকে কিংবা যথাযথভাবে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করতে না পারে, তা হলে *গোপীচন্দন** ধারণ করে থাকলেই সে ঐ সমস্ত ক্রিয়াকর্মের স্থায়ী সুফল অর্জন করে থাকে। *পদ্মপুরাণে* যমরাজের উপদেশ উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, গোপীচন্দন এবং তুলসী বৃক্ষের গোড়া থেকে সংগৃহীত মৃত্তিকা মিশিয়ে তিলকের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান তৈরি হয়। এই সমস্ত কোনটাই না পাওয়া গেলে, *পদ্মপুরাণের* বিধান অনুসারে পর্বতশিখর থেকে, নদীতট থেকে, দীঘিপাড় থেকে, বিল্ববৃক্ষের গোড়া থেকে, সমুদ্রতীর, উঁইঢিবি কিংবা শ্রীরঙ্গম, বেঙ্কটগিরি, কূর্মক্ষেত্র, বরাহক্ষেত্র, নরসিংহতীর্থ, দ্বারকা কিংবা প্রয়াগতীর্থ থেকে মৃত্তিকা সংগ্রহ করা চলে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে বৃন্দাবনধামের শ্রীরাধাকুণ্ডের কর্দম থেকেও তিলক ধারণ করতে পারা যায়। যে চন্দন ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সেবায় অর্পণ করা হয়েছে, তা থেকে তিলক ধারণ করা চলে। এই সবের কোনটাই না পাওয়া গেলে, শ্রীবিগ্রহের চরণামৃত সংগ্রহ করে, তাই দিয়েও তিলক সেবা করা চলে। চরণামৃতের অভাবে শুদ্ধ জল দিয়েও তিলক সেবা করা যেতে পারে।

মুদ্রা-ধারণ

মুদ্রা মানে প্রতীক। মুদ্রাধারণ বলতে বোঝায় ভগবানের বিভিন্ন প্রতীক, যেমন শঙ্খ বা চক্র ইত্যাদির চিহ্ন শরীরে ধারণ করা। কোনও কোনও সম্প্রদায়ে দীক্ষার সময়ে কিংবা চাতুর্মাস্য ব্রতের শুরুতে দ্বাদশী তিথি উপলক্ষ্যে মুদ্রাগুলি স্থায়িভাবে কিংবা মাঝে মাঝে গরম ছাপ ব্যবহার করে দেহের বিভিন্ন অঙ্গে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। অবশ্য, গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা গোপীচন্দন দিয়েই মুদ্রাচিহ্ন ধারণ করে থাকেন। ভগবানের নামাবলীও গোপীচন্দন দিয়ে শরীরে (কপালে এবং বক্ষে) ছাপ লাগিয়ে বা লিখে রাখা যেতে পারে। এটাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মধ্যে সাধারণত প্রচলিত।

---

* শ্রীল প্রভুপাদ নিউ ইয়র্কে ভক্তদের পরামর্শ দিতেন তারা যেন তাদের তালুতে তরল গোপীচন্দন মিশ্রণের সময়ে নষ্ট না করে—"গোপীচন্দনের অপচয় কোর না। অতি মূল্যবান জিনিস।"

তুলসী কণ্ঠীমালা

ঊর্ধ্বপুন্ড্রের মতোই, কণ্ঠদেশে তুলসীমালা জড়িয়ে রাখার মাধ্যমে ভগবানের শরণাগত হয়ে থাকাই বোঝায় এবং সেই জন্যই কণ্ঠে তুলসীমালা ধারণকারী মানুষ ভগবানের প্রিয়জন। তবে যারা বৈষ্ণবের অনুকরণ করবার ছলেই তুলসী কণ্ঠীমালা ধারণ করে থাকে অথচ গুরুত্ব সহকারে ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণের চেষ্টা করে না, সে বিষম অপরাধী। কোনও কোনও ভক্ত অন্যান্য ধরনের উপাদানে তৈরি পবিত্র মালাও ধারণ করে থাকেন—তুলসী, পদ্মবীজ, শ্রীজগন্নাথের রথরজ্জু, কিংবা পবিত্র রেশম থেকে তৈরি সেই মালা ধারণ করে পূজা, জপ এবং অন্যান্য পবিত্র সেবাকার্য করা চলে, তবে স্নানের সময়ে কিংবা মন্দির বা গৃহ থেকে বেরুনোর সময়ে এগুলি খুলে রাখা কর্তব্য। কণ্ঠীমালা সর্বক্ষণের জন্য স্থায়িভাবে ধারণ করে থাকতে হয়, কারণ ঐ গুটিগুলি দুঃস্বপ্ন, দুর্ঘটনা, অস্ত্রাঘাত এবং যমদূতদের কবল থেকে রক্ষা করে থাকে। তুলসীমালা দেখলেই যমদূতেরা বায়ুতাড়িত শুষ্কপত্রের মতোই দিগ্বিদিকে পলায়ন করে।

আচমন

আমরা দেখেছি, *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে—

গোপিকারা প্রথমে ডান হাত থেকে জল পান করে আচমন সম্পন্ন করলেন। তাঁরা ন্যাসমন্ত্র দ্বারা তাঁদের দেহ ও হাত পরিশুদ্ধ করে নিলেন এবং সেই একই মন্ত্র শিশুটির দেহেও প্রয়োগ করলেন। (ভাগবত ১০/৬/২১)

আচমন, অর্থাৎ হাত থেকে জল পান হল শুদ্ধিকরণের পদ্ধতি। শরীর জলমগ্ন করে যেমন দেহের শুদ্ধি এবং সূক্ষ্ম শুচিতা অর্জন করা হয়, তেমনি মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে জলপান করলেও সেই রকম কাজ হয়। তাই যেক্ষেত্রে শুদ্ধিকরণ প্রয়োজন, কিন্তু স্নান করা অসুবিধাজনক, সেক্ষেত্রে আচমন বিধি প্রযোজ্য।

আচমনের সাধারণ প্রক্রিয়া এই রকম—ডান হাতের অঞ্জলিতে নেওয়া জলের দিকে তাকিয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করে তা পান করতে হয়। তারপরে, আরও যত মন্ত্র উচ্চারণ করা হবে, ততই ঊর্ধ্বাঙ্গের বিভিন্ন অংশে স্পর্শের মাধ্যমে আপনার ইন্দ্রিয়াদির শুদ্ধিকরণ করে নিতে থাকবেন। সকল প্রকার আচমনেরই মূল পদ্ধতি একই ধরনের। জল পান করবার সময়ে যে সব মন্ত্রাদি উচ্চারিত হয়ে থাকে, পার্থক্য থাকে সেইগুলিরই মধ্যে। সেই অনুসারে, বিভিন্ন উৎসব

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের বৈদিক, পৌরাণিক, শৈব, তান্ত্রিক এবং বৈষ্ণব রীতি অনুসারে আচমন করা হয়ে থাকে।

বৈষ্ণব আচমন রীতি বর্ণনা প্রসঙ্গে *হরিভক্তিবিলাস* গ্রন্থে *কাশীখণ্ড*, *যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতি*, *ভরদ্বাজ-স্মৃতি*, *কূর্ম পুরাণ* এবং *বিষ্ণু পুরাণ* থেকে উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হয়েছে। এই সব নিয়মাবলীর সারমর্ম নিচে দেওয়া হল—

তিলক সেবা, গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ ও জপ, পূজা ও হোম সমাপন, ব্রত পালন, প্রসাদ গ্রহণ, শাস্ত্র বা মন্ত্রাদি পাঠ বা আবৃত্তি, এবং ধ্যান করার মতো পারমার্থিক কর্তব্যকর্ম সাধনের আগে দেহ ও মনের শুদ্ধতা অর্জনের উদ্দেশ্যে ভক্তের আচমন করা উচিত।* এছাড়া শয্যাত্যাগ, স্নান, পোশাক পরিধান, অধরোষ্ঠ স্পর্শ, প্রসাদ গ্রহণ, অশুদ্ধ স্থানে গমন এবং থুথু কফ ফেলবার পরে আচমন করবার কথা বলা হয়েছে। এমন কি, অশুদ্ধ বাক্য উচ্চারণ, অশুদ্ধ বস্তু স্পর্শ এবং ভ্রমণ থেকে ফিরে আসবার পরেও আচমনের পরামর্শ দেওয়া আছে। হোম অনুষ্ঠানের আগে, গায়ত্রী মন্ত্র জপ, আহার গ্রহণ, দান সমর্পণ করবার আগেও আচমন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শ্মশানঘাট থেকে ফিরে, ঠোঁটে হাত দিয়ে এবং চণ্ডালশ্রেণীর মানুষের সাথে কথা বলার পরেও আচমন করা উচিত বলে শাস্ত্রে উল্লেখ আছে।

যে জায়গায় ভক্ত আচমন করবেন, সেটি যেন শুদ্ধ থাকে—যেমন, চুল, হাড়গোড়, ছাইভস্ম কিংবা অন্য ধরনের অপবিত্র বস্তু সেখানে যেন না থাকে।

আচমনের জল ঠাণ্ডা পরিষ্কার হওয়া চাই, তাতে কোনও ফেনা বা দুর্গন্ধ থাকবে না, এবং নখ, চুল বা অন্য কোনও রকমের অপবিত্র সামগ্রীর স্পর্শ লাগবে না। বৃষ্টির জলে রজোগুণের স্পর্শ থাকে, সেই কারণে আচমনে তা ব্যবহার অনুচিত।

পারমার্থিক ক্রিয়াকলাপের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হওয়ার উদ্দেশ্যে আচমনের সময়ে মাথায় বা কণ্ঠে কোনও বস্ত্রের আবরণ থাকবে না; তখন উপবীত ধারণ, শিখাবন্ধন, কৌপীনধারণ, হাত-পা প্রক্ষালন করা দরকার, জুতো পরা, বা দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় আচমন অনুচিত; আচমনকালে বসার সময়ে হাঁটু বা পা যেন দেখা না যায়।

---

* উল্লিখিতভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা সাধারণত পারমার্থিক ক্রিয়াকলাপের আগে আচমন করে থাকেন। শারীরিক ক্রিয়াকলাপ যা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলির ক্ষেত্রে খুব কমই তাঁরা আচমন করে থাকেন, যদি তার পরে কোনও পারমার্থিক ক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয়, তখন আচমন করেন। শুচিতার বিধি প্রতিপালনের উদ্দেশ্যে ভক্তরা যাঁরা বিগ্রহ অর্চন করেন, তাঁরা এই বিধানগুলি জেনে রাখবেন। শুদ্ধতা ও শুচিতা বিষয়ে আরও বিশদভাবে জানতে হলে পরে 'শুদ্ধিবিচার' পর্যায়ের আলোচনা পাঠ করতে হবে।

গায়ত্রীমন্ত্র জপ

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/২৭/১১) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে নির্দেশ দিচ্ছেন—

'আমার প্রতি সংকল্পযুক্ত হয়ে বেদবিহিত ত্রিসন্ধ্যা উপাসনাদি এবং গায়ত্রী জপের মাধ্যমে আমার পূজা করলে ভক্ত শুদ্ধ চিত্তে কর্মফলাদি থেকে মুক্ত হয়।'

ব্রাহ্মণ-দীক্ষাপ্রাপ্ত ভক্তেরা প্রত্যহ ব্রহ্ম-গায়ত্রী এবং পঞ্চরাত্রিক গায়ত্রী মন্ত্রাদি ত্রিসন্ধ্যা (সূর্যোদয়, মধ্যাহ্ন এবং সূর্যাস্তকালে) জপ করে থাকেন। (ব্রাহ্মণ-দীক্ষাপ্রাপ্ত ভক্তেরা যে সকল মন্ত্রাবলী জপ করে থাকেন, সেইগুলির মধ্যে ব্রহ্ম-গায়ত্রী, যাকে সূর্যগায়ত্রীও বলা হয়, সেটি প্রথম গায়ত্রী মন্ত্র রূপে জপ করেন)। প্রধান সাধন চর্চা হিসাবে ভগবানের নাম শ্রবণ এবং জপ কীর্তনের গুরুত্ব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যেমন স্বীকার করেছেন, তেমনই তিনি নিজের জীবনাদর্শের দৃষ্টান্ত দিয়েও দেখিয়েছেন যে, পারমার্থিক উন্নতি সাধনে যারা আগ্রহী, তাদের পক্ষে অবশ্যই বৈষ্ণব (পঞ্চরাত্রিক) দীক্ষা গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য। পঞ্চরাত্রিক দীক্ষার মাধ্যমে ভক্ত যে সব মন্ত্রলাভ করেন, সেইগুলির সাহায্যে তাঁর অস্থির চিত্তকে তিনি বশীভূত রাখবার উপযোগী শুদ্ধতা অর্জন করেন এবং সেই সব মন্ত্রও লাভ করেন, যা বিগ্রহ অর্চনায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সুতরাং পবিত্র নাম জপ এবং সদ্‌গুরুর কাছ থেকে পঞ্চরাত্রিক মন্ত্র লাভ করা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আন্দোলনের মূল বিষয়বস্তু। বৈদিক দীক্ষার (উপনয়ন সংস্কার) মাধ্যমে ভক্তের ব্রহ্ম-গায়ত্রী মন্ত্র লাভ করার ব্যাপারে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা কারণে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। তবে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর পঞ্চরাত্রিক দর্শনতত্ত্ব অনুসারে এই বৈদিক দীক্ষা সংস্কার অনুশীলন করতেন, যাতে কোনও দীক্ষিত বৈষ্ণব কোনও ব্রাহ্মণের চেয়েও যোগ্যতাসম্পন্ন হতে পারেন। এই কারণেই তিনি যখন বৈষ্ণব পঞ্চরাত্রিক দীক্ষা দিতেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি বৈদিক মন্ত্রও (ব্রহ্ম-গায়ত্রী) প্রদান করতেন। এইভাবেই তিনি তাঁর শিষ্যসমূহকে বৈদিক দীক্ষা প্রদান করতেন। শ্রীল প্রভুপাদও তাঁর গুরুদেবের পদাঙ্ক অনুসরণে বৈদিক ও পঞ্চরাত্রিক দীক্ষা পদ্ধতি যুগ্মভাবে প্রচলিত করে গিয়েছেন। যে সমস্ত বৈষ্ণব তাঁদের গুরুদেবের কাছ থেকে এই মন্ত্র-দীক্ষা লাভ করেছেন, তাঁরা আজীবন তাঁদের গুরুর আদেশে ত্রিসন্ধ্যা এই গায়ত্রী মন্ত্রাবলী জপচর্চায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে থাকেন।

গায়ত্রী মন্ত্র জপের এই পারমার্থিক অনুশীলন আজীবন প্রত্যহ করতে হয়, তাই অপরাধশূন্য হয়ে শুদ্ধভাবে তা জপ করা উচিত। মন্ত্রাবলী জপের আগে, আচমন, প্রোক্ষণ, এবং ভূতশুদ্ধি করে নিতে পারা যায়। এইগুলি মনঃসংযোগে সহায়তা করে।

গায়ত্রী মন্ত্রাবলী যথাসময়ে যে জপ করে না, সে ত্রিসন্ধ্যার অধিষ্ঠাত্রী গায়ত্রী-দেবীর অবমাননা করে বলে গণ্য করা হয়।* অবশ্য, স্থানীয় সময় অনুসারে সঠিকভাবে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের সময়ানুবর্তিতা মেনে চলা কঠিন নয়, বিশেষত উত্তরপ্রান্ত এবং দক্ষিণপ্রান্তের দেশগুলিতে। পূজারীরা বিগ্রহ অর্চনার আগে আনুষঙ্গিক সেবাকার্যের সূচনা করবার সময়ে প্রাতঃকালে অবশ্যই গায়ত্রী মন্ত্র জপ করে নেবেন, অন্যেরা দর্শন-আরতির কিছু আগে সকালে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করে নিতে পারেন। যদি সকালে গায়ত্রী মন্ত্র জপ বাদ পড়ে যায়, তা হলে দুপুরে দু'দফা গায়ত্রী মন্ত্র জপ করে নেওয়া উচিত। দুপুরে বিগ্রহের ভোগ নিবেদনের সময় থেকে বিকালে বিগ্রহাদির বিশ্রামকালীন সময়ের মাঝেই দুপুরের জন্য নির্ধারিত গায়ত্রী জপ সম্পন্ন করতে হয়। যদি সকাল ও দুপুরে দু'বারেই গায়ত্রী জপে অবহেলা হয়ে যায়, তবে সন্ধ্যাহ্নিকের সময়ে তিন দফা মন্ত্র উচ্চারণ করে নেওয়াই উচিত। সন্ধ্যায় বিগ্রহাদি শয়নে গমনের আগেই সান্ধ্য গায়ত্রী জপ সমাপন হয়ে যাওয়া উচিত। যদি অস্বাভাবিক পরিবেশে মনোনিবেশ সহকারে গায়ত্রী জপ করা কঠিন বা অসম্ভব হয়ে ওঠে, তা হলে নিজের বিবেচনা অনুযায়ী সাময়িকভাবে স্বাভাবিক ত্রিসন্ধ্যা সূচির সামঞ্জস্য করে নিয়ে গায়ত্রী জপ সমাপন করা উচিত।

শুদ্ধ, পবিত্র, শান্তিপূর্ণ পরিবেশে, সর্বোত্তম বলতে শ্রীবিগ্রহের সামনে বসে গায়ত্রী জপ করাই উচিত। (অবশ্য, অতি প্রত্যূষে শ্রীবিগ্রহের উত্থানের আগে এটা সম্ভব হবে না, তবে দুপুরে এবং সন্ধ্যায় এটা সম্ভব।) শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন—

> *ভক্তের পক্ষে ভগবানের স্বরূপের পূজা করা অপরিহার্য। কেবল গুরু প্রদত্ত মন্ত্র জপ করে মনে মনে ভগবানের রূপের ধ্যান করাই যথেষ্ট নয়। (ভাগবত ৪/৮/৫৬ তাৎপর্য)*

শাস্ত্রে নির্দেশ আছে, পূর্বমুখো বসে সকালে ও দুপুরে এবং উত্তরমুখো হয়ে সন্ধ্যা আহ্নিক করতে হয়। এই বিধি বিশেষ করে তখনই পালনীয়, যখন

* শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নির্দেশ করেছেন যে, ভগবানের মহিমা কীর্তনের মাঝে নিয়োজিত থাকার ফলে গায়ত্রী মন্ত্র জপের সময় যদি অতিক্রান্ত হয়ে যায়, তবে সেটা নির্ধারিত সন্ধ্যাহ্নিক থেকে বিচ্যুতি নয়, কারণ ভগবানের মহিমা কীর্তন করাই তো গায়ত্রী জপের মূল উদ্দেশ্য। তা সত্ত্বেও, উপযুক্ত কোনও এক সময়ে গায়ত্রী জপের বিচ্যুতি পূরণ করে নেওয়াই ভক্তের উচিত।

বাইরে থাকতে হয়, কিংবা যেখানে কোনও মন্দির বা বিগ্রহ নজরে আসে না। কিন্তু যখন বিগ্রহের সমক্ষে কিংবা গুরুদেবের প্রতিকৃতির সামনে থাকা যায়, তখন স্বাভাবিকভাবেই বিগ্রহ বা গুরুদেবের দিকে তাকিয়ে জপ করাই বিধেয়—তখন দিকনির্ণয়ের বিধি অনাবশ্যক। (উৎসব অনুষ্ঠানে প্রায়ই পূর্বমুখো হয়ে বিগ্রহ অর্চনা করা হয়।)

কোনও নদীতে হাঁটুজলে বা কোমরজলে দাঁড়িয়ে, কিংবা নদীর তীরে বসে বা দাঁড়িয়েও গায়ত্রী জপ করা যায়। চলন্ত গাড়িতে জপ না করাই উচিত, যেহেতু তখন মানসিক চঞ্চলতা হওয়াই স্বাভাবিক; বিছানায় বসেও জপ করা উচিত নয়, কারণ সেটা তো অশুদ্ধ হয়েই আছে। শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্যই, মন্দিরের দিকে পিছন হয়ে, কোনও জলাশয়, অগ্নিকুণ্ড কিংবা বটবৃক্ষের দিকে পিছন ফিরে জপ করা অনুচিত। জপের আগে ভালভাবে স্নান করে, পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করে, বৈষ্ণবতিলক সেবা ও শিখাবন্ধন করে নেওয়া উচিত। গায়ত্রী জপের সময়ে উর্ধ্বাঙ্গের বস্ত্র দিয়ে হাতগুলি ঢেকে রাখা উচিত, এবং নীরবে জপ করা দরকার। যদিও গায়ত্রী মন্ত্র জপের সময়ে উপবীত ধারণ জপের অঙ্গ নয় বলেই মনে করা হয়, তবে প্রথাগতভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা জপের সময়ে তাঁদের উপবীতখানি ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে আড়াই পাক জড়িয়ে রাখেন। শ্রীল প্রভুপাদও তা-ই করতেন।

যে মন্ত্র জপ করা হচ্ছে, তার অর্থ জেনে নেওয়া উচিত। মন্ত্র জপের সময় একাগ্রচিত্ত হতে হবে এবং একই সাথে কথা বলা, এদিক-ওদিকে তাকানো, সামনে-পিছনে দোলা—এসব অনুচিত। হাই তোলা, ঝিমনো, চুলকান, নাক পরিষ্কার করা—এসব জপের সময়ে নিষিদ্ধ। গায়ত্রী জপের সময়ে কোনও প্রবীণ ভক্ত এসে পড়লে, গায়ত্রী জপ বন্ধ করে, তাঁকে যথাযথভাবে অভ্যর্থনা জানানো উচিত এবং তার পরে তাঁর অনুমতি নিয়ে আবার জপ শুরু করাই কর্তব্য।

যজ্ঞোপবীত

শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন—

পবিত্র যজ্ঞোপবীত হচ্ছে আচার্যের কাছে বেদ-পাঠের উপযুক্ত যোগ্যতা লাভের স্বীকৃতি।...সদ্‌গুরু কেবল ঐকান্তিক অকপট তত্ত্বানুসন্ধানীকেই তাঁর শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন এবং তাকে উপনয়নের মাধ্যমে যজ্ঞোপবীত দান করেন। (ভাগবত ১/২/৩ তাৎপর্য)

বৈদিক যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি গায়ত্রী মন্ত্র গ্রহণ করলে তাঁকে উপবীত প্রদান করা হয়ে থাকে। এর তাৎপর্য এই যে, তিনি পারমার্থিক গুরু গ্রহণ

করেছেন এবং তিনি বেদ পাঠের যোগ্য। আপৎকালে উপবীতটিকেই উত্তরীয় স্বরূপ গণ্য করা হয়ে থাকে, কারণ কোনও সময়ে ভক্তের শরীরে উত্তরীয় না থাকলেও কোন উৎসব অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে হতে পারে। প্রচলিত রীতি অনুসারে, মহিলারা উপবীত ধারণ করেন না। বরং পত্নীর হয়ে পতি অতিরিক্ত তিন গাছা উপবীত সূত্র ধারণ করে থাকেন।

স্নানের সময় প্রতিদিন উপবীত পরিষ্কার করে নিতে হয়, সেটি শরীর থেকে খুলে না নিয়ে সাবান ঘষে হাত দিয়ে পরিষ্কার করতে হয়। মলমূত্র ত্যাগের সময়ে উপবীত সূত্র ডানদিকের কানে জড়িয়ে তুলে রাখতে হয়। (যেহেতু সমস্ত পুণ্য তীর্থ দক্ষিণ কর্ণে অধিষ্ঠিত, তাই সেইখানে উপবীত তুলে রাখলে শরীরের অন্যান্য অংশ অপবিত্র হলেও তা পবিত্র হয়েই থাকতে পারে) শৌচকার্য সম্পন্ন হলে, উপবীত খানি যথাস্থানে নামিয়ে রাখতে হয়। কোনও সময়েই উপবীত ধারণ না করে থাকা চলে না।*

মন্দির মার্জন

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মন্দির মার্জন সম্পর্কে উদ্ধবকে বিশদ উপদেশ দিয়েছেন—

> *নিজেকে কপটতাশূন্যভাবে আমার দীন সেবক বলে বিবেচনা করবে, এবং আমার আবাস যে মন্দির, তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবে। প্রথমত প্রত্যেক দিন ঝাড়ু দিয়ে ভালভাবে ধুলো সরাবে, এবং তার পরে আবার গোবরজলে ধুয়ে ফেলবে। মন্দির শুকিয়ে গেলে সুবাসিত জল ছড়িয়ে দেবে এবং মণ্ডল আলপনায় মন্দির সাজাবে। এইভাবে যথার্থই আমার সেবকরূপে সেবা করতে হয়। (ভাঃ ১১/১১/৩৯)*

মন্দির চত্বর (কীর্তন কক্ষ) দিনে অন্তত একবার পরিষ্কার জলে কিংবা সামান্য গোবর মেশানো জল দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করতে হয়। সব চেয়ে ভাল, মঙ্গল আরতির আগেই মন্দির ধুয়ে পরিষ্কার করা।

---

* মস্তক মুণ্ডন এবং তৈল মর্দনের সময়ে উপবীতখানি কোমরে জড়িয়ে রাখা চলে। পারমার্থিক কর্তব্যকর্ম সম্পন্ন করার সময়ে উপবীত বাম কাঁধ থেকে ঝুলিয়ে ডান পাশে থাকবে। কোনও কোনও বৈষ্ণবের কাছে সম্পূর্ণ যথার্থ না হলেও, গৌড়ীয় বৈষ্ণবজনের কাছে খুবই প্রচলিত রীতি এই যে, সাধারণ কর্তব্যকর্ম সম্পন্ন করার সময়ে উপবীতখানি গলায় এক পাক জড়িয়ে রাখতে হয়, কিংবা যখন সাঁতার কাটতে হয়, তখন যাতে উপবীত শরীর থেকে খসে না যায়। চাবি বা অন্যান্য সামগ্রী ঝুলিয়ে রাখবার জন্য এটির ব্যবহার অনুচিত।

বিশেষত উৎসবের দিনগুলিতে মন্দিরটিকে পুষ্পপল্লবে সাজানো এবং সম্ভব হলে চালের পিটুলি গুলে মেঝেতে আলপনা আঁকা উচিত। দক্ষিণ ভারতে এখনও এই রীতি প্রচলিত আছে, মহিলারা প্রতিদিন সকালে মন্দিরে এবং বাড়িতে, এমন কি কুটিরের সামনেও এই সকল আলপনা এঁকে থাকেন। ঐ সমস্ত আলপনা শুধুমাত্র সাজানোর জন্যেই নয়, সেগুলির উপযোগিতাও আছে, কারণ জ্যামিতিক অঙ্কণকার্যগুলি অশুভ মানুষদের চিন্তাধারাকে ব্যাহত করে এবং শুভ পরিবেশ আকর্ষণ করে।

উপকরণ সংগ্রহ (উপাদান)

অর্চন শুরু করবার আগে, সমস্ত দ্রব্য উপকরণ সংগ্রহ করে নিতে হয়। অর্চন উপচারে যে সমস্ত পাত্র এবং উপকরণাদির প্রয়োজন, এবং সেইগুলি কিভাবে পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়, সেই বিষয়ে নিচের অংশটিতে কিছু পরামর্শ দেওয়া হল।

অর্চনের দ্রব্য

শঙ্খ

শক্তি, পবিত্রতা ও সৌন্দর্যের প্রতীক এই শঙ্খ। এর দ্বারা মোক্ষ বোঝায়। পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য সাথী রূপে শঙ্খ আরাধ্য। শঙ্খের মধ্যে যে জল ধারণ করা হয়, তাতে পৃথিবীর সমস্ত তীর্থের জল অধিষ্ঠিত হয়। শুধুমাত্র শঙ্খ দর্শন বা স্পর্শ করলেই পাপনাশ হয়। সাধারণত শঙ্খ থেকে জল অভিষেকের সাহায্যেই ভগবানের স্নান অভিষেক সম্পন্ন করা হয়, শঙ্খের সাহায্যে পাদ্য, অর্ঘ্য এবং আচমন কার্যও সমাধা করা চলে। শঙ্খ সর্বদাই ত্রিপদীর ওপর স্থাপন করতে হয়।

ঘণ্টা

ঘণ্টার ধ্বনিতে সকল প্রকার সঙ্গীত ধ্বনিত হয়। যদি ভক্তের কাছে কোনও বাদ্যযন্ত্র না থাকে এবং কীর্তন করা সম্ভব না হয়, তবে শুধুমাত্র একটি ঘণ্টা ধ্বনিই যথেষ্ট, কারণ তাতেই ভগবান প্রীতিলাভ করেন। সুতরাং অর্চনের আগে পূজার ঘণ্টাটিকে ভগবানের অতি প্রিয় বস্তু বিবেচনা করে পূজা করা উচিত। অনেক পূজা অনুষ্ঠানে হাতল সমেত ঘণ্টার দরকার হয়ে থাকে।*

* হাতলসমেত ঘণ্টা বাজানোর সময়ে সাধারণত বাঁ হাতে তা ধরতে হয়। যখন বাজানো হয় না, তখন সব সময়ে সেটিকে একটি থালায় বসিয়ে রাখা চাই, এটি হল ঘণ্টার আসন। যখনই আরতি, পাদ্য এবং অর্ঘ্য নিবেদন করা হয়, বিগ্রহের অভিষেক হয়, এবং যখনই ভোগ অর্পণ করা হয়, তখন ঘণ্টা বাজানো উচিত। যখন অন্যান্য সামগ্রী (যেমন, পোশাক পরিচ্ছেদ এবং অলঙ্কারাদি) অর্পণ করা হয়, তখনও যথাসম্ভব ঘণ্টা বাজিয়ে তা করা চলে।

শাস্ত্রে বলা হয়েছে, ভগবানের পূজা করার সময়ে গরুড় অঙ্কিত কিংবা ভগবানের চক্রশোভিত ঘণ্টা বাজালে জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত থেকে মুক্তিলাভ হয়।

পাত্রাদি

আচমন এবং পাদ্যার্ঘ্য অর্পণের জন্য ছাড়াও গন্ধদ্রব্যাদি, পুষ্পপল্লব ও তুলসীপত্র নিবেদনের জন্যও বিভিন্ন উপকরণের তৈরি এবং বিভিন্ন রঙের ও আকৃতির পাত্রাদি প্রয়োজন হয়। তামা, সোনা, পিতল, রূপো, নিষ্কলঙ্ক ইস্পাত, মাটি, পাথর, কাঠ, (যেমন, নারকেল খোলা), কিংবা কাঁসার বাসনপত্রও চলে। *বরাহ পুরাণে* বলা হয়েছে, তামার তৈরি পাত্রাদিই সমস্ত পাত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—"সেগুলি পবিত্রতার মধ্যেও পবিত্রতম, সকল শুভ ও মঙ্গলদায়ক।" সোনা রূপোর পাত্রাদি যদিও শুদ্ধ, তবে তামার পাত্র কেবল শুদ্ধই নয়, তাতে জল রাখলে তাও শুদ্ধ হয়ে ওঠে। ভগবান *বরাহ পুরাণে* বলেছেন (*হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থে* উদ্ধৃত)—

> *সোনা রূপো বা কাঁসার বাসনের চেয়ে তামার বাসনপত্রে আমি বেশি প্রীতিলাভ করি।*

তবে, দই এবং লেবুর মতো টক জিনিস তামার পাত্রে রাখা অনুচিত। সুতরাং মধুপর্ক (গোদুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু এবং শর্করার সংমিশ্রণ) রূপোর পাত্রে রাখাই উচিত।

পাদ্যার্ঘ্য এবং আচমনের পাত্রে একটি চামচ থাকা চাই। যদি মধুপর্ক সহ বিশুদ্ধ জল নিবেদন করতে হয়, তবে এই সবগুলির জন্য একটি পাত্র ব্যবহার করা যেতে পারে। সাধারণত পঞ্চপাত্র নামে বিশেষ ধরনের পাত্রেই এইগুলি রাখা হয়।

বিগ্রহের অভিষেকের জন্য ব্যবহৃত পাত্র তামা, পিতল, কিংবা কাঁসার তৈরি হওয়া চাই। অভিষেকের সময়ে শ্রীবিগ্রহকে অশ্বত্থপত্র, কদলীপত্র, কিংবা পদ্মপত্রে স্থাপন করা যেতে পারে। সব চেয়ে ভাল স্নান পাত্র (কিংবা যাকে স্নানবেদি বলে), একদিকে লম্বা নলের মতো খোলা থাকে, যেদিক দিয়ে চরণামৃত নির্গত হয়ে একটি পৃথক আধারে সঞ্চিত হয়। যদি স্নানপাত্রে তেমন কোনও নির্গমন নলিকা না থাকে, তা হলে অভিষেকের পরে শ্রীবিগ্রহকে শুষ্ক করে নিয়ে স্নানপাত্রটি খালি করে চরণামৃতের আধারে ঢেলে নিতে পারা যায়।

স্নানের জল এবং অন্যান্য প্রয়োজনের জন্য, একটি বড় ঢাকনা দেওয়া কলস কিংবা লোটা (তামার তৈরি হলেই ভাল হয়) অর্চনের সময়ে কাছাকাছি রেখে দেওয়া ভাল। অন্য একটি খালি পাত্র, যার ওপরে মুখ খোলা, নিবেদিত

সামগ্রীগুলি নিক্ষেপের জন্য (বিসর্জনীয় পাত্র) রাখা দরকার। আরও একটি ছোট জলপাত্র বা বাটি ও চামচ (হস্ত প্রক্ষালন পাত্র) হাতের নাগালেই রাখা উচিত, পূজা-অর্চনার সময়ে হাত ধোওয়ার জন্য।

অন্যান্য পাত্রাদি, যেমন ধূপদানি ও দীপদানি পিতলের, কাঁসার, রূপোর, তামার, কিংবা মাটির তৈরি হতেও পারে।

নৈবেদ্য পাত্র, যার উপরে ভোগ নিবেদন করা হয়, সেটি সোনা, রূপো, তামা, কাঁসা, মাটি, পলাশকাঠ কিংবা পদ্মপত্রের পাত্রও হতে পারে। যদিও শাস্ত্রে উল্লেখ নেই, তবু খাঁটি ইস্পাত (স্টেনলেস স্টিল) পাত্রও ব্যবহার করা চলে। সম্ভব হলে অ্যালুমিনিয়ামের বাসনপত্র ব্যবহার না করাই ভাল। শাস্ত্রে তিনটি বিভিন্ন মাপের থালা ব্যবহারের নির্দেশ আছে—সব চেয়ে ছোট বারো আঙুল মাপের (নয়-দশ ইঞ্চি বা একুশ সেন্টিমিটার), চব্বিশ আঙুল মাপের মাঝারি, এবং ছত্রিশ আঙুল মাপের সব চেয়ে ভাল মাপের থালা।*

অর্চনের উপকরণাদি

পাদ্য

পরমেশ্বর ভগবানের পাদপদ্ম প্রক্ষালনের উদ্দেশ্যে পাদ্য জলে প্রথামতো চারটি সামগ্রী থাকে—পদ্ম পাপড়ি, তুলসীপত্র, দুর্বা ঘাস, এবং শামাধান্য (শস্য)। এর পরিবর্তে, শুধুমাত্র গোলাপ জল কিংবা গোলাপের পাপড়ি পরিষ্কার জলে দিয়েও পাদ্য নিবেদন করা চলে।

অর্ঘ্য

পুষ্প, আতপ চাল, যব, তিল, দুর্বা ঘাস, কুশাগ্র, রাই সরিষা, এবং চন্দন—এইগুলি জলে মিশিয়ে, কিংবা দই, দুধ, আতপ চাল, কুশাগ্র, যব, তিল এবং রাই সরিষা—এইগুলি জলে মিশিয়ে অর্ঘ্য তৈরি হয়। অথবা শুধুমাত্র চন্দন জলে মিশিয়ে অর্ঘ্যবারি হতে পারে। অর্ঘ্য-উপচার দু'ধরনের হতে পারে—সামান্য অর্ঘ্যবারি কিংবা বিশেষ অর্ঘ্যবারি।

আচমন

চুমুক দিয়ে পান করবার জন্য জলে জায়ফল, লবঙ্গচূর্ণ প্রভৃতি দিয়ে সুবাসিত করা চলে।

---

* এক 'আঙুল' মানে আঙুল যতটা চওড়া। সকালে পূজার শেষে ফল নিবেদনের নৈবেদ্য থালাটি বারো আঙুলের চেয়েও ছোট মাপের হতে পারে।

মধুপর্ক

পবিত্র মঙ্গলদায়ক গোদুগ্ধ, দধি, ঘি, মধু, এবং মিছরি সহযোগে প্রস্তুত উচ্চপর্যায়ের আহার্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের নিবেদন করা হয়। তার পরিবর্তে, দই, মধু এবং ঘি-এর সংমিশ্রণেও মধুপর্ক তৈরি করা চলে। মধুর অভাবে গুড় দেওয়া চলে, ঘি না পেলে খই ব্যবহার করতে পারা যায়, এবং যদি দই না মেলে তো দুধ দিয়েও মধুপর্ক হয়। প্রবীণদের মতে, মধুপর্কে চারভাগ মধু এবং অন্যান্য উপাদানগুলি একভাগ করে থাকবে।

তৈল

কোনও কোনও মন্দিরে পূজারীরা বিভিন্ন ঋতু অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন তৈল নিবেদন করে থাকেন। যেমন, বৃন্দাবনে পূজারীরা সাধারণত গ্রীষ্মকালে রজনীগন্ধা, বর্ষাকালে কদম্ব আর গোলাপ, শরৎকালে যুঁই, এবং শীতকালে হেনা ফুলের সুগন্ধি তৈল নিবেদন করেন। কৃত্রিম রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত তৈল বর্জন করা উচিত, সেগুলিতে সুরাসার জাতীয় অপবিত্র রাসায়নিক বস্তু থাকে।

স্নানের উপকরণাদি

স্নানের মূল উপকরণ হল কয়েকটি বিধিনিষেধ অনুসারে বিশুদ্ধ জল। রাত্রে জল সংগ্রহ করবেন না, তাতে নখের স্পর্শ করবেন না। বিশুদ্ধতার শ্রেষ্ঠতা-পরম্পরায় বিগ্রহ অভিষেকের জন্য সর্বোত্তম হল গঙ্গা বা যমুনার জল, তারপরে যে কোনও তীর্থের জল, সরাসরি সমুদ্রগামী নদীর জল, উপনদীর জল, প্রাকৃতিক ঝর্ণা, হ্রদ, দীঘি বা মনুষ্য-সৃষ্ট জলাশয়ের জল, কুয়োর জল, এবং সর্ব শেষে কোনও পাত্রের জল। ঋতু অনুযায়ী স্নানের উপযোগী আরামপ্রদ উষ্ণতায় জল তৈরি রাখতে হবে—গরমকালে ঠাণ্ডা এবং শীতকালে গরম করা চাই।

শ্রীবিগ্রহের স্নানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকারের উপকরণ মিশিয়ে জল প্রস্তুত করে নেওয়া যেতে পারে। তাই, বিশদভাবে অর্চনের ক্ষেত্রে বিশেষ করে শ্রীবিগ্রহের স্নানের জন্য পুষ্পসুবাসিত জল, সুগন্ধি জল, মন্ত্র জল, কুশ জল, তীর্থবারি, তুলসীজল, পঞ্চরত্নের জল, সোনা-ছোঁয়ানো জল, সর্বৌষধি জল (মুরা, জটামাংসী, বচ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শঠী, চম্পক, মুস্তা প্রভৃতি সহ), নারকেলের জল, কর্পূর জল, কিংবা কদলী জল দিয়ে শ্রীভগবানের বিগ্রহের স্নান করানো হয়। বিভিন্ন ধরনের ফলের রস দিয়েও ভগবানকে স্নান করানো চলে। (পরে 'নৈমিত্তিক সেবা' আলোচনা প্রসঙ্গে স্নান-অভিষেকের বিশদ বর্ণনা থাকবে)

অঙ্গবস্ত্র

ভগবানের বিগ্রহ শুকনো করে মোছার জন্য এবং আরতির সময়ে বস্ত্র নিবেদনের জন্যও শুদ্ধ সুতীবস্ত্র কিংবা বিশুদ্ধ রেশমের প্রয়োজন। রেশমের চেয়ে তোয়ালেই ভাল, কারণ ঐ সুতী বস্ত্রে জল শুকোয় ভাল এবং সেটি বারে বারে কেচে নেওয়া যায়।

পরিধেয় বস্ত্র

ভগবানের বিগ্রহের পরিধেয় বস্ত্র এবং উত্তরীয় হওয়া চাই মজবুত, নরম (কড়মড়ে নয়), পরিছন্ন, ছিন্ন নয়, কেউ পরেনি, সুবাসিত এবং বহু বিচিত্র বর্ণের। শাস্ত্রে অনুমোদন করা হয়েছে, বিভিন্ন স্থানীয় ভঙ্গিমায় শ্রীবিগ্রহের পোশাক পরিধান করানো যেতে পারে তবে ঐতিহ্যমণ্ডিত প্রথাসম্মত পরিচ্ছদ বস্ত্রেই প্রথাসম্মত রন্ধনের মতোই, তিনি বেশি সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন।

বিভিন্ন দিনে কি রঙের বস্ত্র পরিধান করানো যেতে পারে, সেই বিষয়ে শাস্ত্রে সামান্যই উল্লেখ আছে, তবে বিভিন্ন দিন ও ঋতু অনুসারে মন্দিরগুলিতে নিজ নিজ প্রথামতো বিভিন্ন রঙের পোশাক পরিধান করিয়ে থাকেন (যেমন, পুরীতে শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে)। বৃন্দাবনের অনেক মন্দিরে সপ্তাহে প্রতিদিনের অধিপতি গ্রহের অনুকূল গ্রহরত্নাদির বর্ণ অনুযায়ী বিভিন্ন বর্ণের বস্ত্রাদি শ্রীবিগ্রহের পরিধানের জন্য নির্ধারণ করা হয়—রবিবারে সোনালী বা লাল (চুনীর রঙ), সোমবারে সাদা কিংবা রূপোলী (মুক্তার রঙ), মঙ্গলবারে লাল কিংবা গোলাপী (প্রবালের রঙ), বুধবারে সবুজ (পান্নার রঙ), বৃহস্পতিবারে হলদে কিংবা কমলা (পীতাভ নীলার রঙ), শুক্রবারে সাদা, রূপালী, সোনালী, বহুবর্ণ, কিংবা যে কোনও রঙ (হীরার বহুবর্ণ), এবং শনিবারে বেগুনী, নীল, কিংবা কালো (নীলাভ নীলার রঙ)।*

এই পরিচ্ছদ-বর্ণ প্রণালী অনুসরণ করা চলে, তবে সেটা আবশ্যকীয় নয়। তাই শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, "তোমার পরিকল্পনা মতো সমস্ত রঙই কাজে লাগাতে পারো।" (*পত্র তাং ১৬ জানুয়ারি ১৯৭০*)

কৃত্রিম (ইমিটেশন) বস্ত্র দিয়ে বিগ্রহের পোশাক পরিচ্ছদ করা চলে, তবে রেশম ও সূতী বস্ত্রের মতো প্রাকৃতিক সামগ্রীই উত্তম।

ঋতুর উপযোগী পোশাকে শ্রীবিগ্রহকে সাজাতে হবে—শীতকালে গরম পোশাক, গরমকালে হালকা পোশাক। বৃন্দাবনের ঐতিহ্যমণ্ডিত মন্দিরগুলিতে ঋতু অনুযায়ী শ্রীবিগ্রহের বস্ত্র পরিধান ব্যবস্থা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

---

* একাদশীতে প্রায়ই গোলাপী অথবা লাল পরিচ্ছদ পরিধান করানো হয়, পূর্ণিমায় সাদা অথবা রূপালী।

যখন ভক্তরা শ্রীবিগ্রহাদিকে আবহাওয়ার উপযোগী পোশাক পরাতে ব্যর্থ হয়, তখন শ্রীল প্রভুপাদ অসন্তুষ্ট হন—

"ঠাণ্ডার দিনে শ্রীবিগ্রহের গরম পোশাক থাকবে না, এটা মোটেই ভাল নয়।"

(পত্র তাং ৭ নভেম্বর ১৯৭৫)

তুলসীপত্র ও মঞ্জরী

তাজা তুলসীপত্র না পেলে, ভোগ অর্পণের জন্য এবং ভগবানের পাদপদ্মে নিবেদনের জন্য শুকনো তুলসীপত্র ব্যবহার করা চলে। কোনও তুলসীপত্র না পাওয়া গেলে, অর্চনের সময়ে তুলসী কাঠ ভগবানের চরণে স্পর্শ করিয়ে তুলসী অর্পণ করা যায়, এবং ভগবানের ভোগ নিবেদনের সময় তুলসী কাঠের গুঁড়া মেশানো জল সিঞ্চন করা চলে। তুলসী কাঠও পাওয়া না গেলে, তখন তুলসীদেবীর নাম জপ করে তাঁর উপস্থিতি ধ্যানের মাধ্যমে অর্চন সম্পন্ন করা উচিত।

অলঙ্কারাদি

যেহেতু মূল্যবান ধাতু এবং মূল্যবান রত্নাদি চোর-ডাকাত ডেকে আনে, তাই শ্রীল প্রভুপাদ কৃত্রিম (ইমিটেশন) অলঙ্কারাদির সাহায্যেই শ্রীবিগ্রহ সাজানোর জন্য ভক্তদের পরামর্শ দিয়েছিলেন। অবশ্য, অল্প দামি রত্নাদি এবং রূপো শ্রীবিগ্রহের নিরাপত্তার যুক্তিতে সাধারণত ব্যবহার করা যেতে পারে।

চন্দন

গন্ধদ্রব্যে চন্দনমণ্ড, একটু অগুরু ও কর্পূর, কিংবা কস্তুরী ২ ভাগ, চন্দন ৪ ভাগ, কুঙ্কুম ৩ ভাগ, আর কর্পূর ১ ভাগের মিশ্রণ ব্যবহার করা চলে। অতি সূক্ষ্মভাবে তুলসীকাঠের চূর্ণও তাতে মেশানো যায়।*

পুষ্পাদি

শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থে একটি সম্পূর্ণ অধ্যায় নিয়ে পুষ্প সম্পর্কে আলোচনা আছে। শ্রীবিগ্রহ অর্চনায় পুষ্প অতি প্রয়োজনীয় উপাদান, এবং তাই যথাসম্ভব উত্তম পুষ্পাদি নিবেদনের জন্য আমাদের বিপুল চেষ্টা-যত্ন আবশ্যক।

---

* কষ্টিপাথরের কৃষ্ণবর্ণের শ্রীবিগ্রহে তিলক চিহ্নাদি অঙ্কণের জন্য জল-রঙ ব্যবহার করা চলতে পারে, তবে শ্বেত পাথরের শ্রীবিগ্রহে ঐ ধরনের রঙ লাগালে স্থায়ীভাবে ছাপ লেগে যেতে পারে।

আদর্শ ব্যবস্থা অনুযায়ী শ্রীবিগ্রহের নিজস্ব পুষ্পোদ্যান থাকা উচিত যাতে তিনি ঋতু অনুসারে প্রচুর পরিমাণে পুষ্পের সরবরাহ পেতে পারেন। (নিবেদনের যোগ্য এবং অযোগ্য পুষ্পাদির তালিকা পরে দেওয়া হবে।)

পুষ্পাদি না পাওয়া গেলে, পত্র নিবেদন করা যেতে পারে (বিশেষত, তুলসী, আম, জাম, আমলকী, শমী এবং তমালপত্র) কিংবা নবদুর্বা ঘাস। পত্রাদি কিংবা দুর্বা ঘাস কিছুই না পাওয়া গেলে বিশুদ্ধ জল তার বদলে নিবেদন করা যেতে পারে।

শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন—

"শ্রীবিগ্রহের অর্চনের জন্য কাগজের (কিংবা) প্লাস্টিকের তৈরি ফুল আর ফল নিবেদন করার কোন কথাই ওঠে না। যদি কোনও তাজা ফুল বা ফল না মেলে, তা হলে কয়েকটি তাজা পাতার আলপনা এঁকে দিতে পারা যায়। আমাদের মন্দিরগুলিতে দেখা যাবে, কোথাও আমরা ঐ সব করি না। আলপনা আঁকা আমাদের উদ্দেশ্য নয়; শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তুষ্টির উদ্দেশ্যে ভক্তিভরে সেবা নিবেদন করাই আমাদের লক্ষ্য। অবশ্যই, শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করবার জন্য মন্দিরকে যথাসম্ভব ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে তোলার উদ্দেশ্যে সেখানে অঙ্কনকার্য থাকবে। মন্দিরের বাইরে প্লাস্টিকের গহনাদি ব্যবহার করা চলতে পারে। কিন্তু পূজা অর্চনার উদ্দেশ্যে তা নয়। প্রতিদিনের পূজার জন্য অবশ্যই চাই তাজা ফল, ফুল, আর পত্রাদি।" (পত্র তাং ২৬ ডিসেম্বর ১৯৭১)

"শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনের গ্রামীণ পরিবেশেরই অঙ্গীভূত, এবং তিনি পুষ্পপল্লবাদির বড়ই প্রিয়। যতদূর সম্ভব ফুলের পরিমাণ বাড়াতে চেষ্টা করবে।" (পত্র তাং জুন ১৯৭০)

ধূপ

নানা ধরনের ধূপ হতে পারে। আজকাল আগরবাতি ধূপ নিবেদনের বেশ রেওয়াজ হয়েছে, কারণ ওগুলি সহজেই জ্বালিয়ে নিবেদন করা চলে। বিশেষ সতর্কতার সঙ্গেই বলতে গেলে, সুনিশ্চিতভাবে দেখা যায় যে, বাজার থেকে কেনা সমস্ত ধূপেই অশুদ্ধ অপবিত্র মালমশলা থাকেই—রাসায়নিক দ্রব্য এবং সম্ভবত জান্তব সামগ্রীও। এমন কি "পবিত্র চন্দন" ধূপও কৃত্রিম হতে পারে। এই সব অশুদ্ধতার জন্য ঐ জিনিসগুলি নিবেদনের অযোগ্য হয় না, কৃত্রিম গহনাদি নিবেদনের চেয়ে বেশি অযোগ্য তো নয়ই। তা হলেও, উচ্চ আদর্শের

বিচারে, সম্পূর্ণভাবে পবিত্র, বিশুদ্ধ, অরাসায়নিক ধূপ নিবেদন করাই উচিত হবে। সব চেয়ে ভাল হয়, নিজে কিছু গন্ধদ্রব্যাদি মিশিয়ে নিয়ে ধূপকাঠি তৈরি করা চলে কিংবা কাঠকয়লা বা টিকিয়া জ্বেলে তাতে গন্ধদ্রব্য ছড়িয়ে দেওয়া চলে। এগুলি বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। ঐ ধরনের সামগ্রী নিচের প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন পরিমাণে মিশিয়ে নিতে পারা যায়—ধুনো, গুগ্‌গুল, কর্পূর, মিছরি, মধু, চন্দন গুঁড়ো, গোবর, এবং বিভিন্ন মশলা, যেমন—মেথি, ধনে, জিরা, আদা, দারু চিনি, লবঙ্গ, এবং এলাচ। চালের গুঁড়ো বা যবের আটার সাথে ঐগুলি মিশিয়ে ঘি দিয়ে মেখে ছোট ছোট গোলা পাকিয়ে হাওয়ায় শুকিয়ে রাখা চলে। নিবেদনের আগে ঐ গোলা সরষের তেলে ভিজিয়ে কাঠকয়লা কিংবা ঘুঁটের আগুনের ওপর দিলে ধূপের ধোঁয়ার সুগন্ধে ভরপুর হয়ে উঠবে।

দীপ

আরতির সময়ে নিবেদিত ঘিয়ের দীপ নানা আকৃতি এবং মাপের হয়ে থাকে। প্রথাগতভাবে, ঘিয়ের দীপে তিনটির শলতে থাকে, বিজোড় সংখ্যায়। আরতির দীপে সাধারণত পাঁচটি শলতে থাকে (পঞ্চদীপ)। বিশেষ কোনও উপলক্ষ্যে অনেক বেশি শলতে কিংবা পাঁচটি পৃথক দীপ নিবেদিত হয়ে থাকে। একটি ধাতুপাত্রের কিনারা বরাবর ঘিয়ের শলতে বসিয়ে কিংবা মাঝখানে কর্পূর বসিয়েও আরতির প্রদীপ করা চলে। কোনও কোনও দীপে পাতলা সরু ঘিয়ের শলতে তৈরি হয় কুশ কাঠির গায়ে তুলো জড়িয়ে দিয়ে। রূপো, পিতল, কাঁসা, তামা এবং কখনও-বা মাটি দিয়েও দীপাধার তৈরি হয়ে থাকে।

দীপ জ্বালানোর জন্য ঘিয়ের পাকানো শলতে যাতে ঠিক মতো জ্বলতে থাকে—ঠিক পরিমাণ মতো ঘি দিয়ে অতি সরু ডগা তৈরি করে শলতে পাকানোর পদ্ধতি—সেই জন্যই অভিজ্ঞ জনের কাছ থেকে ভালভাবে শিখে নিতে হয়।

নৈবেদ্য

শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন—

ভগবানকে নিবেদিত ভোগ যেন যথাসাধ্য উত্তমভাবে তৈরি করা হয়। খুব ভাল চালের অন্ন, ডাল, ফল, মিষ্টান্ন, শাক-সবজি এবং বিবিধ প্রকার চর্ব-চূষ্য-লেহ্য-পেয় খাদ্যদ্রব্য যেন নিবেদন করা হয়। ভগবানকে নিবেদিত সমস্ত খাদ্যদ্রব্য যেন খুব ভাল ও উত্তম মানের সামগ্রী হয়। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ২৪/৩৩৪ তাৎপর্য)

নিষিদ্ধ খাদ্যসামগ্রী

সাধারণত যে সমস্ত খাদ্যসামগ্রী নিষিদ্ধ, সেইগুলির মধ্যে রয়েছে মাছ, মাংস, ডিম, পিঁয়াজ, রসুন, ব্যাঙের ছাতা, মসুর ডাল, দগ্ধ-অন্ন, সাদা বেগুন, জামির বা গোঁড়া লেবু, মহিষ ও ছাগ দুগ্ধে তৈরি সামগ্রী, লবণাক্ত দুধ, সিদ্ধি। এছাড়া, শ্রীবিগ্রহ সেবার উদ্দেশ্যে কৌটোজাত বা জমাট দুধের খাদ্যসামগ্রীও নিবেদন করা অনুচিত, এবং খামির (ঈস্ট) ও সাদা চিনি দিয়ে তৈরি অস্বাস্থ্যকর সামগ্রীও নিবেদন না করাই ভাল।

শ্রীল প্রভুপাদ মন্তব্য করেছেন—

ঠাণ্ডা করে রাখা জিনিস মানেই নোংরা। আমি কক্ষনো ঠাণ্ডায় তুলে রাখা কিছু গ্রহণ করি না। ও সমস্তই পচা, বরং ঐ একই সবজি, আমাদের দেশে ভারতে যেভাবে করা হয়ে থাকে, সেইভাবে আমরা শুকিয়ে নিয়ে তুলে রাখতে পারি। সেটার বেশ স্বাদ থাকে। (শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীল প্রভুপাদের সাথে কথোপকথন, ৩ নভেম্বর ১৯৭৬)

শশার চাটনি সম্পর্কে বলি—যতদূর সম্ভব দেখতে হবে অভক্তদের হাতে তৈরি কোনও কিছু খাদ্যসামগ্রী যেন শ্রীবিগ্রহের সেবায় নিবেদন না করা হয়। ওদের কাছ থেকে আমরা কাঁচা তাজা ফল, শস্য কিংবা ঐ ধরনের জিনিসপত্র নিতে পারি। খাবার দাবারের জোগাড়-যন্তর এবং রান্নাবান্নার ব্যাপারে একেবারে কঠোরভাবে দীক্ষাপ্রাপ্ত ভক্তদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা চাই। আর এ ছাড়া, ভিনিগার জিনিসটাও ভাল নয়, এটা তামসিক, তমসাচ্ছন্ন, নোংরা খাবার জিনিস। (শ্রীল প্রভুপাদের চিঠি, ২৪ মার্চ ১৯৬৯)

মন্দিরে খাদ্যসামগ্রীতে ক্রীম ব্যবহার করা একেবারেই চলবে না। দোকান থেকে কিনে আনা কোনও খাবার শ্রীবিগ্রহের সেবায় নিবেদন করা চলে না। কর্মীদের হাতে তৈরি কোনও জিনিস শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবায় নিবেদন করা অনুচিত। আইসক্রীম যদি তোমরা নিজেরা তৈরি করতে পার তো বেশ, কিন্তু অন্য কোনওভাবে নয়। (শ্রীল প্রভুপাদের চিঠি, ৬ এপ্রিল ১৯৭৬)

কলে ছাঁটা হয়নি যে লালচে রঙের চাল, তা ব্যবহার করা চলতে পারে। কলে ছাঁটা হোক বা নাই হোক, তাতে কিছু যায় আসে না, তবে সিদ্ধ চাল অবশ্যই ব্যবহার করা চলবে না। সিদ্ধ চাল অপবিত্র বলে মনে করা

হয়। সূর্যপক্ক (আতপ) চালই সবদিক থেকে ভাল। (শ্রীল প্রভুপাদের চিঠি, ১৭ অক্টোবর ১৯৬৭)

সয়াবীন আর মসুর ডাল নিবেদনের অযোগ্য। (শ্রীমৎ হৃদয়ানন্দ দাস গোস্বামীকে শ্রীল প্রভুপাদের একান্ত পত্র)

হাটে বাজারে জিনিসপত্র কেনাকাটা সম্পর্কে বলি—যখনই আমরা সেগুলি দাম দিয়ে কিনি, তখন তা শুদ্ধতা অর্জন করে। সেটাই সাধারণ পরামর্শ। কিন্তু যখন জানছি, কোনও জিনিস ভেজাল, তখনই তা পরিহার করতে হবে। তবে অজান্তে কোনও জিনিস কেনা হয়ে গেলে সেটা আমাদের দোষ নয়। যা কিছু জিনিসপত্র সন্দেহজনক মনে হবে, তা অবশ্যই পরিহার করে চলতে হবে। (শ্রীল প্রভুপাদের চিঠি, ২১ অক্টোবর ১৯৬৮)

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ যা গ্রহণ করবেন না, তাঁকে তা নিবেদন করা যেহেতু অপরাধ, তাই যে কোনও জিনিস, যাতে প্রশ্ন জাগতে পারে, তা নিবেদনের (কিংবা খাওয়ার) আগে অতীব সতর্কতা অবলম্বন করতেই হবে।

নিবেদনের যোগ্য খাদ্যসামগ্রী

শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থে কয়েকটি খাদ্যসামগ্রীর তালিকা দেওয়া আছে, যেগুলি নিবেদনের যোগ্য, যেমন—বিল্ব (বেল), আমলকী, খেজুর, নারকেল, কাঁঠাল, আঙুর, তাল, পদ্মনাল, শাক, গোদুগ্ধজাত সামগ্রী আর শস্যাদি, ঘি এবং চিনি দিয়ে তৈরি খাবার।

শস্যসামগ্রীজাত খাদ্যাদি, বিশেষত অন্ন, সর্বদাই ঘি সমেত নিবেদিত হওয়া উচিত। ঘি ছাড়া অন্ন আসুরিক খাদ্য রূপে বিবেচিত হয়। ঘি, চিনি বা মিছরি, দই, গুড়, এবং মধু, ছোলার খাদ্যসামগ্রী, ডাল, সবজির ঝোল, রকমারি পিঠা এবং চর্ব্য-চূষ্য-পেয় খাদ্যসামগ্রীই ভগবানের প্রীতি বিধান করে থাকে।

আখের রস, দইয়ের ঘোল, পাতিলেবুর মিষ্টি সরবৎ, এলাচ-কর্পূর কিংবা দারুচিনির সুরভিত জল, এবং বিভিন্ন রঙের সুগন্ধি ফলের রস—এই সবও নিবেদন করা চলে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের বহু অনুচ্ছেদে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের উপযোগী খাদ্যসামগ্রীর বর্ণনা রয়েছে। যেমন, অন্ত্যলীলা থেকে একটি নমুনা এখানে দেওয়া হল—সেখানে বর্ণনা করা হচ্ছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদেরা তাঁর সেবার উদ্দেশ্যে কি কি তৈরি করবেন—

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তরা মরিচের ঝাল, মধুর অম্ল, আদা, লবণ, লেবু, দুধ, খণ্ডসার (ছানা ননী), দু'চার রকমের শাক, সুকতার ঝোল, নিম-বেগুন, পটল ভাজা, ফুলবড়ি ভাজা, মুগ ডাল এবং বিবিধ প্রকার ব্যঞ্জন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর রুচি অনুরূপ রন্ধন করেছিলেন। (চৈঃ চঃ অন্ত্য ১০/১৩৫-১৩৭)

একটি পত্রে শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছিলেন, কোন্ কোন্ খাদ্যসামগ্রী সত্ত্বগুণসম্পন্ন এবং কিভাবে তা ভগবানকে নিবেদন করতে হয়—

সত্ত্বগুণসম্পন্ন খাদ্যসামগ্রী হল গম, আটা, ময়দা, সুজি, চাল, ডাল (শুঁটি, মটর), মিছরি, মধু, মাখন, দুগ্ধজাত সবরকমের জিনিস, শাকসবজি, ফুল, ফল, শস্যাদি। সুতরাং এই সব খাদ্য সামগ্রী থেকে নানা আকারের খাবার তৈরি করা চলে, তবে ভক্তদের বুদ্ধি দিয়ে সেগুলিকে নানাভাবে বিভিন্ন প্রণালীতে প্রস্তুত করে নিতে হয়। (শ্রীল প্রভুপাদের পত্র, ১৩ নভেম্বর ১৯৬৮)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীবিগ্রহের সেবার উদ্দেশ্যে নিবেদনের জন্য সেরা চালের বর্ণনা দিয়েছেন—

শুক্ল চাউল বলতে আতপ চালকে বোঝায়, অর্থাৎ ধান ভানার আগে যে-চাল সিদ্ধ করা হয়নি। ধান, ভানার আগে যদি তা সিদ্ধ করা হয়, তাকে বলা হয় সিদ্ধ চাল। সাধারণত, অতি উৎকৃষ্ট আতপ চাল ভগবানের ভোগে নিবেদন করা হয়। তাই ভগবান আচার্য, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কীর্তনগোষ্ঠীর কীর্তনীয়া ছোট হরিদাসকে শিখি-মাহিতির ভগ্নীর কাছ থেকে এই চাল চেয়ে আনতে পাঠিয়েছিলেন। (চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ২/১০৩ তাৎপর্য)

স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রিয় কোনও খাদ্য অথবা ভক্তের বা তাঁর পরিবারবর্গের প্রিয় রুচিকর বিশেষ কোনও খাদ্যসামগ্রী তা নিবেদনের যোগ্য বিবেচিত হলে ভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে অর্পণ করা যেতে পারে।* নিজের

* যথাযথভাবে রান্না করা হলে অন্ন, ডাল, রুটি চাপাটি, সবজি, পকোড়া এবং পরমান্ন জাতীয় সব খাদ্যই শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান করে। শ্রীকৃষ্ণের ভক্তরূপে নিজেকে যিনি পরিচয় দেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে এমন কিছুই নিবেদন করবেন, যা শ্রীকৃষ্ণ ভালবাসেন। তা সত্ত্বেও যদি মনে হয়, কোনও স্থানীয় খাদ্যসামগ্রী অতি উচ্চ মানের এবং সেই খাদ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান হবে, তবে তা ভগবানকে নিবেদন করা চলে। মূল নীতি হল, শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধান, নিজের নয়।

বা স্থানীয় পছন্দ অনুযায়ী খাদ্য নিবেদন করা চলতে পারে বলা হয়েছে যাতে, এমন একটি শ্লোক সম্পর্কে শ্রীল সনাতন গোস্বামী মন্তব্য করে লিখেছেন, এর অর্থ এই যে, সাধারণ লোকে কোনও একটি বিশেষ খাদ্যসামগ্রী পছন্দ না করলেও, যদি কেউ তা পছন্দ করে, তবে সে তা নিবেদন করতে পারে। তবে এর মধ্যে শাস্ত্র-অনুমোদিত খাদ্যসামগ্রীর কথাই তোলা হয়েছে—যেগুলি নিষিদ্ধ, তেমন খাদ্যের কথা বলা হয়নি। তাই কেউ যদি কোনও নিষিদ্ধ খাদ্যের প্রিয় হয়ে থাকে, তবে সেটা ভগবানকে নিবেদন করতে পারে না। আর তাই সেটা যে নিজে খেতেও পারে না। তা ছাড়া নিবেদনের যোগ্য যে সমস্ত খাদ্যসামগ্রীও বিস্বাদ, অরুচিকর, অখাদ্য, কোনও কারণে অপবিত্র, কিংবা কীটপতঙ্গ, পশুপাখি বা মানুষের উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে, তা নিবেদন করা চলে না।

নিবেদনের যোগ্য কিছুই যদি না পাওয়া যায়, তা হলে কেবলমাত্র ফল নিবেদন করাও চলে। এমন কি যদি ফলও দুর্লভ হয়, তবে শুদ্ধ জল নিবেদন করে তার সাথে বিবিধ খাদ্যসামগ্রী নিবেদনের ধ্যান সহযোগে অর্চনা করা যেতে পারে। যদি জলও দুষ্প্রাপ্য হয়ে ওঠে, তা হলে অন্তত মনে মনে ভোগ নিবেদন করা উচিত।

ভগবানের ভোগ নিবেদনের পরিমাণ

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থে লিখেছেন—

শ্রীকৃষ্ণ সাধারণ মানুষের মতো ক্ষুধার্ত হন না, কিন্তু তবুও তিনি ক্ষুধার্ত হওয়ার মতো লীলা করেন এবং তিনি যে কোনও জিনিস যে কোনও পরিমাণে আহার করতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণের ভোজন করার ব্যাপারে যে দর্শন রয়েছে, তা আমরা আমাদের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভব করতে পারি। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য ৪/৭৭, তাৎপর্য)

আরও একখানি চিঠিতে শ্রীল প্রভুপাদ লেখেন—

"শ্রীবিগ্রহের উদ্দেশ্যে ভোগ নিবেদন সম্পর্কে বলি—রান্না-করা খাদ্যসামগ্রী শ্রীবিগ্রহের সেবার উদ্দেশ্যে নিবেদনের জন্য একটি থালায় একজনের আহারের পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণে নিতে হবে, রান্না করা সবটা নয়। বাকি খাদ্যবস্তু উনানে বা রান্নাঘরে গরম রাখতে হবে ভক্তরা সেবন করা পর্যন্ত। (শ্রীল প্রভুপাদের পত্র, ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯)*

---

* কয়েকটি খাদ্য আবার একবার গরম করা উচিত নয়, কারণ তাতে হজমে বিঘ্ন সৃষ্টির ফলে রোগব্যাধি ঘটাতে পারে। আয়ুর্বেদে অন্ন, সবজি, ঘি, তেল এবং ওষধি খাদ্যদ্রব্য দু'বার গরম করতে নিষেধ করা হয়েছে।

অস্ট্রেলিয়াতে শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে ভোগ-নিবেদনের পরিমাণ হওয়া উচিত ষোল বছর বয়সের একটি অতি ক্ষুধার্ত ছেলের খাওয়ার মতো। সেক্ষেত্রে তিনি একথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিলেন যেন শেষবেলার সান্ধ্যভোগে খানকতক পুরিও নিবেদন করা হয়—বড় মাপের ছ'খানা, মাঝারি আটখানা, কিংবা ছোট ছোট ষোলখানা পুরি শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে ভোগ নিবেদনের থালায় থাকা চাই।

রন্ধনকক্ষের উৎকর্ষমান

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে নিবেদনের অভিলাষে আমরা যেমন বিশুদ্ধ পবিত্র সব সেরা খাদ্যসামগ্রী বেছে আনব, তেমনি সেগুলির জন্য রন্ধনকার্যটিও সমাধা করতে হবে শুদ্ধভাবে। ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য আহারাদি প্রস্তুত করার সময়ে অতি সন্তর্পণে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক নিয়মকানুনগুলি অবশ্যই মেনে চলা চাই এবং খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করার ব্যাপারে অতীব যত্নবান হতে হবে, যাতে নৈবেদ্য নিবেদনের যথার্থ ভক্তিভাবময় মানসিকতা অক্ষুণ্ণ থাকে এবং তা ভগবান গ্রহণ করেন।

যাঁরা খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত এবং বিশেষত রন্ধন করেন, তাঁদের মানসিকতা যেহেতু খাদ্যাদির অণুপরমাণুর মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে যায়, তাই ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সেবার উদ্দেশ্যে রন্ধনাদি কাজে ব্রাহ্মণ দীক্ষায় দীক্ষিত ভক্তরাই কেবল দায়িত্ব নিতে পারেন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, বিশুদ্ধতা তথা পবিত্রতা এবং দৃঢ়তা—এই সমস্ত ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী যদি ভক্তের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়—এবং শ্রীবিগ্রহের উদ্দেশ্যে নিবেদনের জন্য রন্ধনাদির কাজে তিনি আগ্রহান্বিত হন—তা হলে ব্রাহ্মণ দীক্ষা গ্রহণের জন্য তাঁর গুরুদেবের কাছে আবেদন করা যেতে পারে।

শ্রীল প্রভুপাদ গুরুত্ব সহকারেই বলতেন, ভগবানের উদ্দেশ্যে ভোগ রন্ধনের জন্য একমাত্র ব্রাহ্মণই চাই। তিনি একখানি চিঠিতে (তাং ২৪ নভেম্বর ১৯৭৪) একবার লিখেছিলেন—

> *"রন্ধন সম্পর্কে, আমি বলি, অব্রাহ্মণেরা রন্ধনের কাজে সহায়তা করতে পারেন, কিন্তু তাঁরা রন্ধন কার্যে হাত লাগাতে পারেন না।"*
>
> *"লক্ষ্য রাখা উচিত, শ্রীবিগ্রহের সেবা পরিচর্যা এবং ভোগ রন্ধন যেন কেবলমাত্র যথাযথভাবে ব্রাহ্মণ দীক্ষাপ্রাপ্ত ভক্তরাই করেন।" (শ্রীল প্রভুপাদের চিঠি, তাং ১৯ ডিসেম্বর ১৯৭৪)*

"যতদূর সম্ভব দেখতে হবে যেন কোনও অভক্ত যার দীক্ষাগ্রহণ করা হয়নি সে যেন রন্ধনকক্ষে না ঢোকে। বাইরে থেকে তারা সাহায্য করতে পারে। তবে তাদের দিকে সযত্ন দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে তাদের মধ্যে থেকে শুদ্ধ ভক্ত গড়ে উঠতে পারে।" (শ্রীল প্রভুপাদের চিঠি, তাং ৪ এপ্রিল ১৯৭১)

"দীক্ষা গ্রহণ না করলে কেউ ভগবানের নৈবেদ্য রান্না করবার অধিকার পেতে পারে না। তাকে রীতিমতো ভক্ত হতে হবে, তবে সে বিগ্রহ অর্চন করতে পারবে। বাইরের কোনও লোকের পক্ষে মন্দিরে শ্রীবিগ্রহের ভোগ রন্ধন করা অনুচিত।" (শ্রীল প্রভুপাদের চিঠি, ১১ জুলাই ১৯৭৬)

শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থে এই বিষয়টি নিয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—

যে খাদ্য (বিশেষত শস্যাদি) অবৈষ্ণবের হাতে রান্না হয়েছে বা পাপীতাপীদের হাতের রান্না, বা যে-খাদ্য শ্রীবিষ্ণুর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়নি, তা যেন কুকুরেরই মাংস বলে মনে করতে হবে।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার নীতিনিয়মগুলি সুস্পষ্টভাবে বুঝে নেওয়া চাই। বুঝতে হবে কিভাবে কোনও মানুষ কিংবা বস্তু কলুষিত হয়ে পড়ার ফলে শুদ্ধতার পর্যায় থেকে সে বিচ্যুত হয়েছে। বুঝতে হবে, সংক্রমণ কিভাবে হয়, কিভাবে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে এবং কিভাবেই-বা কোনও সামগ্রীকে পরিশোধন করা যায়।

রন্ধনকারীর মানসিকতা সঞ্চারিত হয়ে যায় তাঁর হাতে রান্না খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে এবং তাই রন্ধনকক্ষে থাকাকালীন তাঁকে কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে থাকার খুব চেষ্টা করতে হবে। যেখানে ভগবানের ভোগ রান্না করা হয়, সেটি শ্রীবিগ্রহকক্ষেরই সম্প্রসারিত অংশ রূপে মর্যাদা দেওয়া হয়ে থাকে, কারণ সেখানেই তিনি আহার গ্রহণ করেন। অতএব সমান ধরনের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উৎকর্ষমান (স্ট্যানডার্ড) এই দুটি জায়গাতেই প্রতিপালিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শ্রীল প্রভুপাদ অতীব গুরুত্ব সহকারে বলতেন যে, সকল সময়ে ভক্তদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কঠোর বিধি অনুসরণ করা উচিত। এই সম্পর্কে তিনি একখানি চিঠিতে লেখেন—

"প্রধান বিষয়টি হল এই যে, ভগবানের উদ্দেশ্যে যে কোনও প্রকার ভোগ নিবেদিত হোক্, তার প্রত্যেকটি অতি শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে প্রস্তুত ও নিবেদন করতে হবে। জগন্নাথ পুরীতে ভগবানের জন্য ছাপ্পান্ন রকমের ভোগ রান্না করে নিবেদন করা হয়ে থাকে। ভগবানকে যতবার ভোগ অর্পণ করা যায়, ততবারই তিনি

তা গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু একটি মাত্র বিষয়ে মনে রাখতে হবে যে, তাঁকে যা কিছু নিবেদন করা হবে, তা শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে করা চাই। যে খাদ্যসামগ্রী নিবেদন করা হয়েছে, তা আর কখনও ফ্রিজের মধ্যে অন্যান্য নিবেদন-না-করা সামগ্রীর মধ্যে যেন রাখা না হয় কিংবা রন্ধনকক্ষে তা ফিরিয়ে না আনা হয়। ফ্রিজ সর্বদা অতি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং পবিত্রভাবে রাখতে হবে। তার মধ্যে কোনও বাড়তি খাদ্যসামগ্রী থাকলে তা আলাদা করেই রাখতে হবে, এবং যদি কোনও বাড়তি ফ্রিজ থাকে, তবে সেটি রান্নাঘরের বাইরে রেখে দিতে হবে এবং তার মধ্যে নিবেদন না করা খাদ্যাদি কিংবা বাড়তি প্রসাদাদি তুলে রাখা চলে। রান্নাঘরের মধ্যে কখনই কারুরই খাওয়া উচিত নয়। খাওয়ার অনেক জায়গা আছে, তবে কেন রান্নাঘরের মধ্যে খাওয়া? রান্নাঘরটিকে ভগবানের থাকবার ঘর বলে বিবেচনা করা উচিত এবং রান্নাঘরে জুতো পায়ে দিয়ে কারও ঢোকা উচিত নয়। ভগবানের জন্যে যা খাদ্যসামগ্রী তৈরি হচ্ছে, তার ঘ্রাণ নেওয়া এবং স্বাদ পরীক্ষা করা রান্নাঘরের মধ্যে কখনই করা চলে না। রান্নাঘরের মধ্যে কথাবার্তা সেইটুকুই বলা চলে, যা তাঁর ভোগ রন্ধনের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ প্রয়োজন, এবং রান্নাঘর থেকে যে সব বাসনকোশন নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সেইগুলি নোংরা হয়ে গেলে সেই অবস্থাতেই রান্নাঘরে ঢোকানো অনুচিত। সেগুলি তাড়াতাড়ি ধুয়ে নিতে হবে। ভোগ প্রস্তুতের আগে ভালভাবে হাত ধুয়ে নিতে হবে এবং এইভাবে প্রতিটি বিষয়ে প্রস্তুতি পর্বে যথাযথ পরিচ্ছন্নতা মেনে চলা চাই। এই সমস্ত বিধি মানতে কি অসুবিধা? এই নিয়মগুলি তো খুবই সহজ এবং এই সব মেনে চলতেই হবে। শ্রীকৃষ্ণের নিয়ম মানতেই হবে। এই ভক্তিটুকু না থাকলে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লাভের কোনও কথাই ওঠে না। নিয়মগুলি মানতেও অসুবিধা তো কিছু দেখি না।" (শ্রীল প্রভুপাদ, ১৬ জুন ১৯৬৮)

ভগবানের সেবায় ভোগ অর্পণ করার পরে সেই খাদ্যসামগ্রী মজুত রাখার সময়ে খারাপ হয়ে গেলে, পচন ধরে গেলে খুব অপরাধ। রন্ধনকারীকে জানতে হবে কি কি আনাজ আছে এবং তাজা থাকতেই তা কাজে লাগানো উচিত।

শ্রীল প্রভুপাদ সব বিষয়ে যা দেখেছেন, তাই দেখে লিখেছিলেন—

"দেখবে, রান্নাঘরে কিছু অপচয় না হয়।" (শ্রীল প্রভুপাদের চিঠি থেকে, ১০ নভেম্বর ১৯৭৫)

যদি রান্নার সময়ে কোন খাদ্য মেঝেতে পড়ে যায়, সেটি যদি কাঁচা সবজি হয়, তা হলে পরিষ্কার জলে ভালভাবে তা ধুয়ে নিয়ে, তবে ব্যবহার করা উচিত। কোনও খাদ্যই অপচয় করা অনুচিত। (শ্রীল প্রভুপাদের চিঠি—১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮)

রান্নাঘরের নিয়মাবলী

রান্নাঘরের পোশাক

● মাথার চুল ঢেকে রাখা উচিত যাতে খাদ্যসামগ্রীতে একটিও চুল না পড়ে। ভোগ নৈবেদ্যে একটি চুলও যদি পড়ে, তবে তা বিষম অপরাধ।

● রান্নাঘরে পশমের পোশাক পরা অনুচিত।

● পোশাকাদি পরিচ্ছন্ন হওয়া চাই—অর্থাৎ স্নানঘরের পোশাক যেন না হয়, খাওয়ার সময়ে বা ঘুমোনোর সময়ে পরা পোশাক যেন না হয় কিংবা মন্দির প্রাঙ্গণের বাইরে থেকে পরে আসা পোশাকাদিও যেন না হয়।

নিজের পরিচ্ছন্নতা

● ভালভাবে স্নান সেরে, তিলক সেবা করে, কণ্ঠীমালা ধারণ করা চাই।

● রান্নাঘরে ঢোকবার আগে হাত ধুতে হবে এবং সেই হাতটি মুখে কিংবা চুলে লাগলে বা হাঁচি কিংবা কাশি হলে (আশা করি, মুখ ঢেকে হাঁচি কাশি সারা হবে), তখন আবার হাত ধুতে হবে।

খাদ্যের বিশুদ্ধতা

● রান্নার উপাদানগুলি জোগাড় করে নিয়ে, সব শাকসবজি ধুতে হবে এবং ফলমূল আর যা কিছু ধোওয়া যেতে পারে, সবই ধুয়ে নেওয়া উচিত।

● ধোওয়ার উপযোগী কোনও জিনিস যদি মেঝেতে কিংবা ধোওয়ার জায়গায় পড়ে যায়, তবে সেটিকে আবার ধুয়ে নিতে হবে। যদি সেটি ধোওয়ার পক্ষে উপযোগী না হয় তো সেটিকে বাদ দিয়েই দিতে হবে। কোনও উপাদান যদি পায়ের ওপরে পড়ে যায়, তবে সেটি ধোওয়ার মতো হোক বা না-ই হোক, তা বাদ দিতে হবে।

● যা কিছু রান্না করা হয়ে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে তা ঢাকনা দিয়ে রাখতে হবে। ভোগ নিবেদনের আগে যদি কোন পশু তা লক্ষ্য করে থাকে, তবে তা অবশ্যই বাদ দিয়ে দিতে হবে। শুধুমাত্র রন্ধনকারী এবং পূজারী ছাড়া ভোগ নিবেদনের আগে অন্য কেউ নৈবেদ্যের দিকে লক্ষ্য দেবে না।

● ঘি যখন ভাজার কাজে লাগছে না, তখন রান্নাঘরের কর্মীরা তা যেন ঢাকনা দিয়ে রাখে। পুরনো ঘি নিয়মিতভাবে বদলে নতুন ঘি ঢালতে হবে।

● লক্ষ্য রাখতে হবে যেন সকল রকমের উপাদান যথাযথভাবে পাত্রের মধ্যে বন্ধ করে রাখা হয়।

রান্নাঘর ও বাসনপত্রের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

● রান্নাঘরে যে ভক্তরা সেবা করেন, তাঁদের নিয়মিতভাবে রান্নাঘরটিকে এবং চুল্লীর স্টোভ, ওভেন আর ফ্রিজ সব কিছু একেবারে সম্পূর্ণভাবে ঝকমকে তক্‌তকেভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখা উচিত। (গোবর জল দিয়ে নিয়মিত পরিষ্কার করলেই ভাল হয়।)

● যারা বাসনপত্র মাজে, তাদের নিয়মিতভাবে বাসন ব্যবহারের ঠিক পরেই সেগুলি ভাল করে চেঁছে মুছে পরিষ্কার করে রাখা উচিত। (ব্যবহারের পরেই যত শীঘ্র পরিষ্কার করা হবে, তত সহজে সেগুলি পরিষ্কার হয়ে যায়)।

● রান্নাঘরে কেউ কিছু খাবে না, এমনকি সেখানকার জলের কল থেকে কেউ জলও খাবে না বা কলতলায় মুখ ধোবে না।

● দিনে অন্তত একবার রান্নাঘর থেকে জঞ্জাল সরিয়ে দিতে হবে।

● রান্নাঘরে প্রসাদ বোঝাই করে রাখা অনুচিত। ভোগ নিবেদন হয়ে যাওয়া মাত্রই, যত শীঘ্র সম্ভব বাসনপত্র ধুয়ে মুছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে সমস্ত প্রসাদ রান্নাঘর থেকে সরিয়ে ফেলতে হয়।

যথাযথ মানসিকতা প্রতিপালন

● যথেষ্ট সময় নিয়ে শুদ্ধ চিত্তে ভোগ নিবেদনের প্রস্তুতি প্রয়োজন। অতিব্যস্ততায় অপচয় হয়।

● কথাবার্তা শুধুমাত্র কৃষ্ণকথার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা চাই।

● আধুনিক জনপ্রিয় গানবাজনার রেকর্ডিং রান্নাঘরে বাজানো চলবে না। প্রচলিত ভজন ও কীর্তনাদি রেকর্ডই বাজানো ভাল।

● রান্নাঘরে একই সাথে নারী ও পুরুষের উপস্থিতি যতটা সম্ভব পরিহার করে চলতে হবে।

সাধারণত কেবলমাত্র বৈষ্ণবদেরই রান্নাঘরে ঢুকতে দেওয়া চলে, যেহেতু বৈষ্ণব ধারায় গড়ে ওঠা ভক্তরাই কেবলমাত্র যথাযথভাবে এই সমস্ত নিয়মকানুনের সার্থকতা বুঝতে এবং তা মেনে চলতে পারেন।

সম্ভব হলে, ভাজাভুজি খাঁটি ঘি দিয়েই করা উচিত। ভাজার জন্য ঘি নিয়মিত বদলে দেওয়া দরকার। (ঘি এবং অন্যান্য তেল একবার মাত্র ব্যবহার

করলেই সব চেয়ে ভাল হয়, কারণ প্রত্যেকবার গরম হওয়ার ফলে ঐগুলির পরিপাক গুণ কমতে থাকে। দক্ষ ভোগ রন্ধনকারী ভাজাভুজির জন্য স্বল্প পরিমাণে ঠিক প্রয়োজন মতো ঘি নিয়ে ভাজার পরে সেটি হালুয়া তৈরি কিংবা অন্নের সাথে পরিবেশনের কাজে লাগাতে পারেন।) ঘি না পাওয়া গেলে কিংবা তৈরি করে নেওয়া সম্ভব না হলে, নারকেল, সরিষার, সূর্যমুখী কিংবা বাদাম তেল ব্যবহার করা যেতে পারে।

রান্নাঘরের বাসনপত্র

যতদূর সম্ভব, রন্ধনকারী প্লাস্টিকের বাসন বা পাত্রাদি ব্যবহার করবেন না। মশলাপাতি চিনেমাটি, পিতল কিংবা খাঁটি ইস্পাতের (স্টেনলেস স্টিল) পাত্রে রাখাই সব চেয়ে ভাল।

রান্নাঘরের বাসনপত্র পাথরের তৈরি হলেই বেশ ভাল হয়। কাঁসা আর তামার পাত্রের ভিতরটায় যদি টিন অর্থাৎ রাঙের আস্তরণ না থাকে, তা হলে কোনও টক খাদ্যসামগ্রী (যাতে টম্যাটো কিংবা দই আছে) তাতে রাখা চলবে না, তবে ঐ সব পাত্র অন্য কাজে খুবই ভাল। ঢালাই লোহার পাত্রে যদি মরচে দাগ না থাকে, তা হলে ভাজার কাজে তা ব্যবহার করা চলে, তবে সিদ্ধ করার কাজে কখনই নয়, খাঁটি ইস্পাত (স্টেনলেস স্টিল) যদিও খুব উচ্চ শ্রেণীর বলে মনে করা হয় না, তবু ব্যবহার করা চলতে পারে। অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রগুলি (বেশ বিষাক্ত পদার্থের তৈরি) কিংবা এনামেল-করা লোহার পাত্রগুলি (যা থেকে এনামেল খসে গিয়ে ভোগসামগ্রী দূষিত করতে পারে) রন্ধনকারীর পরিহার করে চলাই উচিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীবিগ্রহ অর্চনের চৌষট্টি উপচার

হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থে দৈনন্দিন বিগ্রহ অর্চনের উদ্দেশ্যে চৌষট্টি উপচারের তালিকা দেওয়া আছে। অর্চনের সময়ে পরমেশ্বর ভগবানকে যে সমস্ত বিভিন্ন সামগ্রী বা সেবা অর্পণ করা হয়, সেইগুলিকে উপচার বলা হয়। এই অধ্যায়টিতে দৈনন্দিন সেবা সুচি অনুসারে পর পর চৌষট্টি উপচারের কথা আলোচনা করা হবে।* যেখানে যেমন প্রয়োজন, আমরা বিভিন্ন উপচারের কাজ সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করব এবং সামগ্রীগুলির নিবেদন সংক্রান্ত সাধারণ কোনও নিয়মবিধি থাকলে তার উল্লেখ করব। পরবর্তী অধ্যায় ৩ এবং ৪ অংশে উপচারাদি নিবেদনের বিশেষ পদ্ধতিগুলির বর্ণনা পাবেন।

চৌষট্টি উপচারের মধ্যে প্রাতঃকালীন পূজায় নিবেদনের জন্য ১৬টি মূল উপাদান (ষোড়শোপচার) দেখতে পাওয়া যাবে। এই ষোলটি মূল উপাদানের অধিকাংশই নানাভাবে সারা দিনে বিভিন্ন সময়ে নিবেদিত হয়ে থাকে, এবং এই উপাদানগুলির মধ্যে কয়েকটি পরিপূরক বলে ষোড়শোপচারের সঙ্গেও নিবেদিত হতে পারে। এইভাবেই উপচারের তালিকাটি ষোলটি থেকে চৌষট্টি হয়ে দাঁড়িয়েছে। শ্রীল সনাতন গোস্বামী দেখিয়েছেন যে, *হরিভক্তিবিলাসে* বিশেষভাবে উল্লেখ করা না থাকলেও আরও অনেক উপচার নিবেদন করতেও পারা যায়, বিশেষ করে উৎসবাদির দিনে। তাই বিগ্রহের অর্চনায় চৌষট্টি উপচারেই সীমাবদ্ধ থাকে না। আশা করা যায় না যে, প্রত্যেক মন্দিরে প্রতিদিন

---

* *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, মধ্যলীলা ২৪/৩৩৪ শ্লোকের তাৎপর্যে শ্রীল প্রভুপাদ উপচারের এই তালিকাটি অন্তর্ভুক্ত করেছেন, তবে তাতে উপচারগুলি উপস্থাপনার ক্রমবিন্যাস *হরিভক্তিবিলাস* গ্রন্থের উপস্থাপনা থেকে সামান্য ভিন্ন। বর্তমান নিবন্ধে *হরিভক্তিবিলাস* গ্রন্থটিকেই অনুসরণ করা হয়েছে, যেহেতু এতে দৈনন্দিন নিত্যসেবার যথাযথ নিবেদনের ক্রমই অনুসরণ করা হয়েছে। আমরা এখানে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করতে পারি যে, ইসকনে বিগ্রহ অর্চন সম্পর্কিত প্রথম পুস্তিকা "বিগ্রহ অর্চনের সার্থকতায়" ৩৩০-৩৪০ শ্লোকগুলি ছিল এবং *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, মধ্যলীলা ২৪ অধ্যায়ের তাৎপর্যসহ, সনাতন গোস্বামীকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁর *হরিভক্তিবিলাস* গ্রন্থে কি কি সন্নিবিষ্ট হওয়া উচিত। ১৯৭৪ সালে শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তদের দিয়ে সমস্ত মন্দিরে "বিগ্রহ অর্চনের সার্থকতা" পুস্তিকাটি বিতরণের ব্যবস্থা করেন এবং অনুরোধ জানিয়েছিলেন যে, সমস্ত ইসকন মন্দিরে যেন বিগ্রহ সেবা-অর্চনের সময়ে সেটি কার্যকরী করা হয়।

সব কটি চৌষট্টি উপচার নিবেদন করতে হবে, কিন্তু অন্তত একজন পূর্ণ সেবারত পূজারীর সাহায্যে অধিকাংশ উপকরণই নিবেদন করা যেতে পারে। শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন, *"কখনও চৌষট্টি উপচারের সব ক'টি সংগ্রহ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে, তাই আমরা নির্দেশ দিয়েছি যে, অন্তত ভগবানের শ্রীবিগ্রহের প্রতিষ্ঠার দিন যেন চৌষট্টি উপচারে ভগবানের সেবা করা হয়। ভগবানের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার পর, চৌষট্টি উপচারের সবগুলি দিয়ে যতদিন সম্ভব ভগবানের পূজা করা উচিত।" (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ২৪/৩৩৪ তাৎপর্য)*

ষোড়শোপচার পূজা

প্রাতঃকালীন পূজার সময়, মূল বিগ্রহাদিকে, বিশেষ করে প্রকাশ্যস্থানে অবস্থিত মন্দিরে অন্তত ষোড়শোপচারে পূজা করা উচিত। অন্যান্য বিগ্রহাদির (মন্দিরে মূল বিগ্রহাদি ছাড়া অন্যান্য অতিরিক্ত বিগ্রহাদি বা বাড়িতে আরাধিত রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহাদি থাকলে তাঁদের) উদ্দেশ্যে যতদূর সম্ভব ৫টি, ১০টি কিংবা ১২টি উপচার দিয়ে পূজা নিবেদন করা চলে, নিজ সামর্থ্য অনুসারে, সময় বুঝে।* পূজারীরা সচরাচর বিভিন্ন ধরনের প্রাথমিক অর্চনাদির মাঝে মাত্র দু'তিনটি উপচার নিবেদন করে থাকেন, যেমন, বিগ্রহ-কক্ষের দ্বারীর অর্চন, ঘণ্টা ইত্যাদি উপকরণাদির অর্চন, কিংবা ভগবানের অধিষ্ঠান-ক্ষেত্রের অর্চন (পীঠপূজা)।

একটি মাত্র উপচার যা অবশ্যই অর্পিত হওয়া চাই, অন্য সমস্ত উপচার থাকুক বা না-ই থাকুক তা হল ভক্তি।

চৌষট্টি উপচার

প্রাতঃকালে শ্রীবিগ্রহের সেবা, যথা—জাগরণ, নমস্কার এবং মঙ্গল আরতি থেকেই চৌষট্টি উপচার তালিকা শুরু হয়ে যায়। এই ক্রিয়াগুলিকে বলা হয় জাগরণ সেবা। এরপরে যা বর্ণনা করা হচ্ছে, সেইগুলি চৌষট্টি উপচারের মাধ্যমে পূজার তালিকা ও তার যথাযথ ব্যাখ্যা।

---

* শালগ্রাম শিলা বিরাজিত থাকলে, মূল বিগ্রহগুলিকে শালগ্রাম শিলার পূজার মাধ্যমে মূল বিগ্রহগণও প্রাতঃকালীন অর্চনা পেতে পারেন। যেমন, যদি বিশাল মর্মর বিগ্রহের সাথে ছোট ধাতব বিগ্রহাদিও অধিষ্ঠিত থাকেন, তবে ছোট বিগ্রহগুলিকে প্রতিদিন অভিষেক করানোর প্রয়োজন হয় না। অবশ্য, তাঁদের প্রত্যহ একটি ভিজা বস্ত্রখণ্ডের দ্বারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে শৃঙ্গারাদি সহকারে বস্ত্র-আভরণে বিজয় (বড়) বিগ্রহাদির মতোই সুসজ্জিত করে রাখা উচিত। যদিও তাঁদের প্রতিদিন অভিষেকের আবশ্যক হয় না, যেহেতু তাঁদের পরিবর্তে শালগ্রাম শিলার অভিষেক প্রতিদিন করা হচ্ছে, তবু ধাতব বিগ্রহাদি ঘষামাজা করে সপ্তাহে একবার অভিষেক করা প্রয়োজন, অন্তত প্রত্যেক একাদশী তিথিতে। শ্রীল প্রভুপাদ পরামর্শ দিয়েছেন বিগ্রহের অন্তত দর্শনীয় অংশগুলি—তাঁদের মুখ, হাত ও পা—সময়সাপেক্ষে প্রতিদিন ঘষামাজা করা উচিত।

জাগরণ সেবা

♦ (১) পূজার জন্য বিগ্রহকক্ষে প্রবেশের পূর্বে বাদ্যসহযোগে বেদস্তুতি ও স্তোত্রপাঠের মাধ্যমে ভগবানের সমক্ষে বিনম্র আত্মনিবেদন (*বেদঘোষণাবীণাদিবাদ্যৈর্বন্দীস্তবৈর্প্রবোধনম্*)।

প্রথাগতভাবে, বড় বড় মন্দিরগুলিতে ভক্তবৃন্দ মন্দিরের মধ্যে বৈদিক স্তোত্র উচ্চারণের মাধ্যমে ভগবানকে জাগরণের সেবা অর্পণ করে থাকেন। দক্ষিণ ভারতে বেঙ্কটেশ্বর মন্দিরে, ভক্তরা 'বেঙ্কটেশ্বর সুপ্রভাত' নামে ভগবানকে জাগরণের বিশেষ স্তোত্র পাঠ করতে থাকেন।

মূল ষোড়শোপচার					
১৬ উপচার	১২ উপচার	১০ উপচার	৫ উপচার	৩ উপচার	২ উপচার
আবাহন					
১। আসন	আসন	আসন			
২। স্বাগত	স্বাগত	স্বাগত			
৩। পাদ্য	পাদ্য	পাদ্য			
৪। অর্ঘ্য	অর্ঘ্য	অর্ঘ্য			
৫। আচমন	আচমন	আচমন			
৬। মধুপর্ক	মধুপর্ক				
৭। পুনরাচমন	পুনরাচমন				
অভিষেক এবং শৃঙ্গার ও বস্ত্র আভরণ					
৮। স্নান					
৯। বস্ত্র					
১০। অলঙ্কার					
অর্চন					
১১। গন্ধ	গন্ধ	গন্ধ	গন্ধ	গন্ধ	গন্ধ
১২। পুষ্প	পুষ্প	পুষ্প	পুষ্প	পুষ্প	পুষ্প
১৩। ধূপ	ধূপ	ধূপ	ধূপ		
১৪। দীপ	দীপ	দীপ	দীপ		
১৫। নৈবেদ্য	নৈবেদ্য	নৈবেদ্য	নৈবেদ্য	নৈবেদ্য	
সমাপ্তি ক্রিয়া					
১৬। প্রণাম					

পূজারী অন্তত একটি ঘণ্টা বাজিয়ে ভগবানের মনোযোগ প্রার্থনা করছেন এবং তিনি জানাবেন যে, তিনি পূজা-অর্চনা নিবেদন করতে অভিলাষী।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ মন্দিরের মধ্যেও একটি ঘণ্টা বাজানোর প্রয়োজনীয়তায় গুরুত্ব দিয়েছেন, যাতে দর্শনার্থীরাও ভগবানের মন্দির ভবনে প্রবেশ করে তাঁরা অর্চনের প্রথম উপকরণটি নিবেদন করতে পারেন—

"মন্দিরের সম্মুখে একটি বৃহৎ ঘণ্টা ঝুলিয়ে রাখা উচিত, যাতে মন্দিরে প্রবেশ করার সময়ে দর্শনার্থী সেটি বাজাতে পারেন। একে বলা হয় প্রবোধন বা বাদ্য স্তব দ্বারা ভগবানের কাছে নিজেকে নিবেদন। এটি হল শ্রীবিগ্রহ অর্চনের প্রথম উপচার।" (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ২৪/৩৩৪ তাৎপর্য)

♦ (২) শ্রীবিগ্রহ দর্শনে 'জয়' শব্দ

শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন—

"ঘণ্টাটি বাজাবার সময় 'জয়' শব্দ উচ্চারণ করা উচিত—'জয় শ্রীরাধা-গোবিন্দ' কিংবা 'জয় শ্রীরাধা-মাধব'। 'জয়' শব্দটি উচ্চারণ করা অবশ্যই চাই। তারপরেই ভগবানকে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করতে হয়। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ২৪/৩৩৪ তাৎপর্য)

♦ (৩) নমস্কার

শ্রীবিগ্রহাদি জাগরণের পরে অতি প্রত্যূষে তাঁদের প্রণতি নিবেদন করা উচিত, কারণ শাস্ত্রে অনুশাসন আছে যে, ভগবান যখন বিশ্রাম (নিদ্রা) গ্রহণ করেন, তখন তাঁকে প্রণতি নিবেদন করে বিরক্ত করা অনুচিত। (এমন কি, কঠোর বিধিপূর্বক, ঐ সমস্ত সময়ে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের প্রদক্ষিণ করাও অনুচিত) তা ছাড়া, শ্রীবিগ্রহ-কক্ষের বাইরে প্রণতি নিবেদন করতে হয়, কখনই ভেতরে নয়, কারণ সম্ভ্রমপূর্বক দূরত্ব রক্ষা করে শ্রদ্ধা নিবেদন করাই রীতি। শ্রীবিগ্রহকক্ষের মধ্যে করজোড়ে প্রণাম মুদ্রা সহকারে প্রণাম জানাতে হয়, মন্ত্রোচ্চারণের সাহায্যে এবং মনে মনে।

অষ্টাঙ্গ-প্রণাম ও পঞ্চাঙ্গ-প্রণাম

শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন—

" 'দণ্ড' মানে হচ্ছে লাঠি। শরীরের আটটি অঙ্গ যখন প্রণতি নিবেদন করে দণ্ডের মতো ভূপতিত হয়, তাকে বলা হয় দণ্ডবৎ। কখনও কখনও আমরা

মুখে বলি দণ্ডবৎ, কিন্তু ভূ-পতিত হয়ে প্রণতি নিবেদন করি না। কিন্তু তথাপি 'দণ্ডবৎ' মানে হচ্ছে গুরুজনের সামনে দণ্ডের মতো ভূ-পতিত হয়ে প্রণতি নিবেদন করা।" (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ১/৬৭, তাৎপর্য)

শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থে বলা হয়েছে কিভাবে দণ্ডবৎ-প্রণাম নিবেদন করতে হয়—পা, হাঁটু, বুক, হাত, মাথা, চোখ, মন এবং বাক্য—এই আটটি অঙ্গ দ্বারা অষ্টাঙ্গ প্রণাম করা চাই। দুই পা, হাঁটু, বুক, দুই হাত* এবং মাথা ভূমি স্পর্শ করবে আর অর্ধ উন্মীলিত চোখ দু'টি ভূমি-অভিমুখী রেখে, যথোপযুক্ত প্রার্থনা-মন্ত্র উচ্চারণ করবার সময়ে ধ্যানমগ্নভাবে চিন্তা করা চাই যেন মাথাটি ভগবানের শ্রীচরণকমলের নিচে নিবেদিত হয়ে রয়েছে।

পঞ্চাঙ্গ-প্রণাম করতে হলে—হাঁটু, বাহু, মাথা, বুদ্ধি এবং বাক্য—এইগুলি দিয়ে প্রণতি নিবেদন করতে হয়। (বুকটি ভূমি স্পর্শ করে না।) একটি হাত দিয়ে প্রণতি নিবেদন করা অপরাধ—অর্থাৎ, একটি হাত মাথায় তুলে, অন্য হাতটি জপথলির মধ্যে কিংবা অন্য কোনও পবিত্র সামগ্রীতে নিয়োজিত রেখে। প্রণতি নিবেদন করবার সময়ে, হাতে কিছু ধরা থাকলে তা নামিয়ে রাখতে হয়।

পুরুষেরা এই দু'রকমেরই প্রণতি নিবেদন করতে পারেন, কিন্তু প্রথাগতভাবে মহিলারা কেবলমাত্র পঞ্চাঙ্গ প্রণামই করে থাকেন, কারণ তাঁদের বক্ষ ভূমিস্পর্শ করা অনুচিত। *শ্রীহরিভক্তিবিলাস* গ্রন্থে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে প্রণামের উপযোগিতা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, প্রণাম যখনই করা হবে, তখন অন্তত চারবার দণ্ডবৎ করতে হয়।

প্রণাম করবার সময়ে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কোন্ দিকে মুখ রাখা উচিত, সেই বিষয়ে বিশেষ অনুশাসনাদি খুবই সামান্য ধরনের। সাধারণ নিয়ম হল, যাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হচ্ছে, তাঁর দিকে মাথা রাখা। মন্দিরে যখন শ্রীবিগ্রহের বিপরীত দিকে শ্রীগরুড়-বিগ্রহ অধিষ্ঠিত থাকেন, তখন শাস্ত্রে বলা হচ্ছে যে, শ্রীবিগ্রহকে বাঁদিকে রেখে প্রণতি নিবেদন করা উচিত যাতে শ্রীগরুড়ের দিকে (কিংবা, অনেক ইসকন মন্দিরে শ্রীল প্রভুপাদের দিকে) পা না থাকে। প্রণাম নিবেদনের সময়ে প্রথমে নিজ গুরুদেবের প্রণাম-মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয়, তার পরে শ্রীল প্রভুপাদের প্রণাম-মন্ত্র (যদি ভিন্ন গুরুদেব হন) এবং শেষে পূজাবেদীর শ্রীবিগ্রহাদির উদ্দেশ্যে প্রণাম মন্ত্রাদি উচ্চারণ করা উচিত।

শাস্ত্রে বলা হচ্ছে, শ্রীবিগ্রহ কক্ষে প্রবেশকালে বিনীতভাবে, ঈষৎ আনত হয়ে, এবং প্রথমে ডান পা ঘরের ভেতরে দিতে হয়। শ্রীবিগ্রহ-কক্ষে যখনই

---

* হাত দু'খানি ছড়িয়ে সামনে মাথার ওপরে দিতে হবে; মাথার নিচে কিংবা বুকের নিচে চেপে থাকবে না।

সেবাকার্যের উদ্দেশ্যে প্রবেশ করতে হবে, তখন একটা কিছু শব্দ করে এগুতে হবে—যেমন, দরজায় টোকা দিয়ে, হাতে তালি দিয়ে, কিংবা ঘণ্টা বাজিয়ে। তবে সেবাকার্য চলাকালীন যতবার শ্রীবিগ্রহ-কক্ষে ঢুকতে হবে, ততবারই শব্দ করে ঢোকবার দরকার হয় না, তবে প্রথমে সেবাকার্য শুরু হবার সময়ে তা করা চাই।

♦ (৪) মঙ্গল-আরতি (আরাত্রিক)

শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন—

> *"সূর্যোদয়ের দেড় ঘণ্টা পূর্বে, নিয়মিতভাবে মন্দিরে ভগবানের মঙ্গল-আরতি করা কর্তব্য।"* (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ২৪/৩৩৪ তাৎপর্য)*

শ্রীল প্রভুপাদ *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে আরতি দর্শনের উপকারিতা বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করেছেন—

> *"ভগবানের আরতি সম্বন্ধে স্কন্দ পুরাণে বর্ণনা করা হয়েছে, 'কেউ যদি আরতির সময়ে ভগবানের শ্রীমুখমণ্ডল দর্শন করেন, তা হলে তিনি কোটি কোটি বছরের সঞ্চিত সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হন। তিনি, এমন কি ব্রহ্মহত্যার মতো জঘন্যতম পাপ থেকেও মুক্ত হন।" (৯ম অধ্যায়)*

আরতিকে অনেক সময় *নীরাজন* বা দৃষ্টি বলাও হয়, যার অর্থ হল, কারও নিরাপত্তার জন্য, অশুভ প্রভাব কিংবা কোন অমঙ্গলের বিষয় থেকে তাঁকে মুক্ত করার জন্য তাঁর সামনে কিছু পবিত্র মঙ্গল দ্রব্যের সঞ্চালন করা। নানা প্রকার উপকরণ নিবেদন করা হয়ে থাকে, সবই শুদ্ধ রূপে জড়জাগতিক সামগ্রী এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পবিত্র বস্তু (যেমন, শব্দ, রূপ, স্পর্শ, ইত্যাদি)। সুতরাং ভগবানের আরতি অনুষ্ঠানে যা কিছু নিবেদিত হয়, তা সবই বিশেষ মঙ্গলসূচক, তবে অতি প্রত্যূষে প্রথমে যে আরতি নিবেদিত হয়, সেটিকে বিশেষ করে মঙ্গলময় বলে বিবেচনা করা হয় সকল যোগদানকারী এবং দর্শনার্থীদের পক্ষেও।

মঙ্গল-আরতি (দিনের প্রথম আরতি) অবশ্যই পূর্ণ আরতি হওয়া চাই, তাতে ধূপ, দীপ, জল, বস্ত্র, পুষ্প ও চামর ব্যজন থাকবে। গরমকালে, এই সময়ে পাখা ব্যবহার করাও চলে।

---

* বিভিন্ন স্থানের ভৌগোলিক ও ঋতু-পরিবেশ অনুসারে, মন্দিরে মঙ্গল-আরতি ভোর ৪টার আগে কখনই শুরু করা উচিত নয় এবং সাধারণত ভোর ৫টার পরেও নয়—অবশ্য, যদি স্থানীয় প্রতিবেশীরা শব্দের জন্য আপত্তি না করেন।

মঙ্গল আরতির আগে দুগ্ধসামগ্রীর মিষ্টান্ন নিবেদন করা উচিত। ভোগ নিবেদনের বিস্তারিত পরামর্শ পরে 'নৈবেদ্য উপচার' অংশে পাওয়া যাবে।

পূর্বাঙ্গ কর্ম

যোড়শোপচারে মূল শ্রীবিগ্রহের প্রধান অর্চন শুরু করবার আগে, প্রাথমিক শুদ্ধি ও অর্চনের জন্য কয়েকটি কর্তব্য সম্পাদন করা চাই।

শুদ্ধির জন্য অর্ঘ্য (সামান্য অর্ঘ্য ও বিশেষ অর্ঘ্য)

পূজা-অর্চনার জল দরকারি উপাদান। এটা যে কেবলমাত্র অনেক উপকরণের শুদ্ধির জন্যেই প্রয়োজন হয়, তা নয়—জল যখন শ্রীবিগ্রহের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়, তখন সেই জল আর শ্রীবিগ্রহ অভিন্ন হয়ে ওঠে। সেই জলে পারমার্থিক শক্তি সঞ্চারিত হয়ে যায়। ঐভাবে শুদ্ধিকৃত জল *প্রোক্ষণ* অর্থাৎ বিভিন্ন স্থানে ও সামগ্রীতে ঐ পবিত্র জল নিক্ষেপ করে, এমন কি নিজেকেও, শুদ্ধ করে নেওয়া যায়। এই পদ্ধতি সমস্ত পূজা প্রকরণে সাধারণভাবে প্রচলিত আছে এবং বিভিন্ন পূজা পদ্ধতি সংক্রান্ত গ্রন্থেও সামান্য অর্ঘ্যের ঐরকম বর্ণনা আছে। অর্চনের পূর্বেই সামান্য অর্ঘ্য নিবেদন করা উচিত।

মূল শ্রীবিগ্রহের পূর্ণাঙ্গ অর্চন শুরু হওয়ার আগে, আরও একটি অর্ঘ্য প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে, যাকে বলে *'বিশেষ অর্ঘ্য'*। শ্রীবিগ্রহকে বন্দনা জানানোর উদ্দেশ্যে এবং তাঁর অর্চন শুরু করবার পূর্বে স্থান উপকরণাদি এক পূজারী নিজেকে চূড়ান্তভাবে পারমার্থিক বিশুদ্ধতার পর্যায়ে উন্নীত করতে চান। এই 'বিশেষ অর্ঘ্য' একটি পৃথক পাত্রে রাখা যেতে পারে, তাতে অন্যান্য বিবিধ উপকরণাদি থাকতে পারে, যা ভগবানের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য-উপচার স্বরূপ নিবেদিত হয়েছে। সাধারণত বিশেষ অর্ঘ্য থাকে একটি শঙ্খের মধ্যে, তাই অনেক সময়ে এই প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় শঙ্খ-স্থাপন। সহজ সরল পূজা অনুষ্ঠানে সামান্য অর্ঘ্য দ্বারাই বিশেষ অর্ঘ্যের সেবা নিবেদিত হতে পারে।

আসন-স্থাপন

'আরতি ছাড়া অন্যান্য পূজা-অর্চনার ক্ষেত্রে পূজারীকে আসনে বসতে হয়, নচেৎ মনোনিবেশ করা দুঃসাধ্য। এমন কি, শাস্ত্রে পরামর্শ দেওয়া আছে যে, বসবার আসন পদ্ধতির ক্ষেত্রে *পদ্মাসন* এবং *স্বস্তিকাসন* পা ভাঁজ করে পায়ে কাপড় ঢাকা দিয়ে বসতে হয়। পূজা যেখানে করতে হয়, সেখানেই আসনে উপবেশন করা চাই। মেঝেতে বসে পূজা-অর্চনা করা সেবা অপরাধ। শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, কাঠ, পাথর, বাঁশ, মাটি, ও কুশ ছাড়া অন্য ঘাসের

তৈরি আসনে বসলে রোগ ব্যাধি, দারিদ্র্য এবং দুঃখ জাগতে পারে। কুশ ঘাস, রেশম কিংবা পশমের আসন হল বৈষ্ণবদের অর্চন পদ্ধতির জন্য সর্বোৎকৃষ্ট।

পাত্র-স্থাপন

পূজার জন্য বিভিন্ন পাত্র ও আধারগুলি এমনভাবে সাজিয়ে নিয়ে বসতে হবে যাতে পূজার সময়ে নিজ আসন ছেড়ে নড়তে না হয় এবং তাতে একাগ্রতা ও পূজার বিঘ্ন না ঘটে। যত্ন নিতে হবে যেন নিবেদিত সামগ্রী অন্য কোনও সামগ্রীর সাথে স্পর্শ না হয়। তা যদি হয়, তা হলে অন্য সামগ্রীগুলি ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদনের অযোগ্য হয়ে যায়।

গুরুপংক্তি নমস্কার

পূজা অর্চনা শুরু করার আগে শ্রীগুরুদেব ও গুরুবর্গের আশীর্বাদ প্রার্থনা করা উচিত, মনে রাখতে হবে, আমরা শুধুমাত্র আমাদের গুরুদেব ও তাঁর গুরু-শিষ্য পরম্পরার সহায়তার জন্য পূজা অর্চনা সম্পাদন করছি। সুতরাং পূজা পদ্ধতি শুরু করার আগে করজোড়ে (প্রণাম মুদ্রা) মনে মনে গুরুদেবকে দণ্ডবৎ প্রণতি জানাতে হয়।

করশুদ্ধি, পুষ্পশুদ্ধি ও দ্রব্যশুদ্ধি

পূজা-অর্চনার সমস্ত উপকরণাদি একত্রিত করে নিয়ে আসনে উপবেশনের পরে, হাত ধুয়ে করশুদ্ধি করতে হয়। কেউ যদি অশুদ্ধ হাত দিয়ে পবিত্র ক্রিয়াদি সম্পন্ন করে, তবে সব কিছুই অশুদ্ধ হয়ে যাবে। জল দিয়ে হাত ধুয়ে কিংবা হাতে চন্দন ঘষে পবিত্র করে নিতে হয়। পূজারীর হাত পবিত্র হলে, অন্যান্য উপকরণাদিও পবিত্র হয়ে ওঠে।

পুষ্পাদি পবিত্র করে নিতে হয় প্রোক্ষণ (সামান্য অর্ঘ্যের জল প্রক্ষেপ), মুদ্রাদি* এবং মন্ত্র দ্বারা।

---

* বিশদভাবে পূজা-অর্চনার ক্ষেত্রে, মুদ্রাদি প্রয়োগ ইচ্ছা হলে করা যেতে পারে। মুদ্রা হল হাতের ভঙ্গিমাদি যা ভগবানের প্রীতিসাধন করে। ভগবানের উদ্দেশ্যে মনোনিবেশের পক্ষে এই হস্তমুদ্রাদি পূজারীকে সাহায্য করে। বিষ্ণু পূজার জন্য চব্বিশটি মুদ্রা নির্দেশিত আছে। কতকগুলির দ্বারা ভগবানের অস্ত্রশস্ত্রাদি বোঝায়, অন্যগুলি বিভিন্ন কাজের সহায়ক হয়, যেমন চক্র-মুদ্রা রক্ষা করে এবং ধনুমুদ্রা অমৃত সৃষ্টি করে, বেণু, বনমালা, বিল্ব, শ্রীবৎস, এবং কৌস্তুভ, এই পাঁচটি মুদ্রা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ প্রিয়, পূজার আগে পূজারী এইগুলি ভগবানের সামনে নিবেদন করতে পারেন। তা ছাড়া, ষোড়শোপচারের প্রত্যেকটির জন্য মুদ্রা নির্ধারিত আছে, প্রত্যেকটি উপচার নিবেদনের সময় যথাযথ মুদ্রা প্রদর্শন করা যেতে পারে। (শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের অর্চনায় উপচার-মুদ্রা প্রদর্শিত হয় না।)

শ্রীবিগ্রহ মূল মন্ত্রাদি উচ্চারণ করে, সামান্য অর্ঘ্য প্রোক্ষণ করে (শ্রীবিগ্রহ অর্চনার মন্ত্রপূত জল নিক্ষেপ করে) এবং হস্তমুদ্রাদি প্রদর্শন করে পূজার উপকরণগুলিকে পারমার্থিকভাবে পরিশুদ্ধ করে নেওয়া যায়।

ভূত-শুদ্ধি

পাপ বাসনায় পূর্ণ ভূতাদি শরীর থেকে শুদ্ধতা অর্জনের জন্য ভূত-শুদ্ধি প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। অবশ্য জড় শরীরের উৎপত্তিই হয় পাপ বাসনা থেকে। সেই অবস্থায় কোনও মানুষ ভগবানের পূজার জন্য, এমন কি ভগবানের সান্নিধ্য লাভের জন্যও এই শরীর নিয়ে অগ্রসর হওয়াই অনুচিত। শাস্ত্রে তাই বলা হয়েছে, *নাদেবো দেবং অর্চয়েৎ*—"দেব পর্যায়ে (অর্থাৎ পবিত্র পর্যায়ে) উপনীত না হলে কারও পক্ষে ভগবানের পূজা করা চলে না।"

যে পদ্ধতির মাধ্যমে আমাদের জড় চেতনা পরিশুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং আমাদের চিন্ময় দেহের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়, তাকে বলে ভূত-শুদ্ধি। *শ্রীহরিভক্তিবিলাস* গ্রন্থে বলা হচ্ছে—

> *ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এই পঞ্চভূতে সৃষ্ট মানবদেহ সচ্চিদানন্দ ভগবানের উদ্দেশ্যে জাগরিত করে তোলার প্রক্রিয়াকে ভূত-শুদ্ধি বলে।*

সমস্ত পূজা-পদ্ধতির নির্দেশাবলীতেই ভূত-শুদ্ধির প্রক্রিয়া বর্ণনা করা আছে। সর্বপ্রকার পূজা, জপ এবং ধ্যান সাধনার ক্ষেত্রে ভক্তদের উন্নতি লাভের সকল পর্যায়ে এই প্রক্রিয়াটি প্রযোজ্য হয়।

ভূত-শুদ্ধির দু'ধরনের প্রক্রিয়ার মধ্যে যে কোনও একটি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে—প্রথমটি বিশদ ও সুসংবদ্ধ প্রক্রিয়া, যার সাহায্যে শরীর থেকে স্থূল ভূত উপাদানগুলি বহির্গত হয়ে নতুন প্রাণশক্তিময় উপাদানে নির্মিত শরীর লাভ হয়, এবং অবশেষে বিশুদ্ধ চেতনার পর্যায়ে উপনীত হওয়া যায়, দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটি কৃষ্ণভক্তরা পছন্দ করেন, যাতে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় যে, মানুষ হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস এবং তার ফলে সে সম্পূর্ণ চিন্ময় ও বিশুদ্ধ। কেউ যদি তেমন চেতন পর্যায়ে অধিষ্ঠিত হতে পারে, তবে দেহের ভূত-উপাদানসমূহ স্বতঃই পরিশুদ্ধ হয়ে ওঠে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৮/৫৪) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করেছেন, ব্রহ্মভূত পর্যায়ে অধিষ্ঠিত মানুষের লক্ষণাদি কেমন হয়—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥

"যিনি এইভাবে চিন্ময় ভাব লাভ করেছেন, তিনি পরম ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেছেন। তিনি কখনই কোন কিছুর জন্য শোক করেন না বা কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না, তিনি সমস্ত জীবের প্রতি সমদৃষ্টি সম্পন্ন। সেই অবস্থায় তিনি আমার শুদ্ধ ভক্তি লাভ করেন।" (*গীতা* ১৮/৫৪)

প্রারম্ভিক অর্চন

গুরুপূজা

অর্চনের প্রতিটি অনুষ্ঠানে গুরুপূজা দিয়ে সূচনা করা অবশ্যই কর্তব্য। এইভাবেই শ্রীগুরুদেবের কৃপাশক্তি অর্জন করতে হয়, ভগবানের কাছে ভক্তি নিবেদনের প্রথম এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পন্থা। শুধুমাত্র গুরুকে সন্তুষ্ট করে এবং তাঁর কৃপালাভ করেই ভগবানের কাছে যে কোনও বস্তু নিবেদনের মাধ্যম গড়ে তুলতে হয়। এই বিষয়ে *পঞ্চরাত্র* শাস্ত্রে সুদৃঢ়ভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে—

> *প্রথমে গুরুপূজা সম্পন্ন করে, তারপরে আমাকে (ভগবানকে) যে পূজা করে, তার সিদ্ধিলাভ হয়। নচেৎ পূজা হয় নিষ্ফল। (হরিভক্তিবিলাস, ৪/৩৪৪)*

> *গুরুপূজার আগে কেউ পূজা-অর্চনা করলে তার কেবল দুর্ভাগ্য জোটে। তার পূজা হয় নিরর্থক। (হরিভক্তিবিলাস, ৪/৩৪৫)*

> *প্রথমে গুরুদেবের সমক্ষে উপনীত হতে হয়, তাঁকে প্রণতি জানাতে হয়, তাঁর উদ্দেশ্যে কিছু নিবেদন করতে হয়, এবং ভক্তিভরে তাঁর পূজা করতে হয়। তাঁর কৃপা অর্জনের পরে, পরমেশ্বর ভগবানের পূজা করা উচিত। (হরিভক্তিবিলাস)*

গুরুদেবকে একখানি চিত্রপটের মাধ্যমে, একটি মূর্তি, একটি যন্ত্র (মন্ত্র-খচিত নক্‌শা অঙ্কন), ঘট, কিংবা গুরুদেবের পাদুকা, যা তাঁর থেকে অভিন্ন সত্তা, এই সবের মাধ্যমেও পূজা করতে পারা যায়। সাধারণত গুরুদেবের চিত্রপট কিংবা মূর্তিকেই পূজা করা হয়ে থাকে। গুরুদেবের চিত্রপটে তাঁর সর্বাঙ্গ রূপ থাকা উচিত।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ষোড়শোপচারে গুরুদেবের পূজার পরামর্শ দিয়েছিলেন, কিন্তু তা সম্ভব না হলে সামর্থ্য ও পরিবেশ অনুযায়ী বারো, দশ, অথবা পাঁচটি উপচারেও পূজা করতে পারা যায়। সম্ভব হলে প্রকৃত সামগ্রী

দিয়েই পূজা সম্পন্ন করা উচিত; নচেৎ, চন্দনসিক্ত পুষ্পাদি কিংবা বিশুদ্ধ জলও নানা সামগ্রীর বিকল্পরূপে যথাযথ মন্ত্রাদি উচ্চারণ সহকারে নিবেদন করা চলে। তাও সম্ভব না হলে, অন্ততপক্ষে মানস-পূজার মাধ্যমেই গুরুদেবের পূজা করা উচিত।'* প্রণামান্তে পূজা সমাপন করা উচিত এবং ভগবানের সেবাকার্যে নিয়োজিত থাকার জন্য গুরুদেবের অনুমতি প্রার্থনা করা কর্তব্য। গুরুপূজার পদ্ধতি নিয়ে তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা থাকবে।

গৌরাঙ্গ পূজা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামীরা শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের পূজার আগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে প্রথমে পূজা অর্পণ করেন, কারণ কেবলমাত্র তাঁরই মাধ্যমে আমরা শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের সেবায় উদ্যোগী হতে পারি।** গুরুপূজার মতো ষোল, বারো, দশ কিংবা পাঁচটি উপাদান দিয়ে অথবা যতগুলি সম্ভব উপাদান দিয়ে এবং সেই সঙ্গে বিকল্প সামগ্রী দিয়েও পূজা করা চলে। শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের পূজা-অর্চনা সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা প্রার্থনা করে তাঁদের প্রণামান্তে পূজা সমাধা করা কর্তব্য।

শ্রীশ্রীগৌর-নিতাইয়ের পূজা-অর্চনার গুরুত্ব সম্পর্কে শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন—

> *শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের সেবার মাধ্যমে জড়জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় এবং তার ফলে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ বিগ্রহের পূজা-অর্চনার যোগ্যতা লাভ হয়। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ৮/৩১ তাৎপর্য)*

ধ্যান

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩/২৮/১৮) ভগবান শ্রীকপিলদেব তাঁর জননীকে ধ্যান সম্পর্কে উপদেশ দিয়েছেন—

---

* এই পরামর্শটি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে নিবেদিত প্রাথমিক অর্চনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

** অবশ্য যে সমস্ত মন্দিরে মূল বিগ্রহস্বরূপ শ্রীশ্রীগৌর-নিতাই বিরাজিত থাকেন, সেখানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রাথমিক পূজা নিবেদন নিষ্প্রয়োজন। যে সব মন্দিরে শ্রীশ্রীগৌর-নিতাই বিগ্রহ বিরাজমান এবং যেখানে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ বা শ্রীজগন্নাথ মূল বিগ্রহ রূপে অধিষ্ঠিত রয়েছেন, সেখানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু (কিংবা শ্রীশ্রীগৌর-নিতাই, অথবা সম্পূর্ণ শ্রীপঞ্চতত্ত্ব)-এর চিত্রপটের মাধ্যমে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ বা শ্রীজগন্নাথের পূজারী পূজা নিবেদন করবেন। যদি একজন পূজারী সমস্ত বিগ্রহাদির পূজা করতে থাকেন, তবে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের পূজার আগে শ্রীশ্রীগৌর-নিতাইয়ের পূজা করে নেবেন। যদি শালগ্রাম শিলা পূজার মাধ্যমে মূল বিগ্রহাদি পূজা করা হতে থাকে, তা হলে শালগ্রাম শিলা পূজার আগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর একটি চিত্রপটে পূজারীর প্রারম্ভিক পূজা নিবেদিত হওয়া উচিত।

পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর ভক্তদের চিন্তায় ধ্যানমগ্ন হতে হয়। যতক্ষণ না মন দৃঢ়নিবদ্ধ হয়, ততক্ষণ ভগবানের শাশ্বত নিত্য রূপের ধ্যান করতে হয়।

ধ্যান বলতে বোঝায় ভগবান এবং তাঁর পার্ষদবর্গ, পরিকরাদি, লীলাবিলাস ও দিব্যধাম সম্পর্কিত ভাবনামৃতে মনকে একাগ্র করে রাখা। বিগ্রহ অর্চনার ক্ষেত্রে আরাধ্য শ্রীবিগ্রহ হন ধ্যানের লক্ষ্য বস্তু। ভূত*শুদ্ধির* মাধ্যমে মন পরিশুদ্ধ হয় এবং ভগবানের রূপ ও লীলাবিলাসে মনোনিবেশের মাধ্যমে তা চিন্ময় হয়ে ওঠে। মনের মধ্যে ভগবানের রূপকে ভগবানের থেকে অভিন্ন একটি মূর্তি (শ্রীবিগ্রহ) বলেই বিবেচনা করা হয়, এবং পূজারীর মনটি হয় *পীঠ*, অর্থাৎ ভগবানের পূজার উদ্দেশ্যে পবিত্র বেদী।

ভগবানের যে-রূপের ধ্যান করা হয়, তা যথাযথ শাস্ত্র থেকে প্রামাণ্য বর্ণনাদির অনুযায়ী হওয়া উচিত। কোনও কোনও পূজা-পদ্ধতি গ্রন্থাদিতে আরাধ্য শ্রীবিগ্রহের বর্ণনা দিয়ে শ্লোকাদির উল্লেখ থাকে এবং এই সময়ে সেইগুলির আবৃত্তি করা চলে। অবশ্য, সংস্কৃত শ্লোকগুলির আবৃত্তি করাই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়, ঐ বর্ণনার মাধ্যমে মনের মধ্যে ভগবানের যে-রূপটি জাগ্রত হয়ে ওঠে, সেটাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই, যদি দেখা যায়, নিজের মাতৃভাষায় মূল সংস্কৃত শ্লোকগুলির অনুবাদ আবৃত্তি করলে তার দ্বারা মনের মধ্যে ভগবানের রূপ নিরীক্ষণ করার পক্ষে সহায়ক হয়, তবে সেই অভ্যাসই মেনে চলা উচিত।

মানস-পূজা

ভগবানের রূপের ধ্যান করার পরে, সেই রূপটির আরাধনায় মনকে নিয়োজিত করা উচিত। ধ্যান হল মানস-পূজার প্রস্তুতি; যেহেতু ধ্যান হল পরোক্ষ, মানস-পূজা হল প্রত্যক্ষ। যা কিছু উপচারাদি বাহ্যিকভাবে নিবেদিত হয়, তা অবশ্যই পরিপূর্ণ ভক্তি ও মনোযোগ সহকারে প্রথমে মানসিকভাবে নিবেদন করে নিতে হয়।* তা ছাড়া, বাহ্যিকভাবে পূজার ক্ষেত্রে সীমিত সামর্থ্য অনুসারে নিবেদিত উপচারাদি সাদাসিধে হতে পারে, তবে মানস পূজার সময়ে ভগবানের পূজা অতীব ঐশ্বর্যময় করে তুলতে পারা যায়। (*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু*, অধ্যায় ১০, মানস-পূজায় নিবেদিত গরম

---

* বাহ্যিকভাবে পূজা-অর্চনার সময়ে যে কয়টি উপচার থাকবে, মানস-পূজায় সেইগুলি কিংবা তারও বেশি উপচার থাকা চাই, কম নয়। তাই, বাহ্যিকভাবে পূজা-অর্চনার ক্ষেত্রে যদি ষোড়শোপচার থাকে, তবে মানস-পূজাতেও ষোড়শোপচার থাকা উচিত।

পরমান্নে ব্রাহ্মণ-ভক্তের হাতের আঙুল দগ্ধ হওয়ার কাহিনী) মানস-পূজা হল ধ্যানের চরম পর্যায়। শাস্ত্রে নির্দেশিত হয়েছে, মানস-পূজা ব্যতীত সাধন-ভক্তি অনুশীলনকারীর বহু উপচারাদি সহকারে পূজাও নিরর্থক। মানস-পূজা ব্যতিরেকে উপচারাদি সহকারে পূজা কনিষ্ঠ ভক্তের পক্ষে অপরাধের হেতু সৃষ্টি করতে পারে, কারণ শ্রীবিগ্রহের জড় বস্তুরূপে দর্শনের প্রবণতাই তার হবে। তাই, সকল প্রকার শ্রীবিগ্রহ অর্চনের ক্ষেত্রে *মানস-পূজা*, অর্থাৎ *অন্তর-যোগ* হল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মহাত্মারা (বিশেষত সর্বদা পর্যটনরত সন্ন্যাসীরা) প্রায়শই কেবলমাত্র এই ধরনের পূজা-অর্চনাই সম্পন্ন করে থাকেন, যে-কথা *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* থেকে উদ্ধৃত নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে—

> *যখন শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী শুনলেন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বৃন্দাবনে যাবেন, তখন তিনি ভারি খুশি হলেন এবং মনে মনে সেখানকার পথঘাট সাজাতে শুরু করে দিলেন। প্রথমে তিনি ফুলিয়া শহর থেকে আরম্ভ করে একটি চওড়া রাস্তা মনে মনে কল্পনা করে নিলেন। রাস্তাটিকে তিনি মণি-মাণিক্য দিয়ে মুড়ে দিলেন, তারপর তার ওপরে বৃন্তচ্যুত পুষ্পশয্যা রচনা করে দিলেন। মনে মনে তিনি পথের দু'ধারে বকুল ফুলের বৃক্ষসারিতে সাজিয়ে দিলেন এবং মাঝে মাঝে দু'পাশে তিনি দিব্যদর্শন সরোবর স্থাপনা করে দিলেন। এই সরোবরগুলিতে স্নানের ঘাটগুলি মণি-মাণিক্য দিয়ে গাঁথা হল, এবং প্রস্ফুটিত পদ্মের সমারোহে সেইগুলি ভরপুর হয়ে উঠল। রকমারি পাখিরা সেখানে কলরব করতে থাকল, এবং সরোবরের জল যেন ঠিক অমৃতের মতো মনে হতে লাগল। সমস্ত পথটি নানা রকমের স্নিগ্ধ সমীরণে ভরে উঠল, তাতে রকমারি ফুলের সুবাস ভেসে আসতে থাকল। তিনি এই পথটি গঠন করে চললেন সেই কানাই নাটশালা পর্যন্ত। শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারীর মনের মধ্যে রাস্তাটি কানাই নাটশালার ওধারে আর গড়া গেল না। কেন যে পথটি গড়ে তোলা আর সম্ভব হল না, তা তিনি বুঝতেই পারলেন না, এবং তাই তিনি বিস্ময়বোধ করতে লাগলেন। তখন তিনি বিপুলভাবে সুনিশ্চিত হয়ে ভক্তদের বলেছিলেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই সময়ে বৃন্দাবনে যাবেন না।*
>
> *(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১/১৫৫-১৬১)*

ধ্যান এবং মানস-পূজা কেবলমাত্র মূল শ্রীবিগ্রহের উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত হয়, তা নয়, শ্রীগুরুদেব এবং শ্রীচৈতন্যদেবের প্রারম্ভিক পূজার ক্ষেত্রেও সেটি হয়।

প্রধান অর্চন

ভগবানের অভ্যর্থনা

♦ (৫) ভগবানকে আসন প্রদান ও স্বাগত জ্ঞাপন

আসন বলতে বোঝায় শ্রীভগবানকে কোনও বিশেষ প্রকারের অর্চন নিবেদনের আগে তাঁকে যেভাবে বা যে পরিবেশে উপবেশন অর্থাৎ অবস্থান করানো হয়। ভগবানের যে সব পার্ষদগণ তাঁকে বিবিধ প্রকার সেবা নিবেদন করে থাকেন, তাঁদের দ্বারাই ভগবান পরিবৃত হয়ে থাকেন, এবং এই সকল পার্ষদবর্গের মধ্যে থাকেন অর্চনকারীর আপন দীক্ষাগুরু। যেহেতু গুরুদেবের মাধ্যমেই ভগবানের সেবা-অধিকারের ক্ষেত্রে শিষ্য প্রবেশাধিকার লাভ করে থাকেন, সেই কারণে শিষ্য অবশ্যই উপলব্ধি করবেন যে, যেখান থেকে ভগবানের প্রতি সেবা নিবেদন সম্পন্ন করার জন্য তাঁর গুরুদেব উপবেশন অথবা স্থান গ্রহণ করবেন, শিষ্যের উপলব্ধি করা উচিত যে, সেখানে একটি আসন বা স্থান নির্দিষ্ট করে রাখা অবশ্যই উচিত। শ্রীল প্রভুপাদ এই কথা *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* (*মধ্যলীলা* ২৪/৩৩৪, তাৎপর্য) গ্রন্থে ব্যাখ্যা করে লিখেছেন—

> *ভগবানের পূজা বেদীর সম্মুখে একটি আসন থাকা উচিত। এই আসনটি গুরুদেবের জন্য। শিষ্য সব কিছু গুরুদেবের কাছে নিয়ে আসে, এবং গুরুদেব তা ভগবানকে নিবেদন করেন।*

ষোড়শোপচার পূজার অঙ্গ হিসাবে শ্রীভগবানের জন্যও একটি আসন নিবেদন করা উচিত, সাধারণ পদ্ধতি হল এই যে শ্রীভগবান যেখানে দাঁড়িয়ে অভিষেকের পূর্বে পাদ্য, অর্ঘ্য ইত্যাদি গ্রহণ করবেন, সেখানে পুষ্পস্তবক কিংবা পুষ্পকোরক, ফুল বা ফুলের পাপড়ি বিছিয়ে রাখতে হয়।

স্বাগত* মানে অভ্যর্থনা এবং স্বাচ্ছন্দ্য বিধান। শ্রীভগবানকে আহ্বান জানিয়ে প্রশ্ন করা উচিত—তিনি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবেন কি না, এবং তারপর পরম প্রীতিভরে তাঁকে আবাহনের উদ্দেশ্যে ধ্যানমগ্ন হওয়া উচিত এবং তাঁকে মনোরমভাবে সন্তুষ্ট করার জন্য উদ্যোগী হতে হয়। শ্রীল প্রভুপাদ এই বিষয়ে বুঝিয়ে বলেছেন—

> *"বৃন্দাবন বলতে বোঝায় যেখানে প্রত্যেকেই কিভাবে শ্রীকৃষ্ণের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের আয়োজন করা যায়, তাই নিয়ে আত্মনিয়োজিত হয়ে আছেন।*

---

* ষোড়শোপচারের তালিকায় স্বাগত হল দ্বিতীয় কৃত্য, সেটি চৌষট্টি উপচারের তালিকায় পৃথক একটি উপচার হিসাবে উল্লেখ করা নেই।

এই হল বৃন্দাবন। সেখানে ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কেউ থাকে না। সমগ্র বৃন্দাবনই সেই সেবায় নিয়োজিত হয়ে রয়েছে—যশোদামাতা থেকে শুরু করে, নন্দ মহারাজ, তরুণী গোপীরা, আর তরুণ গোপবালকেরা সবাই, সেই হল বৃন্দাবন। সেখানে কেন্দ্রবিন্দু হলেন শ্রীকৃষ্ণ। সেই কারণে যতই আমরা শ্রীকৃষ্ণের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের উদ্দেশ্যে আত্মনিয়োজিত হয়ে থাকব, তাতেই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ হবে। তখন আমরা মুক্তিলাভ করব।" (শ্রীহরিশৌরি দাস রচিত 'এক দিব্য পারমার্থিক দিনপঞ্জী' থেকে)

শ্রীভগবানকে আসন প্রদান এবং অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের পরে তাঁর রাত্রিবাস সরিয়ে নিতে হবে এবং শ্রীবিগ্রহকে গামছা জড়িয়ে রাখতে হবে। সব চেয়ে ভাল হয়, শ্রীবিগ্রহ যতক্ষণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হচ্ছে, পালিশ করা হচ্ছে (ধাতব শ্রীবিগ্রহ হলে), এবং স্নান করানো হচ্ছে, ততক্ষণ সর্বদাই শ্রীবিগ্রহের অঙ্গে গামছাটি থাকা উচিত, এবং যখন ভগবানের অঙ্গ মুছিয়ে শুকনো করা হচ্ছে, তখন গামছাটি সরিয়ে নিতে হয়। সেই সময়ে তাঁকে একটি শুকনো গামছা নিবেদন করা চাই। (অঙ্গ শুকনো করার জন্য তোয়ালে ও শুকনো গামছা দুটিকেই বলা হয় অঙ্গবস্ত্র, যেটি হল দ্বাবিংশতম উপচার)

♦ (৬) দন্তকাষ্ঠ বা দন্তধাবন নিবেদন

শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন—

মঙ্গল আরতির পর ভগবান মুখ ধোন, তাই তাঁর দন্ত ধাবনের জন্য একটি দাঁতন নিবেদন করা হয়। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা ২৪/৩৩৪ তাৎপর্য)*

ঠিক যে ধরনের দাঁতন কাঠি সাধারণত সকলে দাঁত মাজার জন্য ব্যবহার করে থাকে, ভগবানকে সেই ধরনের একটি দাঁতন কাঠি নিবেদন করলেও চলবে। এই সময়ে একটি জিভ-ছোলা দিতেও পারা যায়।

♦ (৭) পাদ প্রক্ষালন

পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমন, এবং মধুপর্ক নিবেদন—এই সমস্ত বিধিই রাজা অথবা অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য প্রচলিত বৈদিক রীতি। এইগুলির পরিবর্তে কখনও-বা বিশুদ্ধ জলও নিবেদন করা হয়ে থাকে।

---

* তার পরিবর্তে বিকল্প হিসাবে, মঙ্গল আরতির পূর্বে ভগবানের শয্যাত্যাগের ঠিক পরেই দন্তকাষ্ঠ নিবেদন করা যেতে পারে।

যে উপকরণগুলি অনুপস্থিত, সেইগুলির কথা মনে মনে চিন্তা করে তার বদলে জলের মধ্যে ফুল কিংবা তুলসীপত্র দিলেও চলে।

শ্রীভগবানকে আসন প্রদান, শয়ন থেকে জাগরণ এবং তাঁকে শয়নে দেওয়ার আগে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে, ভগবানের ভোগ গ্রহণের আগে এবং পরেও তাঁকে পাদ্য নিবেদন করা যেতে পারে।

♦ (৮) অভ্যর্থনা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের লক্ষণ স্বরূপ অর্ঘ্য নিবেদন

অভ্যর্থনার অঙ্গ স্বরূপ কোনও সম্মানিত অতিথির মাথার ওপরে কিংবা মাথায় স্পর্শ করানো হয় যে সমস্ত মাঙ্গলিক সামগ্রিক মিশ্রণ, সেই নিবেদনটিকে বলা হয় অর্ঘ্য। কথাটির ভাষাগত অর্থ হল এই যে, কোনও ব্যক্তিকে অর্ঘ্য প্রদান করলে সেটি তাঁর মাথায় ছিটিয়ে দিতে হয় অথবা তাঁর হাতে নিবেদন করা হয় যাতে তিনি তাঁর নিজের মাথায় সেটি নিক্ষেপ করতে পারেন। অতএব, অর্ঘ্য মানে 'হাতের মধ্যে নিবেদন' করা, তাই বোঝানো হয়। দুটি পদ্ধতিই গ্রহণযোগ্য, তবে হাতে অর্ঘ্য প্রদান করাই বেশি সম্মানজনক বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। বাম হাতে একটি ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে অর্ঘ্য প্রদান করতে হয়।

♦ (৯) আচমন

শ্রীভগবানকে ভোগ নিবেদনের পূর্বে এবং পরে, তাঁকে স্নান করানো কিংবা পোশাক সজ্জার পরে, এবং ভগবানকে উপবীত প্রদানের পরে আচমন নিবেদন করা যেতে পারে।

♦ (১০) মধুপর্ক ও পুনরাচমন

অনেকে বিধান দিয়ে থাকেন যে, শ্রীভগবানের দক্ষিণ হস্তে একটি পাত্রে তাঁর গ্রহণের উদ্দেশ্যে মধুপর্ক নিবেদন করা উচিত।

মধুপর্ক নিবেদনের পরে, আবার আচমন করতে হয়। (ষোড়শোপচারের নির্ধারিত মান অনুসারে তালিকায়, মধুপর্কের পরে নিবেদিত আচমনকে একটি পৃথক উপচাররূপেই গণ্য করা হয়ে থাকে।)

শ্রীবিগ্রহের স্নান

♦ (১১) পাদুকা

শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন—

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহের সামনে কাষ্ঠপাদুকা এনে রাখতে হয়। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা ২৪/৩৩৪, তাৎপর্য)

ভগবানের শ্রীবিগ্রহ যখনই স্থানান্তরে গমন করেন, তখনই অল্পক্ষণের জন্য পাদুকা নিবেদন করা যেতে পারে। আবাহনের পরে, শ্রীভগবানকে একটি বিশেষ স্নানভূমিতে আমন্ত্রণ জানাতে হয়।

♦ (১২) অঙ্গ মার্জন

ভগবানের শ্রীবিগ্রহের অঙ্গমার্জন জল ও নরম কাপড় দিয়ে করানোর আগে সমস্ত পুরানো ফুল, চন্দন ইত্যাদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে ফেলা চাই। এবার গোপীচন্দন চূর্ণ এবং তাজা পাতিলেবুর রস* কিংবা জল মিশিয়ে ধাতব শ্রীবিগ্রহ পালিশ করতে হবে, এবং তারপর স্নানের আগে ভিজা কাপড় দিয়ে মুছে দিতে হবে। (শ্রীবিগ্রহ যদি জলনিরোধক না হন, তবে শুধুমাত্র একটি শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে দিতে হবে।)

♦ (১৩) অভ্যাঙ্গ

ভগবানের শ্রীবিগ্রহের স্নানের আগে তাঁর শ্রীঅঙ্গে সুগন্ধি তেল মাখানো চলে।** বিশেষ করে একাদশী তিথিতে এই নিবেদন বিশেষ শুভকর্ম।

শ্রীসনাতন গোস্বামী উল্লেখ করেছেন যে, বিশেষ করে শ্রীবিগ্রহের মাথায় তেল মাখানো উচিত।

যে তুলার টুকরা দিয়ে শ্রীবিগ্রহের অঙ্গে সুগন্ধি নিবেদন করা হয়ে থাকে, সেটি শ্রীবিগ্রহ আরতির শেষে ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করা চলে।

♦ (১৪) উদ্বর্তন

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে (মধ্য ২৪/৩৩৪ তাৎপর্য) শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন, শ্রীবিগ্রহ-অঙ্গে তেল মাখার পর নরম কাপড় বা স্পঞ্জ দিয়ে বাড়তি তেল মুছে দেওয়া উচিত। হয়ত একখানি নরম তোয়ালে এই কাজে বেশি সুবিধাজনক হবে, কারণ প্রাকৃতিক স্পঞ্জ এক ধরনের সামুদ্রিক প্রাণীর দেহাবশেষ আর কৃত্রিম স্পঞ্জ প্লাস্টিক থেকে তৈরি হয়। স্নানের আগে তৈল মর্দনের ফলে মানুষের দেহত্বকের লোমকূপ পরিচ্ছন্ন হয়। শারীরিক প্রসাধনের মতো কাজ করে। তৈল মর্দনের পরে, স্নানের আগে, বাড়তি তেল মুছে ফেলতে হয়।

---

* বোতলে ভরা বাজারের লেবুর রসে ভেজাল থাকে এবং তাই তা গ্রহণযোগ্য নয়। কোনও ভক্ত বাদাম বাটা দিয়ে ধাতব শ্রীবিগ্রহ পালিশ করে থাকেন।

** ভগবানের শ্রীবিগ্রহের স্নানের ঠিক আগেই তাঁর শ্রীঅঙ্গে তেল কিংবা সুগন্ধি নিবেদন করা সব চেয়ে ভাল সময় (শ্রীনৃসিংহ প্রার্থনার সময়ে মঙ্গল আরতির ঠিক পরেই নয়)। তা ছাড়া, পোশাক ও অঙ্গসজ্জার পরেও তেল বা সুগন্ধি শ্রীভগবানের শ্রীমুখে এবং করকমলে লিপ্ত করা যেতে পারে।

♦ (১৫) স্নান

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে—

যে জলে কিছুক্ষণ যাবৎ সুন্দর সুগন্ধি পুষ্পাদি ভিজিয়ে রাখা হয়েছে, সেই জলে শ্রীভগবানকে স্নান করানো উচিত। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা ২৪/৩৩৪ তাৎপর্য)

পঞ্চামৃত স্নান

শ্রীবিগ্রহকে সাধারণত প্রতিদিন পঞ্চমৃত স্নান করানো হয় না, তবে মন্দিরে অন্তত শালগ্রাম শিলাকে পঞ্চামৃত স্নান প্রতিদিনই নিবেদন করা উচিত। শ্রীবিগ্রহের ওপরে একটি শঙ্খ ধারণ করে তা থেকে প্রতিটি উপকরণ স্নানধারায় নিবেদন করাই সবচেয়ে ভাল। স্নানের তরল পদার্থগুলি যেন বেশি গরম কিংবা বেশি ঠাণ্ডা না হয়। নিচের (১৬ থেকে ২০ নং) পাঁচটি উপকরণ দিয়ে পঞ্চামৃত স্নান হয়—

♦ (১৬) ক্ষীর-স্নান

ঠাণ্ডার দিনে দুধ সামান্য গরম করে দিতে হয়।

♦ (১৭) দধি-স্নান

দই ঘুঁটে নিতে হয়, যাতে স্বচ্ছন্দ ধারায় নামতে থাকে।

♦ (১৮) ঘৃত-স্নান

ঘি গরম করে নিতে হয় যাতে তরল হয়ে যায়, তবে বেশি গরম যেন না হয়।

♦ (১৯) মধু-স্নান

জল মিশিয়ে মধু পাতলা করে নিতে হয়, যাতে সহজ ধারায় নামতে থাকে।

♦ (২০) সিতা-স্নান

চিনি কিংবা গুড় জলে গুলে নিতে হয় এবং সেই মিষ্ট জল শ্রীবিগ্রহের অঙ্গে ঢালতে হয়।

ভগবানের শ্রীবিগ্রহকে পঞ্চামৃতে স্নান করানোর পরে, ভগবানের শ্রীঅঙ্গে বার্লি চূর্ণ বা ময়দা ঘষে ঘি মুছে ফেলতে পারা যায় এবং তার পরে গরম জলে তাঁর শ্রীঅঙ্গ ধুয়ে নিতে হয়। গাভীর পুচ্ছরোম কিংবা নারকেলের ছোবড়া দিয়ে তৈরি একটা ব্রাশ ব্যবহার করে শ্রীবিগ্রহের শ্রীঅঙ্গের যে সমস্ত কোণেখাঁজে ধুলোবালি লেগে আছে, তা পরিষ্কার করা সহজ হতে পারে। শ্রীবিগ্রহকে গরম জলে স্নান করানোর পরে, আবহাওয়া ভাল থাকলে, ঠাণ্ডা জলেও স্নান করানো ভাল।

জল-স্নান

♦ (২১) মন্ত্রপূত জল

সঠিকভাবে বলতে গেলে, যে-জলে কিছু বৈদিক মন্ত্র এবং শ্রীবিগ্রহের বীজ মন্ত্রাদি উচ্চারিত হয়েছে, তাকেই মন্ত্রপূত জল বলা চলে। স্নানের সময়েও মন্ত্র উচ্চারণ করা চলে। শ্রীল প্রভুপাদ *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থের (*মধ্য* ২৪/৩৩৪) তাৎপর্যে লিখেছেন—

মন্ত্রজলে শ্রীবিগ্রহকে স্নান করিয়ে এই মন্ত্র পাঠ করবে—

চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্।
লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং
গোবিন্দমাদিপুরুষং ত্বমহং ভজামি ॥

শ্রীবিগ্রহকে স্নান করানোর সময়, *শ্রীব্রহ্মসংহিতা* থেকে শ্লোকাদি উচ্চারণ করতে হবে; তা ছাড়া *শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, বিষ্ণুসহস্রনাম, পুরুষসূক্ত,* কিংবা অন্যান্য উপযুক্ত শাস্ত্রাদি থেকে শ্লোকাদি উচ্চারণ করা চলে। নানা উপচারে শ্রীবিগ্রহের পূজা এবং আরতির এই সময়ে, বাদ্যযন্ত্রাদি বাজানো, কীর্তন পরিবেশন, শাঁখঘণ্টা বাজানো, কিংবা উপযুক্ত টেপরেকর্ড বাজানো বা মন্ত্রাদি উচ্চারণ বেশ ভাল হয়।

♦ (২২) অঙ্গ বস্ত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে (*মধ্য* ২৪/৩৩৪ তাৎপর্য) বলা হয়েছে, "গামছা দিয়ে ভগবানের গা মুছিয়ে দেওয়া হবে।"

আরতি অনুষ্ঠানে গা মোছানো এবং নিবেদনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত সমস্ত বস্ত্রাদি প্রত্যেকবার ব্যবহারের পরে ধুয়ে নিয়ে, কলুষিত জায়গা থেকে দূরে কোনও শুদ্ধ পবিত্র স্থানে শুকিয়ে নিতে হবে।

ভগবানের অঙ্গসজ্জা

♦ (২৩) বস্ত্রসজ্জা

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর শ্রীগোপাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন, "শ্রীবিগ্রহের শ্রীঅঙ্গ মার্জন করে তিনি বস্ত্র পরালেন। তারপর চন্দন, তুলসী, পুষ্পমাল্য শ্রীবিগ্রহের অঙ্গে পরিয়ে দিলেন।" (*শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* মধ্যলীলা ৪/৬৩)

শ্রীবিগ্রহের আরাধনা ও মন্দির শোভন সম্পর্কে অনেক নির্দেশরেখা শ্রীল প্রভুপাদ দিয়েছেন। নিচে তার কয়েকটি দেওয়া হল —

শ্রীকৃষ্ণের মাথায় ময়ূরের পালক থাকা চাই। (শ্রীল প্রভুপাদের লেখা ৮জুন ১৯৭৫ তাং পত্র থেকে)*

সাজসজ্জা এমন আকর্ষণীয় হবে যে লোকেরা জগন্নাথদেবকে দর্শন করেই মায়ার সমস্ত আকর্ষণ ভুলে যাবে। এটিই জগন্নাথের সাজসজ্জার পদ্ধতি। আমাদের চোখ মায়ার সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু আমাদের চোখ যদি জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয় তা হলে মায়ার দ্বারা আকৃষ্ট হওয়া আর হবে না। (শ্রীল প্রভুপাদের লেখা ৭জুন ১৯৬৮ তাং পত্র থেকে)

আমাদের মন্দিরগুলিতে শ্রীকৃষ্ণ যেভাবে আবির্ভূত হয়ে থাকেন, তাতে মনে হয়, তিনি কৈশোর বয়সেই অধিষ্ঠিত এবং তাঁর পোশাকাদিও কৈশোর বয়সোপযোগী পোশাক। আমাদের মন্দিরগুলিতে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের বিগ্রহাদি ঠিক দ্বারকাধামে শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ শ্রীবিগ্রহাদি রূপে পূর্ণ উপচারে পূজিতা হয়ে থাকেন। শ্রীবৃন্দাবনধামে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ যেভাবে আবির্ভূত হয়েছেন, সেইভাবে শ্রীবিগ্রহের আরাধনা অতি উচ্চস্তরের পূজা। (শ্রীল প্রভুপাদের লেখা ১৬ জানুয়ারি ১৯৭০ তাং পত্র থেকে)

শ্রীজগন্নাথদেবকে যথার্থভাবে অঙ্গসজ্জা করতে হলে তাঁকে ক্ষত্রিয়রাজ রূপে সাজাতে হবে, এবং তাঁকে অনন্তরূপে সাজাতে হয়। (১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩ তাং শ্রীল প্রভুপাদের চিঠির উত্তর থেকে)

---

* শ্রীচৈতন্যের শ্রীবিগ্রহে ময়ূরের পালক পরানো হবে কিনা, সেই সম্পর্কে কিছু মতভেদ রয়েছে, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ থেকে তিনি অভিন্ন, যা তাঁর বিভিন্ন লীলায় তিনি ব্যক্ত করেছেন। তিনি অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন, এবং তাই আমরা তাঁকে একটি ময়ূরের পালক পরিয়ে সাজাবার অভিলাষ জানিয়েছি। শ্রীল প্রভুপাদ এই যুক্তিতে সম্মত হন এবং কেউ তা করতে পারে তা বলেছিলেন। তবে, তিনি এটাকে বিধান করেননি। এই জগতে, এমন কি চিন্ময় জগতের অবতাররূপে শ্রীচৈতন্যের ভূমিকা ঠিক শ্রীকৃষ্ণেরই ভক্তরূপে ভাবান্বিত। তাঁর লীলায় তাই ময়ূর পালক সামঞ্জস্যবিহীন হবে। আমাদের পরামর্শ, শ্রীচৈতন্যের মাথায় ময়ূরের পালক না দেওয়াটি উচিত, কারণ আমাদের শাস্ত্রে যেভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বর্ণনা রয়েছে, সেইভাবেই তাঁর একটা প্রামাণ্যরূপের মান উপস্থাপন করতে আমরা চাই।

কোনও কোনও ক্ষেত্রে শ্রীমতী রাধারাণীর চুলে ময়ূরীর পালক পরিহিতা রূপে বর্ণনা আছে। শ্রীল প্রভুপাদ নির্ধারণ করেন যে, শ্রীকৃষ্ণের সর্বদা ময়ূরের পালক থাকবে, নূপুর আর বাঁশি থাকবে।

শ্রীশ্রীপঞ্চতত্ত্বের শ্রীবিগ্রহাদির সকলেরই তুলসীকণ্ঠী মালা পরিধান করা উচিত, দু-হারা, তিন-হারা, চার-হারার কম নয় কিংবা আমার গুরু মহারাজের মতো, পাঁচ হারা। শুধুমাত্র শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মুকুট ও নাকচাবি পরবেন। (২০ নভেম্বর ১৯৭১ তাং শ্রীল প্রভুপাদের পত্র থেকে)

শ্রীমতী রাধারাণীর পদযুগল কি দেখা যাবে? *উত্তর হল—না, কখনই তাঁর পদযুগল দেখা যাবে না। অবশ্য শ্রীকৃষ্ণের পদযুগল দেখাতে হবে। (৪ জানুয়ারি ১৯৭৫ তাং শ্রীল প্রভুপাদের পত্র থেকে)*

ভক্তরা সাধারণত আলপিন ব্যবহার করে শ্রীভগবানের বস্ত্র সজ্জা ঠিক ঠিক জায়গায় রাখতে চেষ্টা করেন। তবে খুব সতর্কভাবে তা করা চাই, যেন ভগবানের ব্যথা না লাগে।* শ্রীবিগ্রহের চারদিকে বস্ত্র সজ্জা প্রসারিত করে রাখবার উদ্দেশ্যে প্রায়ই সরু সুতো ব্যবহার করা হয়, যতদূর সম্ভব সেই সুতো খুব কম ব্যবহার করতে হবে যেন সুতো দিয়ে পুতুল নাচের মতো ভগবানের বিগ্রহাদিকে মনে না হয়। তা ছাড়া, সিংহাসন থেকে আলগা সুতো ঝুলতে যেন দেখা না যায়।

♦ (২৪) উপবীত নিবেদন

স্পষ্টই বোঝা যায়, ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সজ্জায় অন্যান্য পোশাকাদি পরানোর আগেই তাঁকে পবিত্র উপবীত ধারণ করাতে হয়। উপবীতে থাকা চাই ন'হারা সাদা কিংবা হলুদ রঙের তুলা বা রেশমী সুতার ন'হারা। তার পরিবর্তে বিকল্প ব্যবস্থায়, সুতী বা রেশমী সুতা তিন হারা, রূপালী সুতো তিন হারা এবং সোনালী সুতো তিন হারা লাগাতে হয়। এবার ভগবানের শ্রীবিগ্রহের কপালে উল্লম্বভাবে ঊর্ধ্ব-পুণ্ড্র তিলক অঙ্কন করা যাবে।** শ্রীবিগ্রহের বাহু, দু'পাশে এবং কণ্ঠেও ঊর্ধ্ব-পুণ্ড্র তিলক আঁকা চলে। এ ছাড়া, শ্রীভগবানের কপালে, গালে, হাতে, বাহুতে, পদযুগলেও এবার তিলক সজ্জা করা চলে। হলুদ কিংবা কুমকুম মিশিয়ে জল সহ তিলক তৈরি করা চলে এবং সোনা কিংবা রূপার কাঠি, অথবা তুলসী শাখার সাহায্যে সেই তিলক লাগাতে হয়।

---

* শ্রীবিগ্রহাদি সজ্জার সময়ে রাধারাণীর প্রসারিত করকমলে আলপিন ধরে রাখতে দেবেন না।

** তিলক একটি সাধারণ বর্গনির্দেশক শব্দ, যার দ্বারা দেহের উপরের সকল রকমের শুভ অঙ্গসজ্জাকেই বোঝায়, তার মধ্যে ঊর্ধ্বপুণ্ড্র চিহ্নটি ভগবান ও ভগবদ্ভক্তেরা ধারণ করেন। আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব রূপে, শ্রীকৃষ্ণকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের ঊর্ধ্বপুণ্ড্র তিলকে, অর্থাৎ একটি তুলসীপত্র অঙ্কণের দ্বারা দুটি ক্ষীণ উল্লম্ব রেখার সংযোগ বোঝায়। প্রথাগতভাবে, শ্রীমতী রাধারাণী কেবলমাত্র তাঁর কপালে লাল সিঁদুরের ফোটা পরেন, ঊর্ধ্বপুণ্ড্র রেখা নয়। (শ্রীল প্রভুপাদের সাথে ২২ এপ্রিল ১৯৭২ তাং টোকিয়োতে সংলাপ দ্রষ্টব্য।)

♦ (২৫) পুনরাচমন

বৈদিক সংস্কৃতি অনুযায়ী, শ্রীবিগ্রহের অঙ্গসজ্জার পরে শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়া অনুসারে আচমন করা উচিত।

♦ (২৬) গন্ধ অনুলেপন

শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন, *"চন্দন আদি সুগন্ধি তেল ভগবানের শ্রীঅঙ্গে লেপন করতে হয়।" (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা ২৪/৩৩৪ তাৎপর্য)*

গন্ধ বলতে বোঝায় চন্দনবাটা, যার সঙ্গে অন্যান্য উপকরণ মেশাতে হয়। সেটি শ্রীভগবানের বিগ্রহের সর্বাঙ্গে কিংবা তাঁর পদযুগলে, বুকে এবং কপালে লাগাতে হয়। গন্ধ অনুলেপনের পরে, শীতলতা অনুভব বৃদ্ধির জন্য পাখা দিয়ে বাতাস করতে পারা যায়। মধ্যমা কিংবা অনামিকা অঙ্গুলি দিয়ে কিংবা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠ এক সাথে জোড়া করে গন্ধ অনুলেপন করতে হয়।

ঠাণ্ডার দিনে শ্রীভগবানের বিগ্রহের কপালে চন্দন, কর্পূর কিংবা অন্য কোনও ঠাণ্ডা কিছু অনুলেপন করা ঠিক নয়। তবে চন্দনবাটা দিয়ে অলঙ্করণ করা যেতে পারে এবং তুলসীপত্র ভগবানের চরণকমলে নিবেদনের জন্য চন্দন ব্যবহার করা চলে।

তুলসীপত্র ও তুলসীমঞ্জরী

এবার শ্রীভগবানের পাদপদ্মে তুলসীপত্র নিবেদন করতে হবে।

শ্রীভগবানের সেবায় যত কিছু সামগ্রী নিবেদিত হয়, সেই সবের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রশংসনীয় বস্তুটি হল তুলসী। বস্তুত, শুধুমাত্র বিশুদ্ধ জল আর তুলসীপত্র দিয়েই ভক্ত যথাযথভাবে ভগবানের অর্চন সম্পন্ন করতেই পারে।

কেবলমাত্র শ্রীশ্রীবিষ্ণুতত্ত্ব বিগ্রহাদির উদ্দেশ্যেই তুলসীপত্রাদি নিবেদন করা চলতে পারে, তবে শ্রীগুরুদেব এবং শ্রীমতী রাধারাণী যাতে শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে তুলসীপত্র নিবেদন করতে পারেন তাই তাঁদের হাতেও তুলসীপত্রাদি রাখা যেতে পারে। ভোগ নিবেদনের সময়েও শ্রীগুরুদেব এবং শ্রীমতী রাধারাণীর ভোগপাত্রে তুলসীপত্র রাখা চলে, যাতে তাঁরা নিজেরা ভোগ গ্রহণের আগে তা শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করতে পারেন।

গরুড়-পুরাণ এবং *বৃহন্নারদীয়-পুরাণ* এই দুটি শাস্ত্রেই বলা হয়েছে, ভোগ নৈবেদ্যের ওপরে সব সময়ে তুলসীপত্র অর্পণ করতে হয়—"তুলসী ব্যতিরেকে, শ্রীভগবানের প্রীতিবিধানের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত পূজা অর্চনা, স্নান-অভিষেক, এবং ভোজ্য আর পানীয় যা কিছুই নিবেদিত হোক না কেন, তাকে

যথার্থ পূজা-অর্চনা, স্নান-অভিষেক, কিংবা নিবেদন বলে বিবেচনা করা যায় না। তুলসীপত্র ছাড়া, কোনও পূজা বা আহার্য বা পানীয় শ্রীভগবান গ্রহণ করেন না।”

তুলসীপত্রের প্রাচুর্য থাকলে, শ্রীভগবানকে একটি তুলসীমাল্য অর্পণ করা যেতে পারে। তা না হলে, শ্রীভগবানের পুষ্পমাল্যের মধ্যে তুলসীপত্র বা মঞ্জরী গেঁথে দেওয়াও চলে।

♦ (২৭) অলঙ্কার সজ্জা

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে বলা হয়েছে, “ভগবানের শ্রীঅঙ্গে মুকুট আদি সব রকমের অলঙ্কার পরিয়ে দেওয়া উচিত।” (*চৈঃ চঃ মধ্য* ২৪/৩৩৪ *তাৎপর্য*)

আরতির আগে পর্দা খোলার সময়ে যেন শ্রীবিগ্রহের অঙ্গের অলঙ্কারাদি বিশেষত মুকুট আর কর্ণকুণ্ডল, ঠিক ঠিক জায়গায় আছে কিনা, তা সযত্নে লক্ষ্য করতে হবে।

তা ছাড়া সযত্নে দেখতে হবে, অলঙ্কারাদি খুলে ফেলার সময়ে যেন মোম বা অন্য প্রকার আঠাপট্টি সমস্তই শ্রীবিগ্রহের শ্রীঅঙ্গ থেকে পরিষ্কারভাবে মুছে নেওয়া হয়।

♦ (২৮) বিচিত্র দিব্য পুষ্প নিবেদন

যখন একটি করে পুষ্প ভগবানের পূজায় নিবেদন করা হয়, তখন পুষ্পটি সোজাভাবে ধরে নিবেদন করতে হয়। তবে অনেকগুলি পুষ্প একসাথে অর্ঘ্যস্বরূপ ভগবানের পূজার উদ্দেশ্যে নিবেদিত হলে, সেই নিয়ম মানা চলে না। যখনই শ্রীবিগ্রহ স্থানান্তর করা হয়, তখন প্রথমেই তাঁকে তাঁর পাদুকাযুগল নিবেদন করাই রীতি এবং তার পরে, বিনয়-নম্রতার নিদর্শন স্বরূপ, তাঁকে পুষ্পাঞ্জলি (করজোড়ে পুষ্পের অর্ঘ্য) নিবেদন করতে হয়। শ্রীবিগ্রহের মস্তকে, বক্ষে, নাভিকুণ্ডে, পাদপদ্মে এবং সমগ্র দেহে পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করা যেতে পারে।

পুষ্প নিবেদনের সময়েই কিংবা অঙ্গসজ্জা ও অলঙ্কার সজ্জার সময়েও, যেমন সুবিধা, মাল্য নিবেদন করা যেতে পারে। সতেজ তাজা পুষ্পমাল্য শ্রীভগবানের বড়ই প্রীতিপ্রদ। শ্রীল প্রভুপাদ এই বিষয়ে *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে লিখেছেন—

“শ্রীকৃষ্ণ তাঁর গলদেশে বৈজয়ন্তী মালা ধারণ করেন। বৈজয়ন্তী মালা অন্তত পাঁচটি বিভিন্ন রঙের ফুল দিয়ে তৈরি হয়। এই মালা সাধারণত

শ্রীকৃষ্ণের জানু অথবা চরণ স্পর্শ করে। এই মালা ছাড়া অন্য কোনও ফুলের মালাও কখনও তাঁর মস্তকে শোভা পায়, কখনও-বা তাঁর গলদেশ এবং বক্ষঃস্থলে বেষ্টন করে বিরাজ করে।... "শ্রীকৃষ্ণকে কখনও কখনও বনমালী বলা হয়। ফুল এবং মালায় তাঁর বিভিন্ন অঙ্গ বিভূষিত থাকে বলে তাঁকে বনমালী বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণ কেবল বৃন্দাবনেই এই রকম বেশভূষায় সজ্জিত ছিলেন না, কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনেও তিনি এইভাবে সজ্জিত ছিলেন।" (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ষড়বিংশতি অধ্যায়)

♦ (২৯) ধূপ নিবেদন

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে লিখেছেন—

"হরিভক্তিসুধোদয় গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, 'কোনও বিশেষ ওষধি আঘ্রাণ করার ফলে যেমন সাপের বিষ কেটে যায়, তেমনই ভগবানকে অর্পিত সুগন্ধি পুষ্প আঘ্রাণ করার ফলে জড় বিষয়ের প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত হওয়া যায়।" (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, অধ্যায় ৯)

নির্ধারিত সময়ে আরতি অনুষ্ঠানের সময় ছাড়া, দিনের অন্যান্য সময়েও ধূপ নিবেদন করা চলে। তবে, ভোগ নিবেদনের সময় ধূপ জ্বালানো অনুচিত, কারণ ভোগসামগ্রী আহার্যবস্তুগুলির সুবাসিত আঘ্রাণ অবশ্যই শ্রীবিগ্রহের প্রীতিবিধানের এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বটে। তাই ধূপের সুবাসে তা যেন বরবাদ না হয়ে যায়। শ্রীভগবান তাঁর ভোগ সেবন সমাপন করলে, তার পরে (বিশেষত আরতি অনুষ্ঠানের অঙ্গ স্বরূপ) ধূপ নিবেদন করা চলতে পারে। দিনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের রকমারি ধূপ নিবেদন করতে পারা যায়।

♦ (৩০) দীপ নিবেদন

যিনি শ্রীবিগ্রহের উদ্দেশ্যে দীপ নিবেদন করেন এবং যাঁরা তা দর্শন করেন, তাঁদের সকলেরই পক্ষে তা অতীব শুভ লক্ষণ। দীপদান অনুষ্ঠানটিতে আরতি উৎসব সমারোহের প্রধান নিবেদনের স্বরূপ মর্যাদা দেওয়া হয়ে থাকে।

ঘৃত-প্রদীপ নিবেদনের আগে একটি কর্পূর দীপ, বিশেষত মধ্যাহ্নকালীন ভোগ-আরতির সময়ে, নিবেদন করা যেতে পারে। সচরাচর কৃত্রিম রাসায়নিক কর্পূর ব্যবহার করা হয়ে থাকে, কারণ প্রাকৃতিক কর্পূর অত্যন্ত মহার্ঘ্য।

♦ (৩১) দৃষ্টি-অপসারণ সংস্কার

শ্রীল প্রভুপাদ *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থে লিখেছেন—

"সব সময়ে সচেতন থাকা উচিত যাতে নাস্তিক এবং আসুরিক ব্যক্তিরা ভগবানের শ্রীবিগ্রহের কোনও রকম ক্ষতি করতে না পারে।" (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা ২৪/৩৩৪ তাৎপর্য)

অশুভ প্রভাবাদি মোচনের উদ্দেশ্যে, *হরিভক্তিবিলাস* গ্রন্থে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, শ্রীবিগ্রহের মস্তকের ওপরে তিনবার শঙ্খ চালনা করা উচিত। অন্যভাবে, (বিশেষত অভিষেক-আদি বিশেষ উৎসবকালে) একটি ছোট রেকাবীতে সরিষাদানা, লবণ এবং নিমপত্র নিয়ে সেটি শ্রীবিগ্রহের সামনে আন্দোলিত করা যেতে পারে।

আরও বিশদভাবে, শ্রীল প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন, শ্রীবিগ্রহাদির সুরক্ষার উদ্দেশ্যে সকল প্রকার সতর্কতা অবলম্বন করা আমাদের উচিত। বিশেষ করে, শ্রীবিগ্রহাদির কাছে যখন কেউ উপস্থিত থাকেন না, তখন তাঁদের অঙ্গে কোনও প্রকার ক্ষতি যাতে কেউ না করতে পারে, তা থেকে তাঁদের সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে ধাতুনির্মিত ফটক বসানো উচিত। তা ছাড়া, শ্রীবিগ্রহ-কক্ষে পূজারীদের নাগালের মধ্যেই একটি অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র কিংবা আগুন নেভানোর উপযোগী মোটা কম্বল তৈরি রাখা উচিত।

♦ (৩২) নৈবেদ্য অর্পণ

আহার্যসামগ্রী প্রস্তুতি

নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিগুলি থেকে বোঝা যায় যে, কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলনের ক্ষেত্রে শ্রীভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে আহার্যসামগ্রীর প্রস্তুতি ও প্রসাদ গ্রহণ অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—

"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আনন্দিত হয়েছিলেন, কারণ অনেক রকমের খাদ্যদ্রব্য খুব সুন্দরভাবে রান্না করে শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, সব রকমের ভোগ শ্রীকৃষ্ণের জন্যই রান্না করা হয়, মানুষের জন্য নয়। কিন্তু ভক্তেরা মহানন্দে শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদিত সেই সকল দ্রব্য প্রসাদরূপে গ্রহণ করেন।" (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা ৩/৬৪ তাৎপর্য)

"শ্রীকৃষ্ণের ভোগের জন্য আহার্যসামগ্রীর রন্ধন প্রণালী এবং ভোগ নিবেদনের পদ্ধতিগুলি সবই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অনুমোদন করেছিলেন। তিনি এতই আনন্দিত হয়েছিলেন যে, তখন তিনি বলেছিলেন, 'এই ধরনের অন্ন যিনি শ্রীকৃষ্ণকে ভোজন করান, জন্ম-জন্মান্তরে

তাঁর চরণকমল আমার মস্তকে আমি স্বয়ং ধারণ করে থাকব।' " (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা ৩/৬৫ তাৎপর্য)

"ভোগ সেবার সৌষ্ঠব দেখে অত্যন্ত আনন্দিত মনে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী উপলব্ধি করলেন যে, সেখানে শ্রীভগবানকে অতি উত্তম উত্তম ভোগ নিবেদন করা হয়।" (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা ৪/১১৪)

ভক্তদের সুদক্ষ রন্ধনপটু হওয়া উচিত, যাতে শ্রীবিগ্রহের উদ্দেশ্যে কেবল উত্তম আহার্যসামগ্রীই নিবেদিত হতে পারে। "সন্দেহ বোধ হলে, ভোগ নিবেদন করা অনুচিত।" এই বিষয়ে খুব সহজ পদ্ধতিতে নিজেকে যাচাই করা যেতে পারে, একটি প্রশ্নের মাধ্যমে—"আমার শ্রীগুরুদেব যদি এখানে উপস্থিত থাকতেন, তা হলে কি আমি এই পদটি তাঁকে ভোগ নিবেদন করতাম?" যদি জানতে পারা যায় যে, কোনও পদ বেশি পুড়ে গেছে কিংবা বেশি নুন দেওয়া হয়ে গেছে, যা শ্রীবিগ্রহাদি অথবা শ্রীগুরুদেবকে নিবেদন করা উচিত হবে না তা হলে সেটি বাদ দিয়ে রাখাই ভাল।

নৈবেদ্য অর্পণের পদ্ধতি

শ্রীভগবানের প্রীতিবিধানের উদ্দেশ্যে কোনও মহাভোজের আয়োজন সম্পর্কে *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থের নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিটি প্রণিধানযোগ্য—

"সমস্ত আহার্য সামগ্রী তিনটি সমানভাগে ভাগ করা হয়েছিল। তার একটি ভাগ শ্রীকৃষ্ণের ভোগের জন্য ধাতু-পাত্রে রাখা হল। তিন ভাগের অন্য দু'ভাগ রাখা হল কলাপাতায়। সেই কলাপাতাগুলি মাঝখান দিয়ে না চিরে আস্তই রাখা হয়েছিল এবং যে-কলাগাছে অন্তত বত্রিশ আঁটি কলা ফলেছিল, সেই গাছ থেকেই ঐ কলার পাতাগুলি আনা হয়েছিল। দুটি পাতায় খুব ভাল করে স্তূপাকারে সব রকমের খাদ্যসামগ্রী সাজিয়ে দেওয়া হয়েছিল।" (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা ৩/৪২-৪৩)

শ্রীল প্রভুপাদ এই বিষয়ে আরও লিখেছেন—

"শ্রীভগবানের ভোগ যখন রন্ধনশালা থেকে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন তা ঢেকে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এইভাবে নিয়ে যাওয়ার কারণ হল, কেউ যেন তা দেখতে না পায়। যারা ভগবদ্ভক্তির পন্থা সম্পর্কে অবগত নয়, তারা ঐ ভোগ খাওয়ার জন্য বাসনা করতে পারে, এবং তার ফলে অপরাধ হয়। তাই কাউকে তা দেখতে পর্যন্ত দেওয়া হয় না। কিন্তু যখন তা শ্রীবিগ্রহের সামনে আনা হয় তখন

ঢাকনা অবশ্যই খুলে ফেলতে হয়।" (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা ৪/১২৪ তাৎপর্য)*

শ্রীবিগ্রহের উদ্দেশ্যে ভোগ নিবেদনের ক্ষেত্রে শ্রীগুরুদেবের অত্যাবশ্যকীয় মর্যাদার কথা সুচারুভাবে বর্ণিত হয়েছে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিগুলির মাধ্যমে—

ভোগ নিবেদনের ক্ষেত্রে শ্রীগুরুদেবের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানালেই যথেষ্ট হয়। পদ্ধতিটি হল এই যে, সমস্ত কিছুই শ্রীগুরুদেবের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হচ্ছে এবং শ্রীগুরুদেব সেই একই খাদ্যসামগ্রী শ্রীভগবানকে নিবেদন করছেন বলে স্বীকার করা হচ্ছে। যখনই কোনও সামগ্রী শ্রীগুরুদেবের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হচ্ছে, তিনি তৎক্ষণাৎ তা শ্রীভগবানকেই নিবেদন করছেন। এইটাই হল ব্যবস্থা, এবং যেহেতু আমরা পরম্পরা ব্যবস্থার সব কিছু করে আসছি, তাই যথাযথ প্রণালী মাধ্যমেই আমাদের চলা উচিত—যেমন, প্রথমে শ্রীগুরুদেব, তার পরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তারপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তাই যখন আমরা প্রার্থনা জানাই, তখন বলি—বন্দেঽহম্ শ্রীগুরু...এবং ক্রমশ পর পর গোস্বামীগণ, তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে, এবং তারপরে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে। সেটাই প্রার্থনা নিবেদনের পদ্ধতি। তবে বেদীতে যে গুরুদেবের প্রতিকৃতি রয়েছে, তাঁর সামনে ভোগসামগ্রীর প্রতিটি বস্তু উপস্থাপন করার অর্থ এই যে, শ্রীগুরুদেব কৃপাপূর্বক সেইগুলি শ্রীভগবানের প্রীতিবিধানার্থে নিবেদন করার জন্যে সযত্ন হবেন। সুতরাং শুধুমাত্র শ্রীগুরুদেবের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানালেই সব কিছু সম্পূর্ণ হয়ে যায়।" (শ্রীল প্রভুপাদের লেখা পত্র, তাং ২৮ মে ১৯৬৮ থেকে সংকলিত)

"হ্যাঁ, শ্রীগুরুদেবের উদ্দেশ্যে তিনবার প্রার্থনা মন্ত্রটি উচ্চারণ করা যেতে পারে এবং তা ছাড়া 'নমো ব্রহ্মণ্য'—প্রার্থনাটিও তিনবার। তা ছাড়া,

---

* ভোগ নিবেদনের সময়ে সতর্ক থাকা উচিত যাতে ঐ আহার্যসামগ্রী নিজে উপভোগের চিন্তা না জাগে। ঐ ধরনের চিন্তায় অনুতপ্ত বোধ করার আদর্শ দৃষ্টান্ত হলেন শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী তাঁর ক্ষীরচোরা গোপীনাথ কাহিনী প্রসঙ্গে—"শ্রীভগবানের প্রেমময়ী ভক্তিসেবামূলক সকল কাজেই শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর মতো পরমহংস পুরুষের সর্বদা প্রীতি অনুভব হয়ে থাকে। জড়জাগতিক ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় তাঁর কাজের ব্যাঘাত ঘটে না। শ্রীভগবানকে নিবেদিত ক্ষীরের কথা শুনে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী তার অল্প একটু আস্বাদনের ইচ্ছা করেছিলেন, যাতে তিনি তাঁর গোপালের জন্যও তেমনই ক্ষীর তৈরি করতে পারেন। কিন্তু তিনি এমনই নিষ্ঠাপরায়ণ ছিলেন যে, তিনি সেটিকেও অপরাধ বলে বিবেচনা করেছিলেন, কারণ তা শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে ভোগ নিবেদনের জন্য তৈরি করা হয়েছিল।" (চৈ.চ.মধ্য ৪/১২৪)

শ্রীগুরুদেবকে নিবেদনের পরে 'নমো মহাবদান্যায়' মন্ত্রটি তিনবার উচ্চারণের মাধ্যমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যেও ঐ ভোগ নিবেদন করা যেতে পারে। আর সব শেষে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যেও তিনবার (নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়) মন্ত্র উচ্চারণ করা যেতে পারে।" (শ্রীল প্রভুপাদের লেখা পত্র, তাং ২২ মার্চ ১৯৬৮ থেকে সংকলিত)

"শ্রীবিগ্রহের উদ্দেশ্যে যা কিছুই নিবেদিত হয়ে থাকে, প্রকৃতপক্ষে তা সবই শ্রীগুরুদেবের মাধ্যমেই পৌঁছে যায়। শ্রীগুরুদেব তা নিবেদন করেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তা নিবেদন করেন শ্রীকৃষ্ণকে। তার পরে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ তা ভোজন করেন কিংবা শ্রীজগন্নাথদেব তা ভোজন করেন, তারপরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভোজন করেন, তারপরে শ্রীগুরুদেব তা ভোজন করেন, এবং সেটি তখন মহাপ্রসাদ হয়ে ওঠে। সুতরাং যখনই কোনও সামগ্রী নিবেদন করা হয়, তখন সেইভাবে মনে মনে চিন্তা করতে হয় আর গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয়, আর তখন সব কিছু সুসম্পন্ন হয়ে ওঠে। সবশেষে, ঘণ্টা বাজিয়ে, থালাটি নিয়ে, জায়গাটি মুছে দিতে হয়।" (শ্রীল প্রভুপাদের চিঠি, তাং ১৬ জুন ১৯৬৯ থেকে সংকলিত)

এই পত্রগুলিতে শ্রীল প্রভুপাদ ভোগ নিবেদনের প্রয়োজনীয় কার্যকলাপ বর্ণনা করেছেন। বিশদভাবে পূজা অর্চনার ক্ষেত্রে, নিজেকে শ্রীগুরুদেবের সেবক রূপে বিবেচনা করে শ্রীভগবানের প্রীতিবিধানের উদ্দেশ্যে আরও অন্যান্য সেবা নিবেদনের অভিলাষ করা যেতে পারে। যেমন, পরিবেশ বা আবহাওয়া জনিত সূক্ষ্ম আবিলতা কিংবা রন্ধনকালীন ত্রুটিজনিত কলুষতা হয়ত আহার্য সামগ্রীর মধ্যে এসে থাকতে পারে, তাই সেইগুলিকে পরিশোধন করার জন্য, পারমার্থিক উপায়ে চিন্ময় সত্ত্বগুণে গুণান্বিত করার উদ্দেশ্যে এবং শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে ঐ খাদ্যসামগ্রী নিবেদনের আগে সুরক্ষিত রাখার মানসে, কতকগুলি পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারা যায়। এইগুলি প্রোক্ষণ (জলসিঞ্চন), মন্ত্র উচ্চারণ, মুদ্রা-প্রকরণ এবং ধ্যানের মাধ্যমে সুসম্পন্ন করা হয়ে থাকে। এ ছাড়া শ্রীভগবানকে তাঁর সিংহাসন থেকে নেমে এসে ভোগ সেবনের আসনে উপবিষ্ট হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো, তাঁকে আসন পরিগ্রহণের জন্য আসন প্রদান, এবং পাদপদ্ম, মুখ-হাত প্রক্ষালনের জন্য জল প্রদান—এই গুলি বিধিবদ্ধ চিরাচরিত আচরণ বিধি। তারপরে মূল মন্ত্র উচ্চারণ সহকারে শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য অর্পণ করা যেতে পারে। ভোজনের শেষে, আবার পাদপদ্ম, হাত ও মুখ প্রক্ষালনের জন্য শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে জল প্রদান বিধিসম্মত আচরণ।

ভোগ নিবেদনের কালপরিধি

শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে ভোগ নিবেদনের মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টিবিধানের পদ্ধতি সম্পর্কে শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের বিস্তারিত পরামর্শ দিয়ে রেখেছেন। তিনি লিখেছেন—

শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত ভোগ-নৈবেদ্যের থালাটি ১৫-২০ মিনিট কিংবা তারও বেশি সময় তাঁর সামনে রেখে দিতে হয়—অবশ্য আধ ঘন্টার বেশি নয়। (২৫ জানুয়ারি ১৯৬৮ তাং শ্রীল প্রভুপাদের লেখা চিঠি থেকে)

অন্যান্য ভোগ নিবেদন ছাড়া, নৈবেদ্য নামে যে পঞ্চদশ উপচারটি প্রাতঃকালীন পূজা-অর্চনার সময়ে নিবেদিত হয়ে থাকে, সেটি অতি অল্পক্ষণের জন্যই শ্রীভগবানের উপভোগের নিমিত্ত তাঁর সামনে রাখা হয়। এই নিবেদনের সময়টিতে, শ্রীভগবানের সামনে উপস্থিত থাকা যেতে পারে, (চোখ বন্ধ রেখে) গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতে হয় আর সেই সময়ে শ্রীভগবান আহার্য গ্রহণ করে থাকেন।

♦ (৩৩) মুখবাস

মৌরি, এলাচ, কিংবা লবঙ্গ, তার সাথে মিছরির টুকরো আর শুকনো গোলাপের পাপড়ি নানাভাবে বিভিন্ন সুগন্ধি মশলা মিশিয়ে শ্রীভগবানের মুখশুদ্ধির উদ্দেশ্যে নিবেদন করা যেতে পারে।

♦ (৩৪) তাম্বূল নিবেদন

শ্রীগোপালের বিগ্রহসেবার উদ্দেশ্যে কত আশ্চর্য উপায়ে নিবেদন করা হয়ে থাকে, তার সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থে—

শ্রীবিগ্রহকে প্রথমে নানা প্রকার ভোগ নিবেদন করা হল, তারপর নূতন পাত্রে সুবাসিত জল নিবেদন করা হল, এবং পরে মুখ ধোওয়ার জন্য জল দেওয়া হল। অবশেষে বিবিধ মশলাসহ তাম্বূল নিবেদন করা হল। তারপর ভগবানের আরতি, এবং আরতির পরে সকলে বহুবিধ স্তব করলেন, এবং ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করে আত্মসমর্পণ করলেন। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা ৪/৬৫-৬৬)

তাম্বূল হচ্ছে পান ও সুপারির মিশ্রণ। নানা রকমের উপকরণাদি দিয়ে বিভিন্ন উপায়ে এটি তৈরি করার পদ্ধতি আছে। দুর্ভাগ্যবশত, অধিকাংশ পাশ্চাত্য দেশগুলিতেই আসল জাতের পানপাতা পাওয়া যায় না। মশলাপাতির দোকানে অন্য সমস্ত উপকরণগুলি সচরাচর পাওয়া যায়।

এবার, প্রথমে শ্রীগুরুদেবকে শ্রীভগবানের প্রসাদ নিবেদন করার পরে, শ্রীভগবানের পার্ষদদের উদ্দেশ্যে প্রসাদ নিবেদন করা যেতে পারে।

♦ (৩৫) দিব্য-শয্যা

শ্রীল প্রভুপাদ যেভাবে বর্ণনা করেছেন, সেইভাবে একটি আরামপ্রদ গদিমোড়া আসনে কিংবা বিছানায় শ্রীভগবানকে বিশ্রামের জন্য আহ্বান জানানো যেতে পারে—"যথা সময়ে শ্রীভগবান যাতে শয্যায় আরামে বিশ্রাম করতে পারেন, তার ব্যবস্থা করে রাখা উচিত।" (*শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, মধ্যলীলা ২৪/৩৩৪ তাৎপর্য)

উপরোক্ত ৩৫ অনুচ্ছেদ থেকে পরবর্তী ৩৮ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত নির্দেশাবলী দর্শনারতির আগে প্রাতঃকালীন পূজায় এবং বৈকালিক পূজায় উভয় ক্ষেত্রেই অনুসরণ করা যেতে পারে। বিকালে, অন্যান্য উপকরণাদি ছাড়াও পরিচ্ছন্ন বস্ত্রাদি ও অতিরিক্ত অলঙ্কারাদি কিছু নিবেদন করা চলতে পারে। আসন বলতে এখানে যা উল্লেখ করা হয়েছে, তার দ্বারা *পর্যঙ্কাসন*-ও বোঝায়, অর্থাৎ যে-আসন থেকে দিবাভাগে শ্রীভগবান দর্শন দিয়ে থাকেন। তখন বুঝতে হবে যে, শ্রীভগবান পর্যঙ্ক আসনেই বিশ্রাম গ্রহণ করছেন।

♦ (৩৬) কেশ-প্রসাধন

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থে লিখেছেন—

"শ্রীভগবানের কেশরাশি চিরুণী দিয়ে পরিচ্ছন্ন ও সুসজ্জিত করে দিতে হয় (কেশ প্রসাধন)।" (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা ২৪/৩৩৪ তাৎপর্য)

শ্রীমতী রাধারাণী এবং অন্যান্য সখীদের কেশরাশি বিনুনী সজ্জা করে দিতে হয়, কখনও খোলা চুল রাখতে নেই। মাঝে মধ্যে সেই বিনুনীসজ্জা সামনের দিকে দেখানো যেতে পারে।

কেশ-প্রসাধনের ক্ষেত্রে সাধারণত কৃত্রিম কেশরাশি দিয়ে তৈরি পরচুলা ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

ক্ষুদ্রাকৃতি ধাতব শ্রীবিগ্রহাদিতে কেশরাশির বিশেষ প্রয়োজন হয় না, যথাযথভাবে মুকুটাদি এবং কর্ণভূষণাদি দিয়ে অঙ্গসজ্জা করালে, পরচুলা ছাড়াই ক্ষুদ্রাকৃতি শ্রীবিগ্রহগুলি অতি উত্তম শোভা পায়।

♦ (৩৭) দিব্য-বস্ত্র

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এবং তাঁর সাজসজ্জার বহুবিধ বর্ণনা পাওয়া যায়। শ্রীবিগ্রহাদির সাজসজ্জা এবং অলঙ্কার ভূষণাদির জন্য বিভিন্ন মন্দির থেকে ঐ

সমস্ত বর্ণনা সহ বিভিন্ন ভঙ্গিমা ও প্রচলিত ধরনের সুযোগ পাওয়া যেতে পারে। অবশ্য, শ্রীবিগ্রহাদির পোশাক-পরিচ্ছদ এবং অলঙ্কার-ভূষণাদির বিষয়টি যথেষ্ট শিল্পকলা নিপুণতার অন্তর্ভুক্ত, যা বিশেষ দক্ষভক্তের কাছ থেকে উত্তমরূপে শিক্ষালাভ করা যেতে পারে।

♦ (৩৮) মুকুটম্ মহৎ

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে লিখেছেন—

তাঁর কিরীট, কুণ্ডল, কণ্ঠহার, তাঁর চতুর্বিধ পরিধান, তাঁর মাথায় বলয়, তাঁর অঙ্গুরীয় তাঁর পায়ের নূপুর এবং তাঁর বাঁশি—এইগুলি শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অলঙ্কার। (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, অধ্যায় ২৬)

একটি মুকুট বা কিরীট সকালে এবং অন্য একটি বিকালে নিবেদন করা যেতে পারে, বিশদভাবে পূজা-অর্চনার ক্ষেত্রে, বস্ত্রসজ্জা এবং সাজসজ্জা সারা দিনের মধ্যে ক্রমান্বয়ে অতি সহজ সরল থেকে আরও বিস্তারিতভাবে করা যেতে পারে।

যদি কখনও শ্রীবিগ্রহ দর্শনকালে কোনও অলঙ্কার কিংবা মুকুট স্থানচ্যুত হয়, তা হলে সব চেয়ে ভাল ব্যবস্থা হল শ্রীবিগ্রহের সামনে পর্দা বন্ধ করে সেগুলি ঠিক করে দেওয়া।

♦ (৩৯) দিব্য গন্ধানুলেপন

সুযোগ-সুবিধা হলে, শ্রীভগবানের প্রসাদ তাঁর পার্ষদবর্গের উদ্দেশ্যে নিবেদনের পরে, প্রাতঃকালীন দর্শনের আগে শ্রীভগবানের শ্রীঅঙ্গে চন্দন দ্বারা অলঙ্করণ করে দেওয়া চলে।

♦ (৪০) কৌস্তুভাদি বিভূষণ

৩৮ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত উপচারাদি বলতে প্রধানত ধাতব বাহুবন্ধ এবং মুকুটাদি বোঝায়, আর উপচার ৪০ বলতে রত্নভূষণ, লকেট প্রভৃতি অলঙ্কারাদি বোঝাচ্ছে।

♦ (৪১) বিচিত্র দিব্য পুষ্প

পুষ্পমাল্যাদির সাথে, শ্রীভগবানকে তুলসীমাল্য নিবেদন করা যেতেও পারে।

বিকালে, শ্রীবিগ্রহের জাগরণ, গাত্রোত্থান ও বস্ত্রসজ্জার পরে, তাঁকে তাজা পুষ্পমাল্য এবং বহুবর্ণ পুষ্পসম্ভারে সুসজ্জিত করা চলতে পারে।

ষোড়শোপচার পূজায় প্রণাম-পর্ব

ভগবানের পূজার শেষ পর্বে নিম্নলিখিত কার্যক্রমগুলিকে ষোড়শোপচারে পূজায় ষোড়শতম উপচার অর্থাৎ প্রণাম-পর্ব রূপে বিবেচনা করা যেতে পারে।

♦ (৪২) মঙ্গল-আরাত্রিক

শ্রীভগবানের স্নানপর্বের পূর্বে, আমরা তাঁর উদ্দেশ্যে মঙ্গলআরতি (৪র্থ উপচার) নিবেদন করে থাকি। স্নানের পরে, আবার আমরা তাঁর উদ্দেশ্যে ধূপ ও দীপ নিবেদন করি (২৯ এবং ৩০ উপচার)। এবার, শ্রীভগবানকে আরও পরিধেয় বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত করবার পরে, তাঁর সেবার উদ্দেশ্যে আরও বিশদভাবে কিছু করার জন্য আরতি করে তাঁর পূজা করতে পারা যায়। প্রত্যেক দিনের পূজার সময়ে অবশ্য সচরাচর তা করা হয়েই থাকে এবং ধ্যানযোগে ৪৪ থেকে ৪৭ উপচারগুলি তখন নিবেদিত হয়।

♦ (৪৩) দর্পণ অথবা আদর্শ

ভগবানের সন্তোষবিধানের উদ্দেশ্যে তাঁর দর্শনদানের পূর্বে অল্পক্ষণের জন্য তাঁর সামনে একটি আয়না ধরা উচিত, যাতে তিনি দেখতে পারেন যে, সকলের সামনে দর্শন দানের আগে তাঁর সাজসজ্জা যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়েছে কি না। ঘিয়ের প্রদীপ যেভাবে শ্রীবিগ্রহের সামনে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখানো হয়, আয়না সেভাবে ঘোরাতে নেই—স্থিরভাবে ধরে থাকতে হয়। ষোড়শোপচারে পূজার সময়ে, আরতির ঠিক আগেই দর্শন দানের সময়ে আবার আয়না ধরা যেতে পারে।

♦ (৪৪) সুখয়ানেন মণ্ডপাগমনোৎসব

ষোড়শোপচারে পূজার সময়ে, কিংবা উৎসবে, ক্ষুদ্রাকৃতি শ্রীবিগ্রহটি একটি পালকিতে নিয়ে বেদি অভিমুখে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে এবং সেখানে তাঁকে ভোগ ও আরতি নিবেদন করা যায়।

♦ (৪৫) সিংহাসনোপবেশ

উৎসবের বেদিমঞ্চে শ্রীবিগ্রহের উদ্দেশ্যে ভোগ এবং আরতি নিবেদনের পর অবশ্যই তাঁকে মন্দিরে ফিরিয়ে নিয়ে আসা চাই। গমন এবং আগমন, উভয় ক্ষেত্রেই কীর্তন, শঙ্খধ্বনি এবং চামর ব্যজন সহকারে শ্রীবিগ্রহের সাথে ভক্তদের থাকতে হয়।

♦ (৪৬) পাদ্যাদেঃ পুনরর্চন

বিশদভাবে পূজা-অর্চনার সময়ে, যখনই শ্রীভগবান সেবা গ্রহণের উদ্দেশ্যে এক অবস্থান থেকে অন্যত্র গমন করেন, তখনই পাদ্য, অর্ঘ্য এবং আচমন সহকারে তাঁর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাভক্তি নিবেদন করা উচিত। আরও বিশদভাবে পূজা অর্চনা করতে হলে, মধুপর্ক এবং পুনরাচমন যুক্ত করা চলে।

♦ (৪৭) পুনর্ধূপাদি-অর্পণ, উত্তম নৈবেদ্য

দর্শন-আরতির উদ্দেশ্যে পর্দা খোলবার আগেই, শেষবারের মতো প্রতিটি জিনিস বেদিতে ঠিক ঠিক আছে কিনা তা মিলিয়ে নেওয়া উচিত—যেন গুরুপরম্পরার প্রতিকৃতিগুলি সঠিকভাবে পর পর সাজানো থাকে, বেদিতে যেন আলপিনের কুশনটি পড়ে না থাকে, এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক খুঁটিনাটি। আয়না দেখানোর সময়ে এইভাবে সব মিলিয়ে দেখে নেওয়া চাই।

বেদির সজ্জা

শ্রীবিগ্রহাদির বিভিন্ন আকার, পরিমাপ ও সংখ্যা অনুযায়ী এবং শ্রীবিগ্রহ-কক্ষের আকার অনুযায়ী সিংহাসন বা বেদির আকার বিভিন্ন রকমের হতে পারে। যেহেতু সিংহাসনটি হচ্ছে শ্রীভগবানের উপবেশনের আসন এবং ক্রিয়াকর্মের স্থান, তাই অবশ্যই সেটি সম্পূর্ণভাবে পরিচ্ছন্ন থাকা চাই। সেটি বেশ মনোহর হওয়াও উচিত। সিংহাসনটির যদি কোনও ছাদ থাকে, তবে নিয়মিতভাবে তা পরিষ্কার করে রাখা চাই। যদি ছাদ না থাকে, তবে অন্তত একটি চন্দ্রাতপ ছত্রের মতো কিছু শ্রীবিগ্রহের মাথার ওপরে থাকা চাই। জনগণের কাছে দর্শন দিয়ে চলে এলে শ্রীবিগ্রহাদির বিশ্রামের কিছু ব্যবস্থা থাকা চাই। যদি মন্দির কক্ষটি খুবই ছোট হয়, যাতে আলাদা ঘরে দরজা দিয়ে শ্রীবিগ্রহ কক্ষ তৈরি করা না যায়, তা হলে তার জন্য একটি পর্দা টানিয়ে কাজ সেরে নেওয়া যেতে পারে, মন্দির কক্ষটি যদি তার পক্ষেও অতীব ক্ষুদ্র হয়, তা হলে সিংহাসনের নক্সা এমনভাবে করা যায় যাতে পর্দা সেখানেই সংযুক্ত থাকবে। এই বিষয়ে শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন—

> *"সিংহাসন বেদিটিতে পর্দা লাগিয়ে এমনভাবে তৈরি করানো যেতে পারে, যাতে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের বিশ্রাম গ্রহণের সময়ে তা বন্ধ রাখা যায়।" (৬ মে ১৯৬৮ তাং শ্রীল প্রভুপাদের চিঠি থেকে)*

আমাদের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিকৃতি দিয়ে শুরু করে অন্যান্য গুরুপরম্পরার প্রতিকৃতিগুলিও সামনে থেকে দেখলে বাঁদিক থেকে ডান দিকে পর পর সাজিয়ে রাখা চাই।* যেমন শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী, এবং শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর। শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী এবং ষড়্গোস্বামীদেরও রাখা ভাল। মন্দিরে বিগ্রহ কক্ষে যদি একাধিক বেদি থাকে, তা হলে গুরুপরম্পরার প্রতিকৃতিগুলি একই বেদিতে স্থাপনা করা উচিত। শ্রীনৃসিংহদেব এবং শ্রীশ্রীপঞ্চতত্ত্বেরও একখানি করে প্রতিকৃতি সেখানে থাকা উচিত। পূজায় নিয়োজিত পূজারীর নিজ গুরুদেবেরও একখানি প্রতিকৃতি পূজার সময়ে পূজা বেদিতে স্থাপনা করা উচিত। পূজা-অর্চনা সম্পন্ন হলে, পূজারী সেই প্রতিকৃতিখানি লোকচক্ষুর অন্তরালে পাশে সরিয়ে রাখবেন। (এই বিধি অবশ্যই শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যবর্গের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।)

উৎসবাদির দিনে উপলক্ষ্য অনুসারে একখানি যথোপযুক্ত প্রতিকৃতি বেদিতে কিংবা বেদির নিচেই সাজানো টেবিলে রাখা যেতে পারে। যেমন, শ্রীরামানুজাচার্য কিংবা শ্রীল মধ্বাচার্যের আবির্ভাব তিথি উদ্‌যাপনের দিনে তাঁদের একটি করে প্রতিকৃতি, কিংবা শ্রীবরাহদেবের স্মরণোৎসবে অর্থাৎ বরাহ মহাদ্বাদশীতে তাঁর একটি প্রতিকৃতি স্থাপনা প্রদর্শন করা চলতে পারে।

গাভী, ময়ূর এবং হাতির মতো শুভ জীব বা প্রাণীদের ছোট ছোট আলঙ্কারিক কাঠের, ধাতুর কিংবা মাটির প্রতিকৃতি দিয়ে বেদিটিকে সাজাতে পারা যায়। বিভিন্ন দিনের উপলক্ষ্য অনুসারে উপযুক্তভাবে একখানি নকশা-আঁকা বা ছাপা পটচিত্র শ্রীবিগ্রহাদির পিছনে ঝুলিয়ে দেওয়া উচিত। শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলীও শ্রীভগবানের গ্রন্থ ও অবতারাদি রূপে সাজিয়ে রাখা চলতে পারে। বেদিতে কিংবা বেদির পাশে (একটি উঁচু টুলে) অন্তত দর্শন আরতির সময়ে এক বা একাধিক তুলসী বৃক্ষ থাকা উচিত। পূজারীর জন্য যদি বেদিতে ঘড়ি বসানো হয়, তবে তা যেন স্পষ্টভাবে সকলের চোখে না পড়ে। বেদিতে প্রত্যেক বিগ্রহের কাছে ধাতব কিংবা কাপড়ের ঢাকনা দেওয়া এক পাত্র খাবার জল থাকা চাই।

বেদির ওপরে কিংবা চারিদিকে ঘিয়ের প্রদীপ সাজিয়ে কিংবা ঝুলিয়ে রাখতে পারা যায়। যদিও তার বদলে মোমবাতি জ্বালিয়ে রাখাও চলে, তবে সেইগুলি উচ্চমানের অথবা শুদ্ধ জিনিস বলা চলে না। প্রত্যেকবারে আরতির সময়ে অন্তত একটি ঘিয়ের প্রদীপ পূজারীর কাছে (বেদির বাঁদিকে) সর্বক্ষণ

---

* এই ধরনের ব্যবস্থাই শ্রীল প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন।

জ্বালিয়ে রাখা উচিত।* ভগবানকে নিবেদনের জন্য ধূপ এবং প্রদীপ এই প্রদীপটি থেকে জ্বালিয়ে নেওয়া যেতে পারে। সব চেয়ে ভাল হয়, আরতির সময়ে দীপ নিবেদনের জন্য সেটি জ্বালিয়ে নেওয়ার জন্য একটি সরু কাঠিতে তুলো জড়িয়ে নিয়ে তা ঘিয়ে ডুবিয়ে নিতে হয়। যদি সম্ভব হয়, তবে পূজার সময়ে ব্যবহারের জন্য আগুন সরাসরি দেশলাই কাঠি বা লাইটার থেকে না নেওয়াই উচিত।

বেদি সজ্জা সম্পর্কে আরও মন্তব্য

বেদির ওপরে কিংবা বেদির এক পাশে দেওয়ালে শ্রীশ্রীপঞ্চতত্ত্বের একখানি প্রতিকৃতি শ্রীশ্রীগৌর-নিতাই বিগ্রহাদির বেদির সঙ্গে রাখা যেতে পারে। যে-মন্দিরে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের বিগ্রহাদি নেই, সেখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিতাই বা শ্রীশ্রীপঞ্চতত্ত্বের বেদির ওপরে সাধারণত নিকটস্থ শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ মন্দির থেকে সংগৃহীত শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের প্রতিকৃতি স্থাপনা করা চলে। কোনও কোনও মন্দিরে শ্রীনৃসিংহদেবের প্রতিকৃতির পরিবর্তে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনৃসিংহ কিংবা শ্রীশ্রীপ্রহ্লাদ-নৃসিংহের ক্ষুদ্রাকৃতি বিগ্রহ থাকতেও পারে।

বেদির একেবারেই ওপরে যদি একখানি ঘর থাকে, তবে এমন ব্যবস্থা করা উচিত, যাতে সেখানে কেউ না যায় এবং আজেবাজে জিনিসে ভরা না থাকে। শ্রীবিগ্রহাদির ওপরের কক্ষটিতে চারাগাছের টব, সাজানো বেড়া, কিংবা গম্বুজের আকারে একটা কাঠামো রাখা উচিত। তা ছাড়া, হাত-মুখ ধোওয়া কিংবা জল-কলের ব্যবস্থা বিগ্রহ-কক্ষ এবং রন্ধন-কক্ষ থেকে যতদূর সম্ভব দূরে রাখা উচিত।

গুরুবর্গের প্রতিকৃতিগুলিতে তাঁদের পূর্ণ অবয়ব প্রদর্শন করা চাই—কেবল মুখমণ্ডল বা আবক্ষ প্রতিকৃতি নয়। যে কোনও প্রতিকৃতি বেদি থেকে দূরে সরানো থাকলেও, বেদিতে যে সব ছবি পূজা করার জন্য নির্ধারিত হয়, সেইগুলি অতীব শ্রদ্ধাসম্ভ্রম সহকারে বিবেচনা করা কর্তব্য। বেদিতে যখন রাখা হয়নি, তখনও শ্রীগুরুদেবের প্রতিকৃতি সুন্দরভাবে সোজা অবস্থায় রেখে

*প্রথাগত ঐতিহ্যমণ্ডিত পঞ্চরাত্রিক মন্দিরগুলিতে বাস্তবিকই একটি অখণ্ডদীপ থাকে, যা কখনও নিভতে দেওয়া হয় না। এই দীপাগ্নি ঠিক বিগ্রহ স্থাপনার মতোই গুরুত্ব সহকারে প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং পূজা-অর্চনা ও রন্ধনাদি সকল কাজে এই দীপ থেকেই সর্বদা অগ্নি সংযোগ করা হয়ে থাকে। বিগ্রহকক্ষে সকলের অগোচরে অথচ অনায়াসে ব্যবহারযোগ্য স্থানে সর্বদা একটি অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র কিংবা আগুন-নেভানোর উপযোগী মোটা কম্বলাদি রাখা উচিত। ঠিক সেইভাবে রন্ধনকক্ষেও একটি অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র কিংবা কম্বলাদি তৈরি থাকা আবশ্যক।

দিতে হয়—তার মানে অন্যান্য ছবির সঙ্গে গাদা করে রাখা কিংবা হাবিজাবি উপকরণাদির আবর্জনার মধ্যে তা ফেলে রাখা অনুচিত। সব চেয়ে ভাল হয় সেইগুলিকে একটি তাকে (শেল্‌ফে) বা টেবিলে বিগ্রহ কক্ষের মধ্যে সাজিয়ে রাখা, তবে সকলের অগোচরে।

মাঝে-মধ্যে বেদিতে অন্যান্য প্রতিকৃতি বসাতে গেলে, মনে রাখতে হবে, তা যেন *শ্রীমদ্ভাগবতে* লিপিবদ্ধ চারি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত আচার্যবর্গের এবং অবতারগণের প্রতিকৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। বিশেষ দিনে স্থানীয় শ্রদ্ধেয় সাধুসন্তের প্রতিকৃতি মন্দির কর্তৃপক্ষের অভিরুচি অনুসারে মন্দিরকক্ষে কিংবা বেদির কাছেই একটি পৃথক টেবিলে প্রদর্শিত হতে পারে।

বেদির ওপরে শঙ্খাদি সম্পর্কে : বামমুখী শঙ্খ সচরাচর লক্ষ্মীমন্ত শঙ্খ হয় না, এগুলি অতি বিরল। যদিও যথার্থ লক্ষ্মীমন্ত শঙ্খ পাওয়া যায়, তবে তার জন্য কোনও বিশেষ পূজা নিবেদন প্রয়োজন হয় না, বিশেষ করে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের বিগ্রহাদি সেবার মন্দিরে। শ্রীলক্ষ্মীদেবীর উৎস যিনি শ্রীমতী রাধারাণী, তাঁর পূজাই শ্রীলক্ষ্মীদেবীর পূজা। আজকাল অধিকাংশ বামমুখী শঙ্খ যা পাওয়া যায় পেঁচালো শঙ্খের মতো, সেগুলি যথাযথভাবে পূজা-অর্চনার জন্য নির্ধারিত হয় না, তবে ভারতের বহু মন্দিরে যথার্থ শঙ্খের পরিবর্তে ব্যবহারের জন্য তা অনুমোদন করা হয়ে থাকে, অন্ততপক্ষে শ্রীবিগ্রহের স্নান-অভিষেকের ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য। তবে বেদিতে ঐ ধরনের শঙ্খাদি রাখার কোনও প্রয়োজন নেই।

♦ (৪৮) দিব্য তাম্বূল মহানীরাজন

এই সময়ে শ্রীভগবান প্রাতঃকালীন প্রধান দর্শনদানের সময়ে আরতির মাধ্যমে নিবেদিত হন এবং সেটি সাধারণত সংক্ষেপে ধূপ, পূজা ও চামর, কিংবা দীপ ও চামর, অথবা শুধুমাত্র চামর ব্যজনের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়ে থাকে। দর্শন ও আরতির জন্য পর্দা খোলার আগে, প্রত্যেকবার আরতির সময়ে যেভাবে করা হয়, সেইভাবে পূজারী শ্রীবিগ্রহ কক্ষের বাইরে থেকে তিনবার শঙ্খধ্বনি করবেন।

শ্রীল প্রভুপাদ নির্দেশ দিয়েছেন যে, এই সময়ে ভক্তমণ্ডলী 'গডেজ্ অভ ফরচুন' নামে *ব্রহ্মসংহিতার* টেপ অ্যালবাম থেকে *'গোবিন্দম্ আদিপুরুষম্'* রেকর্ডটি বাজিয়ে শোনাবেন।

পূর্বে (৪৩ নং অনুচ্ছেদে) যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, আরতি নিবেদনের আগে, সর্বাঙ্গীণ পূজা সম্পাদনের আগেই, আবার একবার দর্পণ প্রদর্শন করা চলতে পারে।

♦ (৪৯) চামর-ব্যজন এবং ছত্র-সেবা

ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পার্ষদবর্গ কিভাবে তাঁর উদ্দেশ্যে উপচারাদি নিবেদন করেছিলেন, তা *শ্রীমদ্ভাগবতে* এইভাবে বর্ণনা করা আছে—

হে রাজন্! ভরত শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকাদ্বয়, সুগ্রীব এবং বিভীষণ চামর ও উৎকৃষ্ট ব্যজন, হনুমান শ্বেতছত্র, শত্রুঘ্ন ধনুক এবং দুটি তূণ, সীতাদেবী তীর্থজলে পূর্ণ কমণ্ডলু, অঙ্গদ খড়্গ এবং ঋক্ষরাজ জাম্ববান স্বর্ণ কবচ ধারণ করেছিলেন।

(শ্রীমদ্ভাগবত ৯/১০/৪২-৪৩)

চমরী বলদের পুচ্ছকেশ দ্বারা নির্মিত চামর এবং ময়ূরের পালকের তৈরি পাখা কিংবা অন্য কোনও ধরনের পাখা সম্পূর্ণ আরতি উৎসব সমাপনান্তে নিবেদিত হয়ে থাকে। ঐ দুটিই রাজকীয় সেবার অঙ্গ, চামরের বাস্তব উপযোগিতা হল মশা-মাছি-পোকামাকড় তাড়ানো আর পাখাটি অবশ্য শীতলতা প্রদানের জন্য। ভারতে কোনও কোনও মন্দিরে শ্রীবিগ্রহের মাথার ওপরে যান্ত্রিক টানা পাখার ব্যবস্থা করা থাকে, যেটি দর্শন কক্ষ পর্যন্ত দড়ি দিয়ে টানানো থাকে, যাতে দর্শনার্থীরা পাখা টেনে শ্রীভগবানকে শীতলতা নিবেদনের সেবা সম্পন্ন করবার সুযোগ পেতে পারে।

♦ (৫০) গীত

শ্রীল প্রভুপাদ *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থে লিখেছেন—

হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র এবং মহাজন অনুমোদিত গান গাওয়া উচিত। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা ২৪/৩৩৪ তাৎপর্য)*

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে শ্রীভগবানের মহিমা কীর্তনের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে—

ভগবানের মহিমা নিরন্তর কীর্তনকারী ব্রাহ্মণ অবশ্যই কৃষ্ণলোক প্রাপ্ত হন। দেবাদিদেব মহাদেবের স্তুতি থেকেও এই কীর্তন শ্রীকৃষ্ণের অধিক প্রিয়। (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু নবম অধ্যায়; লিঙ্গ পুরাণ থেকে উদ্ধৃত)

---

* 'পঞ্চরাত্র-প্রদীপ গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে সারাদিনের বিভিন্ন সময়ে নিবেদনের উপযোগী মহাজনবর্গ অনুমোদিত প্রামাণ্য গীত-ভজনাদির উল্লেখ করা আছে। সর্বোপরি প্রধান গীতটি হল হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র, তার আগে পঞ্চতত্ত্ব মন্ত্রগীতি নিবেদিত হবে।

♦ (৫১) বাদ্য

শ্রীভগবানের প্রীতিসাধনের উদ্দেশ্যে পরিপাটিভাবে ভোগ রন্ধন শিক্ষা করা যেমন উচিত, তেমনই মৃদঙ্গ এবং করতালের মতো কোনও বাদ্যযন্ত্র শিক্ষার অন্তত সামান্য কিছু পারদর্শিতাও শ্রীভগবানকে আনন্দদানের অভিলাষে আয়ত্ত করার জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত। কোনও কোনও মন্দিরে (যেমন বৃন্দাবনে শ্রীরাধারমণ মন্দিরে) ভক্ত-সঙ্গীতজ্ঞেরা নিয়মিতভাবে সন্ধ্যায় শ্রীভগবানের প্রীতিবিধানের উদ্দেশ্যে ভারতীয় রাগসঙ্গীত নিবেদন করে থাকেন।

♦ (৫২) নর্তন

শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন—

> *দ্বারকা-মাহাত্ম্যে ভগবানের শ্রীমূর্তির সম্মুখে নৃত্য করার মহিমা বর্ণনা করে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "যে মানুষ প্রসন্নচিত্তে ভক্তিপূর্বক আমার সামনে নৃত্য করতে করতে শরীরের ভঙ্গিমার দ্বারা অন্তরের বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করেন, তাঁর কোটি কোটি জন্মের সঞ্চিত পাপ বিনষ্ট হয়ে যায়।" (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, নবম অধ্যায়)*

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থের ঐ একই অধ্যায়ে দেবর্ষি শ্রীনারদ মুনি উক্তি রয়েছে—

> *'দিব্যভাব প্রকাশ করে যিনি ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে নৃত্য করেন এবং করতালি দেন, তাঁর শরীর থেকে পাতকরূপী সমস্ত পক্ষী উড়ে চলে যায়।' তালি দিলে যেমন পাখিরা উড়ে যায়, তেমনই শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের সম্মুখে নৃত্য করলে এবং করতালি দিলে শরীর থেকে পাতকরূপী সমস্ত পক্ষীকে উড়িয়ে দেওয়া যায়।*

শ্রীবিগ্রহাদির সমক্ষে বৃত্তাকারে নৃত্য করা যদিও অপরাধজনক নয়, তা হলেও তাঁদের দিকে পশ্চাৎ প্রদর্শন যেন না করা হয়, সেই বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। আমাদের অবশ্যই মনে রাখা উচিত যে, আমাদের নৃত্য তাঁদের প্রীতিবিধানের জন্যই নিবেদিত হচ্ছে। বিশেষ করে আরতি উৎসবানুষ্ঠান যখন চলছে, তখন ভক্তমণ্ডলীর মনোযোগ মূলত শ্রীবিগ্রহাদি অভিমুখেই নিবদ্ধ থাকা উচিত। তা ছাড়া, শ্রীবিগ্রহাদির সামনে ভাবোদ্দীপক উচ্ছল নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশনের সময়ে তার মধ্যে অবশ্যই সুবিবেচনাপ্রসূত সংযমের পরিচয় থাকা চাই—উদ্দামভাবে চারিদিকে চরকিপাক খেয়ে যে-নৃত্যানুষ্ঠান শ্রীবিগ্রহের সম্ভাব্য ক্ষতিসাধন করতেও পারে, তা নিশ্চয়ই পরিত্যজ্য!

♦ (৫৩) প্রদক্ষিণ

শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন—

যে মানুষ বিষ্ণুমূর্তির পরিক্রমা করেন, তিনি এই জড় জগতে জন্ম-মৃত্যুর চক্রকে প্রতিহত করে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হন। (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, নবম অধ্যায়, হরিভক্তিসুধোদয় গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত)

কারও চারিপাশে ডানদিক থেকে বাঁদিকে ঘড়ির কাঁটার মতো ঘুরে পাদচারণা করলে, এবং তাঁর দিকে শরীরের ডানদিক ফিরিয়ে চললে, সেটা শ্রদ্ধা প্রদর্শনের একটি পন্থা হয়। শ্রীভগবানকে এইভাবে পরিক্রমা করে, আমাদের সর্ব অঙ্গ দিয়ে তাঁর আরাধনা করে থাকি। শ্রীবিগ্রহের সামনে অন্য কাউকে প্রদক্ষিণ করা অনুচিত, তা ছাড়া, শ্রীবিগ্রহকেও একবার মাত্র প্রদক্ষিণ করা উচিত নয়। পূজার আঙ্গিক স্বরূপ, অন্তত তিনবার শ্রীবিগ্রহ প্রদক্ষিণ করা কর্তব্য।

♦ (৫৪) অষ্টাঙ্গ প্রণাম

শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন—

নারদীয় পুরাণে শ্রীবিগ্রহকে সম্মান প্রদর্শন এবং দণ্ডবৎ প্রণতি সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "যিনি প্রভূত পুণ্যকর্ম আচরণ করেছেন এবং যে মানুষ কেবল শ্রদ্ধা সহকারে পরমেশ্বর ভগবানকে প্রণতি জানিয়েছেন, তাঁরা সমপর্যায়ভুক্ত নন।" যে-মানুষ বহু যাগ-যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছেন, তিনি পুণ্যফল লাভ করবেন। কিন্তু সেই সমস্ত পুণ্যের ফল যখন শেষ হয়ে যায়, তখন তাঁকে আবার এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করতে হয়; কিন্তু যে-মানুষ কেবল একবার শ্রদ্ধা সহকারে ভগবানের শ্রীবিগ্রহকে প্রণতি নিবেদন করেছেন, তাঁকে আর কখনও এই জগতে ফিরে আসতে হবে না, কেননা তিনি সরাসরিভাবে কৃষ্ণলোকে উন্নীত হবেন। (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, নবম অধ্যায়)

নৃসিংহ-পুরাণে এইভাবে শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদনের মহিমা বর্ণনা করা আছে—

সকল যজ্ঞের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল প্রণাম। এক প্রণামে জীব শুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং শ্রীভগবানের সান্নিধ্য লাভ করে।

ভূমিতে দেহ অবনত করে শ্রদ্ধা নিবেদনের নাম প্রণাম। শ্রীভগবানের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের এবং তাঁর শ্রীচরণকমলে মাথা নত করে দেওয়ার

অভিব্যক্তি স্বরূপ এই প্রণাম নিবেদন আরাধনার যথোপযুক্ত চূড়ান্ত পর্যায়। ষোড়শোপচারের তালিকায়, প্রণাম হল ষোড়শতম উপচার। বিশদভাবে বিবেচনা করে দেখলে, এই প্রণাম নিবেদনের মধ্যে স্তুতি, স্তব আবৃত্তি ও প্রদক্ষিণ, শ্রীবিগ্রহের মূল মন্ত্র ও গায়ত্রী, তথা কর্মার্পণ ও আত্মসমর্পণ মন্ত্রোচ্চারণাদিও অন্তর্ভুক্ত করা চলে। বস্তুত, 'প্রণাম-পর্ব' শীর্ষক সম্পূর্ণ অংশটিকেই প্রণাম উপচার সম্বন্ধীয় বিষয়বস্তুরই অতিরিক্ত সংযোজন রূপে বিবেচনা করা যেতে পারে। স্বাগত উপচার ব্যতীত অন্যান্য উপচারগুলি সামগ্রীভিত্তিক, প্রণাম উপচার শ্রীবিগ্রহের উদ্দেশ্যে আত্মনিবেদনের প্রসঙ্গ। ইতিপূর্বে ৩নং উপচারে কিভাবে অষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদন করতে হয়, তার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

সেই অনুসারে (৩নং অনুচ্ছেদ) প্রণাম দিয়ে শ্রীবিগ্রহ আরাধনা শুরু হয় এবং শেষ হয়। শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন—

শ্রীবিগ্রহ আরাধনার সময়ে দণ্ডবৎ প্রণামের ক্ষেত্রে, বিগ্রহ কক্ষের দরজা খোলবার আগেই দণ্ডবৎ প্রণত হওয়া উচিত। তারপরে আলো জ্বালিয়ে আবার দণ্ডবৎ প্রণাম করা উচিত। দণ্ডবৎ প্রণতি কোনও বিধিনিষেধ নেই। যতবার পারা যায়, ততই ভাল। (২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ তাং লেখা শ্রীল প্রভুপাদের পত্র থেকে)

♦ (৫৫) স্তুতি

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থে লিখেছেন, "ভগবানের পাদপদ্মে নানা ধরনের প্রার্থনা ও স্তুতি নিবেদন করা উচিত।"

নির্বাচিত প্রার্থনা আবৃত্তি করার উপযোগিতা সম্পর্কে শ্রীল প্রভুপাদ *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে ব্যাখ্যা করেছেন—

মনীষীদের মত অনুসারে ভগবদ্গীতা বহু প্রামাণিক স্তবে পরিপূর্ণ, বিশেষ করে একাদশ অধ্যায়ে। কেননা, সেখানে অর্জুন ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করে তাঁর স্তব করেছিলেন। এইভাবে গৌতমীয় তন্ত্রে সব কটি শ্লোকই হচ্ছে ভগবানের স্তব। শ্রীমদ্ভাগবতে তো ভগবানের শত শত স্তব রয়েছে। ভক্তের উচিত এই সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে কিছু শ্লোক চয়ন করে প্রতিদিন তা পাঠ করা। স্কন্দ পুরাণে বলা হয়েছে, "যাঁর জিহ্বা নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের স্তবরত্নের দ্বারা বিভূষিত, তিনি মুনি-ঋষিদের নমস্য এবং দেবতাদেরও আরাধ্য।"...নৃসিংহপুরাণে বলা হয়েছে, "কোন ব্যক্তি যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের সম্মুখে এসে বিভিন্ন স্তব পাঠ করেন, তিনি যে তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে বৈকুণ্ঠলোকে

উন্নীত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।" (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ৯ম অধ্যায়)

শ্রীভগবানের পূজা-অর্চনায় ভক্ত তাঁর অঙ্গ নিয়োজিত করার পরে, তাঁর জিহ্বার সাহায্যে শব্দ ও ধ্বনির মাধ্যমে ভগবানের পূজা করে থাকেন—প্রথমে নীরবে জপ করেন, পরে উচ্চ স্বরে কীর্তন করেন (ভগবানের নাম, লীলা, গুণ ও পরিকরাদির মহিমা বর্ণনা)। জপ বলতে বোঝায়, গুরুদেব প্রদত্ত মূলমন্ত্রাদি ও গায়ত্রী মন্ত্রাদি (প্রত্যেকটি দশ বার করে) জপ। উপলব্ধি করবার চেষ্টা করতে হবে, যে বিগ্রহের পূজা-অর্চনা করা হচ্ছে, মন্ত্র তাঁর থেকে অভিন্ন। প্রথমে ভালভাবে আসনে বসা উচিত, আচমন করা চাই, এবং জপ করবার সময়ে গায়ের কাপড় দিয়ে ডান হাতটি ঢেকে রাখতে হয়। (ডান হাতের আঙুল দিয়ে মন্ত্র জপের সংখ্যা গণনার কার্যটি দেখানো অনুচিত)। উচ্চস্বরে জপ (স্তুতি) করবার সময়ে, *বেদ, পুরাণাদি, পঞ্চরাত্র*, কিংবা অন্যান্য অনুমোদিত বৈষ্ণব গ্রন্থাদি থেকে শ্রীবিগ্রহ বন্দনামূলক শ্লোকাবলী আবৃত্তি করা চলে। নিজ আঞ্চলিক ভাষাতেও প্রার্থনা উচ্চারণ করা ভাল। *হরিভক্তিবিলাস* গ্রন্থে *ভগবদ্গীতা, বিষ্ণুসহস্রনাম* এবং *স্তবরাজ* (*গৌতমীয় তন্ত্র* থেকে) আবৃত্তি করবার পরামর্শ দেওয়া আছে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর পরামর্শ দিয়েছেন যে, ভক্তেরা পদ্যপঞ্চক এবং বিজ্ঞপ্তিপঞ্চক থেকে স্তব আবৃত্তি করতে পারে। সেই সময়ে নিজের কোনও প্রার্থনাও ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা যেতে পারে।

♦ (৫৬) মূর্ধ্নি শ্রীচরণাব্জয়োঃ স্থাপন

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন—

ভগবানের শ্রীচরণে মস্তক স্থাপন (এটি সকলের পক্ষে সম্ভব না হতেও পারে, কিন্তু পূজারীর অন্তত তা করা উচিত)। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২৪/৩৩৪ তাৎপর্য)

পূজা অর্চনা নিবেদনের সকল কার্য সমাধা হওয়ার পরে, শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে নিজেকে নিবেদন করা উচিত। শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে আমাদের নিজেদের সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ ও নিবেদন করাই পূজা-অর্চনার শেষ কাজ এবং পূজা পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা যে লক্ষ্যে উপনীত হতে প্রয়াসী, তার চরম কৃত্য।

কিছু ঐতিহ্যমণ্ডিত মন্দিরে, বিশেষত দক্ষিণ ভারতে, দর্শনার্থীদের মাথায় একটি শঠারি স্পর্শ করানোর প্রথা প্রচলিত আছে। শঠারি হল ঘণ্টার আকৃতি একটি সামগ্রী যেটি শ্রীভগবানের পাদপদ্মের প্রতীকস্বরূপ, সাধারণত সেটি

তামা, রূপা কিংবা সোনা দিয়ে তৈরি হয় এবং মূল বিগ্রহ পূজার সাথে সেটিরও পূজা করা হয়ে থাকে।

♦ (৫৭) তীর্থ-নির্মাল্য-ধারণ

স্কন্দ পুরাণে কতকগুলি ক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে, যেগুলি পালন করলে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপও দূর হয়—

> *শঙ্খ থেকে জল গ্রহণ, বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা, শ্রীভগবানের প্রসাদী পুষ্পাদি, অভিষেকবারি, প্রসাদী চন্দন এবং সুগন্ধি ধূপাদি গ্রহণ করলে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ বিনষ্ট হয়।*

পূজার সময়ে পূজারী শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে যে সমস্ত পুষ্পমাল্যাদি, পুষ্পস্তবক, চন্দন, অভিষেক বারি ও তুলসীপত্রাদি নিবেদন করে থাকেন, নির্মাল্য বলতে সেইগুলিকেই বোঝায়। পূজা সমাপনের পরে, ভক্তগণ শ্রীভগবানের প্রসাদরূপে এই সকল বস্তু গ্রহণ করে তাঁদের মাথায় ধারণ করবেন।* শ্রীভগবানকে সন্তুষ্ট করাই পূজা-অর্চনার উদ্দেশ্য, ভগবানকে সন্তুষ্ট করে মানুষ তাঁর কৃপা লাভ করে। ভগবানের শ্রীবিগ্রহরূপের মাধ্যমে তাঁর সেই কৃপা নির্মাল্যরূপেই লাভ হয়। সুতরাং পায়ে মাড়িয়ে কিংবা নোংরা জায়গায় রেখে দিয়ে এই নির্মাল্যের অবমাননা করা অনুচিত। যথাযথভাবে শ্রদ্ধা সহকারে নির্মাল্য পুষ্পাদি গ্রহণের পরে তা জড়ো করে নিয়ে নদীতে, দীঘিতে বা সাগরে ভাসিয়ে দিতে হয়।

> *শ্রীবিষ্ণুর স্নান অভিষেকের জল সেবন এমনই শক্তিদায়ী যে, জীবহত্যা তথা লক্ষকোটি পাপের ফল বিনষ্ট হয়ে যায়। তবে, সেই পবিত্র জল যদি কেউ একটি মাত্র ফোঁটাও মাটিতে ফেলে, তবে তাকে অনুরূপ আটগুণ লক্ষ কোটি পাপের ফল ভোগ করতে হয়। (হরিভক্তিবিলাস)*

যখন মহাপ্রসাদ, নির্মাল্য পুষ্পাদি, তুলসীপত্র ও মঞ্জরী, কিংবা চরণামৃত গ্রহণ করতে হয়, তখন যাতে হাত উপচে মাটিতে না পড়ে যায়, সেই জন্য

---

* ভক্তগণ প্রসাদী পুষ্পমাল্য গ্রহণ করে মাথায় স্পর্শ করেন, ধারণ করেন এবং আঘ্রাণ করে থাকেন। তাঁরা প্রসাদী তুলসীমালা দিয়ে কেবলমাত্র মাথায় স্পর্শ করেন ও ঘ্রাণ নেন, তবে তা ধারণ করেন না। আরও এক ধরনের নির্মাল্য হল শ্রীবিগ্রহের ব্যবহৃত বস্ত্রাদি। প্রসাদীরূপে বিতরিত শ্রীবিগ্রহের বস্ত্রাংশ শ্রদ্ধা সহকারে গ্রহণ করা উচিত। কাঁচের বাক্সে বা ফ্রেমে সেই প্রসাদী বস্ত্র রেখে দেওয়ালে ছবির মতো রাখা যায়। তা পরিধান করাও চলে, তবে তা কাটা বা সেলাই করা রীতি নয়। যদি কাটা বা সেলাই করতে হয়, তবে তা পূজার বস্ত্রাদির জন্য করা উচিত। জপথলি বা শিশুনাট্যের পোশাকাদি (অবশ্যই ভগবানের মাহাত্ম্যমূলক নাটক!) জন্য তা ব্যবহার করা চলে। কোমরের নিচের অংশে প্রসাদী বস্ত্র পরিধান বর্জনীয়।

বাঁ হাতটি ডান হাতের নিচে ধরে রাখতে হয়। চরণামৃত সেবনের পরে হাত ধোওয়ার প্রয়োজন হয় না, কারণ চরণামৃত ঠোঁট দুটিকে পবিত্র করে তোলে, তাই সেই ঠোঁটের স্পর্শে হাত অপবিত্র হতে পারে না। *অগস্ত্য সংহিতায়* বলা হয়েছে—"যে-জল ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অথবা কোনও শুদ্ধ বৈষ্ণবের পাদপদ্ম বিধৌত করেছে, তা সমস্ত তীর্থস্থানের মিলিত জলরাশির সমান মহাপবিত্র। তেমন চরণামৃত পান করে, কারও হাত বা মুখ আচমনের প্রয়োজন হয় না।" অবশ্য যদি চরণামৃত সেবনের পরে কোনও শাস্ত্রগ্রন্থ কিংবা ঐ ধরনের কোনও আরাধ্য সামগ্রী স্পর্শ করতে হয়, তা হলে পরিষ্কার জলে হাত ধুয়ে নিতে হবে।

♦ (৫৮) উচ্ছিষ্ট ভোজন

ভারতের বহু মন্দিরে সাধারণত রীতি আছে, দর্শন আরতির পরে, পূজাবেদী কক্ষ থেকে সরাসরি ভক্তদের মধ্যে পূজারী সামান্য মুষ্টিপরিমাণ প্রসাদ বিতরণ করতে পারেন। ভক্তগণ তৎক্ষণাৎ সেই উচ্ছিষ্ট সশ্রদ্ধভাবে সেবা করতে পারেন, তবে তা খাওয়ার সময়ে মন্দির-কক্ষের কিছুটা পাশে সরে যেতে হয় যাতে শ্রীবিগ্রহাদির একেবারে সামনে প্রসাদ গ্রহণ করা না হয়।

মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ ও সান্ধ্য অর্চন

দিনের বিভিন্ন সময়ে যে ভোগ নিবেদন এবং আরতি অনুষ্ঠান হয়ে থাকে, সেগুলি ষোড়শোপচার পূজারই সংক্ষিপ্ত রূপ।

বিশদভাবে পূজার ক্ষেত্রে, দ্বাদশোপচার নিবেদন করাও চলে কিংবা দুপুরে (নিয়মিত ভোগ নিবেদন ও আরতির ক্ষেত্রে) দশোপচার পূজা নিবেদন করতেও পারা যায়। আর বিকালে শ্রীভগবানকে টাটকা পোশাকাদি পরিধান করানো উচিত।

শয়ন সেবা

শ্রীভগবানকে বিশ্রামে অধিষ্ঠিত করার আগেই সম্ভব হলে রাত্রের পোশাকে তাঁকে সজ্জিত করে দেওয়া উচিত। কোন কোন মন্দিরে প্রথা আছে সর্বশেষ সান্ধ্য ভোগারতির আগেই শ্রীভগবানের পোশাক বদলে দেওয়া হয়। শ্রীল প্রভুপাদ বৃন্দাবনধামের ভক্তদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, সর্বশেষ আরতির আগে যেন পোশাক পরিবর্তন না করা হয়, যাতে দর্শনার্থী জনগণ পূর্ণ ঐশ্বর্যমণ্ডিত শোভায় শ্রীবিগ্রহাদি দেখতে পান। তবে যে সমস্ত মন্দিরে ঐ সময়ে যৎ সামান্য দর্শনার্থী থাকেন, সেখানে এই নির্দেশ ইচ্ছামতো অনুসরণ করা যেতে পারে।

♦ (৫৯) পাদসেবোদ্দেশোপবেশনম্

শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন, *"ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সামনে বসে মনে মনে ভগবানের পাদসম্বাহন করা উচিত।" (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা ২৪/৩৩৪ তাৎপর্য)।*

♦ (৬০) শ্রীভগবানের শয্যা সাজানো

কোমল বস্ত্র, পুষ্পাদি এবং সুগন্ধি বিচূর্ণাদি ব্যবহার করে শ্রীভগবানের জন্য একটি আরামপ্রদ শয্যা তৈরি করা উচিত। শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন, *"শ্রীভগবান শয্যায় বিশ্রাম গ্রহণের পূর্বে শয্যাটিকে পুষ্পশোভিত করা উচিত।" (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা ২৪/৩৩৪ তাৎপর্য)*

♦ (৬১) হস্তপ্রদান

যখনই শ্রীবিগ্রহকে এক জায়গা থেকে অন্যত্র নিয়ে যেতে হবে, তখনই যেদিকে তাঁকে নিয়ে যেতে চান, সেই দিকে করজোড়ে নির্দেশ করতে হয়। কেবলমাত্র ধাতব কিংবা দারুনির্মিত শ্রীবিগ্রহাদি সরানো উচিত, মর্মর শ্রীবিগ্রহাদি নয়।

♦ (৬২) শয়নস্থানাগম মহোৎসব

শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন, *"শ্রীবিগ্রহকে তাঁর শয্যায় নিয়ে আসতে হবে।" (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা ২৪/৩৩৪ তাৎপর্য)*

সর্বদাই অতীব যত্ন ও শ্রদ্ধা সম্ভ্রম সহকারে শ্রীবিগ্রহ বহন করা উচিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সব চেয়ে ভাল হয় যদি শ্রীবিগ্রহের অঙ্গটি ডান হাত দিয়ে ধারণ করে বাম হাতটি শ্রীবিগ্রহের নিচে রাখা যায়। স্থানান্তরের আগে, সব সময়ে সুনিশ্চিত হয়ে নিতে হবে যেন শ্রীবিগ্রহ যেখানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সেটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখা হয়েছে।

♦ (৬৩) পাদক্ষালন এবং শয্যোপবেশ-নীরাজনোৎসব

শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন, *"শ্রীভগবানের পাদপ্রক্ষালন করে তাঁকে শয্যায় বসানো উচিত।" (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা ২৪/৩৩৪ তাৎপর্য)*

শ্রীভগবানকে তাঁর শয্যায় বসানোর আগে সুগন্ধি দ্রব্য, পুষ্পাদি এবং এক পাত্র মিষ্টি দুধ তাঁকে নিবেদন করা উচিত। দুধ পান করার পর শয্যায় শয়ন

করানোর সময় তাঁকে পান, সুপারী এবং মশলা নিবেদন করা কর্তব্য (গরম কাল হলে পাখার বাতাস করা প্রয়োজন)।

♦ (৬৪) শেষ পর্যঙ্ক এবং পাদ-সম্বাহন

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে, "সবশেষে শ্রীভগবানকে শয্যায় শুইয়ে তাঁর পাদসম্বাহন করা উচিত।" (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা ২৪/৩৩৪ তাৎপর্য)

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে অদ্বৈত আচার্য প্রভুর শ্রীভগবানকে পূজার বর্ণনা দেওয়া আছে— *"মন্দিরে শ্রীবিগ্রহাদির আরতি সম্পন্ন হওয়ার পরে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে শয্যায় বিশ্রাম করতে দেওয়া হল।" (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা ৩/৫৯)*

শ্রীল প্রভুপাদ আরও লিখেছেন :—

> *শ্রীবিগ্রহকে শয্যায় স্থাপন করার ব্যাপারে দেখতে হবে, শ্রীবিগ্রহ যদি খুব ভারী হয়, তা হলে প্রতিদিন তাঁদের শয্যায় শয়ন দেওয়া উচিত নয়। সেই ক্ষেত্রে একটি ছোট বিগ্রহ, যিনি প্রতিদিন নিয়মিতভাবে পূজিত হবেন, তাঁকে শয্যায় শয়ন দেওয়া যেতে পারে। শয়ন দেওয়ার সময়ে নিম্নলিখিত মন্ত্রটি উচ্চারণ করা উচিত।—আগচ্ছ শয়নস্থানং প্রিয়াভিঃ সহ কেশব— "হে কেশব, শ্রীমতী রাধারাণীসহ তুমি কৃপা করে শয্যায় এস।" (হরিভক্তিবিলাস ১১/৪০) শ্রীমতী রাধারাণীসহ শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ শয্যায় স্থাপন করা উচিত এবং তা করা হয় পূজাবেদী থেকে কাষ্ঠ পাদুকা শয্যার পার্শ্বে নিয়ে আসার মাধ্যমে। ভগবানকে শয্যায় শয়ন করানোর পরে, তাঁর পাদসম্বাহন করা উচিত। ঘন দুধ* পান করানোর পরে শয্যায় শয়ন করানোর সময়ে তাঁকে পান, সুপারী এবং মশলা নিবেদন করা উচিত। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা ২৪/৩৩৪ তাৎপর্য)*

বালিশ এবং বিছানা এমনভাবে সাজাতে হবে, যাতে শ্রীবিগ্রহের তলদেশ যথাযথভাবে স্থাপিত হতে পারে, যার ফলে তাঁর শিরোদেশ এবং পাদযুগল সমতলে অবস্থান করে এবং তিনি সমান্তরালভাবে শয়ন করতে পারেন।

---

* ঘন দুধ নিবেদনের পরে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে, বিগ্রহকক্ষে সারারাত তা রাখা যাবে না। তা ছাড়া, দিনের বেলা মন্দিরে চরণামৃতের যে-পাত্রটি রাখা হয়েছিল এবং চরণামৃত সেবনের পর হাত ধোওয়ার জন্য যে জল ছিল, তাও রাত্রে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

তৃতীয় অধ্যায়

শ্রীবিগ্রহ অর্চনের সহজ পদ্ধতি

বহু ইসকন মন্দিরে এবং নামহট্ট সংঘ কেন্দ্রে, বিগ্রহ আরাধনা সহজ সরলভাবে সমাধা করা হয়ে থাকে। ছোট মন্দিরে যেখানে অল্পসংখ্যক ভক্ত আছেন, কিংবা যেখানে মূল বিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌর-নিতাই, কিংবা গৃহস্থদের মতো সাধারণ আরাধনা কেন্দ্র, যেখানে প্রতিদিন পরিপূর্ণ আচারে প্রাতঃকালীন মঙ্গল আরতি নিবেদন করার রীতি যথাযথভাবে মেনে চলা সম্ভব হয় না, সেই সব ক্ষেত্রে সহজ সরল পদ্ধতিতে কিভাবে শ্রীবিগ্রহাদির আরাধনা সম্পন্ন করা যেতে পারে, তা এই অধ্যায়ে বিশদভাবে বর্ণিত হচ্ছে।

এমনকি, যে মন্দিরে মূল শ্রীবিগ্রহাদি বেশ বিশদভাবেই আরাধনা করা হয়ে থাকে, সেখানেও মন্দিরের অন্যান্য শ্রীবিগ্রহাদির উদ্দেশ্যে অর্চন নিবেদনের পদ্ধতি সহজ সরল করা হয়ে থাকে। যেমন, যে মন্দিরে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ, শ্রীশ্রীগৌর-নিতাই এবং শ্রীশ্রীজগন্নাথ-বলদেব-সুভদ্রাদেবীর শ্রীবিগ্রহাদি রয়েছে, সেখানে স্নান-অভিষেকের ক্ষেত্রে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রীশ্রীগৌর-নিতাই এবং শ্রীশ্রীজগন্নাথ-বলদেব-সুভদ্রাদেবীর স্নান-অভিষেকের আয়োজন-অনুষ্ঠান সহজভাবে সম্পন্ন করা চলতে পারে। এইভাবে যেসব ভক্তরা প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত অভিজ্ঞ পূজারী নন, তাঁদেরও এইভাবে শ্রীবিগ্রহ আরাধনায় অংশগ্রহণে অনুপ্রাণিত করা যেতে পারে, যাতে তাঁরা নানা প্রকারের বিশদ পূজা পদ্ধতি শিক্ষা গ্রহণে বাধ্য বলে মনে না করেন। (এখানে আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত— 'ভূমিকা' পর্যায়ে পূর্বেই তা উল্লেখ করা হয়েছে যে, শ্রীবিগ্রহ আরাধনার উৎকর্ষমান খেয়ালখুশিমতো পরিবর্তন করা অনুচিত। *'পঞ্চরাত্র-প্রদীপ'* অনুসারে, কোনও বিশেষ মন্দিরের জন্য যে ধরনেরই সামঞ্জস্য বিধান করা হোক, তা মন্দির কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভ করা চাই এবং তা মন্দিরের আরাধনা সংক্রান্ত উৎকর্ষমানের লিখিত বিবরণী স্বরূপ ভবিষ্যতের সহায়কসূত্র রূপে সংরক্ষিত থাকা উচিত।)

গৃহস্থ অধিবাসীরা যাতে বাস্তবসম্মতভাবে মেনে চলতে পারেন, সেই রকম আরাধনা সেবার উৎকর্ষমান অনুযায়ী যথাযথ সম্ভব সহজ সরলভাবে বাড়িতে শ্রীবিগ্রহ আরাধনার ব্যবস্থা করাই বাঞ্ছনীয়। এই অধ্যায়টিতে বাড়িতে শ্রীবিগ্রহ আরাধনার রূপরেখা এবং সেই ধরনের আরাধনার 'ন্যূনতম উৎকর্ষ' সংক্রান্ত প্রক্রিয়াপদ্ধতি থাকছে।

সারসংক্ষেপে বলা যায়, সে সমস্ত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিশেষ ধরনের সহজ সরল আরাধনা পদ্ধতির কথা এইমাত্র বর্ণনা করা হল, এই অধ্যায়টিতে সেইগুলির দুটি স্তর ব্যাখ্যা করা হয়েছে—একটি হল মোটামুটি সরল ক্রিয়াপদ্ধতি এবং অন্যটি হল অতীব সহজ সরল ক্রিয়াপদ্ধতি। 'অতীব সহজ সরল' পদ্ধতি (প্রথমেই যা বিস্তারিত আলোচনা হবে) বলতে বোঝায় বাড়িতে শ্রীবিগ্রহ আরাধনা এবং দৃষ্টান্তস্বরূপ শ্রীশ্রীগৌর-নিতাই আরাধনার কথা বলা হয়েছে, অধ্যায়টির উপসংহারে থাকছে 'মোটামুটি সরল' ক্রিয়াপদ্ধতি—মন্দিরে মূল বিগ্রহের আরাধনায় দৃষ্টান্তস্বরূপ শ্রীজগন্নাথ আরাধনার পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে।

গৃহে শ্রীবিগ্রহ আরাধনা

ঐতিহ্যমণ্ডিত বৈদিক সমাজে, প্রায় সমস্ত ব্রাহ্মণেরাই কোনও না কোনভাবে শ্রীবিগ্রহ আরাধনা করতেন। প্রায় সমস্ত গৃহস্থদেরই অন্তত একটি শালগ্রাম শিলা বাড়িতে রাখা উচিত এবং তাঁর উদ্দেশ্যে ভোগ ও আরাধনা নিবেদন করতে হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ঐতিহ্য অনুসারে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বহু গৃহস্থপার্ষদ অনুগামী বাড়িতে শ্রীবিগ্রহাদি রাখতেন এবং নিয়মিতভাবে তাঁদের আরাধনা করতেন।* ঠিক তেমনই, আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘভুক্ত বহু ভক্ত বাড়িতে একটি শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করে পূজা করেন।

গৃহে শ্রীবিগ্রহ আরাধনা শুরুর পূর্বে কয়েকটি প্রাথমিক বিবেচ্য বিষয়

শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন—

*"আমি মনে করি, মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহের উদ্দেশ্যেই পূজা-আরাধনা নিবেদন একাগ্রভাবে করা উচিত। অবশ্য, যদি মন্দিরটি নাগালের মধ্যে হয়, কিংবা বেশ দূরে হয়...সেটা অন্য ব্যাপার** কিন্তু*

---

* ঐ ধরনের আরাধনা বংশপরম্পরায় চলে আসছে, তাই পরিবারভুক্ত সকল সদস্যই সযত্নে গৃহের ইষ্টদেবতার পূজা বা আরাধনা করে থাকেন। গৃহে ইষ্টদেবতা প্রতিষ্ঠা করে নিয়মিত পূজা করতে অভিলাষ হলে, মনে রাখতে হবে ভবিষ্যৎ বংশধরেরা আরাধনার পদ্ধতি সুনিশ্চিতভাবে মেনে চলতে পারবে তো! আশা করা অনুচিত যে, বংশধরেরা কিংবা অন্য ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা যথাযথভাবে ঐ আরাধনা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবেন কিনা!

** দিনে অন্তত একটি বারও যদি প্রকাশ্যে কোন মন্দিরে যেতে না পারা যায়, তবে বাড়িতে শ্রীবিগ্রহ স্থাপনা করা যথেষ্ট যুক্তি থাকে। কিন্তু তেমন ক্ষেত্রেও প্রকাশ্যে কোন মন্দিরে যত বার সম্ভব দর্শন করতে যাওয়ার সব রকম প্রয়াস রাখতে হয়, ভক্তসঙ্গ করতে হয়, এবং মন্দিরে কিছু সেবা নিবেদন করা উচিত। শ্রীল সনাতন গোস্বামী তাঁর *দিগ্‌দর্শিনী টীকা* (১১/৬৩) গ্রন্থে লিখেছেন—"বৈদিক নীতি অনুসারে যেখানেই পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেই মন্দিরে যদি যাওয়া আয়াসসাধ্য হয়, তবে প্রতিদিন তাঁর দর্শন লাভ করা ও তাঁর পূজা করা উচিত।

মন্দিরটিতে যদি অনায়াসেই যাওয়া যায় তবে সেটাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ কর্মসূচি।" (৩০ মে ১৯৬৯ তাং শ্রীল প্রভুপাদের চিঠি থেকে)

মন্দিরে শ্রীবিগ্রহের আরাধনা অনুষ্ঠানের আগে যেমন শ্রীগুরুদেবের আশীর্বাদ প্রয়োজন, তেমনই বাড়িতে শ্রীবিগ্রহ আরাধনার জন্যও তাঁর আশীর্বাদ প্রয়োজন। দীক্ষাগ্রহণের প্রচলিত পঞ্চরাত্রিক পদ্ধতিতে, প্রয়োজনীয় পঞ্চরাত্রিক মন্ত্রাদিসহ একটি শ্রীবিগ্রহ শ্রীগুরুদেব তাঁর শিষ্যকে দিয়ে থাকেন। এই নীতি আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ অনুসরণ করে থাকেন, এবং তাই ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীল প্রভুপাদ প্রত্যেক ভক্তকে মন্দিরের শ্রীবিগ্রহাদি আরাধনার জন্য প্রদান করেছেন। যদি শ্রীগুরুদেব কোনও শিষ্যকে কোনও ব্যক্তিগত শ্রীবিগ্রহ আরাধনার অনুমতি দিয়ে থাকেন, তখন সেই শিষ্যের উপলব্ধি করা উচিত যে, ব্যক্তিগত শ্রীবিগ্রহটি তাঁর স্থানীয় সেবাকেন্দ্র সংশ্লিষ্ট মন্দিরের শ্রীবিগ্রহেরই প্রকাশমাত্র। ভগবান এমনই কৃপাময় যে, তিনি ভক্তের নিজগৃহে আবির্ভূত হতে সম্মত হয়েছেন এবং তিনি গৃহটিকে একটি মন্দিরে রূপান্তরিত করে গৃহস্থ পরিবারের আরাধনা স্বীকার করছেন। তবে, বাড়িতে শ্রীভগবানেরই সেবার অজুহাতে যেন প্রকাশ্য মন্দির এবং সেখানকার আরাধ্য শ্রীবিগ্রহাদির সেবায় অবহেলা করার মাধ্যমে শ্রীগুরুদেব ও শ্রীভগবানের কৃপার অমর্যাদা করা না হয়, সেই বিষয়ে গৃহস্থকে যত্নবান হতে হবে।

শ্রীবিগ্রহের আরাধনা মন্দিরেই করা হোক, কিংবা বাড়িতেই হোক — অথবা গাছতলাতেই হোক — বোঝা উচিত যে, শ্রীবিগ্রহ শ্রীভগবানেরই সমমর্যাদাসম্পন্ন অভিন্ন সত্তাবিশিষ্ট। এই উপলব্ধি দৃঢ়ভাবে ধারণ করে, শ্রীগুরুদেবের নির্দেশাদি অনুসরণে ভক্তের যত্নবান হওয়া চাই, অপরাধাদি পরিহার করা উচিত, এবং শ্রীভগবানকে সন্তুষ্ট করা প্রয়োজন। শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন —

> *"আমাদের অবশ্যই জেনে রাখা দরকার যে, শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান রয়েছেন, এবং তাই আমাদের আচার-আচরণ, কথা বলা, এবং ব্যবহারাদির মধ্যে অবশ্যই সতর্ক হয়ে থাকা উচিত, ঠিক যেন আমরা সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের সামনেই উপস্থিত রয়েছি।" (৬ মে ১৯৬৮ তাং শ্রীল প্রভুপাদের পত্র থেকে)*

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ ও তুলসী-সেবা : সরল এবং মহিমান্বিত

শ্রীল প্রভুপাদ প্রায়ই তাঁর শিষ্যবর্গকে নিয়ে পঞ্চতত্ত্ব (শ্রীচৈতন্যদেব এবং তাঁর চারজন প্রধান পার্ষদসহ) এবং গুরুবর্গের প্রতিকৃতিসহ পূজা অর্চনা করতেন। নতুন মন্দির উদ্বোধনের প্রসঙ্গেও শ্রীল প্রভুপাদ লেখেন —

> *পঞ্চতত্ত্ব এবং আচার্যবর্গের প্রতিকৃতি স্থাপন করে নতুন মন্দির উদ্বোধন করা উচিত। যথেষ্ট অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ভক্তমণ্ডলী না পাওয়া গেলে*

মন্দিরে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ কিংবা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা অনুচিত। (২২ জুন ১৯৭০ তাং শ্রীল প্রভুপাদের লেখা চিঠি)

আরও একখানি চিঠিতে তিনি লেখেন—

তেমন যোগ্যতাসম্পন্ন পূজারীর অভাব দেখা গেলে, প্রত্যেক কেন্দ্রে কেবলমাত্র শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পঞ্চতত্ত্ব পারিষদবর্গের সামনে সংকীর্তন মাধ্যমে পূজা নিবেদন করলেও চলবে। (১ জুলাই ১৯৭০ তাং শ্রীল প্রভুপাদের লেখা চিঠি)

পঞ্চতত্ত্ব এবং আচার্যবর্গের প্রতিকৃতিগুলি নিয়ে বাড়িতে সহজ সুন্দরভাবে পূজা অর্চনার অভ্যাস যে কেউ করতে পারেন। সামান্য কিছু পরিবর্তন করে, ঐ একই নির্দেশাবলী অবলম্বনে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ বিশিষ্ট ত্রিমাত্রিক পূজাবিধিও অনুসরণ করা চলতে পারে। যদিও শ্রীবিগ্রহের প্রতিকৃতিতে পোশাক সজ্জা বা অলঙ্করণ করা যায় না, তবে তার সামনে ভোগ নিবেদন, আরতি এবং কীর্তনাদি বেশ ভালভাবেই করা চলে। সেই প্রতিকৃতির সামনে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করা যেতেও পারে—ঠিক ত্রিমাত্রিক শ্রীবিগ্রহেরই জ্ঞানে।

যথাযথভাবে যত্ন করতে পারলে বাড়িতে তুলসী চারা রেখে পূজা অর্চনা করা যেতে পারে। ভারতের লক্ষ কোটি ঘরে ঘরে সব মানুষ জানে—ঘরে তুলসী দেবীর আরাধনা অতি শুভপ্রদ। কেউ যদি প্রতিদিন সকালে তুলসীপূজা কীর্তনের সাথে একটি ধূপ, দীপ ও পুষ্প নিবেদন করেন, তা হলে শ্রীকৃষ্ণ পরম প্রীতিলাভ করেন এবং ভক্তকে বিপুল পারমার্থিক সিদ্ধি প্রদান করেন।

গৃহস্থের পক্ষে অর্চন বিধেয়

শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে, অর্চন গৃহস্থের পক্ষে বিশেষভাবে বিধেয়—

ধর্মপ্রাণ দ্বিজ ব্রাহ্মণ গৃহস্থের গৃহে সৎভাবে অর্জিত অর্থব্যয়ে পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে নিঃস্বার্থভাবে অর্চন করা অতীব কল্যাণকর পন্থা। (শ্রীমদ্ভাগবত ১০/৮৪/৩৭)

কোনও গৃহস্থ যদি সেইভাবে নিঃস্বার্থ হয়ে পূজা-অর্চনা করতে না পারেন, তা হলে তিনি কোনও ভক্তকে পূজা অর্চনার উপকরণাদি দান করার মাধ্যমে সেই ব্যক্তির পূজার সুফল অর্ধেক অর্জন করতে পারেন। তারপর তিনি আরতির সময়ে শ্রীবিগ্রহ দর্শন করতে পারেন, তা হলে শ্রীবিগ্রহ অর্চনের সুফল তাঁর লাভ হবে।

গৃহস্থের উপযোগী অতি উচ্চমানের শ্রীবিগ্রহ অর্চনের একটি উৎকর্ষমান শ্রীল প্রভুপাদ বর্ণনা করেছেন—

বিশেষ করে গৃহস্থ ভক্তদের জন্য অর্চা-বিগ্রহের পূজা করার পন্থা অনুমোদন করা হয়েছে। যতদূর সম্ভব প্রতিটি গৃহস্থের কর্তব্য শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ* শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ অথবা সীতা-রামের, অথবা নৃসিংহ, বরাহ, গৌর-নিতাই, মৎস্য, কূর্ম, শালগ্রাম বা বিষ্ণুর ত্রিবিক্রম, কেশব, অচ্যুত, বাসুদেব, নারায়ণ, দামোদর আদি বৈষ্ণব-তন্ত্র বা পুরাণে বর্ণিত ভগবানের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে নিষ্ঠা সহকারে অর্চন-বিধি পালন পূর্বক সপরিবারে সেই বিগ্রহের পূজা করা। বারো বছর বা বেশি বয়ঃপ্রাপ্ত পরিবারের প্রতিটি সদস্যের সদ্‌গুরু কর্তৃক দীক্ষিত হওয়া উচিত, এবং ভোর চারটা থেকে শুরু করে রাত দশটা পর্যন্ত মঙ্গল আরাত্রিক, নিরাজন, অর্চন, পূজা, কীর্তন, শৃঙ্গার, বৈকালিক-ভোগ, সন্ধ্যা আরাত্রিক, পাঠ, সান্ধ্য-ভোগ, শয়ন আরাত্রিক ইত্যাদি ভগবানের দৈনন্দিন সেবায় যুক্ত হওয়া উচিত। সদ্‌গুরুর নির্দেশনায় এইভাবে ভগবানের অর্চা-বিগ্রহের আরাধনায় যুক্ত হওয়ার ফলে গৃহস্থ ভক্ত অনায়াসে পবিত্র হতে পারবে এবং অতি দ্রুত পারমার্থিক উন্নতি সাধন করবে।" (শ্রীমদ্ভাগবত ২/৩/২২ তাৎপর্য)

শ্রীল প্রভুপাদ প্রায়ই গৃহস্থ ভক্তদের ভগবানের পূজা-অর্চনা যথাসম্ভব ঐশ্বর্যমণ্ডিত এবং আন্তরিকভাবে নিবেদন করার সার্থকতা সম্বন্ধে বলেছেন—

"যে সকল গৃহস্থ সম্পদশালী, তাঁদের পক্ষে অর্চনমার্গই মুখ্যভাবে বিহিত। যদি তাঁরা অর্চন না করে নিষ্কিঞ্চন ভক্তের মতো কেবল স্মরণাদি বিষয়েই আসক্ত থাকেন, তা হলে সেই ধরনের সম্পদশালী গৃহস্থের পক্ষে বিত্তশঠতা বা কৃপণতা দোষ প্রতিপন্ন হয়। পরের দ্বারা অর্থাৎ পূজারী নিয়োগ করে শ্রীবিগ্রহ-সেবা সম্পাদন করাও নিজ নিজ বিষয়াসক্তি বা অলসতারই পরিচায়ক।...অর্চনে যে সকল দ্রব্যাদি আবশ্যক, একমাত্র গৃহস্থগণের পক্ষেই সেগুলি সংগ্রহ করা সহজসাধ্য বলে তাঁদের পক্ষে কৃষ্ণানুশীলন-কার্যে নববিধা ভক্তির মধ্যে অর্চনমার্গেরই প্রাধান্য বিহিত।...অতএব অর্চন না করলে, গৃহস্থদের মহাদোষ উপস্থিত হয়, অধিকন্তু সেই সমস্ত দীক্ষিত গৃহস্থ ব্যক্তির নরকে পতনও শোনা যায়। অর্চনে নিতান্ত অশক্ত এবং অযোগ্য ব্যক্তিদের সম্বন্ধে অগ্নিপুরাণে বলা

---

* সাধারণত, বিশেষ উচ্চমানের সেবার আয়োজন সারাদিন ধরে নিবেদনের ব্যবস্থা না থাকলে কোনও ভক্তের গৃহে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ বিগ্রহসেবা করা অনুচিত। অবশ্য শ্রীশ্রীগৌর-নিতাই সরল অর্চনবিধি স্বীকার করে থাকেন। শ্রীজগন্নাথদেবেরও অর্চন সহজভাবে বাড়িতে করা চলতে পারে, তবে শ্রীজগন্নাথদেবকে নিয়মিতভাবে ঐশ্বর্যমণ্ডিত ভোগ নিবেদন করতে হয়, কারণ শ্রীজগন্নাথ পুরীধামে তাঁকে প্রত্যহ বহু উপচারে অর্চন করা হয়ে থাকে।

হয়েছে, 'যিনি (স্বয়ং পূজা করতে না পেরে) ভক্তিসহকারে অর্চিত অর্চনাকালীন শ্রীবিগ্রহ দর্শন করেন এবং যিনি দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে শ্রীহরির অর্চনে সুখ অনুভব করেন, তিনিও ভক্তিযোগের সুফল লাভ করেন।' শ্রীবিগ্রহ অর্চনের বিশেষ উদ্দেশ্য—অর্চনাকারীকে সর্বদা শুদ্ধ ও নির্মল করে রাখা। গৃহস্থ ভক্তদের এইভাবে শুচিতার বাস্তব দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা উচিত। (শ্রীমদ্ভাগবত ৭/৫/২৪ তাৎপর্য)

মন্দিরে অর্চন এবং গৃহে অর্চনের পার্থক্য

শ্রীল প্রভুপাদের গুরুভ্রাতা এবং সন্ন্যাস-দীক্ষাগুরু শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ একদা দেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ থেকে *অর্চন-পদ্ধতি* নামে যে গ্রন্থখানি প্রকাশ করেছিলেন, তার ভূমিকায় তিনি ব্যাখ্যা করে লিখেছেন যে, দু'ধরনের শ্রীবিগ্রহ অর্চনের বিধি আছে—গৃহে অর্চন এবং মন্দিরে অর্চন। তাঁর ভাষায়—

ভক্ত্যাঙ্গ অর্চন বা ভক্তিমার্গে পরমেশ্বর ভগবানের পূজা-অর্চনা দু'ধরনের হয়ে থাকে। শালগ্রাম শিলা, গোবর্ধন শিলার অর্চন, কিংবা পরমেশ্বর ভগবানের অন্যান্য রূপের মাধ্যমে পূজা নিবেদন—যেটি গৃহস্থরা তাঁদের বাড়িতে সম্পন্ন করে থাকেন, এবং মন্দিরাদির মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহাদি কিংবা শালগ্রাম শিলার সামনে পূজা নিবেদন হল দ্বিতীয় পদ্ধতি। প্রথম ধরনের পূজা অর্চনায় গৃহস্থের সাধ্য-সামর্থ্য অনুসারে উপকরণাদি নিবেদন করতে হয় এবং সেই কারণে অর্চন বিধি সংক্ষেপিত হয়ে থাকে। দ্বিতীয় ধরনের অর্চনায় পরমেশ্বর ভগবানকে রাজাধিরাজের শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম সহকারে পূজা নিবেদন করা হয়। সেই ধরনের রাজকীয় সেবায়, নিয়মিত অর্চন প্রয়োজন, তা না হলে, পাপময় কর্মফল জন্মে। গৃহস্থরা, এবং যারা গৃহত্যাগ করেছেন কিন্তু সহজ সরলভাবে শ্রীবিগ্রহ অর্চন অব্যাহত রেখেছেন, তাঁরা মোটামুটি তাঁদের নিজেদের পরিবারবর্গের প্রয়োজন মতো, বা সহযোগী বৈষ্ণবজনের কিংবা গৃহে সমাগত অতিথিবর্গের প্রয়োজন তথা আপ্যায়ন অনুসারে খাদ্যসামগ্রী নিবেদন করতে পারেন। কিন্তু শ্রীবিগ্রহের রাজকীয় অর্চন সেবার ক্ষেত্রে সব কিছু অবশ্যই সুনিয়ন্ত্রিত হওয়া চাই।

গৃহে শ্রীবিগ্রহ অর্চনের ন্যূনতম পদ্ধতি

শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ একখানি পত্রে শ্রীশ্রীগৌর-নিতাই অর্চনের সহজ সরল নির্দেশাবলী দিয়েছেন—

গৃহে শ্রীশ্রীগৌর-নিতাই অর্চন করতে পারা যায়। তাঁদের অর্চনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপচারটি হল হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ কীর্তন। তাঁদের উদ্দেশ্যে অন্তত একবার আরাত্রিক নিবেদন করতে পারা যায় এবং গৃহে যা কিছু আহার্য সামগ্রী তৈরি হয়, তাই-ই নিবেদন করা চলে। (শ্রীল প্রভুপাদের লেখা চিঠি, তাং ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫)

অন্য একখানি চিঠিতে শ্রীল প্রভুপাদ লেখেন—

শ্রীবিগ্রহাদি এবং নিজের পরিবারবর্গের যত্ন একই সাথে নিতে গেলে, দুটি কাজই পরস্পরের পরিপূরকরূপে সাধন করতে হবে, মূল গুরুত্ব দিতে হবে শ্রীবিগ্রহ অর্চনায়। ঠিক যেমন কর্মব্যস্ত গৃহিণী সদাসর্বদাই গৃহকর্মে ব্যাপৃত থাকলেও তিনি নিজের সাজ-পোশাক, প্রসাধন, চুল বাঁধা, রাঁধাবাড়া ইত্যাদি সমস্ত কাজই সমাধা করতে থাকেন। তাই দুটি কাজই সমান তালে এক সাথে চলতে থাকে। হ্যাঁ, দিনে অন্তত একবার সকালে শ্রীবিগ্রহাদি পোশাক পরিবর্তন করে দিতে হবে। যদি শ্রীবিগ্রহাদির পটের ছবির মতো ক্ষুদ্রাকার হন, তবে রাত্রে তাঁদের শয্যায় শয়ন করানো যেতে পারে। আর বিশ্রাম গ্রহণের আগে তাঁদের অঙ্গে রাতের বিশেষ পোশাকাদি পরিয়ে দেওয়া যেতে পারে। সেটা ভাল। সময় আর সুযোগ সুবিধা থাকলে এই জিনিসগুলি সমাধা করা চলে। স্নানের ব্যাপারে, দুই হাত এবং জিহ্বার উপযোগ প্রয়োজন। বাম হাত দিয়ে একটি ঘণ্টা বাজানো এবং একই সাথে ডান হাত দিয়ে জল ঢালা চলবে। সেই সঙ্গে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র, চিন্তামণি, গোবিন্দ জয় জয় ইত্যাদি কীর্তন করতে হবে। (শ্রীল প্রভুপাদের চিঠি, তাং ১ মে ১৯৭১)

শুচিতা ও নিয়মবিধি

ভক্ত তাঁর সামর্থ্য অনুসারে নিজ গৃহে শ্রীবিগ্রহ অর্চন সম্পন্ন করতে পারেন। অবশ্য, নির্ধারিত নিয়মবিধি অনুসারে তাঁকে শুচিতার সর্বোচ্চ উৎকর্ষমান বজায় রেখে তা করতে হবে। যদিও প্রকাশ্য মন্দিরে যেমন কঠোরভাবে নিয়মবিধি ও অর্চনাসূচী অনুসরণ করে অর্চন সম্পন্ন করা হয়ে থাকে, গৃহে নিবেদিত অর্চনের ক্ষেত্রে তা আশা করা যায় না, তা হলেও শ্রীবিগ্রহ অর্চন যতই নিয়মবিধি নিয়ন্ত্রিত হয়, ততই তা অর্থবহ, তাৎপর্যপূর্ণ এবং প্রীতিপ্রদ হয়ে ওঠে।

শিশুরা এবং শ্রীবিগ্রহ অর্চনা

যে সব গৃহস্থেরা ঘরে শ্রীবিগ্রহাদির অর্চন করে থাকেন, তাঁদের সন্তানাদিকে শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে বাস্তবসম্মত প্রেমময়ী ভক্তিসেবার পরিবেশের মাধ্যমে

গড়ে তোলার বিরাট সুযোগ তাঁরা পেয়ে যান। দণ্ডবৎ প্রণাম, জপকীর্তন, সংকীর্তন নৃত্য এবং বিভিন্ন সেবা সম্পাদনের মাধ্যমে শ্রীবিগ্রহাদির শরণাগতি লাভের জন্য শিশুদের উদ্বুদ্ধ করা উচিত। তারা নতুন কাপড়-চোপড় বা ঐ ধরনের যা কিছু পায়, তা সবই শ্রীভগবানকে নিবেদন করতে যেন শেখে, সেই বিষয়ে তাদের অনুপ্রাণিত করা যেতে পারে। কোনও শিশু যদি একখানি ছবি আঁকে কিংবা অন্য কোনও শিল্পকাজ সৃষ্টি করে থাকে, তবে সেইগুলি শ্রীবিগ্রহের সামনে দেখানোর জন্যে তাকে মা-বাবা শেখাতে পারেন। এইভাবে শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহরূপের প্রতি শিশু তার স্বাভাবিক আকর্ষণ এবং মঙ্গলময় আসক্তি অর্জন করতে পারে।

শ্রীবিগ্রহাদির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ শিশুদের শেখানো উচিত। শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন—

ছোট শিশুদের হাতে শ্রীজগন্নাথদেব না দেওয়া উচিত, কারণ তারা যথাযথ যত্ন নেবে না এবং তাদের অপরাধ হয়ে যাবে। (শ্রীল প্রভুপাদের চিঠি, তাং ৩০ মার্চ ১৯৬৯)

ন্যূনতম দশ বছর বয়স হলেই শ্রীবিগ্রহ অর্চনা শেখা যেতে পারে। তার আগে তারা সাহায্য সহযোগিতা করতে পারে। কিভাবে দণ্ডবৎ প্রণাম করতে হয়, কিভাবে নৃত্য ও সংকীর্তন করতে হয়, কিভাবে মালা গাঁথতে হয়, আরাত্রিকের বাসনপত্র মাজতে হয়, ইত্যাদি তারা শিখে নিতে পারে।...এইগুলিও শ্রীবিগ্রহ আরাধনার বিভিন্ন অংশ বিশেষ। (শ্রীল প্রভুপাদের চিঠি, তাং ১মে ১৯৭১)

যে সমস্ত কনিষ্ঠ ভক্ত যথাযথভাবে প্রশিক্ষণ লাভ করেছে এবং আগ্রহান্বিত, তারা বেশ ভাল পূজারী হয়ে উঠতে পারে, যেহেতু অতি শৈশবাবস্থা থেকে শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহাদির সাথে নিয়মিত সান্নিধ্যলাভের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তারা আসক্তি অর্জন করেছে।

প্রচার-পর্যটন এবং শ্রীবিগ্রহ আরাধনা

যে ভক্ত তাঁর গৃহে শ্রীবিগ্রহ আরাধনার দায়গ্রহণ করেন, তাঁকে একটি শিশু প্রতিপালনেরই মতো একই ধরনের দায়িত্বসূচী মেনে চলতে হয়। যদিও নিয়মিত সেবা সম্পাদনে বিঘ্নাদি সৃষ্টি হতে পারে, তা সত্ত্বেও নিজের সন্তানাদির জন্য যে সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা উচিত বলে কর্তব্যবোধ হয়, ঠিক তেমনই মনোভাব নিয়েই শ্রীবিগ্রহের সেবা সম্পাদন সংক্রান্ত কর্তব্যকর্ম নিষ্ঠাভরে প্রতিপালন করে যেতে হবে। যদি কোন গৃহস্থ-ভক্ত ঘরে শ্রীবিগ্রহ

সেবার আয়োজন করার পরে তাঁকে কখনও প্রচার পরিক্রমায় বা পর্যটনে বার হতে হয়, তবে শ্রীবিগ্রহ আরাধনা যাতে চলতে থাকে, তার জন্য তাঁকে অবশ্যই ব্যবস্থা করে যেতে হয় কিংবা শ্রীবিগ্রহাদি সঙ্গে নিয়ে যেতে হয় বা বাড়িতে অথবা অন্যত্র কোথাও যথাযথ সেবা সম্পাদনের জন্য কারও কাছে রেখে যেতে হয়। তাঁর অনুপস্থিতিকালে শ্রীবিগ্রহাদি অর্চন করতে পারে, পরিবারবর্গের মধ্যে তেমন কোনও ব্যক্তি না থাকলে, অন্য একজন যোগ্য ব্যক্তিকে দিয়ে তিনি তা সম্পন্ন করানোর ব্যবস্থা করতে পারেন, তবে সাধারণত গৃহস্থ নিজে কিংবা তাঁর পরিবারবর্গেরই কোনও একজনের পক্ষে অর্চন করা উচিত। যে প্রকাশ্য মন্দিরের সাথে গৃহস্থ ভক্ত সংশ্লিষ্ট আছেন, তাঁর নিজের গৃহের শ্রীবিগ্রহাদির অর্চনের সেবা চালিয়ে যাওয়ার জন্য সেই মন্দির থেকে সাহায্য সহযোগিতা আশা করা তাঁর উচিত হবে না। তা ছাড়া, তিনি যদি শ্রীবিগ্রহাদি সঙ্গে নিয়ে পরিভ্রমণ করতে বেরোন এবং কোনও মন্দিরে অবস্থান করেন, তবে তাঁকে যত্নবান হতে হবে যেন তাঁর অর্চনা-আরাধনার ফলে সেখানকার অধিবাসী ভক্তদের অসুবিধার সৃষ্টি না হয়।

গৃহে শ্রীবিগ্রহ-অর্চনের বিশদ পদ্ধতি

শ্রীশ্রীগৌর-নিতাই বিগ্রহের অর্চনের দৃষ্টান্ত দিয়ে এই অধ্যায়ে গৃহে শ্রীবিগ্রহাদি অর্চনের বিশদ পদ্ধতি বিবৃত হচ্ছে। সামান্য কিছু সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমে, এই একই পদ্ধতি অন্যান্য শ্রীবিগ্রহাদির সেবা অর্চনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে, কিংবা আলেখ্য মাধ্যমে শ্রীপঞ্চতত্ত্ব অর্চন করাও চলবে। এখানে বিস্তারিত বর্ণনা না থাকলেও প্রয়োজনীয় পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্রীবিগ্রহাদির জাগরণ

১) স্নান করানো, পোশাক পরানো, তিলক চর্চা, এবং আচমন সমাপনের পরে শ্রীগুরুদেবের উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করতে হয়।

২) একটি ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে, "জয় শ্রীশ্রীগৌর-নিতাই" জয়ধ্বনি দিতে হয় এবং বেদির আলোগুলি জ্বালিয়ে দিতে হয়।

৩) ঘণ্টা বাজিয়ে শ্রীগুরুদেবের আলেখ্যে তাঁর চরণ স্পর্শ করতে হয় এবং তাঁকে শয্যা ত্যাগ করে উঠতে অনুরোধ জানাতে হয়, তার পরে গৌর-নিতাই এর চরণ স্পর্শ করে তাঁদেরও শয্যাত্যাগের আবেদন জানাতে হয়। (যদি শ্রীবিগ্রহাদিকে শয্যায় শায়িত না করা হয়ে থাকে, মানসভাবে চিন্তা করা উচিত যে, তাঁরা শয্যায় বিশ্রাম গ্রহণ করেছেন এবং এখন তাঁরা তা থেকে গাত্রোত্থান করছেন।)

৪) শ্রীভগবানের আচমনের জন্য তাঁদের উদ্দেশ্যে জল নিবেদন করতে হয় অথবা নিবেদনের ধ্যান করতে হয়। সম্ভব হলে, এই সময়ে মিষ্টান্ন নিবেদন করা চলে।

ভোগ নিবেদন

১) শ্রীভগবানের ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত একটি থালিতে সুন্দরভাবে ভোগ সাজাতে হয়। আচমন সম্পন্ন করে শ্রীগুরুদেবকে প্রণতি নিবেদন করতে হয়। শ্রীবিগ্রহের সামনে বেদিতে কিংবা একটি টেবিলে ভোগ নৈবেদ্য উপস্থাপন করতে হয়। সংগোপনে শ্রীভগবানের আহারের ব্যবস্থা করে দিতে হয়—বেদির সামনে একটি পর্দা ঘিরে দেওয়া দরকার।

২) ডান হাত দিয়ে পঞ্চপাত্র থেকে জল নিয়ে মহামন্ত্র জপ করতে করতে সেই জল হালকাভাবে ভোগনৈবেদ্যের উপরে ছিটিয়ে দিয়ে শুদ্ধ করে নিতে হবে।

৩) পূজাবেদীর সামনে আসনে বসে এবং একটি ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে গুরুদেবের উদ্দেশ্যে প্রণাম মন্ত্রটি তিনবার উচ্চারণ করে শ্রীভগবানের সেবায় তাঁকে সহায়তার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করতে হয়।

নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে [গুরুদেবের নাম] *ইতি নামিনে॥*

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অতীব প্রিয়জন, বিষ্ণুপাদাশ্রিত আমার গুরুদেব (গুরুদেবের নাম)-এর উদ্দেশ্যে আমার ভক্তিপ্রণত দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করছি।

শ্রীচৈতন্যদেবের উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত প্রার্থনাটি তিনবার উচ্চারণ করে তাঁর কৃপা ভিক্ষা করতে হয়।

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায়তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

হে মহাবদান্য অবতার! আপনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। আপনি শ্রীমতী রাধারাণীর গৌরবর্ণ ধারণ করেছেন, এবং ব্যাপকভাবে শুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম বিতরণ করছেন। আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করি। (*শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা* ১৯/৫৩)

নিম্নোক্ত মন্ত্রটি তিনবার উচ্চারণ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে হবে—

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

সুযোগ্য দেবতুল্য ব্রাহ্মণগণের দ্বারা নিত্য পূজিত এবং তাঁদের অতীব প্রিয়জন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে আমি পুনঃ পুনঃ আমার ভক্তিপ্রণত দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করি। তিনি গো-সম্পদ, ব্রাহ্মণকুল, এবং সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতি নিত্য মঙ্গলময়, এবং তিনি গাভীকুল, ভূমিসম্পদ ও ইন্দ্রিয়াদির প্রীতিবিধান করেন।

(*বিষ্ণুপুরাণ*)

৪) দশ মিনিট ঘর ছেড়ে বাইরে যেতে হবে যাতে শ্রীভগবান এবং তাঁর পার্ষদবর্গ (গুরুদেব ও পূর্বতন মহাজনবর্গ সহ) ভোগ আস্বাদন করতে পারেন। এই সময়ে গুরুদেবের প্রীত্যর্থে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করা উচিত এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রীত্যর্থে গুরুপ্রদত্ত মন্ত্রাবলীর তৃতীয় ও পঞ্চম মন্ত্রগুলি জপ করা কর্তব্য, তার পরে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র এবং অন্যান্য বৈষ্ণব ভজন কীর্তন উচ্চারণ করা যেতে পারে।

৫) আবার ঘরে ঢুকে তিনবার হাতে তালি দিতে হয়। শ্রীভগবান এবং তাঁর পার্ষদবর্গের পরিপূর্ণ তৃপ্তিবিধানে ভোগ নিবেদিত হল, এই বিনম্র প্রার্থনা সহকারে ভোগ নৈবেদ্য পাত্রগুলি সরিয়ে নিতে হবে।

যদিও গৃহে শ্রীবিগ্রহ উপাসনার ক্ষেত্রে সর্বদা সঠিক সময়ে ভোগ নিবেদনের নিয়মানুবর্তিতা আশা করা চলে না, তা হলেও যথাসম্ভব সময়ানুবর্তিতা অবলম্বন করতে চেষ্টা করা উচিত। যখনই যা কিছু খাদ্যসামগ্রী নিজের জন্য কিংবা অন্য কারও জন্য তৈরি হবে, তখনই তা অবশ্যই শ্রীবিগ্রহাদির প্রীতিবিধানে নিবেদন করা চাই, ফলে নিবেদনের সংখ্যা কম বেশি হতেও পারে, যাই হোক, দিনের মধ্যে কয়েকটি নির্দিষ্ট ভোগ নিবেদনের সময় অবশ্যই নির্ধারিত থাকবে (যেমন, প্রাতরাশ মধ্যাহ্নভোজ এবং নৈশভোজ) যার সাথে পরিবারবর্গের রান্নাবান্নার কার্যসূচিরও সামঞ্জস্য করে নিতে হবে।

দৈনিক সেবা

দিনে অন্তত একবার গৃহস্থের ঘরে শ্রীবিগ্রহাদির অর্চন করা উচিত আরতি ও কীর্তন সহকারে—দুবার করতে পারলেই ভাল হয়,—সকালে ও সন্ধ্যায়। সম্ভব হলে মধ্যাহ্ন ভোগ নিবেদনের পরে ধূপ আরতি করাও উচিত।

সকালের পূজা (স্নান ও বস্ত্রসজ্জা)

শ্রীভগবানের পূজা নিবেদনের সহজতম পদ্ধতি হচ্ছে পঞ্চপাত্র থেকে এক কুশী জল নিয়ে মানস পূজার ভঙ্গিতে শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে প্রত্যেকটি উপচার

একে একে নিবেদন করা এবং তার পরে সেই জলটুকু একটি বর্জনীয় পাত্রে ফেলে দেওয়া যেতে পারে। মন্ত্রোচারণ ছাড়াও এইভাবে পূজা নিবেদন করা চলে। শ্রীভগবানকে নিবেদন করে মানসভাবে প্রার্থনা জানাতে হবে যেন শ্রীভগবান সেইগুলি কৃপা করে গ্রহণ করেন। সকালে এইভাবে পূজা নিবেদন করা চলে।

যদি প্রতিদিন শ্রীবিগ্রহের স্নান সম্পন্ন করা সম্ভব না হয়, তবে অন্তত দু'সপ্তাহে একবার (যেমন, একাদশী তিথিতে) স্নান করানো উচিত। শ্রীবিগ্রহাদি যদি ধাতুনির্মিত হয়, তা হলে পালিশ করা উচিত। স্নান বা পালিশের সময়ে তাঁদের প্রীতিবিধানের উদ্দেশ্যে আরাধনা নিবেদন করা যায়। তখন পত্রপুষ্পাদি নিবেদন করা উচিত।

শ্রীশ্রীগৌর-নিতাই আরাধনার আয়োজন এইভাবে করতে হয়—

১) পূজার সমস্ত উপকরণাদি সংগ্রহ করে পরিচ্ছন্নভাবে সাজিয়ে রাখতে হবে, যাতে পূজার সময়ে বিঘ্ন না ঘটে।

২) আসনে বসে আচমন করে নিতে হবে, তারপর নিজ অঙ্গে কিছু জলসিঞ্চন করতে হবে, উপকরণাদি এবং পূজার বেদিতে জল সিঞ্চন করে পবিত্র করে নিতে হবে এবং হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে হবে।

৩) তারপর নিজ গুরুদেবের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদনের সঙ্গে বাঁহাতে ঘণ্টা বাজিয়ে, ডানহাত দিয়ে পুষ্পাদি নিয়ে চন্দনে স্পর্শ করে তা শ্রীগুরুদেবের চরণে অর্পণ করতে হয়। এইভাবে শ্রীগুরুদেবকে স্মরণ করে তাঁর আশীর্বাদ ভিক্ষা করে শ্রীশ্রীগৌরনিতাই আরাধনার প্রস্তুতি নিতে হয়। অতঃপর নীরবে শ্রীগুরুদেব প্রদত্ত গায়ত্রী মন্ত্র জপ করা উচিত।

৪) শ্রীশ্রীগৌর-নিতাই আরাধনার পদ্ধতি এইরকম—

- হাতের মুদ্রার সাহায্যে শ্রীশ্রীগৌর-নিতাইকে আমন্ত্রণ জানাতে হবে স্নানের জন্য, তারপর তাঁদের পোশাকাদি বদল করে দিতে হবে, পরে ভিজা বস্ত্র দিয়ে তাঁদের অঙ্গ পরিষ্কার করে দিয়ে শুকনো গামছা দিয়ে মুছিয়ে দিতে হবে। ধাতুনির্মিত শ্রীবিগ্রহ হলে পালিশ করতে হবে—গোপীচন্দনে সামান্য পাতিলেবুর রস মিশিয়ে। শ্রীবিগ্রহের চোখ এবং রঙিন অংশগুলি বাদ দিয়ে পালিশ করা চাই। পরে একটি পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড দিয়ে পালিশ মুছে নিতে হবে।
- বাঁহাতে ঘণ্টা বাজিয়ে ডানহাতে একটি শঙ্খের সাহায্যে শ্রীবিগ্রহাদির উপরে জল ঢালতে হবে। তিনবার এইভাবে শঙ্খের সাহায্যে স্নান করাতে হবে। স্নানের সময়ে *ব্রহ্মসংহিতার* প্রার্থনা গাইতে হয়—

চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্ ।
লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষে আবৃত চিন্তামণিকর-গঠিত গৃহসমূহে সুরভী অর্থাৎ কামধেনুগণকে যিনি পালন করছেন এবং শতসহস্র লক্ষ্মীগণ কর্তৃক সাদরে পরিসেবিত হচ্ছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

বেণুং ক্বণন্তমরবিন্দদলায়তাক্ষং
বর্হাবতংসমসিতাম্বুদসুন্দরাঙ্গম্।
কন্দর্পকোটিকমনীয়বিশেষশোভং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

মুরলীগান-তৎপর, কমলদলের মতো প্রফুল্লচক্ষু, ময়ূরপুচ্ছ শিরোভূষণ, নীলমেঘবর্ণ সুন্দর-শরীর কোটি-কন্দর্পমোহন বিশেষ শোভা বিশিষ্ট সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

● তোয়ালে দিয়ে শ্রীবিগ্রহাদির অঙ্গ মুছে দিতে হবে এবং তাঁদের বস্ত্রসজ্জা, অলঙ্কার সজ্জা ও পুষ্পমাল্য শোভিত করতে হবে।

● ঘণ্টা বাজিয়ে পুষ্প ও তুলসী-চন্দন শ্রীবিগ্রহাদির শ্রীচরণে নিবেদন করতে হবে। তারপর ধূপ এবং ঘৃত প্রদীপ কিংবা কর্পূরের দীপ নিবেদন করা উচিত।

● ঘণ্টা বাজিয়ে ভোগ নিবেদনের মন্ত্রাদি উচ্চারণ করে, কিছু ফল, মিষ্টান্ন এবং পানীয় জল অর্পণ করতে হয়।

● দণ্ডবৎ প্রণাম করে, পূজায় সমস্ত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়।

● সবশেষে, সব কিছু পরিষ্কার করে নিতে হয়। এই সময় ধূপ, পুষ্প ও চামর ব্যজন সহকারে অল্পক্ষণ দর্শন আরতি সম্পন্ন করা যেতে পারে এবং '*গোবিন্দমাদিপুরুষম্*' টেপ বাজানো চলে।

দিনমানে সেবার সূচী

সারাদিনে যথারীতি সকালে, দুপুরে এবং সন্ধ্যায় ভোগ নিবেদন করা যেতে পারে। পরে শ্রীবিগ্রহাদির শয়ন করাতে হয়, অন্তত মানস প্রক্রিয়াতেও, সকলের দৃষ্টির অন্তরালে। (যদি থাকবার ঘরের মধ্যেই শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে, তা হলে তাঁদের শয়নকালে পর্দার অন্তরালে তাঁদের রাখা উচিত। পর্দা খোলা থাকলে তাঁদের দর্শনমাত্রই যথাযোগ্য শ্রদ্ধা প্রদর্শনের অভ্যাস থাকা চাই।)

রাত্রে শ্রীবিগ্রহাদির শয়ন পদ্ধতি

১) প্রথমে শ্রীগুরুদেবের উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণাম জানিয়ে আচমন করে নিতে হয়।

২) শ্রীবিগ্রহাদির পোশাক পরিবর্তন করে রাত্রিবাস পরিধান করাতে হয়, কিংবা অন্তত তাঁদের অঙ্গ থেকে অলঙ্কারাদি এবং পুষ্পমাল্যাদি সরিয়ে নিতে হয়।

৩) শ্রীবিগ্রহাদির শয্যাগুলি পরিপাটি করে দিয়ে করজোড়ে তাঁদের শয়নের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে হয়। শয্যায় তাঁদের শয়ন দিয়ে, মানসভাবে তাঁদের পাদসেবার চিন্তা করতে হয়।

৪) অবশেষে, দণ্ডবৎ প্রণাম জানিয়ে আলো নিভিয়ে দিয়ে আসতে হয়।

মন্দিরে সাধারণ পূজার পদ্ধতি

অল্প কিছু সংস্কৃত মন্ত্রাদি উচ্চারণের সাহায্যে, চৌষট্টি উপচারের যথাযথ তালিকা অনুসারে পঞ্চরাত্রিক বিধিনিয়মানুযায়ী নৈবেদ্য উপকরণাদি অর্পণের নীতিগুলি সাধারণ পূজার পদ্ধতি রূপে নিচে বর্ণনা করা হচ্ছে। নামহট্ট সংঘগুলিতে এবং গৃহস্থ বাড়িতে ভক্তদের দ্বারা শ্রীবিগ্রহাদি পূজার ক্ষেত্রে বা মন্দিরগুলিতেও এই পদ্ধতি সামান্য কিছু সুযোগ-সুবিধার সাহায্যেই অনুসরণ করা সম্ভব।

প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত শৌচ ও স্নানাদি সম্পর্কিত নিয়মগুলির প্রত্যেকটি অনুসরণ করা আবশ্যক। তা ছাড়া, পূজা-অর্চনার স্থান শুদ্ধিকরণের উপচারগুলিও মেনে চলা দরকার। সেই সঙ্গে ভোগ রন্ধনশালার নিয়মবিধিগুলিও কঠোরভাবে মানতে হবে এবং সময় মতো সব কিছু প্রতিপালনের নীতি অনুসরণ করতে হবে। পূজা-অর্চনার সুযোগ-সুবিধাগুলি খুব সামান্য হলেও, কঠোর নিয়মানুবর্তী হয়ে সব কিছু মেনে চললে অতি সহজেই গৃহে অথবা মন্দিরে অপ্রাকৃত দিব্য পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে।

নিচে বর্ণিত 'প্রয়োগ' বিধি (পরম্পরা অনুযায়ী অনুষ্ঠান পদ্ধতি) অনুসারে শ্রীগুরুদেব ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রাথমিক অর্চনায় পঞ্চ উপচার নিবেদন, এবং শ্রীজগন্নাথদেবের পূর্ণাঙ্গ অর্চনায় ষোড়শ উপচার নিবেদনের রীতি আয়ত্ত করা সম্ভব হবে। যদি শ্রীশ্রীগৌর-নিতাই বিগ্রহাদির পূজা করতে হয়, তা হলে পঞ্চ উপচারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রাথমিক অর্চন বাদ দিলেও চলবে, যথাযথ সামঞ্জস্য রক্ষা করে, (যেমন—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর উদ্দেশ্যে উপযুক্ত প্রার্থনা নিবেদনের মাধ্যমে) শ্রীজগন্নাথদেবের পূজা পদ্ধতি অনুসরণ করে শ্রীশ্রীগৌর-নিতাই তথা অন্যান্য বিগ্রহাদির অর্চন সম্পন্ন করা যেতে পারে।

এই পদ্ধতি অনুসরণ করলে যৎসামান্য সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণের প্রয়োজন হয়। পছন্দ হলে সহজ সরল পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে সংস্কৃত মন্ত্রাবলী উচ্চারণ করা যেতেও পারে।

পাথরের কিংবা কাঠের বা অন্যান্য ভঙ্গুর পদার্থের তৈরি শ্রীবিগ্রহাদি সরাসরি স্নান করানোর দরকার নেই। বরং বিগ্রহাদির সামনে স্নান পাত্রে শঙ্খের সাহায্যে স্নানের জল ঢালা যেতে পারে।

পিতলের শ্রীবিগ্রহাদি প্রতিদিন স্নানের আগে পালিশ করবারও দরকার নেই। তবে নিয়মিতভাবে পরিষ্কার করা দরকার—দু'সপ্তাহ অন্তর একবার, হয়ত একাদশী তিথিতে।

জাগরণ সেবা (প্রাতঃকালীন)

মন্দিরে প্রবেশ :

প্রয়োজনীয় উপকরণাদি

- নিচের উপকরণগুলি তখন থাকা চাই—
  ১) একটি থালায় একটি ছোট ঘণ্টা
  ২) বিশুদ্ধ জল ও কুশীসমেত পঞ্চপাত্র
  ৩) দীপদানির জন্য একটি অগ্নিশিখা
  ৪) পূজারীর বসবার জন্য একটি আসন

শ্রীবিগ্রহ-কক্ষে প্রবেশ করবার আগে

সাধারণ আচমন বিধি পালন করা দরকার—

- আসনে বসতে হবে, একটি ছোট কুশী দিয়ে আচমন পাত্র থেকে খানিকটা জল নিয়ে নিজের হাতে এবং পায়ে ছিটিয়ে নিতে হবে।
- *ওঁ কেশবায় নমঃ* মন্ত্র উচ্চারণ করে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ব্রহ্মতীর্থ দিয়ে ঈষৎ জল পান করতে হবে।
- *ওঁ নারায়ণায় নমঃ* মন্ত্র উচ্চারণ, ডান হাতের ব্রহ্মতীর্থ থেকে জল পান করতে হয়।
- *ওঁ মাধবায় নমঃ* মন্ত্র উচ্চারণ, ডান হাতের ব্রহ্মতীর্থ থেকে জল পান। হাতে ঠোঁট স্পর্শ করেছে, তাই আচমন পাত্র থেকে কয়েক ফোটা জল দিয়ে ডান হাতটি ধুতে হবে এবং জলটি পাশে ফেলে দিতে হবে।
- শ্রীগুরুদেবের প্রণাম মন্ত্র উচ্চারণ করে বিগ্রহ-কক্ষের বাইরে থেকে তাঁকে প্রণিপাত জানাতে হবে এবং ভগবানের পূজা অর্চনা সমাধার জন্য তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করা চাই।

নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে [গুরুদেবের নাম] *ইতি নামিনে॥*

অর্থাৎ, "ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রেষ্ঠ আমার গুরুদেব [নাম]-এর উদ্দেশ্যে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাই এবং তাঁর শ্রীচরণকমলে শরণাগত হই।"

বিগ্রহ-কক্ষে প্রবেশ

● শ্রীবিগ্রহ-কক্ষে প্রবেশের আগে, একটি শব্দ করে কিংবা হাতে তালি দিয়ে বা ঘণ্টা বাজিয়ে বা বিগ্রহ-কক্ষের দরজায় টোকা দিয়ে শ্রীভগবানের মনোযোগ আকর্ষণ করতে হয়। দরজা খুলে, আলো জ্বালিয়ে উৎসবের আনন্দে শ্রীবিগ্রহাদির নামাদি উচ্চারণ করা দরকার —

জয় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ,
জগন্নাথ-বলদেব-সুভদ্রা
(রাধা-কৃষ্ণের নাম) কী জয়!

● তারপর ডান পা আগে এগিয়ে শ্রীবিগ্রহ-কক্ষে প্রবেশ করতে হয়, আলো জ্বালাতে হয়, এবং দীপগুলি জ্বালাতে হয়। তারপর পঞ্চপাত্র থেকে কিছুটা জল নিয়ে হাত ধুয়ে নিতে হয়।

শ্রীগুরুদেব ও শ্রীবিগ্রহাদির জাগরণ

● বাঁ হাতে একটি ছোট ঘণ্টা বাজিয়ে শ্রীগুরুদেবের শয্যাপার্শ্বে গিয়ে নম্রভাবে তাঁর পাদস্পর্শ করে তাঁকে শয্যা ত্যাগের প্রার্থনা জানাতে হবে।

হে করুণাময় শ্রীগুরুদেব, আপনি কৃপা করে শয্যাত্যাগ করুন।

● সেইভাবে, শ্রীশ্রীগৌর-নিতাইয়ের শয্যাপার্শ্বে যেতে হবে। তাঁদের শ্রীচরণ স্পর্শ করে তাঁদের শয্যা ত্যাগের প্রার্থনা জানাতে হবে —

হে শ্রীগৌরাঙ্গদেব! কৃপা করে শয্যা ত্যাগ করুন এবং আপনার শুভ দর্শন দিয়ে ত্রিজগতের কল্যাণ করুন।

হে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, জাহ্নবাপতি, কৃপা করে আপনার দিব্য নিদ্রা থেকে উত্থান করে আশীর্বাদ করুন। নামহট্টে আপনার দিব্য নাম বিতরণ করুন, শুদ্ধ ভক্তিমূল্য মাত্র আহ্বান করুন।

● পরে শ্রীজগন্নাথদেব, শ্রীবলরাম ও শ্রীমতী সুভদ্রাদেবীর সমীপে গিয়ে তাঁদের চরণকমল স্পর্শ করে তাঁদের গাত্রোত্থানের নিবেদন জানাতে হয় —

হে শ্রীজগন্নাথদেব এবং শ্রীবলদেব, কৃপা করে নিদ্রাভঙ্গ করে গাত্রোত্থান করুন। হে শ্রীমতী সুভদ্রাদেবী, জগজ্জননী, কৃপা করে উত্থান করুন এবং আমাদের কৃপাশীর্বাদ বর্ষণ করুন।

● তারপরে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের শয্যার কাছে যেতে হবে এবং তাঁদের চরণপদ্ম স্পর্শ করে তাঁদের গাত্রোত্থানের নিবেদন জানাতে হবে।

হে ভগবান, দেবকীনন্দন, জগৎপতি, কৃপা করে নিদ্রা ত্যাগ করে উত্থান করুন—সকাল হয়েছে।

হে জগৎপতি, হে যশোদা-গোকুলানন্দ, গোপাল মনোহারী, শ্রীরাধিকা সহ কৃপা করে গাত্রোত্থান করুন—সকাল হয়েছে।

অন্যান্য বিষ্ণু-বিগ্রহাদিকেও গাত্রোত্থানের জন্য এইভাবে প্রার্থনা জানানো যেতে পারে—

হে গোবিন্দ, হে পরমেশ্বর, হে লক্ষ্মীপতি, কৃপা করে উত্থান করুন এবং ত্রিভুবনে করুণাধারা বর্ষণ করুন।

অন্যান্য বিগ্রহাদির ক্ষেত্রে, শুধুমাত্র "কৃপা করে উত্থান করুন" বললেই হবে এবং শ্রীবিগ্রহের নাম উচ্চারণ করতে হবে।

● এবার বেদিতে অন্য যে সমস্ত ক্ষুদ্রাকৃতি শ্রীবিগ্রহাদি শায়িত আছেন, সেই দিকে মনোযোগী হওয়া চলে। যদি কেবলমাত্র বৃহদাকার শ্রীবিগ্রহাদিই থাকে, তা হলে তাঁদের গাত্রোত্থানের জন্য মানসিকভাবে নিবেদন জানাতে হয় এবং তাঁদের শয্যা থেকে বেদিতে সেইভাবে স্থানান্তর করাতে হয়। এই সময়ে শ্রীভগবানের মুকুট, উষ্ণীষ, চাদর বা ওড়না ইত্যাদি রাত্রিবাস বদলে দিতে হয়।

● গতদিনের কোনও ফুল মালা* সরিয়ে নিতে হয়, বিগ্রহ কক্ষটিকে পরিষ্কার করে পূজারী নিজের হাত ধুয়ে ফেলবেন।

ভোগ অর্পণ

অল্প ভোগ নিবেদনের ক্ষেত্রে সরলভাবে ভোগ অর্পণ বিধি মেনে চলা যায়, যেমন মঙ্গল আরতির আগে এবং বিকালে ফল নৈবেদ্য অর্পণের ক্ষেত্রে, আর প্রাতরাশ এবং মধ্যাহ্নভোজের মতো প্রধান ভোগ নিবেদনের ক্ষেত্রে আরও বিশদভাবে ভোগ অর্পণ বিধিগুলি মেনে চলতে হয়। তা না হলে, সারাদিনের মধ্যে সমস্ত ভোগ অর্পণের ক্ষেত্রেই নিচের পদ্ধতিমতো নিবেদন করা চলে।

প্রয়োজনীয় উপকরণাদি

নিচের জিনিসগুলি থাকা চাই—

১) একটি থালায় একটি ছোট হাতঘণ্টা

২) শুদ্ধ জল ও চামচ সহ পঞ্চপাত্র

৩) জলভর্তি কোশাকুশি (ঢাকা দেওয়া)

---

* গত সন্ধ্যায় নিবেদিত পুষ্পমাল্য এবং তুলসীপত্রাদি শ্রীবিগ্রহের দেহে পরদিনের মঙ্গল আরতির সময়েও থাকতে পারে।

বিগ্রহ-কক্ষে প্রবেশ

● শ্রীবিগ্রহ-কক্ষে প্রবেশের আগে, একটি শব্দ করে কিংবা হাতে তালি দিয়ে বা ঘণ্টা বাজিয়ে বা বিগ্রহ-কক্ষের দরজায় টোকা দিয়ে শ্রীভগবানের মনোযোগ আকর্ষণ করতে হয়। দরজা খুলে, আলো জ্বালিয়ে উৎসবের আনন্দে শ্রীবিগ্রহাদির নামাদি উচ্চারণ করা দরকার—

জয় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ,
জগন্নাথ-বলদেব-সুভদ্রা
(রাধা-কৃষ্ণের নাম) কী জয়!

● তারপর ডান পা আগে এগিয়ে শ্রীবিগ্রহ-কক্ষে প্রবেশ করতে হয়, আলো জ্বালাতে হয়, এবং দীপগুলি জ্বালাতে হয়। তারপর পঞ্চপাত্র থেকে কিছুটা জল নিয়ে হাত ধুয়ে নিতে হয়।

শ্রীগুরুদেব ও শ্রীবিগ্রহাদির জাগরণ

● বাঁ হাতে একটি ছোট ঘণ্টা বাজিয়ে শ্রীগুরুদেবের শয্যাপার্শ্বে গিয়ে নম্রভাবে তাঁর পাদস্পর্শ করে তাঁকে শয্যা ত্যাগের প্রার্থনা জানাতে হবে।

হে করুণাময় শ্রীগুরুদেব, আপনি কৃপা করে শয্যাত্যাগ করুন।

● সেইভাবে, শ্রীশ্রীগৌর-নিতাইয়ের শয্যাপার্শ্বে যেতে হবে। তাঁদের শ্রীচরণ স্পর্শ করে তাঁদের শয্যা ত্যাগের প্রার্থনা জানাতে হবে—

হে শ্রীগৌরাঙ্গদেব! কৃপা করে শয্যা ত্যাগ করুন এবং আপনার শুভ দর্শন দিয়ে ত্রিজগতের কল্যাণ করুন।

হে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, জাহ্নবাপতি, কৃপা করে আপনার দিব্য নিদ্রা থেকে উত্থান করে আশীর্বাদ করুন। নামহট্টে আপনার দিব্য নাম বিতরণ করুন, শুদ্ধ ভক্তিমূল্য মাত্র আহ্বান করুন।

● পরে শ্রীজগন্নাথদেব, শ্রীবলরাম ও শ্রীমতী সুভদ্রাদেবীর সমীপে গিয়ে তাঁদের চরণকমল স্পর্শ করে তাঁদের গাত্রোত্থানের নিবেদন জানাতে হয়—

হে শ্রীজগন্নাথদেব এবং শ্রীবলদেব, কৃপা করে নিদ্রাভঙ্গ করে গাত্রোত্থান করুন। হে শ্রীমতী সুভদ্রাদেবী, জগজ্জননী, কৃপা করে উত্থান করুন এবং আমাদের কৃপাশীর্বাদ বর্ষণ করুন।

● তারপরে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের শয্যার কাছে যেতে হবে এবং তাঁদের চরণপদ্ম স্পর্শ করে তাঁদের গাত্রোত্থানের নিবেদন জানাতে হবে।

হে ভগবান, দেবকীনন্দন, জগৎপতি, কৃপা করে নিদ্রা ত্যাগ করে উত্থান করুন—সকাল হয়েছে।

হে জগৎপতি, হে যশোদা-গোকুলানন্দ, গোপাল মনোহারী, শ্রীরাধিকা সহ কৃপা করে গাত্রোত্থান করুন—সকাল হয়েছে।

অন্যান্য বিষ্ণু-বিগ্রহাদিকেও গাত্রোত্থানের জন্য এইভাবে প্রার্থনা জানানো যেতে পারে—

হে গোবিন্দ, হে পরমেশ্বর, হে লক্ষ্মীপতি, কৃপা করে উত্থান করুন এবং ত্রিভুবনে করুণাধারা বর্ষণ করুন।

অন্যান্য বিগ্রহাদির ক্ষেত্রে, শুধুমাত্র "কৃপা করে উত্থান করুন" বললেই হবে এবং শ্রীবিগ্রহের নাম উচ্চারণ করতে হবে।

- এবার বেদিতে অন্য যে সমস্ত ক্ষুদ্রাকৃতি শ্রীবিগ্রহাদি শায়িত আছেন, সেই দিকে মনোযোগী হওয়া চলে। যদি কেবলমাত্র বৃহদাকার শ্রীবিগ্রহাদিই থাকে, তা হলে তাঁদের গাত্রোত্থানের জন্য মানসিকভাবে নিবেদন জানাতে হয় এবং তাঁদের শয্যা থেকে বেদিতে সেইভাবে স্থানান্তর করাতে হয়। এই সময়ে শ্রীভগবানের মুকুট, উষ্ণীষ, চাদর বা ওড়না ইত্যাদি রাত্রিবাস বদলে দিতে হয়।
- গতদিনের কোনও ফুল মালা* সরিয়ে নিতে হয়, বিগ্রহ কক্ষটিকে পরিষ্কার করে পূজারী নিজের হাত ধুয়ে ফেলবেন।

ভোগ অর্পণ

অল্প ভোগ নিবেদনের ক্ষেত্রে সরলভাবে ভোগ অর্পণ বিধি মেনে চলা যায়, যেমন মঙ্গল আরতির আগে এবং বিকালে ফল নৈবেদ্য অর্পণের ক্ষেত্রে, আর প্রাতরাশ এবং মধ্যাহ্নভোজের মতো প্রধান ভোগ নিবেদনের ক্ষেত্রে আরও বিশদভাবে ভোগ অর্পণ বিধিগুলি মেনে চলতে হয়। তা না হলে, সারাদিনের মধ্যে সমস্ত ভোগ অর্পণের ক্ষেত্রেই নিচের পদ্ধতিমতো নিবেদন করা চলে।

প্রয়োজনীয় উপকরণাদি

নিচের জিনিসগুলি থাকা চাই—

১) একটি থালায় একটি ছোট হাতঘণ্টা

২) শুদ্ধ জল ও চামচ সহ পঞ্চপাত্র

৩) জলভর্তি কোশাকুশি (ঢাকা দেওয়া)

---

* গত সন্ধ্যায় নিবেদিত পুষ্পমাল্য এবং তুলসীপত্রাদি শ্রীবিগ্রহের দেহে পরদিনের মঙ্গল আরতির সময়েও থাকতে পারে।

৪) বিসর্জনীয় পাত্র (ফেলে দেওয়া জলের জন্য)
৫) ফুলের পাপড়ি (সম্ভব হলে)
৬) ভোগপাত্রের জন্য কিছু ব্যবস্থা—একটি ছোট চৌকি হলে ভাল
৭) শ্রীগুরুদেব এবং শ্রীবিগ্রহাদির জন্য আসন
৮) ভোগ নিবেদন
৯) পিলসুজের প্রদীপ জ্বালানোর জন্য বাতি
১০) পূজারীর জন্য আসন।

প্রারম্ভিক কাজ

● শ্রীবিগ্রহ কক্ষের বাইরে আচমন সেরে শ্রীগুরুদেব এবং শ্রীবিগ্রহাদির উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণাম সহ মন্ত্রোচ্চারণ।

● হাতে তালি বাজিয়ে, বা ঘণ্টাধ্বনি করে, কিংবা দরজায় টোকা দিয়ে শ্রীবিগ্রহাদির মনোযোগ আকর্ষণ করা দরকার। তারপরে শ্রীবিগ্রহ নাম জপ করতে করতে বিগ্রহ কক্ষে প্রবেশ করতে হয়।

● ভোগ নিবেদনের জায়গাটুকু পরিষ্কার করে, নিজের হাত ধুয়ে, খাদ্যসামগ্রী রাখবার জায়গাটি পরিষ্কার করে, টেবিল মুছে রাখতে হয়।

● ঘণ্টা বাজিয়ে, শ্রীগুরুদেবের চরণপ্রান্তে কিছু ফুল দিয়ে শ্রীবিগ্রহ সেবার অনুমতি প্রার্থনা করতে হয়। (প্রয়োজন হলে, ফুলের পরিবর্তে পঞ্চপাত্র থেকে জল অর্পণ করা চলে—চামচে জল নিয়ে শ্রীগুরুদেবের প্রতিকৃতির উদ্দেশ্যে ধারণ করে তার পরে সেই জল বিসর্জনীয় পাত্রে ফেলে দিতে হয়। তা না হলে শুধুমাত্র মানসভাবে ফুল নিবেদন করাও চলে।)

● শ্রীগুরুদেবের জন্য একটি আসন নিবেদন করা চাই।

ভোগ ও শুদ্ধিকরণ

● ভোগ নিবেদনের পাত্রগুলি এনে টেবিলে বা চৌকিতে রাখতে হয়। ডান হাত দিয়ে কয়েক ফোঁটা জল ছিটিয়ে প্রত্যেকটি পাত্রকে প্রোক্ষণ করতে হয়।

● প্রত্যেক পাত্রে তুলসীপত্র দিতে হয় (শ্রীগুরুদেব, শ্রীমতী সুভদ্রাদেবী এবং শ্রীমতী রাধারাণীকেও তুলসী অর্পণ করতে হয়, কারণ তাঁরাই প্রথমে তাঁদের পাত্রগুলি ভোগ গ্রহণের আগে শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করবেন)। সম্ভব হলে, প্রত্যেকটি খাদ্যসামগ্রীর উপরেও একটি তুলসীপত্র রাখা যায়।

আহার্য গ্রহণের জন্য শ্রীভগবানকে আমন্ত্রণ

● ঘণ্টা বাজিয়ে শ্রীবিগ্রহাদির মর্যাদা অনুসারে একে একে প্রত্যেকের শ্রীচরণে পুষ্প নিবেদন করে মনোযোগ আকর্ষণ করা দরকার এবং তার পরে

ভোগ-নৈবেদ্যের আহার্য সামগ্রী গ্রহণের জন্য তাঁদের প্রার্থনা জানাতে হয়। (প্রয়োজন হলে পুষ্প নিবেদনের পরিবর্তে পঞ্চপাত্র থেকে জল নিবেদন করা চলে, কিংবা শুধুমাত্র মানসভাবে পুষ্প নিবেদন করলেও হয়।)

আসনের জন্য কোনও মাদুর বা গদি যদি না থাকে, তা হলে শ্রীবিগ্রহাদির উদ্দেশ্যে নিবেদিত ভোগপাত্রগুলির সামনেই কিছু ফুলের পাপড়ি রাখা যায়। শ্রীবিগ্রহাদির মর্যাদাক্রমে এবং হাত দিয়ে তাঁদের নিয়ে আসার ভঙ্গিতে ভোগ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ করতে হয়।

● আসনে বসে বাঁ হাতে ঘণ্টা বাজিয়ে, পঞ্চপাত্র থেকে জল নিয়ে শ্রীগুরুদেব এবং তার পরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু থেকে শুরু করে তাঁর পার্ষদবৃন্দ, অন্যান্য শ্রীবিগ্রহাদি হয়ে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর সহচরদের উদ্দেশ্যে পাদ্য অর্ঘ্য ও আচমন নিবেদন করতে হয়। এই সময়ে বলতে হয়—

হে (শ্রীশ্রীগৌর-নিতাই, রাধাকৃষ্ণ প্রমুখ) কৃপা করে এই পাদ্য অর্ঘ্য গ্রহণ করুন।

হে (শ্রীশ্রীগৌর-নিতাই, রাধাকৃষ্ণ প্রমুখ) কৃপা করে এই আচমন গ্রহণ করুন।

পাদ্য অর্ঘ্য এবং আচমনের জন্য নেওয়া প্রত্যেকবার চামচ ভর্তি জল বিসর্জনীয় পাত্রে ফেলে দিতে হয়।

ভোগ নিবেদন

● ভোগপাত্রগুলির দিকে নির্দেশ করে প্রত্যেক শ্রীবিগ্রহের উদ্দেশ্যে নিবেদিত ভোগ এবং জল গ্রহণের জন্য প্রার্থনা জানিয়ে বলতে হবে—

হে (শ্রীশ্রীগৌর-নিতাই, জগন্নাথ-বলদেব-সুভদ্রা ইত্যাদি) কৃপা করে এই উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী গ্রহণ করুন।

হে (শ্রীশ্রীগৌর-নিতাই, জগন্নাথ-বলদেব-সুভদ্রা ইত্যাদি) কৃপা করে এই জল গ্রহণ করুন।

● ঘণ্টা বাজিয়ে শ্রীগুরুদেবের উদ্দেশ্যে প্রণাম মন্ত্র উচ্চারণ করে শ্রীবিগ্রহাদি সেবার জন্য তাঁর অনুমতি প্রার্থনা করতে হয়—

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে [গুরুদেবের নাম] *ইতি নামিনে ॥*

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়, শ্রীকৃষ্ণচরণাশ্রিত আমার গুরুদেব শ্রীমদ্ (নাম)-এর উদ্দেশ্যে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাই।

● শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে এই প্রার্থনাটি তিনবার জানিয়ে তাঁর কৃপা ভিক্ষা করতে হয়—

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায়তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য নাম্নে গৌরত্বিষে নমো ॥

"হে মহাবদান্য, কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা, কৃষ্ণস্বরূপ, কৃষ্ণচৈতন্য নামক, গৌরাঙ্গ রূপধারী প্রভু, তোমাকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।" (*শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা* ১৯/৫৩)

● ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে নিচের প্রার্থনাটি তিনবার উচ্চারণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে হয়—

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

ব্রাহ্মণদের নিত্যপূজিত এবং অতি প্রিয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে আমি বারংবার প্রণতি নিবেদন করি। তিনি গো, ব্রাহ্মণ এবং সমগ্র জগতের হিতসাধনে নিত্য প্রবৃত্ত এবং তিনি গাভী, ভূমি ও ইন্দ্রিয়াদির প্রীতিবিধান করেন। (*বিষ্ণুপুরাণ*)

● শ্রীবিগ্রহকক্ষ ত্যাগ করে বাইরে এসে গায়ত্রীমন্ত্র জপ করতে হয়। শ্রীগুরুদেব-প্রদত্ত মন্ত্রগুলি সবই এই সময়ে জপ করা চলতে পারে।* শ্রীভগবান আহার গ্রহণ করছেন, সেই বিষয়ে অভিনিবিষ্ট সহকারে চিন্তা করতে হয়। শ্রীভগবানের আহার গ্রহণের সময়ে, নিজের পছন্দমতো বিভিন্ন শ্লোক আবৃত্তি করা চলতে পারে কিংবা (বিশেষত প্রাতঃরাশ অথবা মধ্যাহ্ন ভোজের সময়ে) শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত ভক্তিগীতি থেকে 'ভোগ আরতি' কীর্তন করা যেতে পারে।

● নির্দিষ্ট কিছু সময় বাদে (সাধারণত প্রাতরাশের মধ্যাহ্নভোজের ও সান্ধ্যভোগের ক্ষেত্রে পনের-কুড়ি মিনিট, মঙ্গল-আরতির আগে বাল্য-ভোগের ক্ষেত্রে পাঁচ থেকে দশ মিনিট), দরজায় টোকা দিয়ে, হাতে তালি বাজিয়ে, কিংবা ঘণ্টা বাজিয়ে তার পরে শ্রীবিগ্রহ-কক্ষে আবার ঢুকতে হয়।

শ্রীভগবানের আহার গ্রহণের পরে

● আসনে বসে বাম হাতে ঘণ্টা বাজিয়ে প্রত্যেক-শ্রীবিগ্রহাদির হস্ত-মুখ প্রক্ষালন, পাদ্য এবং আচমনের জন্য জল অর্পণ করতে হয়। শ্রীগুরুদেব থেকে শুরু করে, ক্রমান্বয়ে প্রত্যেক শ্রীবিগ্রহকে অর্পণ করা হলে, সব শেষে শ্রীকৃষ্ণকে জল অর্পণ বিধেয়। এই অর্পণ সমাধাকালে, বলতে হয়—

---

* সামান্য ভোগ নিবেদনের ক্ষেত্রে, কেবলমাত্র ব্রহ্ম-গায়ত্রী (শ্রীগুরুদেব-প্রদত্ত সাতটি মন্ত্রের প্রথমটি) অথবা গোপাল-মন্ত্র (শ্রীগুরুদেব-প্রদত্ত সাতটি মন্ত্রের ষষ্ঠটি) জপ করা যেতে পারে।

হে (শ্রীশ্রীগৌর-নিতাই, জগন্নাথদেব-বলদেব-সুভদ্রাদেবী প্রমুখ) হাত-মুখ ধোওয়ার জন্য কৃপা করে এই জল গ্রহণ করুন।

হে (শ্রীশ্রীগৌর-নিতাই, জগন্নাথ-বলদেব-সুভদ্রাদেবী প্রমুখ) পাদ প্রক্ষালনের জন্য কৃপা করে এই জল গ্রহণ করুন।

হে (শ্রীশ্রীগৌর-নিতাই, জগন্নাথ-বলদেব-সুভদ্রাদেবী প্রমুখ) আচমনের জন্য কৃপা করে এই জল গ্রহণ করুন।

● ধ্যানমগ্ন হয়ে চিন্তা করতে হয় যেন শ্রীবিগ্রহাদিকে নিজ নিজ বেদি-আসনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং সেই উদ্দেশ্যে হস্তভঙ্গিমা সহকারে তাঁদের পথ নির্দেশ করে নিয়ে যেতে হয়।

শ্রীভগবানের পার্ষদবর্গের মধ্যে প্রসাদ নিবেদন

● শ্রীভগবানের প্রসাদ এবার শ্রীগুরুদেবকে এবং শ্রীভগবানের পার্ষদবর্গের মধ্যে অর্পণ করতে হয় এবং সেই সঙ্গে বলতে হয়—

হে শ্রীগুরু মহারাজ, কৃপা করে এই মহাপ্রসাদ গ্রহণ করুন।
হে শ্রীভগবানের পার্ষদবর্গ, আপনারা কৃপা করে এই মহাপ্রসাদ গ্রহণ করুন।

● সবশেষে, পাত্রগুলি সরিয়ে নিয়ে জায়গাটি পরিষ্কার করে দিতে হয়। হাত ধুয়ে শ্রীগুরুদেবকে এবং শ্রীবিগ্রহাদিকে দণ্ডবৎ প্রণতি জানিয়ে শ্রীবিগ্রহকক্ষের বাইরে চলে আসতে হয়।

আরতি নিবেদন

বিস্তারিত ভাবে আরতি নিবেদন ১২৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ষোড়শোপচারে পূজা

পূর্বাঙ্গ কর্ম (প্রস্তুতি)

● অর্চনায় বিঘ্ন যাতে না ঘটে, তার জন্য আগেই দেখে নেওয়া উচিত অর্চন শুরু হওয়ার সময়ে নিম্নলিখিত উপকরণগুলি ঠিকমতো রয়েছে—

১) একটি ছোট থালায় একটি ছোট হাতঘণ্টা;
২) শুদ্ধ জল ও চমচ সহ একটি পঞ্চপাত্র;
৩) নির্গম-মুখ ও ঢাকনা সমেত জলপূর্ণ একটি জলপাত্র;
৪) বিসর্জনীয় পাত্র (জল ফেলার জন্য);

৫) (ধাতব শ্রীবিগ্রহাদি পালিশ করতে হলে) বাদাম-বাটা কিংবা পাতিলেবুর রস মেশানো গোপীচন্দনচূর্ণ, পালিশ করার জন্য নরম পশম-তুলো বা নরম কাপড়, তেল মোছার জন্য নরম কাপড়;

৬) সুগন্ধি তেল;

৭) শঙ্খদানীর উপরে রাখা একটি জল-শঙ্খ;

৮) স্নান পাত্র;

৯) (প্রয়োজন হলে—যদি মানসভাবে দারু বিগ্রহাদি স্নান করতে হয়) একটি আয়না (স্নান পাত্রে রাখা থাকবে);

১০) চরণামৃত গ্রহণের জন্য পাত্র;

১১) তোয়ালে এবং গামছা (সজ্জাবেশ ধারণের আগে পরিধেয় বস্ত্র) প্রত্যেক বিগ্রহের জন্য পৃথক পৃথক;

১২) সজ্জাবস্ত্র, অন্তর্বাস এবং কিছু পিন;

১৩) অলঙ্কারাদি এবং মোমের আঠা;

১৪) সুগন্ধি চন্দন বাটা;

১৫) ফুল ও মালা;

১৬) তুলসীপত্র ও মঞ্জরী;

১৭) ধূপ ও ঘি কিংবা কর্পূরদীপ;

১৮) নৈবেদ্য (ফল এবং/কিংবা মিষ্টান্ন);

১৯) শ্রীগুরুদেবের প্রতিকৃতি এবং তাঁর জন্য নৈবেদ্যপাত্র;

২০) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বা শ্রীশ্রীপঞ্চতত্ত্বের প্রতিকৃতি এবং নৈবেদ্যপাত্র (শ্রীশ্রীগৌর-নিতাই বিগ্রহাদির আরাধনার ক্ষেত্রে এটি বাদ দেওয়া যায়);

২১) এই নির্দেশাবলী কিংবা এইভাবে প্রয়োগবিধি সম্বলিত কোনও পুস্তিকা যদি প্রয়োজন হয়।

● শ্রীবিগ্রহকক্ষের বাইরে আচমন সম্পন্ন করতে হয় এবং শ্রীগুরুদেবের উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন করা দরকার।

● শ্রীবিগ্রহকক্ষের যেখানে অর্চন করা হবে, সেই জায়গাটি পরিষ্কার করে নিয়ে উপযুক্ত জায়গায় একটি আসন পেতে অর্চনের আয়োজন করতে হবে। একটি আসনে শ্রীগুরুদেব আসীন রয়েছেন মনে মনে চিন্তা করে, নিজের আসনটিতে বসতে হয়।

পাত্র স্থাপন (অর্চনের আয়োজন)

● উপকরণগুলি এমনভাবে সাজিয়ে নিতে হবে যাতে নিবেদিত উপকরণগুলি অনিবেদিত উপকরণগুলিকে স্পর্শ না করে—

● থালায় ঘণ্টা নিয়ে সেটি বাঁদিকে রাখতে হয়, এবং স্নানের জন্য শঙ্খটিকে একটি শঙ্খদানীর উপরে রাখতে হয় যাতে অনায়াসে সেটি তুলে নেওয়া চলে এবং বারে বারে সেখানে নামিয়ে রাখা যায়।

● জলপাত্র, ফুল-মালাগুলি, চন্দন এবং তুলসীপত্র সবই যেন হাতের নাগালের মধ্যেই থাকে।

● আচমন এবং অর্ঘ্যে ব্যবহৃত জল ফেলার জন্য বিসর্জনীয় পাত্রটি ব্যবহার করা উচিত, কিংবা এই জল স্নান পাত্রেও ফেলা চলে, যদি তাতে জল নিষ্কাশনের জন্য নালা মুখ থাকে। অন্য একটি বিসর্জনীয় পাত্র রেখে তাতে নিবেদিত ফুলের পাপড়ি, তুলোর গুটি এবং অন্য কিছু ফেলে দেওয়া চলে।

● স্নানের তোয়ালেগুলি একটি ট্রে, কোনও টেবিল কিংবা বেদীতে রাখা উচিত — পূজারীর কোলে কিংবা একেবারে মেঝেতে তা ফেলে রাখা অনুচিত।

গুরুপংক্তি নমস্কার (গুরুদেব ও পূর্বতন আচার্যবর্গের আশীর্বাদভিক্ষা)

● শ্রীগুরুদেব, সামনে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করতে হয়। তার পরে, পূর্বতন আচার্যবর্গের উদ্দেশ্যে শ্রীগুরুদেবের সেবা মানসভাবে চিন্তা করে, করজোড়ে প্রণামমুদ্রা প্রদর্শন করা উচিত এবং শ্রীভগবানের অর্চনায় সহযোগিতার জন্য তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে হয় —

হে প্রিয় গুরুদেব, ভগবৎ-প্রেমের পরমানন্দময় ফলদায়ী, কৃপা করে আপনি ব্রজভূমির আনন্দবিধায়ক শ্রীকৃষ্ণের সদানন্দময় সেবায় নিয়োজিত হতে আমাকে অনুমতি করুন।

● তারপর মন্ত্রোচ্চারণ করতে হয় —

জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর, শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

করশুদ্ধি, দ্রব্যশুদ্ধি এবং আত্মশুদ্ধি

● জলপাত্র থেকে জল নিয়ে নিজের হাত ধুয়ে নিতে হবে কিংবা অল্প চন্দন হাতে ঘষে নিতে হবে।

● মহামন্ত্র জপ করতে করতে পঞ্চপাত্র থেকে জল নিয়ে হালকাভাবে সমস্ত উপচারের উপরে তা ছিটিয়ে দিয়ে প্রোক্ষণ করে নিতে হবে।

● মহামন্ত্র জপ করতে করতে পঞ্চপাত্র থেকে জল নিয়ে নিজের গায়ে অল্প ছিটিয়ে দিয়ে প্রোক্ষণ সেরে নেওয়া উচিত।

ভূতশুদ্ধি *(ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাসানুদাস রূপে নিজের পরিচয় উপলব্ধি করে শরীরের পঞ্চভৌত উপাদানগুলির পরিশুদ্ধি)*

● নিচের প্রার্থনাটির অর্থবোধে ধ্যানমগ্ন হয়ে উচ্চারণ করতে হয়—

স্বভাবত আমি শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অবিস্মরণীয় কাল যাবৎ তাঁর প্রতি বৈরীভাবের ফলে, আমি দেহাত্মবুদ্ধি সম্পন্ন হয়েছি এবং জড় জগতে জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে ক্রমাগত ভ্রমণ করছি ত্রিতাপ জ্বালা সহ্য করে। এখন আমার গুরুকৃপায় কোনও অচিন্ত্য সৌভাগ্যবশে আমি জেনেছি যে, আমি শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাস, আমি স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক চিৎকণা। এখন, গুরু-আদেশে, তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণে, আমি তাঁর পাদপদ্ম, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং শ্রীশ্রীরাধা-শ্যামসুন্দরের পাদপদ্ম (কিংবা যে-বিগ্রহের অর্চনা করা হচ্ছে, তাঁর পাদপদ্ম) **সেবা করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি।**

প্রারম্ভিক অর্চন

গুরুপূজা

● মূল বিগ্রহ আরাধনার আগে নিজ গুরুদেবের আরাধনা সমাপন করা চাই। প্রথমে, নবদ্বীপধামে শ্রীশ্রীপঞ্চতত্ত্বের পাদপদ্মে তিনি সমাসীন রয়েছেন, এই ধ্যানে আত্মস্থ হতে হয় এবং তাঁর পারমার্থিক গুণাবলী ও কার্যকলাপ স্মরণ করতে হয়।

● তারপর শ্রীগুরুদেবের উদ্দেশ্যে প্রেমধ্বনি উচ্চারণ করতে হয় *জয় ওঁ বিষ্ণুপাদ* (শ্রীগুরুদেবের নাম) *কী জয়।*

● তারপরে, শ্রীগুরুদেবের উদ্দেশ্যে চন্দন, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও কিছু সুস্বাদু মহাপ্রসাদ নিবেদন সহ মানস-পূজা সম্পন্ন করতে হয়।

● বাম হাতে ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে শ্রীগুরুদেবের উদ্দেশ্যে পঞ্চ উপচার নিবেদনের সাথে, প্রত্যেকটি উপচারের সঙ্গে পুষ্পপল্লব কিংবা পঞ্চপাত্র থেকে জল অর্পণ করা উচিত, এবং তারপরে সেইগুলি শ্রীগুরুদেবের প্রতিকৃতির সামনে রাখা একটি আধারে পরিত্যাগ করতে হয়। প্রত্যেকটি উপচার নিবেদনের পরে, পঞ্চপাত্র থেকে কয়েক ফোঁটা জল নিয়ে ডান হাত শুদ্ধিকরণ প্রয়োজন।

● একটি পুষ্পকোরক চন্দনে সিক্ত করে শ্রীগুরুদেবের মস্তক ও হস্তপদে তা লেপন করে বলতে হয়—"হে গুরু মহারাজ, কৃপা করে এই চন্দন-সেবা গ্রহণ করুন।"

● কিছু পুষ্পস্তবক চন্দনে সিক্ত করে শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে নিবেদন করে বলতে হয়—"হে গুরু মহারাজ, কৃপা করে এই পুষ্প নিবেদন গ্রহণ করুন।"

● তারপরে শ্রীগুরুদেবের ডান হাতে তুলসীপত্র রাখা যেতে পারে, যাতে তিনি তা শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদন করতে পারেন।

● ধূপ নিবেদন করে বলতে হয়—"হে গুরুমহারাজ, কৃপা করে এই ধূপ নিবেদন গ্রহণ করুন।"

● একটি দীপ নিবেদন করে বলতে হয়—"হে গুরুমহারাজ, এই দীপ নিবেদন কৃপা করে গ্রহণ করুন।"

● কৃষ্ণমহাপ্রসাদ শ্রীগুরুদেবের উদ্দেশ্যে নিবেদন করে বলতে হয়—হে গুরুমহারাজ, কৃপা করে এই কৃষ্ণমহাপ্রসাদ গ্রহণ করুন।"

● এবার গুরুমূল মন্ত্র এবং গুরুগায়ত্রী মন্ত্র (গুরুপ্রদত্ত দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মন্ত্রগুলি) নীরবে দশবার জপ করতে হয়।

● নিম্নোক্ত শ্লোকাদি উচ্চারণ সহকারে প্রণতি জ্ঞাপন করতে হয়—

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

অজ্ঞানতার তিমিরে অন্ধত্বপ্রাপ্ত আমার চোখগুলিতে জ্ঞানাঞ্জন দিয়ে যে গুরুদেব আমার চক্ষু উন্মীলিত করেছেন, তাঁর প্রতি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি জ্ঞাপন করছি।

নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে [শ্রীগুরুদেবের নাম] *ইতি নামিনে ॥*

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অতীব প্রিয়জন আমার গুরুদেব (গুরুদেবের নাম), যিনি ভগবানের পাদপদ্মে শরণ নিয়েছেন, তাঁর প্রতি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি জ্ঞাপন করি।

গৌরাঙ্গ পূজা

প্রাথমিক আরাধনা স্বরূপ, শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ অথবা শ্রীজগন্নাথদেবের পূজার আগে যদি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আরাধনা করা হয়, তা হলে নিচে যেভাবে বর্ণনা করা হল, সেইভাবে সরল পদ্ধতি অনুসারে শ্রীচৈতন্যদেবের একখানি প্রতিকৃতির পূজা করা চলে। যদি শ্রীশ্রীগৌর-নিতাই বিগ্রহাদির পূজা করা হয়, তা হলে যথাসম্ভব প্রকৃত উপচারাদি সহকারে, তাঁদের আরাধনা করা উচিত।

● শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাস্থলী দিব্য নবদ্বীপধামের ধ্যানে আত্মস্থ হয়ে বলা উচিত—

ত্রিভুবনের অন্তর্গত জড় জগৎ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং শ্রীবৃন্দাবন থেকে সম্পূর্ণ অভিন্ন পুণ্যপবিত্র নবদ্বীপধামের আমি গুণগান করি। গঙ্গানদীর সুরম্য তীরে অবস্থিত মনোরম বৃক্ষরাজি ও পুষ্পোদ্যানে সুশোভিত এই নবদ্বীপ এক বিশাল কূর্মপৃষ্ঠেরই মতো। সেই পবিত্র ধামটি বহু বিশাল প্রাসাদোপম উজ্জ্বল মণিরত্নখচিত অট্টালিকায় পূর্ণ এবং সেই সমস্ত ভবনে সর্বদা দিব্য ভক্তিপ্রেমরসে সঞ্জীবিত কৃষ্ণসংকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে।

● তারপরে নিত্য সপার্ষদ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দিব্য রূপে ধ্যানমগ্ন হয়ে বলা উচিত—

গৌরভক্তবৃন্দ ও পার্ষদবৃন্দ সেবিত, মুক্তামালার মতো গ্রথিত কেশরাশি শোভিত, এবং চন্দ্রাননে স্নিগ্ধ হাসির অমৃত ক্ষরিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আমি আরাধনা করি। তাঁর অপরূপ গৌরকান্তি, অঙ্গে মনোরম বসনের আভরণ, চন্দন ও অগুরু চর্চিত, মাল্যাদি এবং বিবিধ সমুজ্জ্বল অলঙ্কারে সুসজ্জিত। তিনি অতীব মনোহর, মধুর নৃত্যরস উপভোগে মগ্ন, এবং তাঁর বস্ত্রসজ্জা মদনদেবের সাজসজ্জা অপেক্ষা অধিকতর চমকপ্রদ। আমি তাঁর পূজা করি।

● এর পরে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে চন্দন, পুষ্প, ধূপ, দীপাবলী, এবং কিছু সুস্বাদু আহার্য নিবেদন সহকারে মানস-পূজা সম্পন্ন করতে হয়।

● তারপর, বাম হাতে ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে পঞ্চ উপচার নিবেদনের সাথে প্রত্যেকটি উপচারের সঙ্গে পুষ্পপল্লব কিংবা পঞ্চপাত্র থেকে জল অর্পণ করা উচিত এবং তারপরে সেইগুলি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতিকৃতির সামনে রাখা একটি আধারে পরিত্যাগ করতে হয়। প্রত্যেকটি উপচার নিবেদনের পরে, পঞ্চপাত্র থেকে কয়েক ফোঁটা জল নিয়ে ডান হাত শুদ্ধিকরণ প্রয়োজন।

● একটি পুষ্পকোরক চন্দনে সিক্ত করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মস্তক ও হস্ত-পদে তা লেপন করে বলতে হয়—

হে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, কৃপা করে এই চন্দন সেবা গ্রহণ করুন।

● কিছু পুষ্পস্তবক চন্দনে সিক্ত করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পাদপদ্মে নিবেদন করে বলতে হয়—

হে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, কৃপা করে এই পুষ্প নিবেদন গ্রহণ করুন।

● তারপরে তুলসীপত্র চন্দনে সিক্ত করে মহাপ্রভুর পাদপদ্মে রাখা যেতে পারে।

● ধূপ নিবেদন করে বলতে হয়—

হে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, কৃপা করে এই ধূপ নিবেদন গ্রহণ করুন।

● একটি দীপ নিবেদন করে বলতে হয়—

হে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, এই দীপ নিবেদন কৃপা করে গ্রহণ করুন।

● কৃষ্ণ মহাপ্রসাদ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে নিবেদন করে বলতে হয়—

হে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, কৃপা করে এই কৃষ্ণমহাপ্রসাদ গ্রহণ করুন।

● এবার *গৌরমূল মন্ত্র* এবং *গৌরগায়ত্রী মন্ত্র* (গুরুপ্রদত্ত চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্রগুলি) নীরবে দশবার জপ করতে হয়।

● তারপরে জপ করতে হয়—

জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য, শ্রীগদাধর, শ্রীবাস এবং শ্রীচৈতন্যদেবের অন্য সকল ভক্তবৃন্দের জয় হোক্।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পূজা

● শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীবিগ্রহের প্রতি ধ্যানমগ্ন হয়ে পূজা শুরু করার আগে বলতে হয়—

মহাম্ভোধেস্তীরে কনক-রুচিরে নীলশিখরে
বসন্ প্রাসাদান্তঃ সহজ-বলভদ্রেণ বলিনা।
সুভদ্রা-মধ্যস্থঃ সকল-সুর-সেবাবসরদো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥

(*শ্রীশ্রীজগন্নাথাষ্টকম্* ৩)

যিনি মহাসমুদ্রের তীরে কনকোজ্জ্বল নীলাচল-শিখরে প্রাসাদাভ্যন্তরে বলিষ্ঠ সহোদর শ্রীবলদেবসহ সুভদ্রাকে মধ্যে স্থাপনপূর্বক অবস্থান করছেন এবং সমস্ত দেবগণকে যিনি স্বীয় সেবা করবার সুযোগ প্রদান করছেন, সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক হোন।

কৃপা-পারাবারঃ সজল-জলদ-শ্রেণিরুচিরো
রমা-বাণী-রামঃ স্ফুরদমল-পঙ্কেরুহ-মুখঃ।
সুরেন্দ্রৈরারাধ্যঃ শ্রুতিগণশিখা-গীতচরিতো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ (শ্রীশ্রীজগন্নাথাষ্টকম্ ৪)

যিনি দয়ার সাগর, সজল জলধরের মতো যাঁর অঙ্গকান্তি, যিনি লক্ষ্মী-সরস্বতীর সঙ্গে বিহার করছেন, যাঁর বদনমণ্ডল অমল কমলের ন্যায় শোভা পাচ্ছে, যিনি সমস্ত দেবগণের আরাধ্য-ধন এবং বেদ, পুরাণ, তন্ত্রাদি শাস্ত্রসমূহ যাঁর চরিত্র গান করছেন, সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক হোন।

মানস-পূজা

● শ্রীজগন্নাথদেবের উদ্দেশ্যে ষোড়শোপচার নিবেদনের জন্য মনঃসংযোগ করতে হবে। (দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'ষোড়শোপচার' আলোচনা প্রসঙ্গে বর্ণিত 'মানস-পূজা' দ্রষ্টব্য)

উপচার সহকারে পূজা

প্রত্যেকটি উপচার প্রথমে শ্রীজগন্নাথদেবের উদ্দেশ্যে নিবেদন করতে হয়, তারপরে শ্রীবলদেবের উদ্দেশ্যে, তারপরে শ্রীমতী সুভদ্রাদেবীর উদ্দেশ্যে নিবেদন করতে হয়। (যদি শ্রীশ্রীগৌর-নিতাই পূজা হয়, তবে প্রত্যেকটি উপচার প্রথমে শ্রীচৈতন্যদেবের উদ্দেশ্যে, পরে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর উদ্দেশ্যে নিবেদন করতে হয়। বিকল্প ব্যবস্থাক্রমে, প্রথমেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পূজা সম্পূর্ণ সমাপনান্তে, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পূজা করা চলে।)

● বাম হাতে ছোট ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহাদির পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করে তাঁদের স্মরণ করতে হয়।

♦ ১) আসন

● শ্রীজগন্নাথদেব, শ্রীবলদেব ও শ্রীমতী সুভদ্রাদেবীকে পাদুকা পরিধানের জন্য নিবেদন করতে হয়—পূজাবেদীমূলে হস্তমুদ্রা সঞ্চালনের ভঙ্গিমায় তাঁদের আসন নিবেদন করতে হয় এবং বলতে হয়—

হে শ্রীজগন্নাথদেব, হে শ্রীবলদেব, হে শ্রীমতী সুভদ্রাদেবী, আপনারা এই আসনগুলি কৃপা করে গ্রহণ করুন।

♦ ২) স্বাগত

● করজোড়ে শ্রীভগবানের বিগ্রহাদির উদ্দেশ্যে স্বাগত জানিয়ে তাঁদের স্বস্তিবিধানের জন্য প্রার্থনা জানাতে হয়—

হে শ্রীজগন্নাথদেব, হে শ্রীবলদেব, হে শ্রীমতী সুভদ্রাদেবী, আপনারা কৃপা করে আরাম করুন।

♦ ৩) পাদ্য

● শ্রীভগবানের বিগ্রহাদির পাদপদ্ম প্রক্ষালনের জন্য পাদ্য জল দিয়ে বলতে হয়—

হে শ্রীজগন্নাথদেব, হে শ্রীবলদেব, হে শ্রীমতী সুভদ্রাদেবী, এই পাদ্য জল আপনারা কৃপা করে গ্রহণ করুন।

♦ ৪) অর্ঘ্য

● শ্রীভগবানের বিগ্রহাদির হাতে সামান্য অর্ঘ্য জল দিতে হয় বা তাঁরা তাঁদের মাথায় সিঞ্চন করতে পারেন এবং তখন বলতে হয়—

হে জগন্নাথদেব, হে শ্রীবলদেব, শ্রীমতী সুভদ্রাদেবী, আপনারা এই অর্ঘ্য জল কৃপা করে গ্রহণ করুন।

♦ ৫) আচমন

● মুখ আচমনের জন্য শ্রীভগবানের বিগ্রহাদির উদ্দেশ্যে আচমন জল নিবেদন করে বলতে হয়—

হে শ্রীজগন্নাথদেব, শ্রীবলদেব এবং শ্রীমতী সুভদ্রাদেবী, মুখ আচমনের জন্য 'আপনারা এই আচমনীয় কৃপা করে জল গ্রহণ করুন'।

♦ ৬) মধুপর্ক

● বাটিতে মধুপর্ক পানীয় সাজিয়ে শ্রীবিগ্রহাদির সেবায় নিবেদন করে প্রার্থনা জানাতে হয়—

হে শ্রীজগন্নাথদেব, শ্রীবলদেব এবং শ্রীমতী সুভদ্রাদেবী আপনারা এই মধুপর্ক পানীয় কৃপা করে গ্রহণ করুন।

♦ ৭) পুনরাচমন

● আবার মুখ আচমনের জল নিবেদন করে বলতে হয়—

হে শ্রীজগন্নাথদেব, শ্রীবলদেব এবং শ্রীমতী সুভদ্রাদেবী, আপনাদের মুখ আচমনের জন্য এই আচমনীয় জল কৃপা করে গ্রহণ করুন।

♦ ৮) স্নান

● **মূর্তিশুদ্ধি :** শ্রীবিগ্রহাদির পোশাক-পরিধেয় খুলে একটি নরম শুকনো কাপড় দিয়ে তাঁদের পরিষ্কার করে দিতে হয়। তার পরে গামছা কিংবা তোয়ালে দিয়ে তাঁদের জড়িয়ে রাখতে হয়।

● শ্রীবিগ্রহাদির পরিধানের উদ্দেশ্যে পাদুকা নিবেদন করতে হয় এবং হস্তমুদ্রা সহকারে তাঁদের স্নানপাত্রের অভিমুখে স্নানের জন্য আহ্বান জানিয়ে নিয়ে আসতে হয়। স্নানপাত্রটির ঠিক পিছনে তাঁদের অবস্থান করাতে হয়, কিংবা, তাঁদের আকার বৃহৎ হলে, স্নানপাত্রটিকে তাঁদের সামনে স্থাপনা করতে হয়।

● প্রত্যেক শ্রীবিগ্রহের উদ্দেশ্যে সুগন্ধি তেলে সিক্ত একখণ্ড তুলা নিবেদন করতে হয় এবং ধ্যানমগ্নভাবে চিন্তা করতে হয়। যেন তার দ্বারা তাঁদের অঙ্গে সুগন্ধি তেল মর্দন করা হচ্ছে। (তার পরে তুলার খণ্ডটি এক পাশে রেখে দিতে হয়, দর্শন-আরতির পরে এটি সমবেত ভক্তবৃন্দের মাঝে বিতরণ করা যেতে পারে।) তুলার খণ্ডটি নিবেদনের সময় বলতে হয়—

হে শ্রীজগন্নাথদেব, শ্রীবলদেব, এবং শ্রীমতী সুভদ্রাদেবী, আপনারা এসে আপনাদের জন্য তৈল মর্দন এবং স্নান সেবা কৃপা করে গ্রহণ করুন।

এবার নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ায় শ্রীবিগ্রহাদির স্নান সমাপন করতে হয় (এই প্রক্রিয়াটি *দর্পণস্নানীয়ধ্যান* নামে পরিচিত)—

● একটি জলশঙ্খে জল পূর্ণ করতে হয় এবং শ্রীবিগ্রহাদির সামনে একটি দর্পণ এমনভাবে ধরতে হয় যাতে তাঁদের প্রতিবিম্ব পড়ে, এবার তার উপরে কিংবা তার সামনে দিয়ে স্নানপাত্রটিতে জল ঢালতে ঢালতে মানসভাবে ধ্যান করতে হয়। স্বয়ং শ্রীবিগ্রহাদির শ্রীঅঙ্গেই জল ঢেলে স্নান সেবা নিবেদিত হচ্ছে। শঙ্খটি অন্তত তিনবার ভর্তি এবং খালি করতে হয়। শ্রীবিগ্রহাদিকে স্নান সেবা নিবেদনের সময়ে বাম হাত দিয়ে একটি ঘণ্টা বাজাতে হয় এবং *ব্রহ্মসংহিতা* থেকে *গোবিন্দম্* প্রার্থনা কিংবা অন্যান্য যথোপযুক্ত স্তোত্র আবৃত্তি করতে হয়—

চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ-
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্ ।
লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ২৯ ॥

লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষে আবৃত চিন্তামণিকর-গঠিত গৃহসমূহে সুরভী অর্থাৎ কামধেনুগণকে যিনি পালন করছেন, এবং শতসহস্র লক্ষ্মীগণ কর্তৃক সাদরে পরিসেবিত হচ্ছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

বেণুং ক্বণন্তমরবিন্দদলায়তাক্ষং
বর্হাবতংসমসিতাম্বুদসুন্দরাঙ্গম্ ।
কন্দর্পকোটিকমনীয়বিশেষশোভং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৩০ ॥

মুরলীগান-তৎপর, কমলদলের ন্যায় প্রফুল্লচক্ষু, ময়ূরপুচ্ছ শিরোভূষণ, নীলমেঘবর্ণ সুন্দর-শরীর কোটিকন্দর্পমোহন বিশেষ শোভাবিশিষ্ট সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

আলোলচন্দ্রক লসদ্বনমাল্যবংশী-
রত্নাঙ্গদং প্রণয়কেলিকলাবিলাসম্ ।
শ্যামং ত্রিভঙ্গললিতং নিয়তপ্রকাশং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৩১ ॥

দোলায়িত চন্দ্রক-শোভিতা বনমালা যাঁর গলদেশে, বংশী ও রত্নাঙ্গদ যাঁর করদ্বয়ে, সর্বদা প্রণয়কেলিবিলাসযুক্ত যিনি ললিত ত্রিভঙ্গ শ্যামসুন্দর রূপই যাঁর নিত্যপ্রকাশ, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

● এর পর, প্রত্যেক শ্রীবিগ্রহের সামনে একখানি করে তোয়ালে ধারণ করতে হয় এবং মানসভাবে শ্রীভগবানের বিগ্রহাদির অঙ্গ শুষ্ক করে দিতে হয়।

♦ ৯) বস্ত্র

● শ্রীভগবানের বিগ্রহাদির উদ্দেশ্যে পরিষ্কার বস্ত্রাভরণ নিবেদন করে বলতে হয়—

হে শ্রীজগন্নাথদেব, হে শ্রীবলদেব এবং হে শ্রীমতী সুভদ্রাদেবী, এই সুন্দর বস্ত্র-আভরণাদি আপনারা কৃপা করে গ্রহণ করুন।

● শ্রীজগন্নাথদেব এবং শ্রীবলদেবের ঊর্ধ্বাঙ্গে বস্ত্র-আভরণাদি নিবেদনের আগে মানসভাবে তাঁদের উপবীত এবং তিলক সেবা নিবেদন করতে হয়। শ্রীমতী সুভদ্রাদেবীকে বস্ত্রাভরণে সজ্জিত করার পরে মানসভাবে তাঁর কপালে কুম্‌কুম্ সেবা নিবেদন করতে হয়।

♦ ১০) আভরণ

● শ্রীভগবানের বিগ্রহাদির অঙ্গে অলঙ্কার-আভরণাদি দিয়ে সজ্জিত করতে হয়। তার পরে, মানসভাবে চিরুণি দিয়ে তাঁদের কেশ প্রসাধন ও বিন্যাস করে দিতে হয়। এখন কিংবা পরে পুষ্পাদি নিবেদন করা হলে তাঁদের মাল্য অর্পণ করতে পারা যায় (নিচে দ্রষ্টব্য)। এই সেবা সম্পন্ন করবার সময়ে বলতে হয়—

হে শ্রীজগন্নাথদেব, শ্রীবলদেব এবং শ্রীমতী সুভদ্রাদেবী এই সমস্ত অপূর্ব অলঙ্কার আভরণাদি আপনারা কৃপা করে গ্রহণ করুন, আপনাদের কেশ বিন্যাস করে দিতে আমাকে কৃপা করে অনুমতি করুন।

♦ ১১) গন্ধ

● মানসভাবে শ্রীভগবানের বিগ্রহাদির শিরোদেশে, করকমলে ও পাদপদ্মে ঋতুভেদে সুগন্ধিমিশ্রিত চন্দন লেপন করতে হয় এবং সেই সঙ্গে চন্দনে সিক্ত একটি পুষ্প শ্রীবিগ্রহাদির সামনে প্রদর্শন করতে হয় এবং তারপরে সেটি পরিহার করতে হয়। এইভাবে গন্ধসেবা নিবেদনের সময়ে বলতে হয়—

হে শ্রীজগন্নাথদেব, শ্রীবলদেব, এবং শ্রীমতী সুভদ্রাদেবী, আপনারা এই মনোমুগ্ধকর চন্দনসেবা কৃপা করে গ্রহণ করুন।

♦ ১২) পুষ্প

● ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে, চন্দনসিক্ত সুগন্ধি পুষ্পাদি কিংবা পুষ্পকোরকাদি শ্রীভগবানের বিগ্রহাদির পাদপদ্মে নিবেদন করে বলতে হয়—

হে শ্রীজগন্নাথদেব, শ্রীবলদেব, এবং শ্রীমতী সুভদ্রাদেবী আপনাদের চরণকমলে এই পুষ্প নিবেদন কৃপা করে গ্রহণ করুন।

● শ্রীজগন্নাথদেব এবং শ্রীবলদেবের শ্রীপাদপদ্মে চন্দনসিক্ত তুলসীপত্র এবং মঞ্জরী নিবেদন করে বলতে হয়—

হে শ্রীজগন্নাথদেব, এবং শ্রীবলদেব, আপনাদের শ্রীচরণকমলে এই সুগন্ধি তুলসীপত্র এবং মঞ্জরী নিবেদন কৃপা করে গ্রহণ করুন।

● শ্রীভগবানের বিগ্রহাদির উদ্দেশ্যে পুষ্পমাল্যাদি নিবেদন করতে হয়। (বিকল্পে, অলঙ্কারাদি নিবেদনের সময়ে, কিংবা নৈবেদ্য অর্পণের পরে পুষ্পমাল্যাদি নিবেদন করা চলে।) পুষ্পমাল্য নিবেদনের সময় বলতে হয়—

হে শ্রীজগন্নাথদেব, শ্রীবলদেব, এবং শ্রীমতী সুভদ্রাদেবী, এই সদ্য নির্মিত পুষ্পমাল্যাদি আপনারা কৃপা করে গ্রহণ করুন।

♦ ১৩) ধূপ

● ঘণ্টা বাজিয়ে শ্রীভগবানের বিগ্রহাদির উদ্দেশ্যে ধূপ নিবেদন করে বলতে হয়—

হে শ্রীজগন্নাথদেব, শ্রীবলদেব এবং শ্রীমতী সুভদ্রাদেবী, এই ধূপ নিবেদন আপনারা কৃপা করে গ্রহণ করুন।

♦ ১৪) দীপ

● ঘণ্টা বাজিয়ে শ্রীভগবানের বিগ্রহাদির উদ্দেশ্যে একটি ঘৃতদীপ কিংবা কর্পূরদীপ নিবেদন করে বলতে হয়—

হে শ্রীজগন্নাথদেব, শ্রীবলদেব এবং শ্রীমতী সুভদ্রাদেবী, এই উজ্জ্বল দীপ আপনারা কৃপা করে গ্রহণ করুন।

♦ ১৫) নৈবেদ্য

● প্রোক্ষণ সহকারে ভোগ পরিশোধন করে তাতে তুলসীপত্র স্থাপন করতে হয়।

● শ্রীভগবানের বিগ্রহাদির শ্রীচরণকমল প্রক্ষালনের জন্য পাদ্য জল নিবেদন করতে হয়।

● শ্রীভগবানের বিগ্রহাদির উদ্দেশ্যে আচমন জল নিবেদন করতে হয়।

● শ্রীভগবানের বিগ্রহাদির উদ্দেশ্যে ফল এবং/অথবা মিষ্টান্ন সহ পানীয় জল নিবেদন করে বলতে হয়—

হে শ্রীজগন্নাথদেব, শ্রীবলদেব, এবং শ্রীমতী সুভদ্রাদেবী, এই ফল মূল আপনারা কৃপা করে গ্রহণ করুন।

● শ্রীগুরুদেবের সেবাকার্যে সহায়তা করবার অনুমতি ভিক্ষা করে এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদ ভিক্ষা করে নিচের প্রার্থনামন্ত্রগুলি ঘণ্টাধ্বনি সহকারে তিনবার উচ্চারণ করতে হয়—

নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে [শ্রীগুরুদেবের নাম] ইতি নামিনে॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অতীব প্রিয়জন এবং তাঁর শ্রীচরণাশ্রিত আমার শ্রীগুরুদেব শ্রীমদ্ (গুরুদেবের নাম) এর উদ্দেশ্যে আমার ভক্তিপ্রণত প্রণাম জানাই।

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায়তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নম ॥

হে মহাবদান্য অবতার! আপনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। শ্রীমতী রাধারাণীর গৌরাঙ্গকান্তি নিয়ে আপনি প্রকটিত হয়েছেন, এবং আপনি উদারভাবে কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ করে চলেছেন। আপনার উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের শ্রদ্ধাবনত প্রণতি জ্ঞাপন করি।

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

গুণবান ব্রাহ্মণদের নিত্যপূজ্য ও অতিপ্রিয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে আমি পুনঃ পুনঃ আমার ভক্তিপ্রণত প্রণাম জানাই। তিনি গো-জাতি, ব্রাহ্মণকুল এবং সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কল্যাণে নিত্যযুক্ত এবং তিনি গাভীকুল, ভূমিসম্পদ ও ইন্দ্রিয়াদির হিতসাধন করে থাকেন।

● দুই থেকে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা (বসে থেকে, কিংবা চোখ বন্ধ করে, শ্রীভগবান তাঁর ভোগ সেবা করছেন, কিংবা শ্রীবিগ্রহ কক্ষ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন, এইভাবে মানসচিন্তা) করতে হয়। তারপরে আবার আচমন করতে হয়।

● শ্রীভগবানের বিগ্রহাদির উদ্দেশ্যে পুষ্পমাল্যাদি নিবেদন করতে হয় (আগে যদি তা করা না হয়ে থাকে)।

● ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে শ্রীভগবানের বিগ্রহাদির পাদপদ্মে পুষ্পসম্ভার নিবেদন করতে হয়, তাঁদের প্রীতিপ্রদ অন্যান্য যা কিছু হতে পারে তারই প্রতীক স্বরূপ এই পুষ্পার্ঘ্য।

● অবশেষে, শ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ নিজ শ্রীগুরুদেবের উদ্দেশ্যে এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে নিবেদন করে বলতে হয়—

হে গুরুমহারাজ, এই জগন্নাথ মহাপ্রসাদ আপনি কৃপা করে গ্রহণ করুন।
হে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, এই জগন্নাথ মহাপ্রসাদ আপনি কৃপা করে গ্রহণ করুন।

♦ ১৬) প্রণাম

● নীরবে গোপালমন্ত্র এবং কামগায়ত্রী মন্ত্র দশবার জপ করতে হয়।

● *শ্রীশ্রীজগন্নাথাষ্টকম্* প্রভৃতি যথোপযুক্ত শ্লোকাদি উচ্চারণ করে শ্রীভগবানের মাহাত্ম্য কীর্তন করতে হয়।

● পূজার সময়ে কোনও অপরাধ-বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করে বলতে হয়—

শ্রীকৃষ্ণ এবং কৃষ্ণভক্তবৃন্দের কৃপায় পূজা সম্পাদনে আমাদের বিধিনিয়ম পালনে সকল প্রকার অসম্পূর্ণতা কৃপা করে মার্জনা করুন। যা কিছু ত্রুটি হয়েছে তা এখন আমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করে ক্ষমাভিক্ষা করছি। (*সৎক্রিয়াসারদীপিকা*)

● তারপরে জপ করতে হয়—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

দর্শন আরতি

দর্শন আরতির পর্দা খোলবার আগে, সমস্ত অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পরিষ্কার করে ফেলতে হয়, বেদির চারিপাশে মেঝে পরিষ্কারভাবে মুছে দিতে হয়, ঘৃত প্রদীপ বা তৈল প্রদীপগুলি যেখানে যেমন বসানো বা ঝোলানো আছে, সেইগুলি জ্বেলে দিতে হয়, এবং (হাত ধুয়ে নিয়ে) শ্রীভগবানের বিগ্রহাদির সামনে একখানি দর্পণ ধারণ করতে হয় যাতে তাঁরা তাঁদের নিজ রূপ দর্শন করতে পারেন। সেই সময়ে সযত্নে সব কিছু মিলিয়ে দেখে নিতে হয় যেন প্রতিটি জিনিস যথাযথভাবে ঠিক জায়গায় রাখা আছে এবং বেদিতে কোনও কিছু অপ্রয়োজনীয় বা অযাচিত জিনিস (যেমন পিনকুশন) পড়ে নেই। শ্রীবিগ্রহাদির অলঙ্কারাদি—বিশেষত মুকুট এবং কর্ণাভরণগুলি—ঠিকমতো ঠিক জায়গায় পরানো আছে কিনা লক্ষ্য করে নিতে হয়।

ধূপ, ফুল, চামর, এবং গ্রীষ্মকালে পাখাসহ ধূপ আরতি নিবেদন করতে হয়।

প্রণাম

● নিচের মন্ত্রটি উচ্চারণ করে প্রণতি নিবেদন করতে হয়—

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

গুণবান ব্রাহ্মণদের নিত্যপূজ্য ও অতিপ্রিয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে আমি পুনঃ পুনঃ আমার ভক্তিপ্রণত প্রণাম জানাই। তিনি গো-জাতি, ব্রাহ্মণকুল এবং সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কল্যাণে নিত্যযুক্ত এবং তিনি গাভীকুল, ভূমিসম্পদ ও ইন্দ্রিয়াদির হিতসাধন করে থাকেন।

দর্শন আরতির পরের সেবা এবং দিনের বাকি সময়গুলির সেবা পদ্ধতি পরে বিবৃত হবে।

শ্রীল প্রভুপাদের মূর্তি

প্রথাগতভাবে, বিশিষ্ট আচার্যবর্গের পূজা-অর্চনা হয়ে থাকে ত্রিমাত্রিক মূর্তির মাধ্যমে এবং শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর নিজ মূর্তির পূজা-অর্চনা অনুমোদন করেছেন। সমবেত সকল ভক্তবৃন্দেরই প্রতিদিন মন্দিরে চন্দন ও পুষ্পাদি,* মাল্যাদি আরতি ও কীর্তন সহকারে শ্রীল প্রভুপাদের পূজা করা বিধেয়, বিশেষ করে শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর রচিত শ্রীগুরুবন্দনা গীতবাদ্য সহ। শ্রীল প্রভুপাদ বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে, ব্যাসাসনে তাঁর প্রতিকৃতির প্রতি যেভাবে শ্রদ্ধা জানানো হয়, তাঁর মূর্তির উদ্দেশ্যেও মূলত সেইভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন করা চলবে, এছাড়া মূর্তিতে পোশাক পরিধান করানো চলবে। নিয়মিত শ্রীবিগ্রহ অর্চনায় যেভাবে সমস্ত কিছু উপচার নিবেদিত হয়, তা না করলেও চলবে।

ঋতু অনুসারে পূজারী প্রতিদিন শ্রীল প্রভুপাদকে পরিষ্কার পোশাকে ভূষিত করবেন—শীতকালে গরম পোশাকে, গরমকালে হালকা পোশাকে। শ্রীল প্রভুপাদ সন্ন্যাসীরূপে যেভাবে পোশাক পরিধান করতেন, সেইভাবে পোশাক পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করতে হবে। সম্ভব হলে একটি পর্দার আড়ালে কোনও ভক্তের দ্বারা পোশাক পরিধান করানো উচিত।** কোনও শুদ্ধভক্ত শ্রীবিগ্রহকক্ষে প্রবেশের যোগ্য হলে এই সেবায় নিয়োজিত হতে পারবেন। শ্রীল প্রভুপাদের পরিধেয় পোশাকাদি খুলে নেওয়ার পরে, পূজারী একটু সামান্য ভিজা তোয়ালে দিয়ে সাবধানে মূর্তির অঙ্গ পরিচ্ছন্ন করে দিয়ে পরিষ্কার পোশাক পরাবেন। মূর্তি সরানো বা নাড়ানোর সময় তাঁকে বিশেষভাবে সতর্ক হতে হবে—অন্য সময়ে তো বটেই। এই সময়ে ব্যাসাসনটিও পরিষ্কার করে নিতে হবে। সন্ধ্যায় পূজারী সমস্ত মালা এবং চন্দন সরিয়ে পরিষ্কার করে দেবেন, এবং রাতে ঠাণ্ডা থাকলে, শ্রীল প্রভুপাদের গায়ে গরম চাদর জড়িয়ে দেবেন। (তা ছাড়া, সন্ধ্যায়, শ্রীবিগ্রহাদির চরণামৃত এবং হস্ত প্রক্ষালনের জল মন্দিরকক্ষ থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হয়)।

ব্যাসাসনের উপরে কোনও আবরণ, যেমন ছত্র বা চাঁদোয়া থাকা খুবই ভাল।

বেদিতে শ্রীল প্রভুপাদের ছোট ধাতুমূর্তি থাকলে, পূজারী তাঁকে যথারীতি উপচার সহকারে পূজা নিবেদন করবেন এবং পূর্বে বর্ণিত পদ্ধতিতে নিয়মিত পালিশ ও স্নানাদি সংস্কার করবেন।

---

* শ্রীগুরুদেবের পূজার সময়ে আমরা তাঁর শ্রীচরণে পুষ্পাদি অর্পণ করি, করকমলে নয়।

** দীক্ষাপ্রাপ্ত হোক বা না-ই হোক, যে কোনও ভক্ত ১৬ মালা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করলে এবং চারটি বিধিনিয়ম পালন করে চললে, মন্দির কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে পোশাক পরিধানের এই সেবায় নিয়োজিত হতে পারেন।

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীবিগ্রহ অর্চনের আদর্শ পদ্ধতি

মন্দিরগুলিতে নিষ্ঠাবান পূজারীরা অর্চনের এই সাধারণ উৎকর্ষমান অনুসরণ করে চলতে পারেন এবং শ্রীবিগ্রহ অর্চনের পক্ষে এইগুলি বেশ সুবিধাজনক।

ইচ্ছা করলে, সংস্কৃত মন্ত্রগুলিকে অনুবাদ করে নেওয়া চলতে পারে। সেই সম্পর্কে পূর্ববর্তী তৃতীয় অধ্যায়ে অনুবাদের ভাবধারা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এই অধ্যায়টিতে, মূল বিগ্রহ রূপে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের অর্চন পদ্ধতি বর্ণিত হচ্ছে। যে কোনও বিগ্রহের নিত্য পূজার পদ্ধতি মোটামুটি একই রকম, বিশেষত বৈধী ভক্তির পর্যায়ে তাই হয়। অতএব এখানে কিংবা তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত পদ্ধতিগুলিতে যথাযথভাবে ধ্যানমন্ত্র, মূলমন্ত্র, প্রণামমন্ত্র এবং স্তুতি বদল করে নিয়ে একই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

অর্চনের প্রস্তুতি ও শ্রীভগবানের জাগরণ

শ্রীভগবানের জাগরণ ও স্মরণ

জাগরণের পরে, হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র, কিংবা অন্তত 'কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ' জপ করা উচিত। শ্রীগুরুদেবের প্রণাম মন্ত্র প্রার্থনা উচ্চারণ করে প্রণতি জ্ঞাপন করতে হয়—

নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে [গুরুদেবের নাম] *ইতি নামিনে ॥*

তারপরে শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে নিচের প্রার্থনাটি উচ্চারণ করা যেতে পারে —

প্রাতঃ প্রবোধিতো বিষ্ণো হৃষীকেশেন যৎ ত্বয়া।
যদযৎ কারয়সীশান তৎ করোমি তবাজ্ঞয়া ॥

"হে বিষ্ণু, হে ঈশান, হে হৃষীকেশ, আপনি আমাদের জাগ্রত করেছেন, এবং আজ আপনি যা কিছু অভিলাষ করেন, তা আমি করতে এখন প্রস্তুত।" (*হরিভক্তিবিলাস* গ্রন্থের ৩/৯১ শ্লোকে *বিষ্ণুধর্মোত্তর* গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।)

গাত্রোত্থানের পূর্বে মাতা বসুন্ধরার কাছে প্রার্থনা নিবেদন করা যেতে পারে —

সমুদ্রবসনে দেবি পর্বতস্তনমণ্ডিতে।
বিষ্ণুপত্নী নমস্তুভ্যং পাদস্পর্শং ক্ষমস্ব মে ॥

"হে বসুন্ধরা মাতা, আপনাকে বিষ্ণুপত্নীরূপে, সমুদ্রের আবাসনরূপে, এবং পর্বতশোভিত রূপে প্রণতি জানাই। আপনার বক্ষে আমার পাদস্পর্শের জন্য আমাকে মার্জনা করুন।"

গাত্রোত্থান করে শয্যাদি গুছিয়ে রাখতে হয়।

গাত্রোত্থানের পরে শ্রীভগবানের মহিমা কীর্তন করে এবং দুঃস্বপ্নের কুপ্রভাব থেকে নির্বিঘ্নে থাকার জন্য প্রার্থনার উপযোগী বেশ কিছু শ্লোক *হরিভক্তিবিলাস* গ্রন্থে উপস্থাপিত রয়েছে। শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর দ্বারা উচ্চারিত নিম্নলিখিত শ্লোকটি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামীদের বিশেষ প্রিয় —

জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো
যদুবরপরিষৎ স্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্মম্।
স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিতশ্রীমুখেন
ব্রজপুরবনিতানাং বর্ধয়ন্ কামদেবম্ ॥

"পরমেশ্বর ভগবান সকল জীবের আধার রূপে জননিবাস নামে খ্যাত, এবং তিনি দেবকীমাতা ও যশোদামাতার পুত্র রূপে দেবকীনন্দন ও যশোদানন্দন নামেও পরিচিত। তিনি যদুবংশের পথপ্রদর্শক এবং তাঁর শক্তিধর অস্ত্রের সাহায্যে সকল অশুভ বিনাশ করেন এবং প্রত্যেক অসাধু মানুষের নিধন করেন। তাঁর আবির্ভাবের মাধ্যমে তিনি জীবের অমঙ্গলজনক স্থাবর জঙ্গম সব কিছু ধ্বংস করে দেন। তাঁর হাস্যোজ্জ্বল মুখপদ্ম বৃন্দাবনের গোপীগণের নিত্য সঙ্গসুখ বাসনা বৃদ্ধি করে। তাঁর জয় হোক।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/৯০/৪৮)

স্নান ও বস্ত্রসজ্জা

- দাঁত মেজে, জিভ ছুলে নিয়ে নিজের মুখ ধুয়ে ফেলতে হয়। দাড়ি কামাতে চাইলে এখনই তা স্নানের আগে সেরে নেওয়া উচিত।
- কানের চারিপাশে উপবীত সূত্রটি জড়িয়ে রেখে মলমূত্র ত্যাগ করতে হয় এবং শৌচকার্য সম্পাদন করা দরকার।
- স্নান শুরু করার সময়ে, নিচের মন্ত্রটি জপ করা যেতে পারে —

ওঁ অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ ॥

পবিত্র বা অপবিত্র যেভাবেই থাকি, কিংবা জড়জাগতিক জীবনের সকল অবস্থার মধ্যে দিয়ে যেভাবেই চলি, পদ্মপলাশলোচন শ্রীকৃষ্ণের কমল নয়ন দুটি স্মরণ করলে অন্তরে বাহিরে শুদ্ধ হয়ে থাকা যায়। (*হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থের ৩/৪৭ শ্লোকে গরুড় পুরাণ থেকে উদ্ধৃত*)

● নিজের শরীর শুকনোভাবে মুছে নিয়ে, ব্যবহৃত গামছা কিংবা তোয়ালে জল দিয়ে ধুতে হয়।

● উপবেশন করে শিখা বন্ধন করে নিয়ে একবার ব্রহ্মগায়ত্রী মন্ত্রটি জপ করতে হয়।

● পরিষ্কার পোশাক পরে নিয়ে, তার পরে সাধারণ আচমন এইভাবে সম্পন্ন করতে হয়—

আসনে বসে আচমন পাত্র থেকে খানিকটা জল ছোট কুশী দিয়ে নিয়ে নিজের হাতে পায়ে ছিটিয়ে নিতে হয়।

ওঁ কেশবায় নমঃ মন্ত্র উচ্চারণ করে নিজের ডান হাতের ব্রহ্মতীর্থ (বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের নিম্নভাগ) থেকে মৃদুভাবে জল পান করতে হয়।

ওঁ নারায়ণায় নমঃ মন্ত্র উচ্চারণ করে ডানহাতের ব্রহ্মতীর্থ থেকে মৃদুভাবে জল পান করতে হয়।

ওঁ মাধবায় নমঃ মন্ত্র উচ্চারণ করে ডানহাতের ব্রহ্মতীর্থ থেকে মৃদুভাবে জলপান করতে হয়।

ঊর্ধ্বপুণ্ড্র তিলক সেবা

বাম হাতের তালুতে গোপীচন্দন ঘষে তৈরি করে নেওয়ার সময়ে নিচের শ্লোকগুলি উচ্চারণ করতে হয়, তার পরে, তিলক সেবার সময়ে এবং তিলকের মধ্যেখানে পরিষ্কার করে দেওয়ার সময়ে শ্রীভগবানের যথোপযুক্ত বিভিন্ন রূপের নাম জপ করতে হবে। (নিচে দ্রষ্টব্য)

বিকল্প পদ্ধতিতে, নিচে বর্ণিত শ্লোকগুলি একবার এক ছত্র জপ করার সঙ্গে নিজ শরীরের নির্দিষ্ট অঙ্গে তিলকসেবা করতে হয়। শ্লোকটির প্রত্যেকটি ছত্র জপের পরে, তিলকের মধ্যবর্তী স্থানটি পরিষ্কার করার সঙ্গে সঙ্গে (ঐখানে শ্রীভগবান অধিষ্ঠান করেন), শ্রীভগবানের যথাযথ রূপটির নাম জপ করতে হয়। (দৃষ্টান্ত—*ললাটে কেশবং ধ্যায়েন* জপ করে কপালে তিলকসেবা করতে হয়, তার পরে *ওঁ কেশবায় নমঃ* জপ করে তিলকের মাঝের জায়গাটি পরিষ্কার করে দিতে হয়।)

ললাটে কেশবং ধ্যায়েন	ওঁ কেশবায় নমঃ	(কপাল)
নারায়ণম্ অথোদরে	ওঁ নারায়ণায় নমঃ	(উদর)
বক্ষঃস্থলে মাধবং তু	ওঁ মাধবায় নমঃ	(বক্ষ)
গোবিন্দং কণ্ঠকূপকে	ওঁ গোবিন্দায় নমঃ	(কণ্ঠকূপ)
বিষ্ণুং চ দক্ষিণে কুক্ষৌ	ওঁ বিষ্ণবে নমঃ	(দক্ষিণপার্শ্ব)
বাহৌ চ মধুসূদনম্	ওঁ মধুসূদনায় নমঃ	(দক্ষিণবাহুমূল)
ত্রিবিক্রমং কন্দরেতু	ওঁ ত্রিবিক্রমায় নমঃ	(দক্ষিণ স্কন্ধ)
বামনং বামপার্শ্বকে	ও বামনায় নমঃ	(বাম পার্শ্ব)
শ্রীধরং বামবাহৌ তু	ওঁ শ্রীধরায় নমঃ	(বাম বাহুমূল)
হৃষীকেশং তু কন্দরে	ওঁ হৃষীকেশায় নমঃ	(বাম স্কন্ধ)
পৃষ্ঠে চ পদ্মনাভং চ	ওঁ পদ্মনাভায় নমঃ	(পৃষ্ঠ উপরিভাগ)
কট্যাং দামোদরং ন্যসেৎ	ওঁ দামোদরায় নমঃ	(পৃষ্ঠ নিম্নভাগ)

ললাটে তিলক ধারণ করার সময়ে কেশবের ধ্যান করা কর্তব্য। উদরে তিলক ধারণ করার সময়ে নারায়ণের ধ্যান করা কর্তব্য। বক্ষে তিলক ধারণ করার সময়ে মাধবের ধ্যান করা কর্তব্য এবং কণ্ঠে তিলক ধারণ করার সময়ে গোবিন্দের ধ্যান করা কর্তব্য। দক্ষিণ কুক্ষে তিলক ধারণ করার সময়ে বিষ্ণুর ধ্যান করা কর্তব্য। দক্ষিণ বাহুতে তিলক ধারণ করার সময়ে মধুসূদনের ধ্যান করা কর্তব্য। দক্ষিণ স্কন্ধে তিলক ধারণ করার সময়ে ত্রিবিক্রমের ধ্যান করা কর্তব্য এবং বাম কুক্ষে তিলক ধারণ করার সময়ে বামনের ধ্যান করা কর্তব্য। বাম বাহুতে তিলক ধারণ করার সময়ে শ্রীধরের ধ্যান করা কর্তব্য, বাম স্কন্ধে তিলক ধারণ করার সময়ে হৃষীকেশের ধ্যান করা কর্তব্য, পৃষ্ঠের উপরিভাগে তিলক ধারণ করার সময়ে পদ্মনাভের ধ্যান করা কর্তব্য এবং পৃষ্ঠের নিম্নদেশে তিলক ধারণ করার সময়ে দামোদরের ধ্যান করা কর্তব্য। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য ২০/২০২ তাৎপর্য)

শিখার জায়গায় তিলকচিহ্ন দেওয়া হয় না, বরং ডান হাতটি ধুয়ে নিয়ে ভিজে হাতটি দিয়ে শিখাটি মুছে ওঁ বাসুদেবায় নমঃ জপ করতে হয়।

বৈষ্ণব আচমন

শ্রীভগবানের অর্চনার উদ্দেশ্যে শ্রীবিগ্রহ কক্ষে প্রবেশের পূর্বে সর্বদাই আচমন সম্পন্ন করে নিতে হয়।

যথাযথভাবে একটি আসনে উপবেশন করতে হয়। *(যদি কোনও আসন না থাকে, তা হলে ডান হাঁটু গেড়ে মেঝেতে বসে মেঝের উপরে বাঁ পা রাখতে হয়।)

আচমন পাত্রটিতে জল ভর্তি করে নিয়ে দু'হাতে জল ছিটিয়ে পরিষ্কার করে নিতে হয়, আচমন কুশী বাঁ হাতে ধরে, কয়েক ফোঁটা জল ডান হাতের তালুতে ঢালতে হয়। **জলের দিকে লক্ষ্য রেখে যথাযথ মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয় এবং তারপরে ব্রহ্মতীর্থ (বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মূলদেশ) থেকে নীরবে জল সামান্য পরিমাণে পান করতে হয়। নিচের তিনটি পর্যায়ে মূল আচমন পদ্ধতি সম্পন্ন করা হয়। সময় এবং পরিবেশ অনুযায়ী, সম্পূর্ণ আচমন সম্পন্ন করা যেতে পারে—

- *ওঁ কেশবায় নমঃ* মন্ত্র জপ করে ডান হাতের ব্রহ্মতীর্থ থেকে জল পান করতে হয়।
- *ওঁ নারায়ণায় নমঃ* মন্ত্র জপ করে ডান হাতের ব্রহ্মতীর্থ থেকে জল পান করতে হয়।
- *ওঁ মাধবায় নমঃ* মন্ত্র জপ করে ডান হাতের ব্রহ্মতীর্থ থেকে জল পান করতে হয়।
- *ওঁ গোবিন্দায় নমঃ* মন্ত্র জপ করে ডান হাতের উপরে জল সিঞ্চন করতে হয়।
- *ওঁ বিষ্ণবে নমঃ* মন্ত্র জপ করে বাম হাতের উপরে জল সিঞ্চন করতে হয়।
- *ওঁ মধুসূদনায় নমঃ* মন্ত্র জপ করে ডান হাতের আঙুলগুলি দিয়ে ডান গাল স্পর্শ করতে হয়।
- *ওঁ ত্রিবিক্রমায় নমঃ* মন্ত্র জপ করে ডান হাতের আঙুলগুলি দিয়ে বাম গাল স্পর্শ করতে হয়।
- *ওঁ বামনায় নমঃ* মন্ত্র জপ করে ডান বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মূলদেশ দিয়ে উপরের ঠোঁট মুছে দিতে হয়।
- *ওঁ শ্রীধরায় নমঃ* মন্ত্র জপ করে ডান বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মূলদেশ দিয়ে নিচের ঠোঁট মুছে দিতে হয়।
- *ওঁ হৃষীকেশায় নমঃ* মন্ত্র জপ করে দু'হাতের উপরে জল ছিটিয়ে নিতে হয়।
- *ওঁ পদ্মনাভায় নমঃ* মন্ত্র জপ করে পায়ের উপরে জল ছিটিয়ে নিতে হয়।
- *ওঁ দামোদরায় নমঃ* মন্ত্র জপ করে মাথার উপরে জল ছিটিয়ে নিতে হয়।

---

* শাস্ত্রে নির্দেশ করা হয়েছে পূর্বমুখী বা উত্তরমুখী হয়ে পদ্মাসনে বা স্বস্তিকাসনে বসতে হয়। *পদ্মাসন*—পায়ের উপরে পা ভাঁজ করে বসে দুটি পা বিপরীত উরুদেশে স্থাপন করতে হয়। স্বস্তিকাসন—পায়ের উপরে পা ভাঁজ করে বসে গোড়ালি এমনভাবে ভাঁজ করতে হবে যাতে দুই উরু আর গুলের মাঝে পায়ের পাতা দুটি ঢুকে থাকে। হাঁটু দুটি মেঝের উপরে রাখতে হয়।

** আচমনের সময়ে উপবীতসূত্র হাতে নেওয়া কিংবা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে জড়িয়ে নেওয়া অনুচিত, কারণ ওষ্ঠ দ্বারা তা কলুষিত হয়ে যাবে—বঙ্গদেশে প্রচলিত এই প্রথার বিরোধিতা করা হয়ে থাকে।

নিচের মন্ত্রগুলি উচ্চারণের সময়ে, এইভাবে হস্তমুদ্রা সঞ্চালন করতে হয়—

● *ওঁ বাসুদেবায় নমঃ* মন্ত্র জপ করে ডানহাতের আঙুলগুলির ডগা দিয়ে উপরে এবং নিচের ঠোঁট দুটি স্পর্শ করতে হয়।

● *ওঁ সঙ্কর্ষণায় নমঃ* মন্ত্র জপ করে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী দিয়ে ডানদিকের নাসারন্ধ্র স্পর্শ করতে হয়।

● *ওঁ প্রদ্যুম্নায় নমঃ* মন্ত্র জপ করে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী দিয়ে বামদিকের নাসারন্ধ্র স্পর্শ করতে হয়।

● *ওঁ অনিরুদ্ধায় নমঃ* মন্ত্র জপ করে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দিয়ে ডান চক্ষু স্পর্শ করতে হয়।

● *ওঁ পুরুষোত্তমায় নমঃ* মন্ত্র জপ করে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দিয়ে বাম চক্ষু স্পর্শ করতে হয়।

● *ওঁ অধোক্ষজায় নমঃ* মন্ত্র জপ করে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী দিয়ে ডানদিকের কান স্পর্শ করতে হয়।

● *ওঁ নৃসিংহায় নমঃ* মন্ত্র জপ করে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী দিয়ে বাম দিকের কান স্পর্শ করতে হয়।

● *ওঁ অচ্যুতায় নমঃ* মন্ত্র জপ করে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দিয়ে নাভিদেশ স্পর্শ করতে হয়।

● *ওঁ জনার্দনায় নমঃ* মন্ত্র জপ করে ডান হাতের তালু দিয়ে বক্ষদেশ স্পর্শ করতে হয়।

● *ওঁ উপেন্দ্রায় নমঃ* মন্ত্র জপ করে ডান হাতের সমস্ত আঙুলগুলির ডগা দিয়ে মাথা স্পর্শ করতে হয়।

● *ওঁ হরয়ে নমঃ* মন্ত্র উচ্চারণ করে বাম হাতের সমস্ত আঙুলগুলির ডগা দিয়ে ডানদিকের বাহুমূল স্পর্শ করতে হয়।

● *ওঁ কৃষ্ণায় নমঃ* মন্ত্র জপ করে ডান হাতের সমস্ত আঙুলগুলির ডগা দিয়ে বামদিকের বাহুমূল স্পর্শ করতে হয়।

এখন বুকের সামনে দু'হাত জোড় করে প্রণাম-মুদ্রা প্রদর্শন সহকারে ঋগ্বেদ থেকে নিচের মন্ত্রটি জপ করতে হয়—

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা
পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।
তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবং সঃ
সমিন্ধতে বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্॥

সাধারণ দৃষ্টিতে মানুষ যেমন আকাশে সূর্যরশ্মি দেখে, জ্ঞানী ও পণ্ডিত ভগবদ্ভক্তেরা তেমনই ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পরম ধাম নিত্য দর্শন করে

থাকেন। যেহেতু ঐ সকল সুবিদিত তত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা সেই ধাম দর্শন করতে পারেন, তাই তাঁরা সেটি অন্য সকলের কাছেও প্রকটিত করতে পারেন। (ঋগ্বেদ সংহিতা)

সামান্য অর্ঘ্য স্থাপন

অর্চন শুরু করার আগেই সামান্য অর্ঘ্য স্থাপন করতে হয়। মূল শ্রীবিগ্রহের অর্চনের পূর্বে মহাজনদের অর্চনের মাধ্যমে বিকল্প সাধনের দ্বারা বিভিন্ন উপচার নিবেদনের জন্য এবং প্রোক্ষণের সাহায্যে শুদ্ধিকরণের জন্য এই পদ্ধতি কাজে লাগাতে হয়। সকালে এবং বিকালে অন্তত দিনে দু'বার টাটকা শুদ্ধ সামান্য অর্ঘ্য প্রতিষ্ঠা করা উচিত।

মনে রাখতে হবে, যে সকল মুদ্রা ভঙ্গির উল্লেখ করা হয়েছে, সেইগুলি ইচ্ছা অনুযায়ী করলেও চলে।

যথাস্থানে একটি খালি পঞ্চপাত্র রাখতে হয় এবং শুদ্ধ জল দিয়ে সেটি পরিপূর্ণ করতে হয়। আচমন পাত্র থেকে কিংবা জলকুণ্ড থেকে কয়েক ফোঁটা জল ডান হাতের আঙ্গুলগুলির উপরে ঢেলে নিয়ে পঞ্চপাত্রটিকে প্রোক্ষণের সাহায্যে শুদ্ধ করে নিতে হয়—

- *ওঁ অস্ত্রায় ফট্* মন্ত্র উচ্চারণ করে পঞ্চপাত্রটির উপর জল ছিটিয়ে দিতে হয়।
- পঞ্চপাত্রটির উপরে চক্রমুদ্রা, পরে গালীনী মুদ্রা, পরে ধনুমুদ্রা (কিংবা সুরভিমুদ্রা) প্রদর্শন করতে হয়।
- গঙ্গা এবং অন্যান্য পবিত্র নদীসমূহকে আহ্বান জানিয়ে অঙ্কুশমুদ্রা প্রদর্শন করতে হয় এবং মন্ত্রোচ্চারণ করতে হয়—

গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি ।
নর্মদে সিন্ধো কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥

পবিত্র গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্মদা, সিন্ধু, এবং কাবেরী নদীগুলি থেকে জলধারা উপস্থিত হোক।

- এখন জলের মধ্যে আটবার নীরবে বীজ-অক্ষর ওঁ মাঙ্গলিক আবাহন জানাতে হয় এবং সেই সঙ্গে পঞ্চপাত্রের উপরে বীজাক্ষরমুদ্রা ধারণ করে থাকতে হয়। তার পরে পঞ্চপাত্রের উপরে মৎস্যমুদ্রা প্রদর্শন করতে হয়।

গায়ত্রী জপ

একটি আসনে বসে বা দাঁড়িয়ে, মনঃসংযোগ সহকারে গায়ত্রী মন্ত্রাবলী জপ করতে হয়। (গায়ত্রী মন্ত্রাবলী জপের আগে, অতিরিক্ত শুদ্ধিকরণ ক্রিয়া (পূর্বাঙ্গকর্ম), যেমন দিগ্বন্ধন এবং ভূতশুদ্ধি সম্পন্ন করে নিতে পারা যায়।

জাগরণ-সেবা

শ্রীবিগ্রহকক্ষে প্রবেশ

উপকরণাদি প্রয়োজন—

● নিম্নলিখিত জিনিসগুলি যাতে থাকে, সেই বিষয়ে সুনিশ্চিত হতে হবে :

(১) থালায় একটি ছোট ঘণ্টা;

(২) সামান্য অর্ঘ্য জল সমেত একটি পঞ্চপাত্র;

(৩) গরম জলে পূর্ণ একটি ঢাকনা-দেওয়া কমণ্ডলু;

(৪) বিসর্জনীয় পাত্র (ফেলে—দেওয়া জলের জন্য);

(৫) প্রত্যেক বিগ্রহের দন্তক্ষালনের জন্য একটি করে দাঁতনকাঠি;

(৬) প্রত্যেক বিগ্রহের জন্য একটি করে জিভছোলা কাঠি (রূপোর হলেই ভাল);

(৭) প্রত্যেক বিগ্রহের হাত, মুখ ও পা মোছার জন্য একটি করে তোয়ালে;

(৮) ফুলের পাপড়ি আর তুলসীপত্র;

(৯) দীপদানী জ্বালাবার জন্য একটি লাইটার;

(১০) পূজারীর বসবার একটি আসন।

(বিকল্প : দাঁতনকাঠি, তোয়ালে এবং জিভছোলাকাঠির পরিবর্তে, সামান্য অর্ঘ্য জল নিবেদন করে যথাযথ মন্ত্রোচ্চারণ করাও চলে)

শ্রীবিগ্রহকক্ষে প্রবেশের পূর্বে

● শ্রীবিগ্রহকক্ষের বাইরে একটি আসনে বসে আচমন সম্পন্ন করতে হয়।

● শ্রীগুরুদেবের উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করে তাঁর প্রণাম-মন্ত্রটি উচ্চারণ সহকারে দিনের কার্যক্রম সুসম্পন্ন করার জন্য তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে হয়—

নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে [শ্রীগুরুদেবের নাম] *ইতি নামিনে॥*

আমার গুরুদেব শ্রীমৎ (গুরুদেবের নাম), যিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়জন, তাঁর চরণকমলে আমি আশ্রয় গ্রহণ করে আমার সশ্রদ্ধ দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন করছি।

● শ্রীবিগ্রহকক্ষের ঠিক বাইরে থেকে একটি ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে, শ্রীভগবানের জাগরণের চিন্তায় মগ্ন হয়ে তাঁর কৃপাভিক্ষা করে মন্ত্রোচ্চারণ করতে হয়—

সোঽসাবদভ্রকরুণো ভগবান্ বিবৃদ্ধ-
প্রেমস্মিতেন নয়নাম্বুরুহম্ বিজৃম্ভন্ ।
উত্থায় বিশ্ববিজয়ায় চ নো বিষাদং
মাধ্ব্যাগিরাপনয়তাৎ পুরুষঃ পুরাণঃ ॥

পরম পুরুষ অপার কৃপাময় ভগবান, তাঁর পদ্মনেত্র উন্মীলিত করে আমার প্রতি সহাস্যবদনে তাঁর করুণা বর্ষণ করুন, এই কামনা করি। তিনি সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে উত্থিত করতে পারেন এবং তাঁর নির্দেশবাণী প্রদান কৃপাপূর্বক আমাদের সমস্ত দুঃখবিষাদ অপনোদন করতে পারেন। (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৩/৯/২৫)

দেব প্রপন্নার্তিহর প্রসাদং কুরু কেশব ।
অবলোকনদানেন ভূয়ো মাং পরয়াচ্যুত ॥

হে কেশব! হে অচ্যুত ভগবান! আপনি শরণাগত জীবাত্মার আর্তি হরণ করেন। কৃপাপূর্বক আপনি আবার আমার প্রতি আপনার চিন্ময় কৃপাদৃষ্টি প্রদান করে ধন্য করুন।

জয় জয় কৃপাময় জগতের নাথ ।
সর্বজগতেরে করো শুভ দৃষ্টিপাত ॥

শ্রীবিগ্রহকক্ষে প্রবেশ প্রক্রিয়া

● শ্রীবিগ্রহকক্ষে প্রবেশের পূর্বে, হাতে তালি বাজিয়ে, ঘণ্টা বাজিয়ে কিংবা শ্রীবিগ্রহকক্ষের দরজায় টোকা দিয়ে, বা শব্দ সৃষ্টি করে শ্রীভগবানের মনোযোগ আকর্ষণ করতে হয়। দরজা খুলে, আলো জ্বালিয়ে, উৎসবের উৎসাহ নিয়ে শ্রীবিগ্রহাদির নাম জপ-উচ্চারণ করতে হয়।

জয় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ, জগন্নাথ-বলদেব-সুভদ্রা, রাধাশ্যামসুন্দর (কিংবা অন্যান্য শ্রীবিগ্রহাদির নাম) কী জয়!

● তারপরে শ্রীবিগ্রহকক্ষের মধ্যে প্রথমে ডান পা বাড়িয়ে প্রবেশ করতে হয় এবং ঘি অথবা তৈল প্রদীপগুলি জ্বালাতে হয়।

শ্রীগুরুদেব এবং শ্রীবিগ্রহাদির জাগরণ

● বাম হাতে একটি ছোট্ট ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে, শ্রীগুরুদেবের শয্যার কাছে গিয়ে, ডান হাত দিয়ে তাঁর চরণকমল স্পর্শ করে মন্ত্রোচ্চারণ করতে হয়—

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ শ্রীগুরো ত্যজ নিদ্রাং কৃপাময় ।

হে কৃপাময় শ্রীগুরুদেব, কৃপা করে আপনি নিদ্রা ত্যাগ করে উত্থান করুন।

● তার পরে শ্রীগুরুদেবের পাদুকা শয্যা থেকে নিয়ে সিংহাসনে (বেদীতে) রাখতে হয় এবং সেই সঙ্গে মগ্নচিত্তে স্মরণ করতে হয় যেন তিনি শয্যা থেকে গাত্রোত্থান করে ভক্তের সেবাগ্রহণ করতে উদ্যোগী হচ্ছেন।

অনুরূপ প্রক্রিয়া অবলম্বন করে শ্রীবিগ্রহাদির জাগরণ সম্পন্ন করতে হয়—

● শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর শয্যার কাছে গিয়ে তাঁর চরণকমল স্পর্শ করে মন্ত্রোচ্চারণ করতে হয়—

উত্তিষ্ঠ জাহ্নবেশ্বর যোগনিদ্রাং ত্যজপ্রভো ।
নাম্নোহট্টে দিব্যনামং সুশ্রদ্ধার্থং বিতরসি ॥

হে নিত্যানন্দ প্রভু, জাহ্নবেশ্বর, কৃপা করে আপনার দিব্যনিদ্রা ভঙ্গ করে গাত্রোত্থান করুন। নামহট্টের বাজারে শুধুমাত্র বিশ্বাস ও ভক্তির বিনিময়ে আপনি দিব্যনাম বিতরণ করুন।

● শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শয্যার কাছে গিয়ে, তাঁর চরণপদ্ম স্পর্শ করে জপ করতে হয়—

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ গৌরাঙ্গ জহি নিদ্রাং মহাপ্রভো ।
শুভদৃষ্টিপ্রদানেন ত্রৈলোক্যমঙ্গলং কুরু ॥

হে শ্রীগৌরাঙ্গদেব, কৃপাপূর্বক আপনি নিদ্রাভঙ্গ করে উত্থিত হোন এবং আপনার শুভদৃষ্টি প্রদান করে ত্রিলোকের মঙ্গলবিধান করুন।

● তার পরে শ্রীজগন্নাথদেবের, শ্রীবলদেবের ও শ্রীমতী সুভদ্রাদেবীর শয্যাপার্শ্বে গিয়ে একে একে তাঁদের শ্রীচরণপদ্ম স্পর্শ করে জপ করতে হয়—

ত্যজ নিদ্রাং জগন্নাথ শ্রীবলদেবোত্তিষ্ঠ চ ।
জগন্মাতার্চ সুভদ্রে উতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ শুভদে ॥

হে শ্রীজগন্নাথদেব এবং শ্রীবলদেব, কৃপাপূর্বক আপনাদের নিদ্রাত্যাগ করে উত্থান করুন। হে শ্রীমতী সুভদ্রা, সর্বজনপ্রিয়া জগন্মাতা, অনুগ্রহ করে আপনি উত্থান করে আপনার কৃপা আমাদের উপরে বর্ষণ করুন।

● তারপরে শ্রীরাধারাণীর এবং শ্রীকৃষ্ণের শয্যার কাছে গিয়ে, তাঁদের শ্রীচরণকমল স্পর্শ করে জপ করতে হয়—

ঈশ্বর শ্রীহরে কৃষ্ণ দেবকীনন্দন প্রভো ।
নিদ্রাং মুঞ্চ জগন্নাথ প্রভাতসময়ো ভবেৎ ॥

হে পরমনিয়ন্তা শ্রীহরি, শ্রীকৃষ্ণ দেবকীনন্দন হে প্রভু, হে জগন্নাথ, প্রভাত হয়েছে, আপনি কৃপা করে নিদ্রাত্যাগ করুন।

গো-গোপগোকুলানন্দ যশোদানন্দবর্ধন।
উত্তিষ্ঠ রাধয়া সার্ধং প্রাতরাসীজ্জগৎপতে ॥

হে জগৎপতি, হে গোকুলানন্দ, হে গোপীজনের আনন্দ, হে গাভীকুলের আনন্দ, হে যশোদামাতার আনন্দ, হে নন্দ মহারাজের আনন্দ—আপনি শ্রীমতী রাধারাণীকে নিয়ে শয্যাত্যাগ করুন, কারণ প্রাতঃকাল সমাসীন হল।

অন্যান্য শ্রীবিষ্ণুতত্ত্ব বিগ্রহাদির উদ্দেশ্যে নিচের মন্ত্রটি উচ্চারণ করতে হয়—

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠঃ গোবিন্দ উত্তিষ্ঠ পরমেশ্বর।
উত্তিষ্ঠ কমলাকান্ত ত্রৈলোক্যং মঙ্গলং কুরু ॥

হে গোবিন্দ, হে পরমেশ্বর, হে লক্ষ্মীপ্রিয়, কৃপা করে উত্থান করুন এবং ত্রিলোকের মঙ্গল বিধান করুন।

অন্যান্য শ্রীবিগ্রহাদির উদ্দেশ্যে মন্ত্রোচ্চারণ করতে হয় *উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ* "কৃপা করে গাত্রোত্থান করুন", এবং শ্রীবিগ্রহের নাম উচ্চারণ করতে হয়।

এর পরে বেদিতে ফিরে অন্যান্য ক্ষুদ্রাকার শ্রীবিগ্রহাদির শয্যার দিকে মনোযোগী হওয়া চলে। যদি কেবলমাত্র বৃহদাকার শ্রীবিগ্রহাদিই থাকে, তা হলে তাঁদের জাগরিত করার জন্য মগ্নচিত্ত হয়ে তাঁদের শয্যা থেকে তাঁদের বেদীতে নিয়ে আসতে হয়।

- তারপরে রাত্রিবেশ রূপে ব্যবহৃত কোনও মুকুট, শিরস্ত্রাণ, চাদর বা ওড়না শ্রীবিগ্রহাদির অঙ্গে থাকলে তা বদলে দেওয়া উচিত।

গতদিনের নিবেদিত ফুল মালা* কিছু পড়ে থাকলে, সেইগুলি শ্রীবিগ্রহকক্ষের মেঝে থেকে পরিষ্কার করে তারপর নিজের হাত ধুয়ে ফেলতে হয়।

প্রাতঃকালীন নিবেদনের উপকরণাদি

নিচের মন্ত্রগুলি উচ্চারণের সাথে, যথাযথ উপকরণাদি যদি পাওয়া যায়, তবে তা নিবেদন করা যেতে পারে, নচেৎ, তার পরিবর্তে পঞ্চপাত্র থেকে সামান্য অর্ঘ্য জল নিবেদন করতে হয়—

---

* বিগত সন্ধ্যায় যে মালা নিবেদিত হয়েছে এবং পূর্বদিনে যে তুলসীপত্র নিবেদিত হয়েছে, তা পরদিন মঙ্গল আরতি পর্যন্ত শ্রীবিগ্রহাদির অঙ্গে থাকতে পারে।

● *ইদম্ আচমনীয়ম্* এবং গুরুমূল মন্ত্র উচ্চারণ করে মুখে জল সিঞ্চন করতে হয়, হাতের বাকি জল বিসর্জনপাত্রে বর্জন করতে হয়।

● *এষ দন্তকাষ্ঠঃ* এবং গুরুমূল মন্ত্র উচ্চারণ করে, দাঁত মাজার জন্য একটি দাঁতনকাঠি নিবেদন করতে হয়।

● *ইদম্ জিহ্বোল্লেখনম্* এবং গুরুমূল মন্ত্র উচ্চারণ করে, একটি জিভছোলার কাঠি নিবেদন করতে হয়।

● *ইদং হস্তমুখপ্রক্ষালনম্* এবং গুরুমূল মন্ত্র উচ্চারণ করে, হাত ও মুখ ধোওয়ার জল নিবেদন করতে হয়।

● *ইদম্ আচমনীয়ম্* এবং গুরুমূল মন্ত্র উচ্চারণ করে, আচমনের জন্য জল নিবেদন করতে হয়।

● *ইদম্ অঙ্গবস্ত্রম্* এবং গুরুমূল মন্ত্র উচ্চারণ করে, তোয়ালে দিয়ে শ্রীগুরুদেবের হাত ও মুখ শুকনো করে মুছে দিতে হয়।

এবার, একই উপকরণাদি একে একে ক্রমানুসারে যথাযথ মূলমন্ত্রাদি উচ্চারণ সহকারে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীমতী সুভদ্রা, শ্রীবলদেব, শ্রীজগন্নাথদেব, শ্রীমতী রাধারাণী এবং শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যেও নিবেদন করতে হয়।

● অবশেষে, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীচরণে (এবং অন্যান্য বিষ্ণুতত্ত্ব বিগ্রহাদির চরণে) তুলসীপত্র নিবেদন করে মন্ত্রোচ্চারণ করতে হয়—

এতৎ তুলসীপত্রম্ (কিংবা একাধিক পত্র হলে, *এতানি তুলসীপত্রাণি*) এবং মূলমন্ত্র।

এইভাবে শ্রীবিগ্রহাদির জাগরণ সুসম্পন্ন হয়ে গেলে, শ্রীবিগ্রহকক্ষের বাইরে গিয়ে তাঁদের উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন করা যেতে পারে।

ভোগ-অর্পণ

শ্রীবিগ্রহের উদ্দেশ্যে আহার্য নিবেদনের পূর্ণাঙ্গ মর্যাদাসম্পন্ন পদ্ধতি এখানে বর্ণিত হচ্ছে। সারাদিনের মধ্যে বিবিধ ভোগ অর্পণের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে। পূর্বে তৃতীয় অধ্যায়ে ভোগ অর্পণের সহজ সরল পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছিল। কোনও কোনও মন্দিরে হয়ত ঐ সহজ সরল ভোগ অর্পণ পদ্ধতিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য—বিশেষত ঊষাকালে মঙ্গল-আরতির আগে বাল্যভোগ অর্পণ, বিকালে বৈকালিক ভোগ এবং সন্ধ্যা শেষে রাত্রিকালীন ভোগ অর্পণের ক্ষেত্রে। এখন বিশদভাবে ভোগ অর্পণ করা চলতে পারে প্রাতরাশ ভোগ, মধ্যাহ্নে রাজভোগ, এবং সন্ধ্যারম্ভের ভোগ অর্পণের সময়ে।

প্রয়োজনীয় উপকরণাদি

● নিম্নলিখিত জিনিসগুলি আছে কিনা সুনিশ্চিত হয়ে নিতে হবে—

(১) থালার উপরে ছোট একটা ঘণ্টা,
(২) সামান্য অর্ঘ্য জলপূর্ণ পঞ্চপাত্র,
(৩) জলপূর্ণ কমণ্ডলু,
(৪) বাটিতে বা পাত্রে চামচ সহ পাদ্য এবং আচমনীয় জল,
(৫) বিসর্জনীয় পাত্র (পরিত্যক্ত জল ফেলার জন্য),
(৬) ভোগপাত্রাদি রাখার জন্য নিচু চৌকি,
(৭) শ্রীগুরুদেব ও শ্রীবিগ্রহাদির জন্য আসনাদি,
(৮) ভোগ নৈবেদ্য,
(৯) পুষ্পরাজি ও তুলসীপত্র,
(১০) পিলসুজ প্রদীপ প্রজ্বলনের জন্য লাইটার,
(১১) পূজারীর জন্য আসন

প্রাথমিক করণীয়

● শ্রীবিগ্রহকক্ষের বাইরে, আচমন সম্পন্ন করে শ্রীগুরুদেব এবং শ্রীবিগ্রহাদির উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করার সময় প্রণাম মন্ত্রসহ প্রার্থনা।

● হাতে তালি বাজিয়ে বা শ্রীবিগ্রহকক্ষের দরজায় মৃদু আঘাত করে শ্রীবিগ্রহাদির নাম জপ করতে করতে কক্ষে প্রবেশ।

● ভোগ অর্পণের জায়গাটি পরিষ্কার করে, নৈবেদ্য গ্রহণের জায়গাগুলি (টেবিল বা গদি) সাজিয়ে নিয়ে, সেগুলি ঝেড়ে মুছে তারপরে নিজের হাত ধুয়ে নিতে হয়।

● *এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ* এবং গুরুমূলমন্ত্র জপ করে শ্রীগুরুদেবের পাদমূলে কিছু পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনের মাধ্যমে শ্রীবিগ্রহাদির সেবা অধিকার প্রার্থনা করতে হয়। (প্রয়োজন হলে, পুষ্পার্ঘ্যের পরিবর্তে পঞ্চপাত্র থেকে সামান্য অর্ঘ্য জল নিবেদন করা চলতেও পারে।) তারপরে মন্ত্রোচ্চারণ করতে হয় —

শ্রীগুরো পরমানন্দ প্রেমানন্দ ফলপ্রদ।
ব্রজানন্দপ্রদানন্দসেবায়াং মা নিয়োজয় ॥

হে প্রিয় গুরদেব, সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেমানন্দের ফলপ্রদায়ক, পরমানন্দ বিধায়ক, কৃপা করে আমাকে ব্রজানন্দপ্রেমানন্দ শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত করুন।

● *ইদম্ আসনম্* এবং গুরুমূলমন্ত্র জপ করে, শ্রীগুরুদেবকে উপবেশনের জন্য একটি আসন নিবেদন করতে হয়।

ভোগ শুদ্ধি

● ভোগ নিবেদনের থালা এনে টেবিলে বা চৌকির উপরে রাখতে হবে। তারপর প্রত্যেক থালায় ডান হাত দিয়ে কয়েক ফোঁটা সামান্য অর্ঘ্য জল সিঞ্চন করে *ওঁ অস্ত্রায় ফট্* মন্ত্রটি প্রত্যেক থালার উদ্দেশ্যে উচ্চারণ করতে হয়।

● তারপরে, বীজাক্ষর মুদ্রা প্রদর্শন করতে করতে প্রত্যেক শ্রীবিগ্রহের উদ্দেশ্যে আটবার করে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করে যথাযথ ভোগ থালায় নিবেদন করতে হবে—প্রত্যেক থালার উপরে বাম হাতের উপরে ডান হাত রেখে (তালু নিম্নমুখী করে) ডান হাতের করকোষ্ঠিতে মূলমন্ত্র উচ্চারণ সংখ্যা গণনা করতে হয়, গায়ত্রী জপের মতো। (যদি একটি থালা একাধিক শ্রীবিগ্রহের ভোগার্থে নিবেদিত হয়ে থাকে, তবে সেই গোষ্ঠীর মূল শ্রীবিগ্রহের মূল মন্ত্রটি জপ করতে হয়। যেমন, একটি থালাতেই যদি শ্রীজগন্নাথদেব, শ্রীমতী সুভদ্রাদেবী, ও শ্রীবলরামের উদ্দেশ্যে ভোগ নিবেদিত হতে থাকে, তা হলে *ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ* মন্ত্রটি উচ্চারণ করতে হয়। একই থালার ভোগে যদি সমস্ত শ্রীবিগ্রহাদি অংশগ্রহণ করেন, তবে মূল শ্রীবিগ্রহের মূলমন্ত্রটি জপ করা উচিত।

● প্রত্যেক থালায় ভোগ প্রস্তুতির উপরে তুলসীপত্র রাখতে হয়। (শ্রীগুরুদেব এবং শ্রীমতী রাধারাণীর ভোগ থালার উপরেও তুলসীপত্র রাখা চলে, কারণ তাঁরা ভোগ গ্রহণের পূর্বে প্রথমেই উভয়ে শ্রীকৃষ্ণকে তা নিবেদন করবেন।) সম্ভব হলে, প্রত্যেকটি আহার্য সম্ভারের বিভিন্ন পদের উপরেও তুলসীপত্র রাখা যেতে পারে।

ভোজনার্থে শ্রীভগবানকে আমন্ত্রণ

● নিম্ন পর্যায় থেকে ক্রমশ উচ্চ পর্যায়ের শ্রীবিগ্রহাদির প্রত্যেকের শ্রীচরণে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন সহকারে *এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ* ও মূলমন্ত্র উচ্চারণ সহ তাঁদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে হয়।

● যদি কোনও কুশাসন কিংবা গদি বসবার জন্য নিবেদন করতে না পারা যায়, তা হলে শ্রীবিগ্রহাদির ভোগ থালার পেছনে কিছু পুষ্পাকোরকাদি রেখে, নিম্ন থেকে উচ্চ পর্যায়ের শ্রীবিগ্রহাদির প্রত্যেকের *ইদম্ আসনম্* ও মূল মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে তাঁদের ভোগ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে হয়।

● আসনে বসে বামহাতে ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে শ্রীগুরুদেবকে প্রথমে এবং তারপরে শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁর পার্ষদবৃন্দ থেকে শুরু করে ক্রমশ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর পার্ষদবৃন্দ পর্যন্ত সকল শ্রীবিগ্রহাদিকে পাদ্য এবং আচমন জল নিবেদন করতে হয়। এই সময়ে উচ্চারণ করতে হয়—

এতৎ পাদ্যম্ এবং মূল মন্ত্র প্রত্যেক শ্রীবিগ্রহের উদ্দেশ্যে, এবং *ইদম্ আচমনীয়ম্* ও মূলমন্ত্র।

প্রত্যেকবার পাদ্য এবং আচমনীয় জল নিবেদনের পরে তা বিসর্জনীয় পাত্রে ঢেলে দিতে হয়।

ভোগ নিবেদন

● হস্তমুদ্রা সহকারে প্রত্যেক শ্রীবিগ্রহের উদ্দেশ্যে ভোগের থালাটি দেখিয়ে দিয়ে এবং নিচের মন্ত্রাবলী উচ্চারণের সাথে তা নিবেদন করতে হয়—

ইদং *নৈবেদ্যম্* এবং মূলমন্ত্র,
ইদং *পানীয়ম্* এবং মূলমন্ত্র

(কিংবা, বাল্যভোগ ও বৈকালিক ভোগ নিবেদনের সময়ে ইদং *মিষ্টান্নপানীয়াদিকং সর্বম্* (ফল, মিষ্টান্ন ও পানীয় ইত্যাদি) ও মূলমন্ত্র প্রত্যেক বিগ্রহাদির উদ্দেশ্যে উচ্চারণ করা যেতে পারে), এবং প্রাতরাশ, মধ্যাহ্নভোগ ও সান্ধ্যভোগের সময়ে ইদং *অন্নব্যঞ্জনপানীয়াদিকং সর্বম্* (শস্যাদি, সবজি ও পানীয় ইত্যাদি) ও মূলমন্ত্র প্রত্যেক শ্রীবিগ্রহাদির উদ্দেশ্যে উচ্চারণ করা চলে।)

● শ্রীবিগ্রহাদির সেবায় শ্রীগুরুদেবের সাথে সহযোগিতার অনুমতি প্রার্থনা করে একটি ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে তিনবার শ্রীগুরুদেবের উদ্দেশ্যে প্রণাম মন্ত্রটি উচ্চারণ করতে হয়—

নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে [শ্রীগুরুদেবের নাম] *ইতি নামিনে ॥*

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম শরণাগত আমার শ্রীগুরুদেবের উদ্দেশ্যে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাই।

● শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা অভিলাষী হয়ে নিচের প্রার্থনাটি তিনবার উচ্চারণ করতে হয়—

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায়তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥

হে মহাবদান্য অবতার! আপনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। আপনি শ্রীমতী রাধারাণীর গৌর দেহকান্তি গ্রহণ করেছেন, এবং শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম অকাতরে বিতরণ করছেন। আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ ভক্তিপ্রণতি জানাই। (*চৈঃ চঃ মধ্য* ১৯/৫৩)

● পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করে নিচের প্রার্থনাটি তিনবার উচ্চারণ করতে হয়—

নমো ব্রাহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

সকল ব্রাহ্মণগুণসম্পন্ন মানুষের আরাধ্য শ্রীবিগ্রহ, গোজাতি ও ব্রাহ্মণকুলের হিতাকাঙ্ক্ষী, এবং সমগ্র জগতের নিত্য হিতকারী পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দের উদ্দেশ্যে আমি বারংবার প্রণতি জানাই। (*বিষ্ণুপুরাণ*)

● শ্রীবিগ্রহকক্ষ পরিত্যাগ করে গায়ত্রীমন্ত্র জপ করা উচিত। গুরুপ্রদত্ত মন্ত্রাবলী এই সময়ে উচ্চারণ করা যেতে পারে।* শ্রীভগবান ভোগ আহার করছেন, সেই চিন্তায় মগ্ন হতে হয়। শ্রীভগবান যতক্ষণ ভোগ গ্রহণ করছেন, ততক্ষণ নিজের পছন্দমতো বিভিন্ন শ্লোকাবলী উচ্চারণ করা যেতে পারে, কিংবা বিশেষ করে প্রাতঃরাশ অথবা মধ্যাহ্ন ভোগ নিবেদনের সময়ে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ভোগারতি' গানটি উচ্চারণ করা যেতে পারে।

● নির্দিষ্ট কিছু সময় (সাধারণত পনের থেকে কুড়ি মিনিট, বাল্যভোগ নিবেদনের ক্ষেত্রে দশ মিনিট) পরে, দরজায় শব্দ করে, হাতে তালি বাজিয়ে বা ঘণ্টা বাজিয়ে আবার শ্রীবিগ্রহকক্ষে প্রবেশ করতে হয়।

শ্রীভগবানের ভোজন শেষে

● আসনে বসে বামহাতে ঘণ্টা বাজিয়ে জল সিঞ্চন করতে হয়। প্রধান শ্রীবিগ্রহ থেকে শুরু করে, পর পর যে সমস্ত বিগ্রহের জন্য ভোগথালা নিবেদিত হয়েছিল, তাঁদের প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয়—

ইদম্ হস্তমুখপ্রক্ষালনম্ এবং প্রত্যেকে শ্রীবিগ্রহের মূলমন্ত্র, আর হাত মুখ ধোওয়ার জন্য জল অর্পণ করতে হয়,

এতৎ পাদ্যম্ এবং প্রত্যেক শ্রীবিগ্রহের মূলমন্ত্র,
ইদম্ আচমনীয়ম্ এবং প্রত্যেক শ্রীবিগ্রহের মূলমন্ত্র ।

● শ্রীভগবানকে তাঁর বেদীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ধ্যানমগ্ন হয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করতে হয়—

ইদম্ আসনম্ এবং মূলমন্ত্র ।

● **জপ করুন :**

ইদম্ তাম্বূলম্ ও মূলমন্ত্র উচ্চারণ সহকারে প্রত্যেক শ্রীবিগ্রহের উদ্দেশ্যে তাম্বূলাদি নিবেদন করতে হয়।

---

* সংক্ষিপ্ত ভোগ নিবেদনের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র ব্রহ্মগায়ত্রী (গুরুপ্রদত্ত সাতটি মন্ত্রের প্রথমটি) কিংবা গোপাল মন্ত্র (গুরুপ্রদত্ত সাতটি মন্ত্রের ষষ্ঠ মন্ত্রটি) জপ করা চলে।

শ্রীভগবানের পার্ষদবর্গের উদ্দেশ্যে প্রসাদ নিবেদন

● শ্রীভগবানের প্রসাদ অবিশিষ্ট নিচের মন্ত্রাবলী উচ্চারণ সহকারে শ্রীগুরুদেব, শ্রীল প্রভুপাদ* এবং শ্রীভগবানের পার্ষদবর্গের উদ্দেশ্যে নিবেদন করতে হয়—

ইদং মহাপ্রসাদম্ এবং গুরুমূল মন্ত্র,
ইদং মহাপ্রসাদম্ ওঁ ইসকন সংস্থাপকাচার্যায় নমঃ,
ইদং মহাপ্রসাদম্ ওঁ সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদেভ্যো নমঃ।

● সবশেষে, থালাগুলি সরিয়ে নিয়ে প্রসাদ ভোজনের জায়গাটি মুছে দিতে হবে। হাত ধুয়ে, শ্রীগুরুদেব এবং শ্রীবিগ্রহাদির উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাতে হয়।

আরতি উৎসব

প্রত্যেকটি নির্ধারিত ভোগ নিবেদনের পরেই চলে আসে আরতি অনুষ্ঠান। প্রকাশ্যে শ্রীবিগ্রহ আরাধনার নিয়মসেবায় দৈনন্দিন অনুষ্ঠান বলতে কীর্তন ছাড়া অন্যটি হল এই আরতি নিবেদন।

প্রয়োজনীয় পরিকরাদি

● নিচের জিনিসগুলি থাকা চাই—

সকল আরতির জন্য :

১) থালায় একটি ঘণ্টা,

২) সামান্য-অর্ঘ্যজল (কিংবা শুধুই বিশুদ্ধ জল) পূর্ণ পঞ্চপাত্র এবং একটি কুশি (চামচ),

---

* দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'গুরুপূজা' পর্যায়ে উল্লেখ করা আছে যে, শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে পূজা নিবেদনের আগে শ্রীগুরুদেবের উদ্দেশ্যে পূজা নিবেদন করতে হয়। তা ছাড়া, সাক্ষাৎ শিষ্যসমূহ ছাড়াও, ইসকনের সকল সদস্যের পক্ষেই, আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য এবং ইসকনের সমস্ত ভক্তমণ্ডলীর শিক্ষাগুরু স্বরূপ শ্রীল প্রভুপাদের উদ্দেশ্যে ভক্তি প্রণতি নিবেদন ও পূজা করা প্রয়োজন। শ্রীল প্রভুপাদের গুরুপূজা অনুষ্ঠান পালন ছাড়াও, শ্রীবিগ্রহাদির উদ্দেশ্যে ভোগ নিবেদন পর্বের শেষে প্রসাদ নিবেদনের সময়েও নিজ গুরুদেবের উদ্দেশ্যে প্রসাদ অর্পণের পরে তা শ্রীল প্রভুপাদকেও নিবেদনের মাধ্যমে তাঁর মর্যাদা রক্ষা করা উচিত। সেইভাবে, আরতির সময়েও নিজ গুরুদেবের উদ্দেশ্যে আরতি উপকরণাদি নিবেদনের পরে সেইগুলি শ্রীল প্রভুপাদের প্রীতিবিধানের মানসেও নিবেদন করা বিধেয়।

৩) শঙ্খ (বাজানোর জন্য) এবং সেটি শোধনের জন্য ঘটিভর্তি জল,

৪) শঙ্খ শোধনের জল রাখার পাত্র (মন্দির কক্ষে শ্রীবিগ্রহকক্ষের ঠিক বাইরে)।

তা ছাড়া, পূর্ণাঙ্গ আরতির জন্য :

১) ধূপদানি এবং বিজোড় সংখ্যক ধূপকাঠি,

২) কর্পূরদীপদানি (মধ্যাহ্ন আরতির জন্য),

৩) ঘৃতদীপদানি এবং বিজোড় সংখ্যক সলতে (অন্তত পাঁচটি),

৪) অর্ঘ্যজলের জন্য শঙ্খ ও শঙ্খদানি,

৫) জলপূর্ণ কমণ্ডলু (শঙ্খের মধ্যে অর্ঘ্যজল নিবেদনের জন্য),

৬) নিবেদিত অর্ঘ্যজলের জন্য ছোট বিসর্জনীয় পাত্র,

৭) রুমাল,

৮) থালাভর্তি ফুল,

৯) চামর,

১০) ময়ূরপঙ্খী পাখা (কেবল গ্রীষ্মকালে)।

ধূপ-আরতির জন্য :

১) বিজোড় সংখ্যক ধূপকাঠি সমেত ধূপদানি,

২) থালাভর্তি ফুল,

৩) চামর,

৪) ময়ূরপঙ্খী পাখা (কেবল গ্রীষ্মকালে)।

আরতির প্রারম্ভিক কার্যাবলী

● শ্রীবিগ্রহ-কক্ষের বাইরে, আচমন সম্পন্ন করে নিয়ে (তা যদি পূর্বের সেবা নিবেদনের সময়ে না করা হয়ে থাকে), আরাধনা নিবেদনে শ্রীগুরুদেবের ব্রতসাধনে সহযোগিতার জন্য তাঁর অনুমতি প্রার্থনা করে তাঁর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করতে হয়।

● সামান্য অর্ঘ্য জল এনে রাখতে হবে, কিংবা সরলভাবে আরাধনা করার ক্ষেত্রে, বিশুদ্ধ জল ও কুশি সমেত পঞ্চপাত্র থাকা চাই।

● যেখানে আরতির পরিকরাদি রাখা হবে (ছোট নিচু টেবিল-টুল, কিংবা মেঝে, অথবা স্থান সঙ্কুলান হলে, বেদির উপরেই) পরিষ্কার করে নিতে হবে, পরিকরাদি সমেত থালাটি এনে আরতির ক্রম অনুসারে সেইগুলি সাজিয়ে সাজিয়ে রাখতে হবে।

● এবার একটি দীপদানি কিংবা ঝুলন্ত তৈলপ্রদীপ বা ঘৃতপ্রদীপ জ্বেলে নিতে পারা যায়, যা থেকে ধূপ এবং আরতি দীপগুলি জ্বালাতে হবে।*

আরতি নিবেদন গ্রহণের জন্য শ্রীভগবানের প্রতি মিনতি (পুষ্পাঞ্জলি)

● ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে, শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে এবং পরে প্রত্যেক শ্রীবিগ্রহের পাদপদ্মে পুষ্পরাজি নিবেদন করে, আরতি উৎসবের নৈবেদ্য গ্রহণের জন্য প্রত্যেক শ্রীবিগ্রহের উদ্দেশ্যে মিনতি জানাতে হয়। পুষ্পাঞ্জলি নিবেদনের ক্রমানুসার হয় এইভাবে—শ্রীগুরুদেব, শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীমতী সুভদ্রা, শ্রীবলদেব, শ্রীজগন্নাথ, শ্রীমতী রাধারাণী, এবং শ্রীকৃষ্ণ ভগবান। পুষ্পরাজি নিবেদনের সময়ে, *এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ* মন্ত্র এবং প্রত্যেক শ্রীবিগ্রহের মূলমন্ত্র জপ করতে হয়। কিংবা সরল আরাধনার ক্ষেত্রে, কেবলমাত্র বলতে হয়, "কৃপা করে এই সমর্পিত পুষ্পরাজি গ্রহণ করুন।" (প্রয়োজন হলে, পুষ্পরাজির পরিবর্তে এক-এক কুশি জল পঞ্চপাত্র থেকে নিয়ে এক-একজন শ্রীবিগ্রহের উদ্দেশ্যে ধারণ করে সেটি বিসর্জনীয় পাত্রে ফেলে দিতে হয়, কিংবা শুধুই মানসভাবে তাঁদের উদ্দেশ্যে পুষ্পকোরক নিবেদন করতে হয়।

● আবার ঘণ্টা বাজিয়ে, শ্রীবিগ্রহকক্ষের দরজাগুলি খুলে দিতে হয়। তারপরে, ধ্বনিশঙ্খটি ও জলের ঘটি তুলে নিয়ে শ্রীবিগ্রহকক্ষের বাইরে গিয়ে (ঘণ্টা ছাড়া), তিনবার শঙ্খধ্বনি করে, বাইরে-রাখা একটি পাত্রের উপর সেটি জলে ধুয়ে নিয়ে আবার শঙ্খ ও ঘটি ভেতরে এনে রাখতে হয়। (ঘটির উপরে শঙ্খটিকে আড়ভাবে রাখা চলে।) এর পরে পঞ্চপাত্র থেকে জল নিয়ে হাত ধুয়ে ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে পর্দা খুলে দিতে হয়।

---

* নিবেদিত ধূপকাঠিগুলি ব্যবহার করে প্রদীপগুলি জ্বালানো ঠিক নয়। তা ছাড়া, দীপদানি বা ঝুলন্ত দীপের শিখায় সরাসরি ঠেকিয়ে নৈবেদ্যের ঘৃত প্রদীপগুলি জ্বালিয়ে নেওয়াও ভাল নয়। তার বদলে, নিবেদিত হয়নি এমন একটি নতুন ধূপকাঠি বা সরু কাঠের শলাকা বা শক্ত খড় বা কুশডগায় তুলো জড়িয়ে নিয়ে তা ঘিয়ে ডুবিয়ে ব্যবহার করা চলে, সেটি বিঘৎখানেক লম্বা হওয়া চাই। নৈবেদ্যের ঘৃতপ্রদীপ এইভাবে জ্বালিয়ে নেওয়ার পরে, কাঠিটার দগ্ধ প্রান্তটুকু ক্ষণিকের জন্য দীপদানির তেলে বা ঘিয়ে ডুবিয়ে নিয়ে আগুন নিভিয়ে ফেলতে হয়। (পুষ্পাঞ্জলি নিবেদনের আগেই আরতি নিবেদনের উদ্দেশ্যে ধূপ জ্বালিয়ে নিতে পারা যায়।)

ঘি, নারকেল তেল, তিল তেল বা সরষের তেলের দীপের বদলে মোমবাতি জ্বালানো অবশ্য নিম্নশ্রেণীর বিকল্প। সম্ভব হলে, বেদিমূলে মোমবাতি বর্জন করা উচিত, কিন্তু দীপের জন্য তেল বা ঘি না পাওয়া গেলে, আসল মৌচাকের মোম দিয়ে তৈরি বাতি খুঁজে আনতে চেষ্টা করা উচিত। সাধারণভাবে বলতে গেলে, দুর্ঘটনা যাতে না হয়, তার জন্য অতি সতর্কভাবে আগুন নাড়াচাড়া করতে হয়। শ্রীবিগ্রহকক্ষে এবং ভোগরন্ধনকক্ষে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র বা আগুন নেভাবার উপযোগী ভারী কম্বল রাখা উচিত।

● আরতি উৎসব অনুষ্ঠানের সময়ে, ভক্তরা মন্দিরে কীর্তন করতে থাকবেন। দুর্ভাগ্যবশত কীর্তনের জন্য কেউ যদি মন্দিরে না থাকেন, তবে আরতি করতে করতে পূজারী কীর্তন গাইতে বা বাণীবদ্ধ কীর্তন বাজাতেও পারেন।

উপচারাদি পরিশোধন

প্রত্যেকটি উপচার নিবেদনের আগে, পঞ্চপাত্র থেকে জল নিয়ে পূজারীর নিজ ডান হাতে এবং উপচারে তা সিঞ্চন করে পরিশোধন করে নিতে হয়। দুটি পদ্ধতির যে কোনও একটি পালন করে উপচার পরিশোধন করা চলে : (১) কয়েক ফোঁটা জল নিজের ডানহাতে রেখে তা মৃদুভাবে হাত দিয়ে উপচারের উপরে সিঞ্চন করে দিতে হয়, যাতে ঐ জল আঙুলের ডগা দিয়ে নেমে আসে, কিংবা (২) ডানহাতে জলের কুশিটা নিয়ে তা থেকে সরাসরি উপচারের উপরে জল সিঞ্চন করতে হয়। এছাড়া, ইচ্ছা হলে, ঐ দুটি পদ্ধতির সঙ্গে চক্রমুদ্রা, ধেনুমুদ্রা (কিংবা সুরভিমুদ্রা), এবং মৎস্য মুদ্রাগুলি প্রত্যেকটি উপকরণের উপরে প্রদর্শন করা চলে যাতে আরও সূক্ষ্ম পরিশোধন এবং সুরক্ষা সুনিশ্চিত হতে পারে।

নিবেদনের পদ্ধতি

● আসনের উপরে দাঁড়িয়ে এবং ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে, ধূপকাঠি প্রথমে শ্রীগুরুদেবের উদ্দেশ্যে তিন অথবা সাতবার মনোরম ভঙ্গিতে ঘুরিয়ে দেখিয়ে, এবং তার পরে তা একইভাবে শ্রীল প্রভুপাদকে এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দেখাতে হয়।

আরতি উপকরণাদি মনোরম ভাবে নিমগ্নচিত্তে নিবেদন করা কর্তব্য। কিন্তু খুব দ্রুত অথবা খুব ধীরে ধীরে নিবেদন করা ভাল নয় এবং নিবেদনের ভঙ্গিমা যেন খুব লোকদেখানো না হয়, তবে তা অবশ্যই শ্রীগুরুদেব এবং সমবেত বৈষ্ণবজনমণ্ডলীর বিনীত সেবক রূপে প্রদর্শিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বেদির বামদিকে দাঁড়াতে হয় (মন্দিরকক্ষ থেকে যেমন দেখায়)—লোকচক্ষুর অন্তরালে নয়, অথচ শ্রীবিগ্রহাদির দর্শনপথের বিঘ্ন যেন না ঘটে।

শ্রীল প্রভুপাদের সাক্ষাৎ শিষ্য নন যে সমস্ত ভক্ত, তাঁরা—নিজ নিজ গুরুদেবের আরাধনার সাথে, ইসকনে অবস্থানকারী সমস্ত ভক্তগণের সঙ্গে কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদকেও ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্যরূপে এবং ইসকনের সমস্ত ভক্তমণ্ডলীর শিক্ষাগুরু রূপে আরাধনা করে থাকেন। শ্রীল প্রভুপাদের গুরু-পূজা অনুষ্ঠানের সময়ে তাঁর বন্দনা করা সত্ত্বেও, আরতির সময়েও আরতির উপকরণাদি নিজ গুরুদেবের উদ্দেশ্যে নিবেদনের পরে শ্রীল প্রভুপাদের উদ্দেশ্যেও তাঁর সম্মানার্থে নিবেদন করতে হয়।

● তার পরে, সব কিছুই নিজ গুরুদেবের পক্ষে এবং শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আশীর্বাদসহ নিবেদিত হচ্ছে, সেই বিষয়ে সচেতন হয়ে প্রধান বিগ্রহের উদ্দেশ্যে তা নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী পরিপূর্ণ সংখ্যক ক্রম অনুসারে নিবেদন করতে হয়।

● প্রধান বিগ্রহের উদ্দেশ্যে ধূপ নিবেদনের পরে, সেটি প্রসাদরূপে নিম্নক্রমানুসারে (অবরোহ ক্রমে) শ্রীভগবানের পার্ষদবর্গের এবং গুরু পরম্পরার সকলকে—প্রবীণতম থেকে কনিষ্ঠতম সকলকে—নিবেদন করতে হয়। সময়-সুযোগ অনুপাতে, প্রত্যেক জনের উদ্দেশ্যে সাত কিংবা তিনবার চক্রাকারে নিবেদন করা যেতে পারে। (কোনও কোনও পদ্ধতি-পুস্তকে বলা হয়েছে যে, আরতির সময়ে প্রসাদরূপে কিছু নিবেদনের সময়ে, কটিদেশের নিম্নভাগে নিবেদন করা অনুচিত।)

● তার পরে সেটি (একবার বা তিনবার চক্রাকারে ঘুরিয়ে) সমবেত বৈষ্ণবজনের উদ্দেশ্যে শ্রীভগবান এবং তাঁর পার্ষদবর্গের প্রসাদরূপে নিবেদন করা উচিত।

● অবশিষ্ট উপকরণগুলিও একইভাবে নিবেদন করা যেতে পারে। প্রত্যেকটি উপচার নিবেদনের সময়ে মৃদু স্বরে উপচারটির নামোল্লেখ করতে হয় এবং যে বিগ্রহের অর্চন করা হচ্ছে, তাঁর উদ্দেশ্যে যথাযথ মূলমন্ত্রটি উচ্চারণ করা উচিত। কিংবা সহজ সরল অর্চন পদ্ধতি অনুসারে, শুধুমাত্র প্রত্যেক বিগ্রহের উদ্দেশ্যে বলা চাই, "কৃপা করে এই [ধূপ, দীপ, ইত্যাদি] নিবেদন গ্রহণ করুন।"

● নিবেদিত উপকরণগুলির সাথে অনিবেদিত উপকরণগুলি একসাথে মিশে যেন না যায়। পরিকরাদি আনবার সময়ে যে থালিটি ব্যবহার করা হয়েছিল, তাতেই উপকরণগুলি আবার তুলে রাখা যেতে পারে, তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন নিবেদন করা হয়নি এমন উপকরণগুলি ঐসঙ্গে মিশে না যায়।

প্রত্যেকটি উপকরণ কিভাবে নিবেদন করতে হয়

চামর ও পাখা ছাড়া, সব উপকরণগুলিই বাম দিক থেকে ডান দিকে ঘড়ির কাঁটার মতো ঘুরিয়ে দেখাবার সময়ে বাম হাতে (কোমরের উপরে) ঘণ্টা বাজাতে হয় এবং শ্রীবিগ্রহাদির উদ্দেশ্যে মনোযোগ নিবদ্ধ করতে হয়।

● **ধূপ :** শ্রীভগবানের সমগ্র দিব্য শরীরের চারপাশে সাতবার* চক্রাকারে ঘুরিয়ে নিবেদন করতে হয়।

● **দীপ :** ভগবানের পাদপদ্মে চারবার চক্রাকারে ঘুরিয়ে দেখাতে হয়,

---

* ধূপ, অর্ঘ্য, বস্ত্র, এবং পুষ্পাদি সময়াভাবে কমসংখ্যক চক্রাকারে প্রদর্শন করাও চলে। আরতি অনুষ্ঠানের মূল উপকরণ হল দীপ, যার জন্য শাস্ত্রে নির্দিষ্ট সংখ্যক চক্রাকারে প্রদর্শনের বিধি রয়েছে। সাধারণত, অর্ঘ্য নিবেদনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সংখ্যক চক্রাকারে তা প্রদর্শনের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয় না।

নাভিদেশের উদ্দেশ্যে দু'পাক, এবং শ্রীভগবানের মুখমণ্ডলে এলে তিন পাক ঘোরাতে হয়, তারপরে তাঁর সর্বাঙ্গে সাত পাক দীপ দেখাতে হয়।

● **শঙ্খ নিয়ে অর্ঘ্য :** শ্রীভগবানের শিরোদেশে তিন পাক নিবেদন এবং তাঁর সমগ্র দিব্যদেহে সাত পাক নিবেদন করতে হয়। তারপরে সামান্য পরিমাণে অর্ঘ্য জল বিসর্জনীয় পাত্রে ফেলে দিতে হয় এবং পরবর্তী শ্রীবিগ্রহের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য নিবেদনে অগ্রসর হতে হয়।

(আরতি অর্ঘ্য : বিশুদ্ধ বা সুগন্ধি জল)

● **বস্ত্র :** শ্রীভগবানের শরীরের চারিধারে সাতপাক ঘোরাতে হয়।

● **পুষ্পাদি :** শ্রীভগবানের শরীরের চারিধারে সাতপাক ঘোরাতে হয়।

● **চামর :** শ্রীভগবানের সামনে যথোপযুক্তভাবে কয়েকবার দোলাতে হয়।*

● **পাখা :** শ্রীভগবানের সামনে যথোপযুক্তভাবে কয়েকবার দোলাতে হয়।

শ্রীবিগ্রহাদির উদ্দেশ্যে দীপগুলি নিবেদিত হয়ে যাওয়া মাত্রই সেইগুলি সমবেত ভক্তমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে এগিয়ে দিতে পারা ভাল, অনেক মন্দিরের প্রথা আছে—আরতির বিঘ্ন না ঘটিয়ে অর্ঘ্য জল এবং পুষ্পাদি আরতির শেষে শঙ্খধ্বনির পরে বিতরিত হয়ে থাকে।**

আরতির উপচার মন্ত্রাবলী

প্রত্যেকটি উপচারের জন্য নির্ধারিত মন্ত্রাবলী নিম্নরূপ—

● ধূপ : *এষ ধূপঃ* এবং মূল মন্ত্র

● কর্পূর এবং ঘৃত-প্রদীপ : *এষ দীপঃ* এবং মূল মন্ত্র

● শঙ্খমধ্যে জল : *ইদম্ অর্ঘ্যম্* এবং মূল মন্ত্র

---

* প্রত্যেকটি উপচার নিবেদনের সময় হিসাব করে নেওয়ার চেষ্টা করতে হয়, যাতে আরতি সমাপনের আগে বেশ কিছু বার চামর এবং পাখা মনোরমভাবে নিবেদনের সময় পাওয়া যায়।

** প্রচলিত প্রথানুসারে, মন্দিরের সামনের দিকে অবস্থিত গরুড়ের কাছেই প্রথমে দীপ নিবেদন নিয়ে যাওয়া হয়ে থাকে। ইসকনের মন্দিরগুলিতে দীপ নিবেদন প্রথমে ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য শ্রীল প্রভুপাদের কাছেই প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয়, যেহেতু তিনি বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ। অল্পক্ষণের জন্য দীপটি শ্রীল প্রভুপাদের স্পর্শের জন্য তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়ার পরে (আরতির মতো সেটি চক্রাকারে নিবেদিত হবে না), দীপটিকে সমবেত বৈষ্ণব মণ্ডলীর মধ্যে প্রবীণতা অনুসারে পরপর নিয়ে যাওয়া উচিত। (রজঃস্বলা মহিলাদের পক্ষে দীপ স্পর্শ করা অনুচিত।) প্রসাদ-দীপ নিয়ে যে ব্যক্তি সকলের কাছে নিবেদন করতে থাকবেন স্পর্শ করার জন্য, তাঁকে সমবেত ভক্তমণ্ডলীর মাঝে প্রবীণদের প্রতি সজাগ থাকতে হবে, অবশ্য সমবেত ভক্তগণ দীপ নিবেদনের সময়ে ঘটনাক্রমে বঞ্চিত হলে ব্যথিত হওয়া অনুচিত। আমাদের প্রতি শ্রদ্ধা বা সম্মান প্রদর্শনের জন্য ঐ দীপ কাছে আনা হয় না, বরং শ্রীভগবানের প্রসাদরূপে ঐ দীপশিখা স্পর্শ করার পরে তা আমাদের কপালে দু'হাত দিয়ে তুলে নিয়ে আমরা শ্রীভগবানের দীপপ্রসাদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাভক্তি জ্ঞাপনের সুযোগ লাভ করে থাকি।

● বস্ত্র : *ইদম্ বস্ত্রম্* এবং মূল মন্ত্র

● পুষ্পাদি : *এতানি পুষ্পানি* এবং মূল মন্ত্র (*ইদম্ পুষ্পম্*—একটি মাত্র পুষ্প নিবেদনের ক্ষেত্রে)

● চামর : *এষা চামরসেবা* এবং মূল মন্ত্র

● পাখা : *এষা ব্যজনসেবা* এবং মূল মন্ত্র

আরতি সমাপন

চামর ব্যজন পাখা এবং আরতির আগে ও পরে শঙ্খধ্বনি সমেত সম্পূর্ণ আরতি পঁচিশ মিনিট পর্যন্ত চলতে পারে, সংক্ষিপ্ত আরতির সময় (যেখানে ধূপ, ফুল আর চামর নিবেদিত হয়ে থাকে) পাঁচ থেকে আট মিনিট হয়।

● আরতি সমাপন হলে, শ্রীবিগ্রহকক্ষের বাইরে, আরতি আরম্ভের মতোই, তিনবার শঙ্খধ্বনি করতে হয়। আর পরে অর্ঘ্য এবং পুষ্প প্রসাদ সমবেত ভক্তজনের মধ্যে বিতরণ করা চলে।

● যদি মন্দিরের কীর্তন পরিচালক কিংবা অন্য কোনও ভক্ত প্রেমধ্বনি মন্ত্রাবলী উচ্চারণ না করেন, তবে পূজারী তা উচ্চারণ করে দেন। (প্রেমধ্বনি ষষ্ঠ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য)

● তারপরে করজোড়ে শ্রীগুরুদেব এবং শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে বিনম্রভাবে প্রণাম প্রার্থনা নিবেদন করতে হয়।

● অন্তঃপর শ্রীবিগ্রহকক্ষ থেকে আরতিপরিকরাদি সরিয়ে দিয়ে, সেই জায়গাটি এবং উপকরণাদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে, সবশেষে শ্রীবিগ্রহকক্ষের বাইরে এসে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করা বিধেয়।

যোড়শোপচারে পূজার আয়োজন

পূর্বাঙ্গ কর্ম

প্রয়োজনীয় উপকরণাদি

● অর্চনায় বিঘ্ন পরিহারের উদ্দেশ্যে, সূচনার পূর্বেই সুনিশ্চিত হওয়া উচিত যে, নিম্নলিখিত উপকরণগুলি উপস্থিত করা হয়েছে কি না :

১) থালায় একটি ছোট ঘণ্টা;

২) সামান্য অর্ঘ্য জলপূর্ণ একটি পঞ্চপাত্র;

৩) ঢাকনাযুক্ত জলপূর্ণ কমণ্ডলু;

৪) বিসর্জনীয় পাত্র (বর্জিত জল ফেলার জন্য);

৫) পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমন, এবং মধুপর্ক রাখার পাত্রাদি*;

৬) সুগন্ধি তেল;

৭) (ধাতব শ্রীবিগ্রহাদি মেজে ঝকঝকে করতে হলে) পাতিলেবুর রস মিশ্রিত বাদাম চূর্ণ কিংবা গোপীচন্দন চূর্ণ, মেজে ঝকঝকে পরিষ্কার করার জন্য তুলো কিংবা নরম বস্ত্রখণ্ড, তেল মোছার জন্য নরম বস্ত্রখণ্ড;

৮) শঙ্খদানিতে জল-শঙ্খ;

৯) স্নান পাত্র;

১০) চরণামৃতের পাত্র;

১১) প্রত্যেক শ্রীবিগ্রহের জন্য একটি করে তোয়ালে বা গামছা (সাজসজ্জার পূর্বে পরিধেয় বস্ত্র);

১২) পরিধেয় বস্ত্র, অন্তর্বাস এবং আলপিন;

১৩) অলঙ্কার ভূষণাদি ও আঠা (মোম বা অনুরূপ);

১৪) গোপীচন্দন (কিংবা সাধারণ চন্দন) এবং কুঙ্কুম ও তুলসী শাখা অথবা ছোট স্বর্ণ বা রৌপ্য শলাকা, অথবা রঙের তুলি—শ্রীবিগ্রহাদির অঙ্গরাগের জন্য;

১৫) গন্ধদ্রব্য (চন্দন অনুলেপন);

১৬) পুষ্পাদি ও পুষ্পমাল্যাদি;

১৭) তুলসীপত্রাদি ও মঞ্জরী;

১৮) ধূপ এবং ঘি বা কর্পূর দীপমালা (শ্রীগুরুদেব, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, এবং প্রধান শ্রীবিগ্রহাদির প্রত্যেকের অর্চনার জন্য এক-একটি);

১৯) ফলমূল কিংবা মিষ্টান্ন সহ নৈবেদ্য (শ্রীগুরুদেব, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, এবং প্রধান শ্রীবিগ্রহাদির প্রত্যেকের অর্চনের জন্য এক-একটি থালা);

২০) শ্রীগুরুদেবের প্রতিকৃতি এবং তাঁর উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য পাত্র;

২১) শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ অর্চনের ক্ষেত্রে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর (অথবা শ্রীশ্রীপঞ্চতত্ত্বের) প্রতিকৃতি;

২২) প্রয়োজন হলে, এই নির্দেশাবলী অবলম্বনে প্রণীত একটি প্রয়োগপত্র;

২৩) প্রজ্বলিত পলিতাসহ দীপদানি, কিংবা লাইটার।

● শ্রীবিগ্রহকক্ষের বাইরে আচমন সম্পন্ন করতে হয়। শ্রীগুরুদেবের উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন বিধেয়।

আসন স্থাপন

● শ্রীবিগ্রহকক্ষের মধ্যে যেখানে অর্চন সম্পন্ন করা হবে, সেই স্থানটি পরিষ্কার করে নিয়ে, হাত ধুয়ে, অর্চনের উপযোগী যথাযথ স্থানে আসন স্থাপন

---

* এইগুলি পৃথকভাবে আয়োজন করা চলতে পারে, অথবা এই চারটিরই বিকল্প স্বরূপ পঞ্চপাত্র থেকে জল নিবেদন করা যেতে পারে।

করতে হয়, এবং হাঁটু গেড়ে জোড় হাতে প্রণামমুদ্রা সহকারে মন্ত্রোচ্চারণ করতে হয় :

পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা।
ত্বং চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং চাসনং কুরু ॥

হে ধরিত্রী মাতা, হে দেবী, আপনি গ্রহলোকের সকল মানুষকে ধারণ করে আছেন, এবং ভগবান শ্রীবিষ্ণু আপনাকে ধারণ করে রয়েছেন, কৃপাপূর্বক আপনি আজ আমাকে কৃপা করুন—আমি শ্রীভগবানের অর্চনের উদ্দেশ্যে পবিত্র আসনে উপবেশন করছি।

● অর্চন সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে একটি আসনে শ্রীগুরুদেব উপবেশন করে আছেন, এই চিন্তা সহকারে নিজ আসন গ্রহণ করতে হয়।

পাত্র স্থাপন

● উপকরণাদি এমনভাবে সাজিয়ে নিতে হয় যাতে নিবেদিত উপকরণগুলি স্পর্শ না করেই অনিবেদিত উপকরণগুলির সহজে নাগাল পাওয়া যেতে পারে।

● ঘণ্টাটিকে (থালার উপরে) বাঁদিকে রাখতে হয়, এবং অভিষেক শঙ্খটিকে একটি শঙ্খদানিতে রাখতে হয়, যাতে বারে বারে তা সহজেই তোলা এবং রাখা যেতে পারে।

● জলপাত্র, পুষ্পসম্ভার, চন্দন এবং তুলসীপত্রাদি সহজ নাগালে হাতের কাছেই রাখা উচিত।

● আচমন এবং অর্ঘ্য জল নিবেদনের পরে ফেলে দেওয়ার জন্য বিসর্জনীয় পাত্র ব্যবহার করা যেতে পারে, অথবা এই জল কোনও নির্গমন নালিকা সমন্বিত স্নান পাত্রে ঢেলে দেওয়াও চলে। পুষ্পপত্র, তুলা ইত্যাদি নিবেদনের পরে দ্বিতীয় একটি বিসর্জনীয় পাত্রে রাখা যেতে পারে।

● স্নানের তোয়ালে নিজের কোলে কিংবা মেঝের উপরে না রেখে, কোনও রেকাবি, টেবিল, কিংবা বেদির উপরে রাখা উচিত।

গুরুপংক্তি নমস্কার

● *এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ* মন্ত্র এবং গুরুমূলমন্ত্র উচ্চারণ সহকারে শ্রীগুরুদেবের সামনে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করতে হয়। তারপরে, পূর্বতন গুরুবর্গের উদ্দেশ্যে শ্রীগুরুদেবের সেবাধ্যান সহকারে জোড় হস্তে প্রণাম মুদ্রা প্রদর্শনের মাধ্যমে মন্ত্রোচ্চারণ বিধেয় :

শ্রীগুরো পরমানন্দ প্রেমানন্দফলপ্রদ।
ব্রজানন্দপ্রদানন্দ সেবায়াং মা নিয়োজয় ॥

হে পরমপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব, ভগবৎ প্রেমানন্দের পরমানন্দময় ফল প্রদায়ক, ব্রজানন্দ প্রদায়ক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আনন্দময় সেবায় আমাকে কৃপাপূর্বক আপনি নিয়োজিত করুন।

জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য, শ্রীগদাধর, শ্রীশ্রীবাস এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সকল ভক্তবৃন্দের জয় হোক।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

করশুদ্ধি

● জলপাত্র থেকে জল নিয়ে হাত ধুয়ে নিতে হয়, কিংবা চন্দন সামান্য পরিমাণে হাতে ঘষে নিতে হয়।

পুষ্পশুদ্ধি

● *ওঁ অস্ত্রায় ফট্* মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে পুষ্পাদির উপরে সামান্য অর্ঘ্য জল সিঞ্চন করে প্রোক্ষণ সম্পন্ন করে নিতে হয়।

● পুষ্পসম্ভারের উপরে চক্রমুদ্রা এবং ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন করতে হয়।

● বীজাক্ষর মুদ্রা সহকারে ডান হাতটির আঙুলগুলি পুষ্পাদির উপরে রেখে মন্ত্রোচ্চারণ করতে হয় :

ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পসম্ভবে
পুষ্পচয়াবকীর্ণে চ হুং ফট্ স্বাহা।

হে পুষ্পরাজি, হে কুসুমিত লতাগুল্মাদি থেকে সম্ভূত মহাশুভদায়ী পুষ্পসম্ভার সকলে পবিত্র হোন।

● তারপরে পুষ্পসম্ভারের উপরে মৎস্য মুদ্রা প্রদর্শন বিধেয়।

দ্রব্যশুদ্ধি

● *ওঁ অস্ত্রায় ফট্* মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে সামান্য অর্ঘ্য জল কিছু পরিমাণে সমস্ত উপকরণাদির উপরে সিঞ্চনের মাধ্যমে প্রোক্ষণ সম্পন্ন করে নিতে হয়।

● উপকরণাদির উপরে চক্রমুদ্রা এবং ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন বিধেয়।

● বিভিন্ন সামগ্রীর উপরে বীজাক্ষরমুদ্রা ধারণের মাধ্যমে নীরবে আটবার *ক্লীং* বীজ মন্ত্রটি উচ্চারণ করা উচিত।

● উপকরণাদির উপরে মৎস্যমুদ্রা প্রদর্শন বিধেয়।

আত্মশুদ্ধি

● গোপাল মন্ত্র (গুরুপ্রদত্ত ষষ্ঠ মন্ত্র) একবার উচ্চারণের মাধ্যমে সামান্য অর্ঘ্য জল নিজ দেহে অল্প পরিমাণে সিঞ্চন করে প্রোক্ষণ সম্পন্ন করতে হয়।

ভূতশুদ্ধি *(ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাসানুদাস এই স্বরূপ অভিব্যক্তির মাধ্যমে ভৌত বস্তুসমূহের পরিশুদ্ধি)*

● নিম্নলিখিত প্রার্থনাটির ভাবার্থ উপলব্ধি এবং অনুধ্যান মাধ্যমে নিবেদন বিধেয় : **প্রকৃত স্বরূপে আমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশত, অবিস্মরণীয় কাল থেকে তাঁর প্রতি আমি বৈরীভাবাপন্ন হয়ে রয়েছি, এবং আমি দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে রয়েছি এবং জন্ম-মৃত্যুর চক্রে এই জড় জগতের মধ্যে ত্রিতাপ জ্বালায় ক্লিষ্ট হয়ে ক্রমাগত আবর্তিত হয়ে চলেছি। এখন, কোনও অহৈতুকী সৌভাগ্যবলে, আমার শ্রীগুরুদেবের কৃপায় আমি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছি যে, আমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস, আমার স্থূল এবং ক্ষণভঙ্গুর শরীর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চিন্ময় সত্তা আমি। আর তাই আমার শ্রীগুরুদেবের আদেশে, আমি তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণের মাধ্যমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং শ্রীশ্রীরাধা-শ্যামসুন্দর প্রভুর (কিংবা আরাধ্য শ্রীবিগ্রহাদির) পাদপদ্মসেবার সৌভাগ্য অর্জন করেছি।**

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা ।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিল পরমানন্দ পূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ ॥

আমি ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয় নই, বৈশ্য বা শূদ্র নই, ব্রহ্মচারী নই, গৃহস্থ নই, বানপ্রস্থ নই, সন্ন্যাসীও নই, কিন্তু নিত্য স্বতঃপ্রকাশমান সমুজ্জ্বল নিখিল পরমানন্দপূর্ণ অমৃত-সমুদ্ররূপ এবং ব্রজগোপিকাদের পতি শ্রীকৃষ্ণের পদকমলের দাসের অনুদাসের দাস বলে নিজের পরিচয় দিই। (*শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য*, ১৩/৮০ *পদ্যাবলী* ৭৪ থেকে উদ্ধৃত)

প্রাথমিক অর্চনা

ঘণ্টাপূজা

● ঘণ্টাটি নিবেদনের সময়ে একটি পুষ্পকোরক চন্দনে সিক্ত করে, মন্ত্রোচ্চারণ করতে হয়—

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ জয়ধ্বনিমন্ত্রমতাঃ স্বাহা।

● এবার পুষ্পকোরটি চন্দন দিয়ে ঘণ্টার গায়ে লাগিয়ে দিতে হয়। তারপরে বামহাতে ঘণ্টাটি সামান্য বাজিয়ে থালার উপরে রেখে দিতে হয় এবং তখন সর্বদা চিন্তা করতে হয় যেন ঘণ্টাটি শ্রীভগবানের সেবক। তারপরে মন্ত্রোচ্চারণ করতে হয়—

সর্ববাদ্যময়ী ঘণ্টে দেবদেবস্য বল্লভে।
ত্বাং বিনা নৈবব সর্বেষাং শুভং ভবতি শোভনে॥

হে অপরূপ ঘণ্টা, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অতীব প্রিয়, তোমার মধ্যে সকল সঙ্গীতের মধুর মূর্ছনা রূপায়িত হয়ে রয়েছে। তোমাকে ব্যতীত কারও কোন শুভ কার্য সম্পন্ন হতে পারে না।

শঙ্খপূজা

● শ্রীভগবানের স্নান-শঙ্খটিতে পুষ্প-চন্দনাদি নিবেদনের সময়ে, মন্ত্রোচ্চারণ করতে হয়—

এতে গন্ধপুষ্পে
ওঁ হুং হুং হুং নমঃ মহাশঙ্খায় স্বাহা।

গুরুপূজা

প্রধান শ্রীবিগ্রহের পূজা নিবেদনের আগে শ্রীগুরুদেবের পূজা সমাপন করতে হয়। যদি শ্রীগুরুদেবের প্রতিকৃতির অর্চন করা হয়, তা হলে সমস্ত উপকরণাদি নিবেদনের পরিবর্তে চন্দনে এবং/কিংবা সামান্য অর্ঘ্য জলে নিষিক্ত পুষ্পকোরক নিবেদন করা যেতে পারে। প্রতিকৃতির সামনে একটি পাত্রে এই উপকরণগুলি সাজিয়ে নিয়ে নিবেদন করা চলতে পারে। যদি শ্রীগুরুদেবের মূর্তি আরাধনা করা হয়, তা হলে যথার্থ উপকরণগুলিই যথাসম্ভব নিবেদন করা উচিত। যদি মূর্তিটি স্নান করানোর অনুপযুক্ত হয়, তা হলে মানসযোগে স্নান করানোর উদ্দেশ্যে স্নান-শঙ্খ থেকে স্নান পাত্রে জল ঢালা যেতে পারে। যদি পরমগুরু কিংবা অন্যান্য পূর্বতন গুরুবর্গের পূজা

করতে হয়, তা হলে ঐ একই পদ্ধতি অবলম্বন করা চলে তবে সে ক্ষেত্রে যথাযথ মূলমন্ত্র ও প্রণামমন্ত্র উচ্চারণ বিধেয়।

ধ্যান

● যেখানে শ্রীগুরুদেব বিরাজিত, প্রথমে সেই স্থানটিতে ধ্যান চিন্তা প্রয়োগ বিধেয়—

নবদ্বীপের চিন্ময়ধামে শ্রীমায়াপুরের যোগপীঠ, রত্নসিংহাসনে শ্রীগৌরসুন্দর বিরাজিত রয়েছেন। তাঁর দক্ষিণে শ্রীমন্ নিত্যানন্দ, তাঁর বামে শ্রীগদাধর বিরাজিত। সামনে করজোড়ে রয়েছেন শ্রীঅদ্বৈত এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মাথায় ছত্রধারণ করে বিরাজিত শ্রীবাস প্রভু। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সিংহাসনের নীচে এক রত্নখচিত বেদিতে বিরাজ করছেন আমার শ্রীগুরুদেব।

● মন্ত্রোচ্চারণকালে, শ্রীগুরুদেবের রূপ চিন্তা করতে হয় এবং তাঁর চিন্ময় গুণাবলী ও কার্যাবলী স্মরণ করা বিধেয়—

প্রাতঃ শ্রীমন্ নবদ্বীপে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুম্ ।
বরাভয়প্রদং শান্তং স্মরেৎ তন্নামপূর্বকম্ ॥

প্রাতঃকালে শ্রীগুরুদেবকে স্মরণ করা উচিত—যেন তিনি শ্রীনবদ্বীপে বিরাজমান, দুই নয়ন ও দুইবাহুধারী, প্রশান্ত এবং তাঁর নাম জপকারীর উপরে তিনি সর্বসিদ্ধি বরাভয় প্রদান করছেন।

● তারপরে শ্রীগুরুদেবের উদ্দেশ্যে প্রেমধ্বনি দিতে হয় (জয় ওঁ বিষ্ণুপাদ [শ্রীগুরুদেবের নাম] কী জয়)

মানস পূজা

● শ্রীগুরুদেবের উদ্দেশ্যে ষোড়শ, দশ কিংবা পঞ্চ উপচারে পূজা নিবেদনের মানস উদ্যোগ করা বিধেয়।

বাহ্য পূজা

বামহাতে ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে, প্রত্যেকটি উপকরণের জন্য পঞ্চপাত্র থেকে সামান্য অর্ঘ্য জল নিয়ে কিংবা পুষ্পকোরক নিয়ে, শ্রীগুরুদেবের উদ্দেশ্যে ষোড়শোপচারে পূজা নিবেদন করতে হয়। তারপরে সেইগুলি তাঁর প্রতিকৃতির সামনে রাখা একটি পাত্রে বর্জন করতে হয়। প্রত্যেকটি উপচার নিবেদনের পরে, পঞ্চপাত্র থেকে কয়েক ফোঁটা জল নিয়ে দক্ষিণ হস্তটি শোধন করে নিতে হয়—

১) *ইদম্ আসনম্* ও গুরুমূলমন্ত্র উচ্চারণ করতে হয়, এবং হস্তমুদ্রা সহকারে শ্রীগুরুদেবের উপবেশনের জন্য একটি আসন নির্দেশ করতে হয়।

২) *স্বাগতং সুস্বাগতং* ও গুরুমূলমন্ত্র উচ্চারণ করতে হয়, এবং করজোড়ে শ্রীগুরুদেবকে অভ্যর্থনা জানিয়ে তাঁর স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করতে হয়।

৩) *এতৎ পাদ্যম্* ও গুরুমূলমন্ত্র উচ্চারণ করে শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম প্রক্ষালনের জন্য জল নিবেদন করতে হয়।

৪) *ইদম্ অর্ঘ্যম্* ও গুরুমূলমন্ত্র উচ্চারণ করে শ্রীগুরুদেবের হাতে অর্ঘ্য জল দিতে হয় যাতে তিনি তাঁর মাথায় তা সিঞ্চন করতে পারেন।

৫) *ইদম্ আচমনীয়ম্* ও গুরুমূলমন্ত্র উচ্চারণ করে, শ্রীগুরুদেবের পান করার জন্য আচমন জল নিবেদন করতে হয়।

৬) *এষ মধুপর্কঃ* ও গুরুমূলমন্ত্র উচ্চারণ করে, শ্রীগুরুদেবের উদ্দেশ্যে এক পাত্র মধুপর্ক নিবেদন করা বিধেয়।

৭) *ইদং পুনরাচমনীয়ম্* ও গুরুমূলমন্ত্র উচ্চারণ করে, শ্রীগুরুদেবকে আবার আচমনের জল দিতে হয়।

৮) *ইদং স্নানীয়ম্* ও গুরুমূলমন্ত্র উচ্চারণের সাথে শ্রীগুরুদেবকে স্নান করাতে হয়।

৯) *ইদং বস্ত্রম্* ও গুরুমূলমন্ত্র উচ্চারণ সহকারে শ্রীগুরুদেবকে বস্ত্র নিবেদন করে তাঁকে বস্ত্রসজ্জিত করতে হয়।

১০) *ইমানি আভরণানি* ও গুরুমূলমন্ত্র উচ্চারণ সহকারে চশমা বা সন্ন্যাস-দণ্ড প্রভৃতি শ্রীগুরুদেবের ব্যবহার্য সামগ্রী নিবেদন করা বিধেয়।

১১) *এষ গন্ধ* ও গুরুমূলমন্ত্র উচ্চারণ সহযোগে একটি পুষ্পকোরকের সাথে সুগন্ধি নিয়ে শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে লেপন করা উচিত।

১২) *এতানি পুষ্পানি* ও গুরুমূলমন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে চন্দনসহ পুষ্পাদি শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে নিবেদন করতে হয়। তারপরে শ্রীগুরুদেবের দক্ষিণ হস্তে তুলসীপত্র অর্পণ করা যেতে পারে, যাতে তিনি শ্রীভগবানকে তা নিবেদন করতে পারেন। এই সময়ে পূজারী একটি পুষ্পমাল্য নিবেদন করতে পারেন।

১৩) *এষ ধূপঃ* ও গুরুমূলমন্ত্র উচ্চারণ সহকারে ধূপ নিবেদন করা বিধেয়।

১৪) *এষ দীপঃ* ও গুরুমূলমন্ত্র উচ্চারণের সাথে একটি দীপ প্রজ্বলিত করে নিবেদন করা উচিত।

১৫) *ইদং নৈবেদ্যম্* ও গুরুমূলমন্ত্র উচ্চারণ করতে হয় এবং শ্রীগুরুদেবকে মহাপ্রসাদ নিবেদন করবার পরে আচমন জল এগিয়ে দিতে হয়।

ইদং সর্বম্ ও গুরুমূলমন্ত্র উচ্চারণ করে শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন বিধেয়, যে কোনও ধরনের পুষ্প যেগুলি শ্রীগুরুদেবের কাছে প্রিয়, সেইগুলি নিবেদন যোগ্য।

১৬) শ্রদ্ধা সহকারে প্রণাম নিবেদন করতে হয় :

● গুরুমূলমন্ত্র ও গুরু-গায়ত্রী (গুরু প্রদত্ত দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মন্ত্রাবলী) নীরবে দশবার প্রত্যেকটি উচ্চারণ বিধেয়।

গুরুস্তুতি

● নিম্নলিখিত শ্লোক উচ্চারণের মাধ্যমে গুরুস্তুতি নিবেদন বিধেয় :

ত্বং গোপিকা বৃষরভেস্তনয়ান্তিকেঽসি
সেবাধিকারিণি গুরো নিজপাদপদ্মে।
দাস্যং প্রদায় কুরু মাং ব্রজকাননে
শ্রীরাধাঙ্ঘ্রিসেবনরসে সুখিনীং সুখাব্ধৌ ॥

হে প্রিয়বরেষু গুরুদেব, আপনি রাজা বৃষভানুতনয়া গোপিকা রাধার নিয়ত সান্নিধ্যে সেবারত রয়েছেন। কৃপাপূর্বক আমাকে আপনার নিজ পাদপদ্মে ভক্তিসেবার অধিকার অর্পণ করুন। ব্রজধামের কুঞ্জকাননে শ্রীরাধিকার চরণকমলের সেবারসের সুখ আহরণে আপনি কৃপা করে আমাকে আশীর্বাদ প্রদান করুন।

গুরু প্রণাম

● নিম্নোক্ত শ্লোকাবলী উচ্চারণের মাধ্যমে প্রণতি নিবেদন বিধেয় :

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

অজ্ঞানতার অন্ধকারে অন্ধপ্রায় আমার দুই চক্ষু যিনি জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত করেছেন, আমার সেই গুরুদেবের উদ্দেশ্যে আমি সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে [শ্রীগুরুদেবের নাম] ইতি নামিনে ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অতীব প্রিয় আমার গুরুদেব [শ্রীগুরুদেবের নাম]-এর শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করে আমি তাঁর উদ্দেশ্যে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করছি।

জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য, শ্রীগদাধর, শ্রীশ্রীবাস, এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত ভক্তবৃন্দের জয় হোক!

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ-পূজা

শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের অর্চনের আগে যদি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রারম্ভিক অর্চন করতে হয়, তা হলে নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ায় সরলভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতিকৃতির অর্চন করা চলে। যদি শ্রীশ্রীগৌর-নিতাই বিগ্রহাদির অর্চন করতে হয়, তা হলে অবশ্য যথাসম্ভব প্রকৃত উপচারাদি সহকারে তাঁদের আরাধনা নিবেদন করাই বিধেয়। শ্রীশ্রীগৌর-নিতাই অর্চনকালে, প্রত্যেকটি উপচার, গৌরমূলমন্ত্র উচ্চারণ সহকারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে এবং শ্রীমন্ নিত্যানন্দ মূল মন্ত্র উচ্চারণসহকারে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর উদ্দেশ্যে নিবেদন করা উচিত।

নবদ্বীপ ধ্যান

● শ্রীমন্মহাপ্রভুর দিব্য লীলাভূমি নবদ্বীপধামের চিন্তায় ধ্যানমগ্ন হয়ে নিম্নোক্ত শ্লোকটি উচ্চারণ করতে হয়—

স্বর্ধুন্যাশ্চারুতীরে স্ফুরিতম্ অতিবৃহৎ কূর্মপৃষ্ঠাভগাত্রং।
রম্যারামাবৃতং সন্মণিকনকমহাসদ্মসঙ্ঘৈঃ পরিতম্ ॥
নিত্যং প্রত্যালয়োদ্যৎপ্রণয়ভরলসৎকৃষ্ণসংকীর্তনাঢ্যং।
শ্রীবৃন্দাটব্যভিন্নং ত্রিজগদনুপরমং শ্রীনবদ্বীপমীড়ে ॥

পুণ্য নবদ্বীপধামের মহিমা আমি কীর্তন করি। শ্রীবৃন্দাবনধাম হতে সম্পূর্ণ অভিন্ন, ত্রিভুবন সমন্বিত এই ধাম জড় জগৎ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। মনোরম গঙ্গাতীরে অবস্থিত অতিবৃহৎ কূর্মপৃষ্ঠের মতো নবদ্বীপধাম সুরম্য উদ্যানাদিতে পূর্ণ। সেই পবিত্র ধাম কনকনির্মিত মণিমাণিক্যখচিত বিশাল অট্টালিকায় পূর্ণ, এবং সেই সকল স্থানে প্রণয়ভাবে ভক্তবৃন্দ নিত্য কৃষ্ণসংকীর্তনে রত।

শ্রীগৌরাঙ্গ ধ্যান

● নিম্নলিখিত শ্লোকটি উচ্চারণ সহকারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও তাঁর নিত্য পার্ষদবর্গের দিব্যরূপের ধ্যান করতে হয়—

শ্রীমন্ মৌক্তিকদামবদ্ধচিকুরং সুস্মেরচন্দ্রাননং।
শ্রীখণ্ডাগুরুচারুচিত্রবাসনং স্রগ্দিব্যভূষাঞ্চিতম্ ॥
নৃত্যাবেশরসানুমোদমধুরং কন্দর্পবেশোজ্জ্বলং।
চৈতন্যং কনকদ্যুতিং নিজজনৈঃ সংসেব্যমানং ভজে ॥

ভক্ত-পার্ষদসেবিত, মুক্তাদামের মতো কেশবন্ধ এবং চন্দ্রাননে স্মিতহাস্য বিরাজিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে আমি অর্চনা করি। তাঁর কনকদ্যুতিময় দেহে উজ্জ্বল বেশবাস, চন্দন-অগুরুচর্চিত, এবং পুষ্পমাল্যে ভূষিত বিবিধ বর্ণাঢ্য অলঙ্কারে শোভিত। তিনি অতীব মনোরমভাবে মধুর নৃত্যাবেশরসে মগ্ন এবং ভূষণাদি কন্দর্প অপেক্ষাও দ্যুতিময়।

মানসপূজা

● শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে ষোড়শ, দশ, কিংবা পঞ্চ উপাচারে অর্চনায় ধ্যানমগ্ন হতে হয়।

বাহ্যপূজা

বামহাতে ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে পুষ্পার্ঘ্য কিংবা পঞ্চপাত্র থেকে সামান্য অর্ঘ্য ব্যবহার করে প্রতিটি উপচার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সন্তুষ্টিবিধানের উদ্দেশ্যে নিবেদন করতে হয়, এবং তার পরে সেইগুলি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতিকৃতির সামনে রাখা একটি পাত্রে বর্জন করতে হয়। প্রত্যেকটি উপচার নিবেদনের পরে, পঞ্চপাত্র থেকে কয়েক ফোঁটা জল নিয়ে দক্ষিণ হস্তটি শুদ্ধ করে নিতে হয় —

১) *ইদম্ আসনম্* ও গৌর মূল মন্ত্র উচ্চারণের সাথে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উপবেশনের জন্য একটি আসন নিবেদন করতে হয়। (হস্তমুদ্রা সহকারে তাঁকে একটি আসনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়।)

২) *স্বাগতং সুস্বাগতম্* ও গৌর মূল মন্ত্র উচ্চারণ সহকারে করজোড়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে আহ্বান জানিয়ে তাঁর স্বস্তিবিধানের চিন্তা করতে হয়।

৩) *এতৎ পাদ্যম্* ও গৌর মূল মন্ত্র উচ্চারণ সহকারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পাদপদ্ম প্রক্ষালনের জন্য জল নিবেদন করতে হয়।

৪) *ইদং অর্ঘ্যম্* ও গৌর মূল মন্ত্র উচ্চারণ সহকারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর হাতে অর্ঘ্যজল প্রস্তুতি নিবেদন করতে হয়, যাতে তিনি মাথায় সিঞ্চন করতে পারেন।

৫) *ইদং আচমনীয়ম্* ও গৌর মূল মন্ত্র উচ্চারণ সহকারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আচমনের জন্য জল নিবেদন করতে হয়।

৬) *এষ মধুপর্কঃ* ও গৌর মূল মন্ত্র উচ্চারণ সহকারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্য এক পাত্র মধুপর্ক নিবেদন করা বিধেয়।

৭) ইদং *পুনরাচমনীয়ম্* ও গৌর মূল মন্ত্র উচ্চারণ সহকারে আবার আচমনের জল নিবেদন করতে হয়।

৮) ইদং *স্নানীয়ম্* ও গৌর মূল মন্ত্র উচ্চারণ সহকারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে স্নান করানো উচিত।

৯) ইদং *বস্ত্রম্* ও গৌর মূল মন্ত্র উচ্চারণ সহকারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পরিধানের উদ্দেশ্যে বস্ত্র নিবেদন করে তাঁকে বস্ত্রসজ্জিত করতে হয়।

১০) *ইমানি আভরণানি* ও গৌর মূল মন্ত্র উচ্চারণ সহকারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে অলঙ্কারাদি নিবেদন করতে হয়।

১১) *এষ গন্ধঃ* এবং গৌর মূল মন্ত্র উচ্চারণ সহকারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পাদপদ্মে সুগন্ধি নিবেদন করতে হয়।

১২) *এতানি পুষ্পানি* এবং গৌর মূল মন্ত্র উচ্চারণ সহকারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণকমলে পুষ্পচন্দন নিবেদন বিধেয়। তার পরে তাঁর পাদপদ্মে তুলসীপত্র নিবেদন করতে হয়। এই সময়ে একটি পুষ্পমাল্য নিবেদন করা চলতেও পারে।

১৩) *এষ ধূপঃ* এবং গৌর মূল মন্ত্র উচ্চারণের সাথে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে ধূপ নিবেদন করতে হয়।

১৪) *এষ দীপঃ* এবং গৌর মূল মন্ত্র উচ্চারণ করে একটি দীপ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে নিবেদন করা উচিত হয়।

১৫) ইদং *নৈবেদ্যম্* এবং গৌর মূল মন্ত্র উচ্চারণের সাথে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে ভোগ অর্পণ করে, তার পরে আচমন নিবেদন করা বিধেয়।

- ইদং *সর্বম্* ও গৌর মূল মন্ত্র উচ্চারণ করে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রীতিবিধানে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করতে হয়, এর দ্বারা অন্য যা কিছু উপচার তাঁর প্রীতিপ্রদ হতে পারে, সেই সব কিছুরই নিবেদন হল।

১৬) প্রণাম নিবেদন—

- নীরবে দশবার গৌর মূল মন্ত্র ও গৌর গায়ত্রী (গুরুপ্রদত্ত চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্রাবলী) উচ্চারণ করতে হয়। তারপরে নিম্নোক্ত শ্লোকাবলী উচ্চারণ বিধেয়—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্ ।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥

পূর্বে যা অর্পিত হয়নি, উন্নত ও উজ্জ্বল রসময়ী নিজের সেই ভক্তি-সম্পদ দান করার জন্য যিনি করুণাবশত কলিযুগে অবতীর্ণ হয়েছেন, স্বর্ণ থেকেও সুন্দর দ্যুতিসমূহ দ্বারা সমুদ্ভাসিত সেই শচীনন্দন শ্রীহরি

সর্বদা তোমাদের হৃদয়কন্দরে স্ফুরিত হোন। (*শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদি* ১/৪)

জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জয় হোক! শ্রীঅদ্বৈত আচার্য, শ্রীগদাধর, শ্রীশ্রীবাস, এবং সমস্ত গৌরভক্তবৃন্দের জয় হোক!

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

মূল বিগ্রহের পূজা (রাধাকৃষ্ণ পূজা)

নিম্নলিখিত প্রণালীটি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের একত্রে পূজা করার জন্য প্রদান করা হয়েছে। আপনি যদি ভগবানের অন্য কোনও স্বরূপ বা বিগ্রহ পূজা করেন, তা হলে এই প্রণালীটিই অনুসরণ করবেন, কেবল উপচারের নাম উল্লেখ করার পূর্বে বিগ্রহের মূল মন্ত্রটি পরিবর্তন করতে হবে, পরিবর্তন করে বলতে হবে পূজিত বিগ্রহের জন্য নির্দিষ্ট ধ্যান এবং প্রণাম মন্ত্রটিও।

মানসে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ধ্যান এবং পূজা

শ্রীবৃন্দাবন-ধ্যান

- নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করার সময় বৃন্দাবনের ধ্যান করুন :

ততো বৃন্দাবনং ধ্যায়েৎ পরমানন্দ-বর্ধনম্।
সর্বর্তুকুসুমোপেতং পতত্রিগাননাদিতং ॥
ভ্রমদ্ভ্রমরঝঙ্কারমুখরীকৃতদিঙমুখম্।
কালিন্দীজলকল্লোলসঙ্গীমারুতসেবিতম্ ॥
নানাপুষ্পলতাবদ্ধবৃক্ষষণ্ডৈশ্চ মণ্ডিতম্।
কমলোৎপলকহ্লারধূলি ধূসরিতান্তরম্ ॥
তন্মধ্যেরত্নভূমিং চ সূর্যাযুতসমপ্রভম্।
তত্র কল্পতরূদ্যানং নিয়তং প্রেমবর্ষিণম্ ॥
মাণিক্যশিখারালম্বি তন্মধ্যে মণিমণ্ডপম্।
নানারত্নগণৈশ্চিত্রং সর্বর্তুসুবিরাজিতম ॥
নানারত্নলসচ্চিত্রবিতানৈর উপশোভিতম্।

রত্নতোরণগোপুরমণিক্যাচ্ছাদনান্বিতম্ ॥
কোটিসূর্যসমাভাসং বিমুক্তং ষট্‌তরঙ্গকৈঃ ।
তন্মধ্যে রত্নখচিতং স্বর্ণসিংহাসনং মহৎ ।
কমলোৎপলকহ্লারধূলি ধূসরিতান্তরম্ ॥

বৃন্দাবন ধাম নিত্য বর্ধমান আনন্দের আলয়। সেই অপ্রাকৃত ধামে সব সময়ে সমস্ত ঋতুর ফুল এবং ফল উৎপন্ন হয়, এবং বৈচিত্র্যময় পাখির মধুর কলতানে তা পরিপূর্ণ। শীতল বায়ু এবং যমুনার জল সমগ্র পরিবেশকে উজ্জীবিত করে এবং চতুর্দিক ভ্রমরের গুঞ্জনে তা মুখরিত। বৃন্দাবন বিচিত্র পুষ্পসমৃদ্ধ লতাগুল্মের দ্বারা বেষ্টিত, সমস্ত কল্পবৃক্ষের দ্বারা শোভিত এবং তার দিব্য শোভাকে অলঙ্কৃত করেছে লাল, নীল এবং শ্বেতপদ্মের রেণুসমূহ। সেই ধামের ভূমি রত্নসমূহের দ্বারা নির্মিত যা কোটি সূর্যের সমান প্রভা বিকিরণ করে। সেই ভূমিদেশে অবস্থিত একটি মনোরম উদ্যান যা চিরন্তন দিব্যপ্রেম বর্ষণকারী কল্পবৃক্ষের দ্বারা শোভিত, এবং সেই উদ্যানে রয়েছে রত্নখচিত একটি মন্দির যার চূড়াটি পদ্মরাগ মণির দ্বারা গঠিত। নানাপ্রকার রত্নের দ্বারা ভূষিত হওয়ার ফলে মন্দিরটি সমস্ত ঋতুতেই উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত হয়। মন্দিরটি উজ্জ্বল বর্ণময় চন্দ্রাতপের দ্বারা সুশোভিত, নানাবিধ মণি-মাণিক্যের জ্যোতিতে বিচ্ছুরিত, এবং পদ্মরাগ-মণি নির্মিত আচ্ছাদনের দ্বারা আচ্ছাদিত, আর তোরণদ্বার ও খিলাসমূহও রত্নশোভিত। সেই মন্দিরটি কোটি সূর্যের ঔজ্জ্বল্যে উদ্ভাসিত এবং জাগতিক ক্লেশের ষড়্‌বিধ তরঙ্গের প্রভাব থেকে নিত্যমুক্ত। মন্দিরের অভ্যন্তরে রক্ষিত আছে স্বর্ণনির্মিত ও রত্নখচিত একটি সিংহাসন। এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য আলয় শ্রীবৃন্দাবন ধামের ধ্যান করতে হবে। (গৌতমীয় তন্ত্র ৪)

শ্রীরাধাকৃষ্ণ-ধ্যান

● নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাঠপূর্বক শ্রীবৃন্দাবন ধামে রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ধ্যান করতে হবে।

দিব্যদ্-বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাদঃ
শ্রীমদ্‌রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ ।
শ্রীশ্রীরাধাশ্রীলগোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥

আমি শ্রীবৃন্দাবন ধামে কল্পবৃক্ষের নিম্নদেশে অবস্থিত রত্ননির্মিত শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তরে জ্যোতির্ময় সিংহাসনে উপবিষ্ট এবং অন্তরঙ্গ জনগণের দ্বারা সেবিত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ধ্যান করি। (*চৈঃ চঃ আঃ* ১/১৬)

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মানস-পূজা

● মানসে ষোড়শ উপচার সহযোগে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের পূজার ধ্যান করতে হবে।

বিশেষ অর্ঘ্য-স্থাপন

● একটি শঙ্খ-ধারকের উপর শঙ্খ-স্থাপন করে সেটিকে জলপাত্র থেকে বিশুদ্ধ জলের দ্বারা পরিপূর্ণ করতে হবে। জলপাত্র থেকে কয়েক বিন্দু জল দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিসমূহের উপর নিক্ষেপ করতে হবে এবং পরে সেই জল শঙ্খের উপর প্রোক্ষণ করে শঙ্খটিকে শুদ্ধ করতে হবে।

ওঁ *অস্ত্রায় ফট্* মন্ত্র উচ্চারণ করে শঙ্খের উপর জল ছিটাতে (প্রোক্ষণ) হবে।

● শঙ্খের উপর প্রথমে চক্র-মুদ্রা প্রদর্শন করে তারপর গালিনী মুদ্রা এবং সবশেষে ধেনু বা সুরভী মুদ্রা প্রদর্শন করতে হবে।

● তারপর অঙ্কুশ মুদ্রা প্রদর্শন করে গঙ্গা এবং অন্যান্য পবিত্র নদীসমূহকে আবাহন করতে হবে নিম্নলিখিত মন্ত্রে :

গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্মদে সিন্ধো কাবেরী জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥

গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্মদা, সিন্ধু এবং কাবেরী কৃপাপূর্বক এখন এই জলে অবতীর্ণ হোন।

● তারপর জলে মূল বিগ্রহের মূলমন্ত্র বা গায়ত্রী আটবার জপ করতে হবে। এই সময় শঙ্খের উপর বীজাক্ষর মুদ্রা ধারণ করতে হবে। তারপর মৎস্য-মুদ্রা প্রদর্শন করতে হবে।

বিশেষ অর্ঘ্যে বিগ্রহের পূজা

● *এতে গন্ধপুষ্পে* মন্ত্র উচ্চারণ করে এবং মূল বিগ্রহের মূল মন্ত্র জপ করে চন্দন সহযোগে পুষ্পদল (পাপড়ি) বিশেষ অর্ঘ্যরূপে বিগ্রহের উদ্দেশ্যে অর্পণ করতে হবে। (বিকল্প : একটি জলপাত্রে বিশেষ অর্ঘ্য স্থাপন পূর্বক পূজা করতে হবে। তারপর সেই অর্ঘ্য স্নানের জন্য নির্দিষ্ট শঙ্খে স্থানান্তরিত করতে হবে।

তারপর শঙ্খ থেকে সেই অর্ঘ্যরূপ জল পাদ্য, অর্ঘ্য এবং আচমনের জন্য নির্দিষ্ট পাত্রে নিক্ষেপ করতে হবে*।)

● তারপর শঙ্খ থেকে বিশেষ অর্ঘ্য জলের কিয়দংশ পঞ্চপাত্রে নিক্ষেপ করে অবশিষ্ট সামান্য অর্ঘ্যকে বিশেষ অর্ঘ্যে পরিণত করতে হবে।

● অবশেষে পঞ্চপাত্র থেকে চামচে করে বিশেষ অর্ঘ্যের কিছুটা জল দক্ষিণ হস্তের তালুতে গ্রহণপূর্বক সেটি স্বীয় মস্তকে এবং পূজার উপকরণসমূহে অর্চিত বিগ্রহের মূল মন্ত্র পাঠযোগে প্রোক্ষণ করতে হবে।

পীঠ পূজা

● স্নান-পাত্রে চন্দনের দ্বারা অষ্ট পুষ্পদল সমন্বিত পদ্মাকৃতি একটি মণ্ডল অঙ্কন করতে হবে।

● মণ্ডলের কেন্দ্রে কামবীজ (ক্লীং) রচনা করতে হবে।

● শ্রীধাম এবং শ্রীগুরুদেবের ধ্যান করে চন্দন সহযোগে কয়েকটি পুষ্পদল পীঠে অর্পণ করতে হবে।

উপচার সহযোগে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বাহ্যপূজা

(সেই সময়ে শ্রীবৎস, কৌস্তুভ, বিল্ব, বনমালা এবং বেণু নামক শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় পাঁচটি মুদ্রা প্রদর্শন করা যেতে পারে। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পরিশিষ্ট দেখুন)

প্রত্যেকটি উপচারে প্রথমে শ্রীকৃষ্ণকে এবং তারপরে শ্রীমতী রাধারাণীকে অর্পণ করতে হবে।

● *এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ* মন্ত্র উচ্চারণ করে এবং রাধাকৃষ্ণের মূল মন্ত্র জপ করে তাঁদের শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পদল অর্পণ করতে হবে।

♦ ১) আসন

● *ইমে পাদুকে* মন্ত্র পাঠ করে এবং রাধাকৃষ্ণের মূল মন্ত্র জপ করে বিগ্রহের উদ্দেশ্যে পাদুকা অর্পণ করতে হবে।

● *ইদং আসনম্* মন্ত্র পাঠ করে এবং রাধাকৃষ্ণের মূলমন্ত্র জপ করে বিগ্রহকে আসন প্রদান করতে হবে। হস্ত দ্বারা ইঙ্গিতের মাধ্যমে তাঁদের আসন গ্রহণ করার জন্য আবেদন জানাতে হবে।

---

* এই সব বিশেষ অর্ঘ্যের জন্য যদি পৃথক পৃথক জলপাত্র ব্যবহার করা হয় তবে পাদ্য, অর্ঘ্য এবং আচমনের জন্য মূল জলপাত্র থেকে পৃথক পৃথক জলপাত্রে জল নিন। তৃতীয় বিকল্প হচ্ছে তিনটি পাত্র পৃথকভাবে স্থাপন করুন এবং বিশেষ অর্ঘ্যের জন্য যে পদ্ধতি তা অনুসরণ করুন।

♦ ২) স্বাগত

● *স্বাগতং সুস্বাগতম্* মন্ত্র পাঠ করে এবং রাধাকৃষ্ণের মূল মন্ত্র জপপূর্বক করজোড়ে তাঁদের স্বাগত জানাতে হবে। এই সময়ে তাঁদের স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য দিতে হবে।

♦ ৩) পাদ্য

● *এতৎ পাদ্যম্* মন্ত্র পাঠ করে এবং রাধাকৃষ্ণের মূলমন্ত্র জপ করে শ্রীপাদপদ্ম ধৌত করার জন্য বিগ্রহের উদ্দেশ্যে পাদ্য অর্পণ করতে হবে।

♦ ৪) অর্ঘ্য

● ঘণ্টাবাদন করতে করতে *ইদং অর্ঘ্যম্* পাঠ করে এবং রাধাকৃষ্ণের মূলমন্ত্র জপ করে তাঁদের করকমলে অর্ঘ্য প্রদান করতে হবে যাতে তাঁরা তা নিজেদের মস্তকে প্রোক্ষণ করতে পারেন।

♦ ৫) আচমন

● *ইদং আচমনীয়ম্* মন্ত্র পাঠপূর্বক শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মূলমন্ত্র জপ করতে হবে এবং তাঁদের আচমনের জন্য জল প্রদান করতে হবে।

♦ ৬) মধুপর্ক

● *এষ মধুপর্কঃ* মন্ত্র পাঠ করে এবং রাধা-কৃষ্ণের মূলমন্ত্র জপ করে মধুপর্ক পূর্ণ পাত্র বিগ্রহকে অর্পণ করতে হবে।

♦ ৭) পুনরাচমন

● *ইদং পুনরাচমনীয়ম্* মন্ত্র পাঠ করে এবং রাধাকৃষ্ণের মূল মন্ত্র জপ করে পুনরায় আচমনের জন্য জল প্রদান করতে হবে।

♦ ৮) স্নান

● মূর্তিশুদ্ধি : বিগ্রহের বস্ত্রাদি অপসারণপূর্বক উষ্ণজলে সিক্ত একটি নরম বস্ত্রখণ্ডের দ্বারা অঙ্গ মার্জন করতে হবে এবং অঙ্গস্থিত চন্দন, তুলসীসমূহ পরিষ্কার করতে হবে।

● *ইমে পাদুকে* মন্ত্র পাঠপূর্বক রাধাকৃষ্ণের মূলমন্ত্র জপ করে তাঁদের পাদুকা প্রদান করতে হবে স্নান-ক্ষেত্রে বা স্নানপাত্রে আগমনের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে হবে।

● অতঃপর *ইদং সুগন্ধ তৈলং* মন্ত্র পাঠপূর্বক রাধাকৃষ্ণের মূল মন্ত্র জপ করে সুগন্ধি তৈলের দ্বারা বিগ্রহের শ্রীঅঙ্গ মর্দন করতে হবে।

বিগ্রহ যদি ধাতুনির্মিত হন, তা হলে গোপীচন্দন বা বাদামের লেই প্রথমে নরম বস্ত্রখণ্ডের দ্বারা সমস্ত অঙ্গে লেপন করতে হবে (নয়ন ও অন্যান্য চিত্রিত অঙ্গসমূহ বাদ দিয়ে) এবং তারপর আরেকটি নরম বস্ত্রখণ্ডের দ্বারা সেই লেই ধীরে ধীরে অপসারণ করতে হবে।

● *ইদং স্নানীয়ম্* মন্ত্র পাঠপূর্বক রাধাকৃষ্ণের মূল মন্ত্র জপ করতে হবে, এবং ঘণ্টাবাদন সহযোগে *ব্রহ্মসংহিতা* থেকে গোবিন্দ স্তোত্র ও অন্যান্য সময়োপযোগী স্তোত্রাদি পাঠ করতে করতে জলপূর্ণ শঙ্খ থেকে বিগ্রহের উপর জল সিঞ্চন করতে হবে (অন্ততপক্ষে তিন শঙ্খ জল) যদি জলের দ্বারা সাক্ষাৎভাবে বিগ্রহকে স্নান করানো সম্ভব না হয়, তা হলে *দর্পণ-স্নানীয়* ধ্যানের দ্বারা স্নান সম্পন্ন করতে হবে। অর্থাৎ, একটি দর্পণ বা অত্যন্ত মসৃণ উজ্জ্বল একটি রৌপ্যপাত্র বিগ্রহের সম্মুখে স্থাপন করে তাতে প্রতিফলিত বিগ্রহের প্রতিচ্ছবির উপর জল সিঞ্চন করতে হবে এবং মানসে তাঁদের প্রত্যক্ষ স্নানের কথা চিন্তা করতে হবে।

চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্ ।
লক্ষ্মীসহস্রশত সম্ভ্রমসেব্যমানং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

লক্ষ-লক্ষ-কল্পবৃক্ষে আবৃত চিন্তামণিকর গঠিত গৃহসমূহে সুরভি অর্থাৎ কামধেনুগণকে যিনি পালন করছেন এবং শত সহস্র লক্ষ্মীগণ কর্তৃক সাদরে পরিসেবিত হচ্ছেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

বেণুং ক্বণন্তমরবিন্দদলায়তাক্ষং
বর্হাবতংসমসিতাম্বুদসুন্দরাঙ্গম্ ।
কন্দর্পকোটিকমনীয়বিশেষশোভং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

মুরলীগান-তৎপর, কমলদলের ন্যায় প্রফুল্লচক্ষু, ময়ূর-পুচ্ছ শিরোভূষণ, নীলমেঘবর্ণ সুন্দর শরীর, কোটিকন্দর্প মোহন বিশেষ শোভা-বিশিষ্ট সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

● *ইদং অঙ্গ বস্ত্রম্* মন্ত্র পাঠ করে এবং শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মূলমন্ত্র জপ করে নরম বস্ত্র দিয়ে বিগ্রহকে মুছতে হবে।

● *ইদং আচমনীয়ম্* মন্ত্র পাঠপূর্বক শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মূলমন্ত্র জপ করতে হবে এবং তাঁদের আচমনের জন্য জল প্রদান করতে হবে।

♦ ৯) বস্ত্র

● *ইদং বস্ত্রম্* মন্ত্র পাঠ করে এবং শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মূলমন্ত্র জপ করে বিগ্রহের উদ্দেশ্যে বস্ত্র প্রদান করতে হবে।

● ঊর্ধ্বাঙ্গের বস্ত্র পরিধান করানোর পূর্বে নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলি যথাক্রমে পাঠ করে শ্রীকৃষ্ণকে একটি উপবীত, আচমনের জল এবং ঊর্ধ্বপুণ্ড্রের জন্য তিলক অর্পণ করতে হবে।

ইদম্ উপবীতম্ এবং শ্রীকৃষ্ণের মূলমন্ত্র ;
ইদম্ আচমনীয়ম্ এবং শ্রীকৃষ্ণের মূলমন্ত্র ;
ইদম্ তিলকম্ এবং শ্রীকৃষ্ণের মূলমন্ত্র ।

(তিলক রচনার সময়ে বিভিন্ন অঙ্গের জন্য নির্দিষ্ট শ্রীবিষ্ণুর নামসমূহ পাঠ করা যেতে পারে, ঠিক যেমন নিজের ক্ষেত্রে করা হয়। কপালের জন্য *ওঁ কেশবায় নমঃ* ইত্যাদি)

● *ইদং কুঙ্কুমম্* মন্ত্র পাঠ করে রাধারাণীর ললাটে কুঙ্কুম প্রয়োগ করতে হবে।

● *ইদম্ আচমনীয়ম্* মন্ত্র পাঠ করে এবং রাধাকৃষ্ণের মূল মন্ত্র জপ করে আচমনের জন্য জল প্রদান করতে হবে।

♦ ১০) আভরণ

● *ইমানি আভরণানি* মন্ত্র পাঠ করে এবং রাধাকৃষ্ণের মূল মন্ত্র জপ করে বিগ্রহকে অলঙ্কারের দ্বারা সজ্জিত করতে হবে।

● *ইদং কঙ্কণম্* মন্ত্রপাঠ করে এবং রাধাকৃষ্ণের মূলমন্ত্র জপ করে চিরুণির দ্বারা কেশবিন্যাস করতে হবে। পুষ্পমালিকা এই সময়ে অর্পণ করা যেতে পারে, অথবা পুষ্প অর্পণের পরেও করা যেতে পারে (নিম্নে দ্রষ্টব্য)।

♦ ১১) গন্ধ

● *এষ গন্ধঃ* মন্ত্র পাঠ করে এবং রাধাকৃষ্ণের মূল মন্ত্র জপ করে ঋতু অনুসারে সুগন্ধিযুক্ত চন্দন বিগ্রহের শ্রীপাদপদ্মে, হস্তদ্বয়ে এবং ললাটে লেপন করতে হবে।

♦ ১২) পুষ্প

● *এতানি পুষ্পানি* মন্ত্র পাঠ করে এবং রাধাকৃষ্ণের মূল মন্ত্র জপ করে সুগন্ধি পুষ্প ও পুষ্পদল চন্দন সহযোগে ঘণ্টাবাদন করতে করতে বিগ্রহের শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করতে হবে। অলঙ্করণের জন্য অতিরিক্ত পুষ্পাদি এই সময়ে অর্পণ করা যেতে পারে।

● এতৎ *তুলসীপত্রম্* (একটি পত্রের জন্য) বা *এতানি তুলসী পত্রাণি* (একাধিক পত্রের জন্য) মন্ত্র পাঠ করে এবং শ্রীকৃষ্ণের মূলমন্ত্র জপ করে চন্দন সহযোগে তুলসীপত্র ও মঞ্জরী শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে অর্পণ করতে হবে।

● শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করার জন্য রাধারাণীর দক্ষিণ হস্তে তুলসী পত্র প্রদান করতে হবে।

● *ইমানি মাল্যানি* মন্ত্র পাঠ করে এবং রাধাকৃষ্ণের মূলমন্ত্র জপ করে বিগ্রহকে পুষ্পমালিকা প্রদান করতে হবে।

(বিকল্প : আভরণের দ্বারা সজ্জিত করার সময়ে অথবা নৈবেদ্য প্রদানের পরও মাল্য প্রদান করা যায়।)

♦ ১৩) ধূপ

● *এষ ধূপঃ* মন্ত্র পাঠ করে এবং রাধাকৃষ্ণের মূল মন্ত্র জপ করে ঘণ্টাবাদন করতে করতে বিগ্রহের উদ্দেশ্যে ধূপ দান করতে হবে।

♦ ১৪) দীপ

● *এষ দীপঃ* মন্ত্র পাঠ করে এবং রাধাকৃষ্ণের মূল মন্ত্র জপ করে ঘণ্টাবাদন করতে করতে বিগ্রহের উদ্দেশ্যে ঘি অথবা কর্পূর দীপ দান করতে হবে।

♦ ১৫) নৈবেদ্য

● প্রোক্ষণের দ্বারা ভোগ শুদ্ধ করে প্রথমে ভোগের উপর তুলসীপত্র দিতে হবে।

● তারপর *এতৎ পাদ্যম্* মন্ত্র পাঠ করে এবং রাধাকৃষ্ণের মূল মন্ত্র জপ করে বিগ্রহের পদধৌত করার উদ্দেশ্যে পাদ্য জল অর্পণ করতে হবে।

● *ইদম্ আচমনীয়ম্* মন্ত্র পাঠ করে এবং রাধাকৃষ্ণের মূল মন্ত্র জপ করে বিগ্রহকে আচমন করাতে হবে।

● ইদং *নৈবেদ্যম্* মন্ত্র পাঠ করে এবং রাধাকৃষ্ণের মূল মন্ত্র জপ করে বিগ্রহের উদ্দেশ্যে ফলমূল এবং মিষ্টান্ন সহযোগে প্রস্তুত ভোগের পাত্র নিবেদন করতে হবে।

● ইদং *পানীয়ম্* মন্ত্র পাঠ করে এবং রাধাকৃষ্ণের মূল মন্ত্র জপ করে বিগ্রহের উদ্দেশ্যে পানীয় জল নিবেদন করতে হবে।

● শ্রীগুরুদেবের সেবায় সহায়তা করার প্রার্থনা করে এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং শ্রীকৃষ্ণের কৃপা প্রার্থনা করে নিম্নলিখিত স্তুতিসমূহ তিনবার ঘণ্টাবাদন করতে করতে পাঠ করতে হবে—

নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে [শ্রীগুরুদেবের নাম] ইতি নামিনে ॥

আমি আমার পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেবের (গুরুদেবের নাম) উদ্দেশ্যে ভক্তিপূর্ণ প্রণতি নিবেদন করি, যিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণপূর্বক তাঁর প্রিয়ত্ব অর্জন করেছেন।

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায়তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥

হে মহাবদান্য অবতার! আপনি স্বয়ং কৃষ্ণ, এখন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। আপনিশ্রীমতী রাধারাণীর তপ্তকাঞ্চন গৌরবর্ণ পরিগ্রহ করে বিশুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম উদারভাবে বিতরণ করছেন। আমি আপনার উদ্দেশ্যে ভক্তিপূর্ণ প্রণতি নবেদন করি।

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ-হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

আমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে ভক্তিপূর্ণ প্রণতি নিবেদন করি, যিনি সমস্ত ব্রাহ্মণদের আরাধ্য পরম দেবতা, যেনি গাভী ও ব্রাহ্মণদের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী এবং যিনি সর্বদা সমগ্র জগতের মঙ্গল বিধান করছেন। কৃষ্ণ ও গোবিন্দ নামে খ্যাত সেই পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে আমি বারংবার প্রণাম নিবেদন করি।

● পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করতে হবে (নিজ আসনে উপবিষ্ট অবস্থাতেই চোখ বন্ধ করে প্রচুর ভোগ গ্রহণের কথা স্মরণ করতে হবে, কিংবা ঘরের বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করতে হবে।)

● *ইদং হস্ত-মুখ-প্রক্ষালনম্* মন্ত্র পাঠ করে এবং রাধাকৃষ্ণ মূল মন্ত্র জপ করে হস্ত, মুখ প্রক্ষালনের জন্য বিগ্রহের উদ্দেশ্যে জপ প্রদান করতে হবে।

● *এতৎ পাদ্যম্* মন্ত্র পাঠ করে এবং রাধাকৃষ্ণের মূল মন্ত্র জপ করে বিগ্রহকে পাদ্য জল অর্পণ করতে হবে।

● *ইদম্ আচমনীয়ম্* মন্ত্র পাঠ করে এবং রাধাকৃষ্ণের মূল মন্ত্র জপ করে বিগ্রহকে আচমনের জন্য জল প্রদান করতে হবে।

● *ইমানি মাল্যানি* মন্ত্র পাঠ করে এবং রাধাকৃষ্ণের মূল মন্ত্র জপ করে বিগ্রহকে পুষ্পমাল্য পরাতে হবে (যদি পূর্বে পরানো না হয়ে থাকে।)

● *ইদং মুখবাসম্* মন্ত্র পাঠ করে এবং রাধাকৃষ্ণের মূল মন্ত্র জপ করে বিগ্রহকে মুখশুদ্ধিস্বরূপ বিশেষভাবে প্রস্তুত মশলা প্রদান করতে হবে।

● *ইদং তাম্বূলম্* মন্ত্র পাঠ করে এবং রাধাকৃষ্ণের মূল মন্ত্র জপ করে বিগ্রহের উদ্দেশ্যে তাম্বূল অর্পণ করতে হবে।

● ঘণ্টাবাদন করতে করতে *ইদং সর্বম্* মন্ত্র পাঠ করে এবং রাধাকৃষ্ণের মূল মন্ত্র জপ করে শ্রীবিগ্রহের পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিতে হবে। এই পুষ্প বিগ্রহের প্রীতিবিধানকারী অতিরিক্ত উপচারসমূহের প্রকাশস্বরূপ।

♦ ১৬) প্রণাম

● বিগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রণাম, স্তুতি এবং সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত নিবেদন করতে হবে :

নিঃশব্দে মন্ত্র জপ

● নিঃশব্দে গোপাল মন্ত্র এবং কামগায়ত্রী মন্ত্র দশবার করে জপ করতে হবে।

যদি সময় থাকে, তা হলে ভগবানের উপাঙ্গ (পূজার উপকরণ সমূহ) এবং আভরণ (ভগবানের পরিকরসমূহ) পূজা সম্পাদন করা যেতে পারে তাঁদের উদ্দেশ্যে চন্দন সহযোগে পুষ্প এবং ভগবানের মহাপ্রসাদ অর্পণ করার মাধ্যমে। রাধাকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত উপচারসমূহও অর্পণ করা যেতে পারে।

উপাঙ্গ পূজা

● *এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শ্রীমুখবেণবে নমঃ* মন্ত্রোচ্চারণ করে চন্দনসিক্ত সুগন্ধি ফুল শ্রীভগবানের বংশীর উদ্দেশ্যে নিবেদন করে, শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে অর্পণ করতে হয়।

● *এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বক্ষসি বনমালায়ৈ নমঃ* মন্ত্রোচ্চারণ করে সুগন্ধি পুষ্প নিয়ে শ্রীভগবানের বক্ষদেশে বিরাজমান পুষ্পমাল্যের উপরে নিবেদন করতে হয়। তার পরে সেটি তাঁর চরণপদ্মে স্থাপন বিধেয়।

● *এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দক্ষস্তনোর্ধ্বে শ্রীবৎসায় নমঃ* মন্ত্রোচ্চারণ করে শ্রীভগবানের বক্ষদেশের দক্ষিণপার্শ্বে তাঁর শ্রীবৎস চিহ্নে সুগন্ধি পুষ্প নিবেদন করতে হয়। তার পরে ফুলগুলি তাঁর পাদপদ্মে অর্পণ করতে হয়।

● *এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সব্যস্তনোর্ধ্বে কৌস্তুভায় নমঃ* মন্ত্রোচ্চারণ করে সুগন্ধিপুষ্প নিয়ে শ্রীভগবানের বক্ষদেশের বাম পার্শ্বে তাঁর কৌস্তুভ মণিতে স্পর্শ করাতে হয় এবং তার পরে ফুলগুলি তাঁর শ্রীচরণে অর্পণ করাই বিধেয়।

আবরণ পূজা

● *এতে গন্ধপুষ্পে শ্রীললিতাদিসখীভ্যো নমঃ* মন্ত্রোচ্চারণ করে প্রথমে ললিতাদেবীকে এবং পরে অন্যান্য সখীদের উদ্দেশ্যে সুগন্ধি পুষ্প নিবেদন করতে

হয়। সখীদের কোনও মূর্তি না থাকলে, পুষ্পকোরকগুলি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বামে ও দক্ষিণে স্থাপন করলেই হবে।

● *এতে গন্ধপুষ্পে নন্দযশোদাদিভ্যো নমঃ* মন্ত্রোচ্চারণ করে নন্দ মহারাজ এবং যশোদামাতা প্রমুখ শ্রীভগবানের বয়োজ্যেষ্ঠদের উদ্দেশ্যে সুগন্ধি পুষ্প নিবেদন করতে হয়। তারপর পুষ্পকোরক শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে নিবেদন করতে হয়।

● *এতে গন্ধপুষ্পে শ্রীসুবলাদিমিত্রেভ্যো নমঃ* মন্ত্রোচ্চারণ করে সুবল-প্রমুখ সখাবৃন্দের উদ্দেশ্যে সুগন্ধি পুষ্প নিবেদন করতে হয়। তার পরে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে পুষ্পকোরক নিবেদন করা বিধেয়।

● শ্রীবৃন্দাবনধামের গোবৎসাদি, গাভী-বলদ, অরণ্যানী, এবং পশু পক্ষীদের পূজা করার উদ্দেশ্যে *এতে গন্ধপুষ্পে বৎসগোবৃষভবন্যমৃগপক্ষিভ্যো নমঃ* মন্ত্রটি উচ্চারণ সহকারে সুগন্ধিপুষ্প নিবেদন করতে হয়। তার পরে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে পুষ্পকোরক নিবেদন বিধেয়।

● শ্রীবৃন্দাবনধামের সমস্ত অধিবাসীদের পূজা করার উদ্দেশ্যে *এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সর্বব্রজবাসিভ্যো নমঃ* মন্ত্রটি উচ্চারণ করে সুগন্ধি পুষ্প নিবেদন করতে হয়। তার পরে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে পুষ্পকোরক নিবেদন বিধেয়।

● ব্রহ্মা থেকে শুরু করে সকল দেব-দেবীর পূজা করার উদ্দেশ্যে *এতে গন্ধপুষ্পে ব্রহ্মাদিদেবেভ্যো নমঃ* মন্ত্রটি উচ্চারণ সহকারে সুগন্ধি পুষ্প নিবেদন করতে হয়। পরে শ্রীরাধা এবং শ্রীকৃষ্ণের চরণে পুষ্প অর্পণ বিধেয়।

● সকল বৈষ্ণবজনের উদ্দেশ্যে পূজার মানসে, *এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ সর্ববৈষ্ণবেভ্যো নমঃ* মন্ত্রটি উচ্চারণ করে সুগন্ধি পুষ্পাদি নিবেদন করতে হয়। পরে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে পুষ্পকোরক নিবেদন বিধেয়।

● সমস্ত বৈষ্ণবীদের পূজার উদ্দেশ্যে, *এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সর্ববৈষ্ণবীভ্যো নমঃ* মন্ত্রটি উচ্চারণ সহকারে সুগন্ধি পুষ্পাদি অর্পণ করে, শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে পুষ্পাদি নিবেদন বিধেয়।

মহাপ্রসাদ নিবেদন

এবার নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করে শ্রীভগবানের পার্ষদবৃন্দকে মহাপ্রসাদ নিবেদন করতে হয়—

● দীক্ষাগুরুর প্রতিকৃতি বা মূর্তির সামনে শ্রীবিগ্রহাদির নৈবেদ্য প্রসাদ এবং কিছু নির্মাল্য অল্পক্ষণের জন্য ধারণ করার সঙ্গে *ইদং মহাপ্রসাদম্ নির্মাল্যাদিকম্* মন্ত্র এবং গুরুমূলমন্ত্র উচ্চারণ সহকারে ঐ নৈবেদ্য প্রসাদ ও নির্মাল্য তাঁকে নিবেদন করতে হয়।

● শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতিকৃতি বা মূর্তির সামনে শ্রীবিগ্রহাদির নৈবেদ্য প্রসাদ এবং কিছু নির্মাল্য অল্পক্ষণের জন্য ধারণ করার সঙ্গে ইদং *মহাপ্রসাদম্ নির্মাল্যাদিকম্* মন্ত্র এবং গুরুমূলমন্ত্র উচ্চারণ সহকারে ঐ নৈবেদ্য প্রসাদ ও নির্মাল্য তাঁকে নিবেদন করতে হয়।

● শ্রীবৃন্দাবনধামে শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদবর্গ বিরাজমান রয়েছেন, তেমনভাবে তাঁদের চিন্তায় ধ্যানমগ্ন হয়ে *ইদং মহাপ্রসাদম্ নির্মাল্যাদিকম্ ওঁ সর্বব্রজবাসীভ্যো নমঃ* মন্ত্র উচ্চারণ সহকারে তাঁদের উদ্দেশ্যে শ্রীমতী রাধার এবং শ্রীকৃষ্ণের নৈবেদ্য প্রসাদ ও নির্মাল্য অর্পণ করতে হয়।

● *ইদং মহাপ্রসাদম্ নির্মাল্যাদিকম্ ওঁ সর্ববৈষ্ণবেভ্যো নমঃ* মন্ত্র উচ্চারণ করে সকল বৈষ্ণবজনের উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য প্রসাদ ও নির্মাল্য নিবেদন করতে হয়।

আরও কিছু সেবা-পরিকর নিবেদন

(বিকল্প ক্ষেত্রে দর্শন আরতির পরে স্তুতি, কর্ম-সমর্পণ, আত্ম-সমর্পণ এবং অপরাধ-শোধন প্রক্রিয়াদি সাধনের সঙ্গেও এইগুলি নিবেদন করা চলে)

● *এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ* এবং রাধাকৃষ্ণ মূলমন্ত্র উচ্চারণ করে শ্রীবিগ্রহাদির সমীপবর্তী হয়ে তাঁদের পাদপদ্মে পুষ্পকোরক নিবেদন করতে হয়।

● *ইমানি আভরণানি* এবং রাধা-কৃষ্ণ মূল মন্ত্র ও *ইমে মাল্যে* এবং রাধা-কৃষ্ণ মূল মন্ত্র উচ্চারণ সহকারে আরও অলঙ্কারাদি ও পুষ্পমাল্যাদি নিবেদন করতে হয়।

● *এষ-গন্ধঃ* এবং রাধা-কৃষ্ণ মূল মন্ত্র উচ্চারণ করে, ছোট তুলি কিংবা রৌপ্যশলাকার সাহায্যে চন্দন দিয়ে শ্রীভগবানের অঙ্গে আলপনা সজ্জা করে দেওয়া যায়।

● এই সময়ে মানসভাবে শ্রীভগবানকে একটি মণ্ডপে আরোহণ করানোর উদ্দেশ্যে ছত্র, চন্দ্রাতপ, পতাকা ও পাদুকা নিবেদন করা চলে।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ স্তুতি

পাদ্যপঞ্চক

সংসারসাগরান্ নাথ পুত্রমিত্রগৃহাঙ্গনাৎ ।
গোপ্তারৌ মে যুবাম্ এব প্রপন্নভয়ভঞ্জনৌ ॥

হে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ, পুত্র, মিত্র, গৃহ এবং ভূমিসম্পদে পূর্ণ জড় সংসার সাগরে আপনারা আমায় রক্ষা করছেন। তাই আপনাদের শরণাগত সকলেরই আপনারা ভয়ভঞ্জনকারীরূপে পরিচিত।

যোঽহং মমাস্তি যৎ কিঞ্চিদ্ ইহ লোকে পরত্র চ।
তৎ সর্বং ভবতোঽদ্যৈব চরণেষু সমর্পিতম্ ॥

হে ভগবান, আমাকে এবং ইহলোকে পরলোকে আমার যৎকিঞ্চিৎ যা কিছু আছে, সব কিছুকে আপনার শ্রীচরণে সমর্পণ করলাম।

অহম্ অপ্যপরাধানাম্ আলয়স্ত্যক্তসাধনঃ।
অগতিশ্চততো নাথৌ ভবন্তৌ মে পরা গতিঃ ॥

হে নাথ, আমি অবশ্যই বহু অপরাধের আলয়স্বরূপ এবং সম্পূর্ণভাবে ভক্তিসাধন বর্জন করেছি। আমার কোনও গতি নেই। আপনারাই আমার পরম গতি।

তবাস্মি রাধিকানাথ কর্মণা মনসা গিরা।
কৃষ্ণকান্তে তবৈবাস্মি যুবাম্ এব গতির্মম ॥
শরণং বাং প্রপন্নোঽস্মি করুণানিকরাকরৌ।
প্রসাদং কুরু দাস্যং ভো ময়ি দুষ্টেঽপরাধিনি ॥

হে রাধিকানাথ, কর্মে, মানসে ও বাচনে আমি আপনারই দাস। হে কৃষ্ণকান্তা শ্রীমতী রাধারাণী, আমি তোমারই সেবক মাত্র। হে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ, হে করুণাসাগর, আপনারাই আমার একমাত্র আশ্রয়, তাই আমি আপনাদেরই শরণাগত হয়েছি। যদিও আমি অতি দুষ্ট অপরাধী, তবু কৃপা করে আমাকে আপনাদের দাস করে রাখুন।

বিজ্ঞপ্তিপঞ্চক

মৎসমো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী চ কশ্চন।
পরিহারেঽপি লজ্জা মে কিং ব্রুবে পুরুষোত্তম ॥
যুবতীনাং যথা যূনি যূনাম্ চ যুবতৌ যথা।
মনোঽভিরমতে তদ্বন্ মনো মে রমতাং ত্বয়ি ॥

হে পুরুষোত্তম, আমার মত পাপাত্মা কিংবা অপরাধী আর কেউ নেই। কেমন করে আমার লজ্জার কথা আমি বর্ণনা করতে পারি? যেভাবে যুবতীদের মন কোনও যুবকের চিন্তাকল্পে আনন্দ লাভ করে, এবং যুবকদের মন কোনও যুবতীর চিন্তায় আনন্দ পায়, ঠিক

সেইভাবেই কেবলই আপনার চিন্তায় আমার মন আনন্দে ভরিয়ে রাখতে দিন।

ভূমৌ স্খলিতপাদানাং ভূমিরেবাবলম্বনম্ ।
ত্বয়ি জাতাপরাধানাং ত্বমেব শরণং প্রভো ॥

পদস্খলিত মানুষের কাছে ভূমিই যেমন একমাত্র অবলম্বন, তেমনই আপনার প্রতি যারা অপরাধ সৃষ্টি করেছে, তাদের কাছে আপনিই, প্রভু, একমাত্র শরণাগতি।

গোবিন্দবল্লভে রাধে প্রার্থয়ে ত্বাম্ অহং সদা ।
তদীয়ম্ ইতি জানাতু গোবিন্দো মাং ত্বয়া সহ ॥

হে গোবিন্দবল্লভা শ্রীমতী রাধারাণী, আপনার প্রতি সদাই আমার এই প্রার্থনা—আপনি এবং গোবিন্দ আমাকে কৃপা করে আপনাদের একজন সহযোগী হতে দিন।

রাধে বৃন্দাবনাধীশে করুণামৃতবাহিনী ।
কৃপয়া নিজপাদাব্জদাস্যং মহ্যং প্রদীয়তাম্ ॥

হে শ্রীমতী রাধারাণী, হে বৃন্দাবনেশ্বরী, আপনি করুণামৃতবাহিনী নদীর মতো, কৃপা করে আপনার পাদপদ্মে আমাকে দাসত্বের সামান্য অধিকার প্রদান করুন।

কর্মসমর্পণ

● এই গদ্যমন্ত্রটি কিংবা এর অনুবাদ আবৃত্তি করতে করতে নিজের সকল কর্ম শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করতে হয়—

ইতঃ পূর্বং প্রাণবুদ্ধিধর্মাধিকারতো জাগ্রৎ স্বপ্নসুষুপ্ত্যবস্থাসু
মনসা বাচা কর্মনা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যাম্ উদরেণ শিশ্না যৎ
স্মৃতং যদুক্তং যৎ কৃতং তৎ সর্বং শ্রীকৃষ্ণার্পণং ভবতু স্বাহা ।
মাং মদীয়ং চ সকলং হরয়ে সমর্পয়ামি ॥
ওঁ তৎ সৎ ॥

প্রাণ, বুদ্ধি, শরীর এবং ধর্মাধর্ম বিবেচনার যোগ্যতা নিয়ে আমার মন, বাক্য, হাত, পা, উদর, ও শিশ্ন সহযোগে শয়নে স্বপনে জাগরণে যা কিছু চিন্তা করি কিংবা কাজ করি এবং আমার যা কিছু আছে সবই, হে শ্রীকৃষ্ণ, আপনার উদ্দেশ্যে আমি সমর্পণ করলাম।

আত্মসমর্পণ

অহং ভগবতোঽংশোঽস্মি সদা দাস্যোঽস্মি সর্বথা।
ত্বৎ কৃপাপেক্ষকো নিত্যম্ ইত্যাত্মানং সমর্পয়ে॥

হে ভগবান, সদা সর্বদা আপনার কৃপা প্রার্থনা করে, আপনার নিত্য অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে আপনার উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ করলাম।

অপরাধ শোধন

অঙ্গহীনং ক্রিয়াহীনং বিধিহীনং চয়াদ্ ভবেৎ।
অস্তু তৎ সর্বম্ অচ্ছিদ্রং কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-প্রসাদতঃ॥
যৎ কিঞ্চিদ্ বৈগুণ্যং জাতং তদ্ দোষ প্রশমনস্য।
শ্রীকৃষ্ণস্মরণং করোমি॥

অর্চনের কাজে আমাদের প্রক্রিয়ার মধ্যে এবং পূজাবিধি পালনে আমরা যে সমস্ত ত্রুটি সাধন করেছি, শ্রীকৃষ্ণ এবং কৃষ্ণভক্তবৃন্দ কৃপা করে তা প্রশমিত করুন। আমার যা কিছু ত্রুটি হয়ে থাকতে পারে তার দোষ প্রশমনের জন্য আমি এখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হলাম। *(সৎক্রিয়াসারদীপিকা)*

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

দর্শন আরতি

● দর্শন-আরতির জন্য পর্দার আবরণ উন্মোচনের পূর্বেই, সমস্ত অপ্রয়োজনীয় উপকরণাদি পরিষ্কার করে ফেলতে হয়, শ্রীবিগ্রহের বেদীর চারিপাশের মেঝে পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়, পিলসুজ প্রদীপাদি জ্বালিয়ে নিতে হয়, এবং (হাত ধুয়ে) শ্রীবিগ্রহাদির সামনে একটি মুকুর নিবেদন করতে হয় যাতে তাঁরা নিজেদের দর্শন করতে পারেন, এবং সেই সঙ্গে *এষ দর্পণঃ* মন্ত্রোচ্চারণ করতে হয়, রাধাকৃষ্ণ মূলমন্ত্র উচ্চারণ করাও দরকার, সেই সময়ে, সযত্নে সব কিছু উপকরণাদি মিলিয়ে দেখে নিতে হয় ঠিকঠাক আছে কিনা এবং কোনও প্রকার অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র (যেমন, পিন কুশন) বেদীতে পড়ে না থাকে।

(ইচ্ছা করলে, বেশ ঐশ্বর্যমণ্ডিত পূজা নিবেদনের অঙ্গস্বরূপ, পর্দার আবরণ সরে যাবার পরেও দ্বিতীয়বার মুকুর নিবেদন করা চলে, এবং আরতির আগেও তা করা যেতে পারে।)

● ধূপ, ফুল, চামর এবং ব্যজন (গ্রীষ্মকালে) সহ ধূপ-আরতি নিবেদন করতে হয়। অথবা, ধূপ ধুনো জ্বালিয়ে, কর্পূরের বাতি নিবেদন করে চামর ও ব্যজন (গ্রীষ্মকালে) ব্যবহার করা চলে।

প্রদক্ষিণ

● ভক্তমণ্ডলী কীর্তন সহকারে শ্রীবিগ্রহাদিকে তিনবার প্রদক্ষিণ করে থাকেন। (যে সব ছোট মন্দিরে এটা করা সম্ভব নয়, সেখানে অন্তত শ্রীবিগ্রহাদির সমানে বেশ উদ্দীপনা সহকারে কীর্তন পরিবেশন করা উচিত।)

প্রণাম

● শ্রীগুরুদেব এবং শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে অষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদনের সঙ্গে প্রার্থনা আবৃত্তি বিধেয়—

হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে ।
গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোঽস্তুতে ॥

হে আমার প্রিয় কৃষ্ণ, তুমি দীনজনের বন্ধু, তুমি করুণার সাগর, এবং জগতের সৃষ্টিকর্তা ও পালক। তুমি গোপজনের প্রভু এবং গোপিকাদের প্রেমকান্ত—বিশেষত তুমি শ্রীমতী রাধিকার হৃদয়কান্ত। তোমাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি।

তপ্তকাঞ্চন গৌরাঙ্গি রাধে বৃন্দাবনেশ্বরি ।
বৃষভানুসুতে দেবি প্রণমামি হরিপ্রিয়ে ॥

হে শ্রীমতী রাধারাণী, গলিত তপ্ত-কাঞ্চনবর্ণা সৌন্দর্যময়ী তোমাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে দেবী, তুমি বৃন্দাবনবাসের পরমেশ্বরী, তুমি রাজা বৃষভানুর কন্যা এবং পরমেশ্বর ভগবানের অতি প্রিয়।

নির্মাল্য গ্রহণ

● পূজারী (কিংবা কোন সহযোগী) ভক্তদের মধ্যে চরণামৃত বিতরণ করবেন। ভক্তগণ চরণামৃত মাথায় স্পর্শ করে নিম্নলিখিত মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে চরণামৃত পান করবেন—

শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদোদকং প্রেমভক্তিদাং মুদা ।
ভক্তিভারেণ বৈ পীত্বা শিরসা ধারয়াম্যহম্ ॥

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীচরণকমল থেকে আহরণ করা চরণামৃত শুদ্ধভক্তি প্রদান করে। সেই চরণামৃত পান করে আনন্দ ও ভক্তি সুধা লাভ হয়, তাই আমি এই চরণামৃত শিরোধার্য করলাম।

● এখন প্রসাদী পুষ্পমাল্যাদি, চন্দন ও সুগন্ধি উপকরণাদি (যা শ্রীবিগ্রহের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়ে গেছে) ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করতে পারা যেতে পারে এবং তখন সকলের "জয় মহাপ্রসাদ" প্রেমধ্বনি করা উচিত।

এইভাবে ষোড়শোপচারে মূল প্রাতঃকালীন পূজা সম্পন্ন করা যেতে পারে এবং এরই মধ্যে চৌষট্টি উপচারের অধিকাংশ উপকরণই রয়েছে।

বাকি সারাদিন ভোগারতি এবং সান্ধ্য আরতি প্রভৃতির মাধ্যমে বিভিন্ন উপচারাদি নিবেদন করা হয়। চৌষট্টি উপচারের বাকিগুলি শ্রীবিগ্রহের শয়নকালে রাত্রিবেলা নিবেদন করা যেতে পারে।

শয়ন সেবা

● শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহের উদ্দেশ্যে শয়নসেবা নিবেদনের জন্য নিম্নলিখিত উপকরণগুলি প্রয়োজন :—

(১) থালার উপরে রাখা একটি ছোট ঘণ্টা;
(২) পঞ্চপাত্রে সামান্য-অর্ঘ্য জল;
(৩) পাদ্য-অর্ঘ্য জল;
(৪) শ্রীবিগ্রহের শয্যা-আভরণাদি;
(৫) শ্রীবিগ্রহাদির রাত্রিবাস, তিলকাদি মোছবার জন্য কাপড়;
(৬) ফুল;
(৭) প্রত্যেক শ্রীবিগ্রহের জন্য দুধ সহ পাত্র;
(৮) প্রত্যেক শ্রীবিগ্রহের জন্য জলসহ পাত্র;
(৯) তাম্বূল;

অপরাহ্ণে (রাজভোগ আরতির ঠিক পরেই) এবং রাত্রে (শয়ন-আরতির পরে), শ্রীবিগ্রহাদির বিশ্রামের আয়োজন করা উচিত। অপরাহ্ণে পাদ্য-অর্ঘ্য, দুধ, জল, তাম্বূল, বা পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন না করলেও চলে, তবে (ছোট বিগ্রহগুলিকে শয্যায় বিশ্রামের জন্য অবস্থানের পূর্বে) মুকুট ও মাল্যভূষণাদি সরিয়ে নেওয়া উচিত। রাত্রে শ্রীবিগ্রহাদির বস্ত্রাভরণগুলি পরিবর্তন করে দেওয়া দরকার।

যদি কেবলমাত্র বড় আকারের শ্রীবিগ্রহাদি থাকে, তা হলে মানস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাঁদের ছোট শয্যা স্থানে নিয়ে যেতে হয়, ঠিক যেভাবে ছোট শ্রীবিগ্রহাদির জন্য শয্যায় নিয়ে যাওয়া হয়ে থাকে। বিকল্প ব্যবস্থায়, যদি শালগ্রাম শিলা

থাকেন, তা হলে তাঁকে শয্যায় স্থাপন করে বড় শ্রীবিগ্রহাদির উদ্দেশ্যে শয়নসেবা নিবেদনের উপচার সম্পন্ন করতে পারা যায়।

● শ্রীবিগ্রহ কক্ষের বাইরে, আচমন সম্পন্ন করে নিয়ে, শ্রীগুরুদেবের উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন বিধেয়। তারপরে শয়নসেবার উপকরণাদি—যেমন, তাম্বূল, পুষ্পাদি, শ্রীবিগ্রহাদির উদ্দেশ্যে দুধ, জল ইত্যাদি শ্রীবিগ্রহের কক্ষে নিবেদন করা যেতে পারে। পাদ্য অর্ঘ্য এবং বিসর্জনীয় পাত্র দুটিও শ্রীবিগ্রহ-কক্ষে পূর্ব থেকেই রেখে দেওয়া উচিত।

● মেঝেতে অথবা নিচু টেবিলে প্রত্যেক শ্রীবিগ্রহের জন্য শয্যা বেদির সামনে কিংবা পাশে রাখতে হয়। (শ্রীবিগ্রহকক্ষে যদি মশা-মাছি থাকে তো শয্যার চারিপাশে মশারী দিতে হয়।) শয্যা আভরণাদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে দিতে হয় এবং কিছু ফুল রাখতে হয় (মানসভাবে রাখাও চলে)।

● একটি আসনে বসে মানসভাবে চিন্তা করতে হয় যেন শ্রীবিগ্রহাদির শ্রীচরণে উপবেশন করে তাদের উদ্দেশ্যে বিবিধ সেবা নিবেদনের জন্য প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হচ্ছে। রাত্রে সমস্ত পুষ্পমাল্যাদি, অলঙ্কারাদি, এবং বহিরাবরণাদি (অন্তর্বাসগুলি ছাড়া) খুলে দিতে হয়, অল্প ভিজা কাপড় দিয়ে তিলক সজ্জাদি মুছে দিতে হয়, এবং রাত্রিবাসে শ্রীবিগ্রহাদি সাজিয়ে দিতে হয়।*

● তারপরে নিচের মন্ত্রটি (শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে) উচ্চারণের মাধ্যমে শ্রীবিগ্রহাদিকে বিশ্রাম গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে হয় এবং তাঁদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে হাত বাড়িয়ে দিতে হয় :—

আগচ্ছ শয়নস্থানং প্রিয়াভিঃ সহ কেশব ।
দিব্য পুষ্পাঢ্য শয্যায়াং সুখং বিহর মাধব ॥

হে কেশব, আপনার প্রিয়তমা শ্রীমতী রাধারাণী এবং তাঁর সখীগণকে নিয়ে এখন দিব্য সুগন্ধি পুষ্পসজ্জিত শয্যায় আগমন করুন। হে মাধব, এখন প্রীতিভরে আপনার লীলা উপভোগ করুন।

● শ্রীবিগ্রহাদিকে তাঁদের বিশ্রামের স্থানে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, এইভাবে চিন্তা করতে করতে তাঁদের পাদুকাগুলি বেদি থেকে শয্যায় নিয়ে যেতে হয়। শয্যার ঠিক পাশেই একটি ছোট মাদুরে বা বালিশের উপরে পাদুকাগুলি রাখতে হয়, তারপরে শ্রীবিগ্রহাদিকে তাঁদের শয্যায় নিয়ে আসতে হয়। (প্রথমে শয্যার পাশে একটি নিচু টেবিলে শ্রীবিগ্রহাদিকে স্থাপন করাই উত্তম যাতে নিম্নলিখিত

* এই সেবা উপচারগুলি শেষ নিবেদন ও আরতির আগে অর্পণ করা চলে, যদি শ্রীল প্রভুপাদ চাইতেন—বিশেষত বড় মন্দির গুলিতে যেখানে দর্শনার্থী জনগণ শেষ আরতির সময়ে শ্রীবিগ্রহাদির দর্শন লাভ করতে পারেন—সেখানে যেন শয়ন-আরতির শেষ পর্যন্তই শ্রীবিগ্রহাদিকে দিনের পোশাকে সজ্জিত রাখা হয়।

পূজার উপকরণগুলি গ্রহণ করা যেতে পারে। এটি সম্ভব না হলে, মানসভাবে প্রয়োজনীয় সামঞ্জস্য করে নিতে হয়।)

● শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহাদির সামনে উপবেশন করে বামহাতে ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে এবং যথোপযুক্ত মন্ত্রাবলী উচ্চারণ সহকারে নিম্নোক্ত উপচারাদি নিবেদন করতে হয় :—

● *এতৎ পাদ্যম্* এবং রাধা-কৃষ্ণ মূল মন্ত্র উচ্চারণ সহকারে শ্রীভগবানের পাদপদ্মে পাদ্য অর্ঘ্য জল নিবেদন করতে হয়।

● *ইদম্ আচমনীয়ম্* এবং রাধা-কৃষ্ণ মূল মন্ত্র উচ্চারণ সহকারে শ্রীভগবানের আচমন করার জন্য জল নিবেদন করতে হয়।

● *ইদম্ ঘনদুগ্ধম্* এবং রাধা-কৃষ্ণ মূল মন্ত্র উচ্চারণ সহকারে, শ্রীভগবানের সেবার্থে ঘন মিষ্ট দুগ্ধ নিবেদন করতে হয়।

● *ইদম্ পানীয়ম্* এবং শ্রীরাধা-কৃষ্ণ মূল মন্ত্র উচ্চারণ সহকারে, শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে পানীয় জল নিবেদন করতে হয়।

● *ইদম্ হস্তমুখপ্রক্ষালনম্* এবং শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ মূল মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে শ্রীভগবানের হাত-মুখ দেওয়ার জল নিবেদন করতে হয়।

● *এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ* এবং শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ মূল মন্ত্র উচ্চারণ সহকারে শ্রীভগবানের শ্রীচরণপদ্মে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করতে হয়।

● এবার শ্রীভগবানকে শয্যায় স্থাপনা করে *ইদং তাম্বূলম্* ও শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ মূল মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয় এবং শ্রীভগবানের প্রীতিবিধানের উদ্দেশ্যে তাম্বূল নিবেদন করে তাঁদের পাদপদ্মের সেবা করতে হয়।

● তারপর ঘরের তাপ অনুসারে তাঁদের শয্যায় যথাযথভাবে আবরণ পেতে দিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীখানি তাঁর মাথার বালিশের নিচে রাখতে হয়।

যখন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম, শ্রীজগন্নাথ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুদেরও বিশ্রামে স্থাপনা করা হবে, তখনও একই ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয় এবং যথাযথ মূলমন্ত্র ও শয়ন মন্ত্রাবলী উচ্চারণ করতে হয় —

শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের উদ্দেশ্যে নিচের শ্লোকটি উচ্চারণ করতে হয় —

শয্যাম্ আগচ্ছতং কৃষ্ণ যশোদানন্দবর্ধন ।
শয্যাম্ আগচ্ছতং রামপতিতং মাং দয়াং কুরু ॥

হে কৃষ্ণ, হে যশোদানন্দবর্ধন, এখন কৃপা করে আপনার শয্যায় আগমন করুন। হে বলরাম, কৃপা করে আপনার শয্যায় আগমন করুন এবং এই পতিতজনকে দয়া করুন।

শ্রীজগন্নাথদেবের উদ্দেশ্যে, শ্রীবলরাম ও শ্রীমতী সুভদ্রাদেবীর উদ্দেশ্যে নিচের প্রার্থনাটি উচ্চারণ করা উচিত—

আগচ্ছ শয়নস্থানম্ অগ্রজেণ হ্যধোক্ষজ ।
আগচ্ছ নিজশয্যাং চ সুভদ্রে মে দয়াং কুরু ॥

হে শ্রীজগন্নাথদেব, কৃপা করে আপনি এবং আপনার জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীবলরাম এখন আপনাদের শয্যা গ্রহণ করতে পারেন। হে সুভদ্রামাতা, কৃপা করে আপনার বিশ্রামস্থলে আগমন করুন এবং আমাকে দয়া করুন।

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের উদ্দেশ্যে, নিচের শ্লোকটি উচ্চারণ করা উচিত—

আগচ্ছ বিশ্রামস্থানং স্বগণৈঃ সহগৌরাঙ্গ ।
ক্ষণং বিশ্রময় সুখেন লীলয়া বিহার প্রভো ॥

হে শ্রীগৌরাঙ্গদেব, কৃপা করে আপনার পার্ষদগণসহ আপনার বিশ্রামস্থলে আগমন করুন। হে ভগবান, ক্ষণেকের তরে আপনার লীলাবৈচিত্র্য উপভোগের মাধ্যমে আরামে বিশ্রাম করে নিন।

তারপরে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর উদ্দেশ্যে এই প্রার্থনাটি উচ্চারণ বিধেয় :—

আগচ্ছ শয়নস্থানং নিত্যানন্দ জগদ্গুরৌ ।
তবরূপে মহাবিষ্ণোরনন্তে শয়নং কুরু ॥

হে জগদ্গুরু শ্রীমন্ নিত্যানন্দ, কৃপা করে আপনার বিশ্রামস্থলে আগমন করুন। আপনার মহাবিষ্ণুরূপে, সহস্রফণী শেষনাগের উপরে বিশ্রাম গ্রহণ করুন।

তারপরে নিচের প্রার্থনাটি উচ্চারণ করা যেতে পারে :—

সাধু বাসাধু বা কর্ম যদ্ যদ্ আচরিতং ময়া ।
তৎ সর্বং ভগবন্ বিষ্ণো গৃহাণারাধনং পরম্ ॥
অপাং সমীপে শয়নাসনে গৃহে ।
দিবা চ রাত্রৌ চ যথা চ গচ্ছত ॥
যদস্তি কিঞ্চিৎ সুকৃতং কৃতং ময়া ।
জনার্দনস্তেন কৃতেন তুষ্যতু ॥

হে ভগবান, আমি যে সমস্ত পূজা আচরণ সম্পাদন করেছি, তা যথার্থ কিংবা অযথার্থ যাই হোক না কেন, তাই আমার পরম আরাধনা রূপে কৃপাপূর্বক গ্রহণ করুন। হে শ্রীজনার্দন, আমি যা কিছু সুকৃতি সম্পাদন

করেছি, শয়নে আসনে, গৃহে কিংবা বাইরে, যা কিছু করেছি, কৃপা পূর্বক আপনি তাতে আমার প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

একই পদ্ধতি মতো গুরু মূলমন্ত্র উচ্চারণ সহকারে শ্রীগুরুদেবকেও বিশ্রামাসনে স্থাপনা করে মন্ত্রোচ্চারণ করতে হয়—*আগচ্ছ শয়নস্থানং স্বগণৈঃ সহ শ্রীগুরো।*

হে গুরুদেব, আপনার পার্ষদবর্গসহ আপনি আপনার বিশ্রামাসনে আগমন করুন।

অন্যান্য শ্রীবিগ্রহাদির উদ্দেশ্যে মন্ত্রোচ্চারণ বিধেয়—

আগচ্ছ শয়নস্থানং স্বগণৈঃ সহ এবং সেই-সেই শ্রীবিগ্রহের নামোচ্চারণ করতে হয়।

● আলো বা দীপ নিভিয়ে দিয়ে নীরবে শ্রীবিগ্রহ-কক্ষ পরিত্যাগ করে, দরজা বন্ধ করে, শ্রীগুরুদেবকে এবং শ্রীভগবানকে প্রণাম নিবেদন করতে হয়। রাত্রিকালে পূজারী অথবা তাঁর কোনও সহকারী শ্রীবিগ্রহাদির অলঙ্কারভূষণাদি, সাজসজ্জা এবং বস্ত্রগুলি যথাযথভাবে সংরক্ষিত জায়গায় সাজিয়ে রাখবেন, যাতে সেইগুলি শ্রীভগবানের পরিষ্কারাদিরূপে শ্রদ্ধা সহকারে ব্যবহৃত হতে পারে।

মূল মন্ত্রাবলী

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘে বিভিন্ন শ্রীবিগ্রহাদির পূজা-অর্চনার ক্ষেত্রে যে সমস্ত নির্ধারিত মূলমন্ত্রগুলি উচ্চারিত হয়ে থাকে, সেগুলি নিচে দেওয়া হল। যে সব ভক্ত প্রামাণ্য শ্রীগুরুদেবের কাছে দীক্ষাগ্রহণের মাধ্যমে পঞ্চরাত্রিক গায়ত্রী মন্ত্রাবলী উচ্চারণের অনুমোদন লাভ করেছেন, কেবলমাত্র তাঁরাই মূল মন্ত্রাবলী উচ্চারণ করতে পারেন।

গুরু : গুরু-প্রদত্ত সপ্ত মন্ত্রাবলীর দ্বিতীয় মন্ত্র

পূর্বতন গুরু : *ওঁ পরমগুরবে নমঃ*

পূর্বতন গুরু : *ওঁ পরাৎপরগুরবে নমঃ*

পূর্বতন গুরু : *ওঁ পরমেষ্ঠিগুরবে নমঃ*

বৈষ্ণবজন : *ওঁ সর্ববৈষ্ণবেভ্যো নমঃ*

শ্রীচৈতন্যদেব : গুরু-প্রদত্ত সপ্ত মন্ত্রাবলীর চতুর্থ মন্ত্র

শ্রীনিত্যানন্দ : *ক্লীং নিত্যানন্দায় নমঃ* কিংবা *ক্লীং দেবীজাহ্নবাবল্লভায় নমঃ*

অদ্বৈত আচার্য : *ক্লীং অদ্বৈতায় নমঃ*

শ্রীগদাধর : *শ্রীং গদাধরায় নমঃ*

শ্রীশ্রীবাস : *শ্রীং শ্রীবাসায় নমঃ*

শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীজগন্নাথ, গোবর্ধনশিলা ও দ্বারকাশিলা : গোপালমন্ত্র, অর্থাৎ গুরুপ্রদত্ত সপ্ত মন্ত্রাবলীর ষষ্ঠ মন্ত্র, অথবা *ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ*

শ্রীমতী রাধারাণী : *শ্রীং রাং রাধিকায়ৈ স্বাহা কিংবা শ্রীং রাধায়ৈ নমঃ*

শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ : *শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাম্ নমঃ*

ললিতা-বিশাখা : *শ্রীং শ্রীং ললিতাবিশাখাভ্যাং নমঃ*

গোপীগণ : *ওঁ সর্বসখীভ্যো নমঃ*

শ্রীমতী তুলসীদেবী : *ওঁ তুলস্যৈ নমঃ*

শ্রীবলরাম : *ক্লীং বলরামায় নমঃ*

শ্রীমতী সুভদ্রা : *শ্রীং সুভদ্রায়ৈ নমঃ*

শ্রীসুদর্শন : *ওঁ সুদর্শনায় নমঃ*

শ্রীরামচন্দ্র : *ক্লীং রামায় নমঃ* কিংবা *রাং রামায় নমঃ*

শ্রীমতী সীতা : *শ্রীং সীতায়ৈ স্বাহা* কিংবা *শ্রীং সীতায়ৈ নমঃ*

সীতা-রাম : *শ্রীং রাং সীতারামাভ্যাং নমঃ*

শ্রীলক্ষ্মণ : *ক্লীং সংকর্ষণায় নমঃ* কিংবা *লঙ্ লক্ষ্মণায় নমঃ*

শ্রীহনুমান : *হুং হনুমতে নমঃ*

বিষ্ণু শালগ্রামশিলা : *ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়* কিংবা *ওঁ নমো নারায়ণায়*

শ্রীনৃসিংহদেব : *ক্লীং নৃসিংহায় নমঃ* কিংবা *ক্ষ্রৌং নৃসিংহায় নমঃ*

শ্রীলক্ষ্মী-নৃসিংহ : *শ্রীং ক্লীং লক্ষ্মী-নৃসিংহাভ্যাং নমঃ* কিংবা *শ্রীং ক্ষ্রৌং লক্ষ্মী-নৃসিংহাভ্যাং নমঃ*

প্রহ্লাদ : *প্রং প্রহ্লাদায় নমঃ*

প্রহ্লাদ-নৃসিংহ : *প্রং ক্লীং প্রহ্লাদ-নৃসিংহাভ্যাং নমঃ* কিংবা *প্রং ক্ষ্রৌং প্রহ্লাদ-নৃসিংহাভ্যাং নমঃ*

শ্রীবিষ্ণুতত্ত্ব শ্রীবিগ্রহাদির উদ্দেশ্যে উচ্চারিত সকল মূলমন্ত্রের সাথে বীজ অক্ষর *ক্লীং* উচ্চারণ করা যেতে পারে, কারণ এই সকল শ্রীবিগ্রহাদিই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশপ্রকাশ। বিষ্ণুমূর্তি ছাড়া অন্যান্য যে সকল শ্রীবিগ্রহাদির জন্য বিশেষ কোনও মূলমন্ত্র নির্ধারিত নেই, তাঁদের উদ্দেশ্যে পূজা অর্চনা নিবেদনের সময়ে কেবলমাত্র *ওঁ* উচ্চারণসহ শ্রীবিগ্রহের নাম এবং *নমঃ* উচ্চারণ করতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, গোপবালক সুবলের উদ্দেশ্যে মূলমন্ত্রের উচ্চারণ হবে *ওঁ সুবলায় নমঃ*। বিকল্প প্রক্রিয়া মতে, শ্রীবিগ্রহের প্রথম অক্ষরটি নিয়ে তাতে অনুস্বার (ং) যোগ করে বীজমন্ত্রের রূপ দিতে হয়। যেমন, *প্রং প্রহ্লাদায় নমঃ*।

দ্রষ্টব্য : উপরোক্ত মন্ত্রগুলি ছাড়া কোনও বিশেষ বিগ্রহ অর্চনের ক্ষেত্রে অন্য কোনও মন্ত্র উচ্চারিত হতে থাকলে, সেই মন্ত্রই চলতে পারে।

উপচার নামাদি

পূজা-অর্চনা বা অনুষ্ঠান সংস্কারাদির সময়ে, উপচার উপকরণের নাম বা সেই সংস্কারের নাম উল্লেখ করার পরে, আরাধ্য-শ্রীবিগ্রহের মূলমন্ত্রটি

উচ্চারণ করতে হয়। এইভাবে, নিবেদিত উপচার তথা সেবা সংস্কারের প্রতি শ্রীভগবানের দৃষ্টি আকর্ষণ ও তাঁকে শ্রদ্ধা অর্পণ করা হয়ে থাকে।

বাঙালী গৌড়ীয় পূজা-অর্চনায়, উপচারের নামটি এক বচনে উচ্চারণের সময়ে তার আগে 'এই' শব্দটির সংস্কৃত রূপ—*এতৎ* কিংবা *ইদম্* ক্লীবলিঙ্গে (*এতৎ পাদ্যম্, ইদম্ আচমনীয়ম্*), *এষ* পুংলিঙ্গে (*এষ গন্ধ, এষ দীপঃ*), এবং *এষা* স্ত্রীলিঙ্গে (*এষা গঙ্গামৃত্তিকা*) যোগ করতে হয়। উপচার উপকরণটি একাধিক (বহুবচন) হলে, তার আগে *এতানি* ক্লীবলিঙ্গে (*এতানি পুষ্পানি*), *এতে* পুংলিঙ্গে এবং *এতা* ক্লীবলিঙ্গে ব্যবহার করা বিধেয়। উপকরণটি সংখ্যায় দুটি হলে, তার আগে *এতে* ক্লীবলিঙ্গে বা স্ত্রীলিঙ্গে (*এতে গন্ধপুষ্পে*), এবং *এতৌ* পুংলিঙ্গে ব্যবহার করতে হয়। মূল উপচারগুলির নাম নিম্নোক্ত—

এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ (ফুলের পাপড়ি)
ইমে পাদুকে (পাদুকা)
ইদম্ আসনম্ (আসন)
এতৎ পাদ্যম্ (পাদ্যার্ঘ্য জল)
ইদম্ অর্ঘ্যম (অর্ঘ্য বারি)
ইদম্ আচমনীয়ম্ (আচমনের জল)
এষ মধুপর্কঃ (মধুপর্ক পানীয়)
ইদং পুনরাচমনীয়ম্ (দ্বিতীয়বার আচমন)
ইদং সুগন্ধতৈলম্ (সুগন্ধি তেল)
ইদং স্নানীয়ম্ (স্নান)
ইদং বস্ত্রম্ (বস্ত্র)
ইদং উপবীতম্ (উপবীত)
ইদং তিলকম্ (তিলক)
ইদং আভরণম্ কিংবা বহুবচনে *ইমানি আভরণানি* (অলঙ্কারাদি)
এষ গন্ধঃ (সুগন্ধি সহ চন্দন বাটা)
এতে গন্ধপুষ্পে (চন্দনচর্চিত পুষ্পাদি)
এতেৎ তুলসীপত্রম্ কিংবা বহুবচনে *এতানি তুলসীপত্রানি* (তুলসী পত্র)
ইদং সগন্ধপুষ্পম্ কিংবা বহুবচনে *এতানি সগন্ধপুষ্পানি* (সুগন্ধি পুষ্প)
ইদং মাল্যম্ কিংবা বহুবচনে *ইমানি মাল্যানি* (পুষ্পমাল্য)
এষ ধূপঃ (ধূপ)
এষ দীপঃ (দীপ)
ইদং নৈবেদ্যম্ (আহার্য সামগ্রী)
ইদং পানীয়ম্ (পানীয়)
ইদং তাম্বূলম্ (পান)

পঞ্চম অধ্যায়

ভক্তিযুক্ত ভগবৎ-সেবা অনুশীলন
স্বাধ্যায়, সাধনা ও সদাচার

পঞ্চাঙ্গ পূজা-অর্চনার শেষ পর্যায়টি হল স্বাধ্যায়। যাকে বলা চলে নিজের প্রচেষ্টায় অধ্যয়ন চর্চা। এইভাবে নিজে নিজে পূজা-অর্চনার প্রয়াস করতে করতে স্বভাবতই বিভিন্ন ধরনের সেবায় নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ আসে, এবং সেইগুলি চর্চা করতে করতে ভক্তের মধ্যে যথার্থ বিনয়নম্রতার স্বভাব এবং পরিচ্ছন্নতার উচ্চ আদর্শ বিকাশ লাভ করতে থাকে। শ্রীভগবানের পবিত্র নাম সেবা, বৈষ্ণবগণ, অতিথিবর্গ, ভগবৎ-প্রসাদ, তুলসী, শাস্ত্রাদি এবং পবিত্র তীর্থধামাদির সেবা চর্চার মাধ্যমেও শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে এবং তাঁর পার্ষদপরিকরাদি, বৈষ্ণবগণও দেবতাদের প্রতি এবং প্রতিটি জীবের প্রতিও ভক্তের শ্রদ্ধাভাব দৃঢ় হতে থাকে। শ্রীবিগ্রহ আরাধনার মাধ্যমেই এই সেবা মনোবৃত্তি সযত্নে লালিত হতে পারে, এবং এরই মাধ্যমে শ্রীভগবানকে ভক্ত তার আশ্রয়দাতা ও রক্ষকরূপে মনে মনে আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলতে পারে, ফলে—ভক্ত স্বার্থান্বেষী চিন্তাভাবনা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারে আর এই পন্থায় শ্রীভগবানের পবিত্র নাম, বৈষ্ণবগণ এবং অন্যান্য শুভ চিন্তায় মনোনিবেশ সহকারে সেবা মনোভাব গড়ে তুলতে পারে। তা ছাড়া, শ্রীবিগ্রহ আরাধনা ছাড়াও, ভগবদ্ভক্তি সেবার চৌষট্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে ভক্তসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ, ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন এবং ধামে বসবাস প্রভৃতি কার্যক্রমের মধ্যে চার রকমের সাধনভক্তির পন্থা আছে, সেইগুলিরও পরিপোষণ হতে থাকে স্বাধ্যায় চর্চার ফলে। স্বাধ্যায় থেকে সদাচারও বিকশিত হতে থাকে। কোনও ভক্ত যখন এই সবগুলি কার্যক্রমের মধ্যে আত্মনিয়োগ করে থাকে, তখনই বাস্তবিক শ্রীভগবানের অর্চন সম্পূর্ণ ও সার্থক হয়।

নামসেবা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর 'শিক্ষাষ্টক' শ্লোকাবলীর মধ্যে ভগবানের পবিত্র নামের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন এইভাবে—

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তিঃ
তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি
দুর্দৈবম্ ঈদৃশম্ ইহাজনি নানুরাগঃ ॥

হে ভগবান, তোমার নামই জীবের সর্বমঙ্গল বিধান করেন, এই জন্য তোমার 'কৃষ্ণ', 'গোবিন্দাদি' বহুবিধ নাম তুমি বিস্তার করেছ। সেই নামে তুমি স্বীয় সর্বশক্তি অর্পণ করেছ এবং সেই নাম-স্মরণের কালাদি নিয়ম (বিধি বা বিচার) করনি। প্রভু, জীবের পক্ষে এমন কৃপা করে তুমি তোমার নামকে সুলভ করেছ, তবুও আমার নাম-অপরাধরূপ দুর্দৈব এরকম অবস্থা করেছে যে, তোমার সুলভ নামেও আমার অনুরাগ জন্মাতে দেয় না। (*শিক্ষাষ্টক* ২)

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর রচিত *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থের মধ্যে শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সংলাপের বর্ণনায় লিখেছেন, "সার্বভৌম ভট্টাচার্য তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ভগবদ্ভক্তি সাধনের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা কি?" শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন বললেন যে, ভগবানের নাম-সংকীর্তনই ভগবদ্ভক্তি সাধনের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা।" (*শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য,* ৬/২৪১)

যদিও শ্রীভগবানের পবিত্র নাম জপ কীর্তন সাধন ভক্তির মূল পঞ্চপ্রক্রিয়ার অন্যতম এবং এই কলিযুগে প্রেমভক্তিময় সেবার প্রাণ, তবুও অর্চনার পঞ্চাঙ্গের অন্যতম এই স্বাধ্যায় প্রকরণের একটি বিষয় রূপে এটিকে স্বীকার করতে পারি। পঞ্চরাত্রিকী বিধিমতে এখানে পূজা অর্চনার বিধিনিয়মাদি বর্ণনা করা হচ্ছে বলে, নামসেবা সম্পর্কিত আলোচনায় নামাপরাধমুক্ত কীর্তন বিকাশ লাভের বাস্তবসম্মত পথনির্দেশ বিবৃত করা হল।

জপমালায় হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ

শাস্ত্রাদিতে নামজপের যে বিধিনিয়মাদি লিপিবদ্ধ আছে, সেইগুলি বিশেষত গায়ত্রী মন্ত্রাবলী জপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তুলনীয়ভাবে বিচার করে দেখলে, শ্রীভগবানের পবিত্র নাম জপের ক্ষেত্রে সেই সমস্ত নিয়মাবলী মেনে চলবার আবশ্যকতা হয় না। তবে, এই সমস্ত নিয়মাবলীর মধ্যে অনেকগুলি মন্ত্রোচ্চারণের প্রতি নিবিড় মনোনিবেশের সহায়ক হয় বলে ভক্ত সেই নিয়মগুলি প্রয়োগের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় নিবিষ্টমনা হওয়ার ইচ্ছায় এবং পবিত্র নাম উচ্চারণে অপরাধ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সেইগুলি অনুসরণ করতে পারে। শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ বলেছেন—

"হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র অবশ্যই যে কোনও জায়গায় এবং যে কোনও সময়ে জপ করা চলতে পারে, এবং তার ফলে অতিক্রান্ত শুভ ফল অর্জন করা সম্ভব হতে পারে। তা সত্ত্বেও হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করবার সময়ে চারটি বিধিবদ্ধ কর্তব্য পালন অবশ্যই করতে হয়। জপ করতে বসে শরীর সোজা রাখতে হয় এবং তাতে জপের প্রক্রিয়া সার্থক হওয়ার পথ সুগম হয়ে থাকে, তা না হলে নিদ্রাচ্ছন্নতা আসতে পারে।" (ভাগবত ৭/১৫/৩১)

জপসংখ্যা গণনা

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (অন্ত্য ৩/১৩৭, তাৎপর্য) গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত নিচের অনুচ্ছেদটিতে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছেন—কিভাবে শিষ্যদের চিন্ময় পারমার্থিক জীবনে অগ্রগতি সাধনের জন্য তিনি শিক্ষা প্রদান করে থাকেন—

"আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে আমরা আমাদের অনুগামীদের শিক্ষা দিচ্ছি জপমালায় নিরন্তর 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র জপ করবার জন্য। যারা নিরন্তর 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র জপ করতে পারে না, তাদের উপদেশ দেওয়া হয়েছে অন্ততপক্ষে প্রতিদিন ১৬ মালা 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র জপ করা উচিত, যাতে তারা নিরন্তর হরিনাম জপ করবার স্তরে ক্রমে উন্নীত হতে পারে।"

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নির্দেশ দিয়েছেন—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

"তৃণের থেকেও সুনীচ হয়ে, তরুর থেকেও সহিষ্ণু হয়ে, এবং নিজে কোন রকম সম্মানের প্রত্যাশা না করে অপরকে সমস্ত সম্মান প্রদান করে, নিরন্তর হরিনাম করতে।" এই মনোভাব অবলম্বন না করলে নিরন্তর হরিনাম করা যায় না। হরিদাস ঠাকুরও বলেছেন, নিরন্তর নাম লও। (*চৈঃ চঃ অন্ত্য* ৩/১৩৭, তাৎপর্য)

শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ ব্যাখ্যা করেছেন যে, শ্রীভগবানের পবিত্র নাম জপের জন্য কোনও বিধিনিষেধ নেই। তিনি লিখেছেন—

পথে চলার সময়েও মৃদু স্বরে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ জপ করা চলে, কিংবা বাসে করে কোথাও যেতে যেতেও জপ করা যেতে পারে। যখন হাতে

কোনও কাজ করা হচ্ছে, তখনও মুখে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করা যেতে পারে এবং যখন বিশ্রাম করা হচ্ছে, তখনও জপ করা চলতে পারে। এমন কি স্নানঘরে স্নান করবার সময়েও জপ করতে পারা যায়। এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর হরা শক্তির নাম জপ করবার ক্ষেত্রে কোনও বাধা নেই। এই কাজে কোনও ক্ষতি নেই, কিন্তু লাভ আছে অনেক—সেই লাভটি হল অপ্রাকৃত উপলব্ধি। (শ্রীল প্রভুপাদের লেখা চিঠি তাং ২২ এপ্রিল ১৯৭০)

জপমালার গুটিগুলি (তুলসী কিংবা নিম কাঠের হলেই ভাল হয়) সুতোয় গেঁথে নিতে হয় এবং প্রত্যেক গুটির পরে একটি করে গিঁট বেঁধে দিতে হয়। একটি বাড়তি গুটি থাকবে, যাকে কৃষ্ণগুটি বা মেরুগুটি বলা হয়ে থাকে—জপ করবার সময়ে ঐ গুটিকাটি কখনও অতিক্রম করে যেতে নেই। মেরুগুটি থেকে এক দিকে অষ্টম ও নবম গুটির মাঝে একটি ছোট সুতোর বিনুনী থাকা উচিত যার দ্বারা প্রথম আটটি গুটি পৃথক করে রাখা যায়—যেগুলি প্রধানা অষ্ট সখীদের প্রতিভূ। গুটিগুলি সুতোয় গাঁথা হয়ে গেলে, জপমালাটিকে পঞ্চগব্যে (গাভীর পাঁচটি উৎপাদন—দুধ, দই, ঘি, গোবর ও চোনা / গোমূত্র) ধুয়ে নিয়ে পরিশুদ্ধ করে নিতে হয়। তারপরে মালাটিকে শ্রীবিগ্রহের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা উচিত।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা তাঁদের ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ এবং মধ্যমা অঙ্গুলি দিয়ে তাঁদের মালা জপ করে থাকেন। বাঁ হাত দিয়ে কিংবা ডান হাতের তর্জনী দিয়ে মালা স্পর্শ না করাই উচিত। জপগুটিকা এবং ডান হাতটি ঢাকা রাখার জন্য একটি জপ থলির মধ্যে ঐ গুলি ভরে রাখা দরকার। (এদেশে অনেক বৈষ্ণবভক্ত যে জপথলিটিকে চাদরে ঢেকে রাখেন, তার কোনও প্রয়োজন হয় না।) আঙুল থেকে মালা যেন পড়ে না যায়—সেটা অমনোযোগ আর ঝিমুনির লক্ষণ আর কী।

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের অন্তর্ভুক্ত যে সব ভক্তেরা শ্রীগুরুদেবের কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেন, তাঁরা প্রতিদিন ষোল মালা (প্রত্যেক মালায় ১০৮টি গুটিকা থাকে) জপ করবেন।* শ্রীল প্রভুপাদ সতর্ক করে বলেছেন, "যাকে নির্দিষ্ট সংখ্যক মালা জপ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা যদি কেউ সম্পূর্ণ করতে না পারে,

---

* জপমালা ব্যবহার সংক্রান্ত শুদ্ধতা বিষয়ক পথনির্দেশ যা এখানে বর্ণিত হয়েছে, যতদূর সম্ভব সেইমতো সব চেয়ে অনুকূল পরিবেশে নির্ধারিত সংখ্যা গণনার মাধ্যমে মালা জপ করা উচিত। অন্যান্য সময়ে—যেমন, পর্যটনকালে বা নানাবিধ সেবাকার্য নিবেদনের সময়ে—কিছুটা কঠোরতা হ্রাস করা চলতে পারে। সর্বোপরি পালনীয় নীতি হল এই যে, যত বেশি সম্ভব জপ করা উচিত, পারলে দিনে ২৪ ঘণ্টাই। যেমন, কোনও ক্ষেত্রে যেখানে পরিপূর্ণ মনোযোগে জপ করা কঠিন, সেক্ষেত্রে যান্ত্রিক জপ গণনা পদ্ধতির শরণ নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু শ্রীগুরুদেব বিশেষ করে যে কয় সংখ্যা জপমালায় জপ করতে নির্দেশ দিয়েছেন, তা সম্পূর্ণভাবে মেনে চলা অবশ্য কর্তব্য এবং সুন্দরভাবে জপ অনুশীলনের অনুকূল সকল প্রকার বিশদ পদ্ধতি পালন করা উচিত।

তা হলে ধরে নিতে পারা যায় যে, তার পারমার্থিক জীবনধারা ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। (চৈঃ চঃ অন্ত্য ১১/২৩ তাৎপর্য) আর তিনি একখানি চিঠিতে লিখেছিলেন—

"প্রত্যেকের অবশ্যই প্রতিদিন ষোল মালার নিয়মবিধি কঠোরভাবে মেনে চলা উচিত। যদি কেউ অন্য কোনও কৃষ্ণভাবনাময় কাজকর্মে ব্যস্ত থাকে এবং তার ফলে জপ অনুশীলনের প্রাত্যহিক কার্যক্রম পূর্ণ করতে না পারে, তা হলে সে অবশ্যই পরদিন তার খাওয়া ঘুম বা অন্যান্য ইন্দ্রিয় পরতৃপ্তিমূলক ক্রিয়াকর্ম বাদ দিয়ে আগের দিনের বাকি মালা জপ পূরণ করে নেবে।" (শ্রীল প্রভুপাদের লেখা ১১অক্টোবর ১৯৬৯ তাং পত্র থেকে)।

"১৬ মালা জপের রীতি নিতান্তই স্বল্পতম বিধান যা আমার শিষ্যবর্গের জন্য নির্ধারিত করেছি, যাতে তারা অন্তত সেইটুকুও করে। আসলে, জপচর্চা সকল সময়ে চলতে থাকা উচিত।" (শ্রীল প্রভুপাদের ২৫ জুন ১৯৭৪ তাং পত্র থেকে)

যেহেতু শ্রীভগবানের পবিত্র নাম জপের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব হতে থাকে, তাই জপ চর্চার সময়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাকে যথাযথভাবে আচ্ছাদিত থাকা উচিত, গলায় কণ্ঠিমালা এবং দ্বাদশাঙ্গে বৈষ্ণবীয় তিলক সজ্জা করা দরকার। তা ছাড়া, জপথলিটিও নিয়মিত ধুয়ে কেচে পরিষ্কার করে নেওয়া ভাল।

জপগুটিকাগুলি শ্রদ্ধা সহকারে হাতে রাখতে হয় এবং সব সময়ে পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করা চাই। অপরিচ্ছন্ন হাতে জপমালা স্পর্শ না করাই ভাল, যেমন—খাওয়াদাওয়া, মলমূত্র ত্যাগ বা মুখ, পা অথবা গোপনাঙ্গের মতো অপরিচ্ছন্ন স্থান স্পর্শ করার পরে হাত না ধুয়ে জপমালা স্পর্শ করা অনুচিত। যতদূর সম্ভব, জপমালা নিয়ে কলঘরে স্নানাগারে না যাওয়াই উচিত। যদি ঘটনাক্রমে কখনও জপমালার অবাঞ্ছিত ব্যবহার করা হয়ে যায়, তা হলে তৎক্ষণাৎ সেটি নিজের মাথায় ঠেকিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করা কর্তব্য।

অঙ্গবিন্যাস, স্থান ও সময়

ভক্তরা জপ অনুশীলনের সময় কিভাবে অবস্থান করবেন, সেই বিষয়ে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ বিশেষ কঠোরতা মেনে চলতেন। একবার, এক দল ভক্ত যখন জপ করছিলেন, তিনি তখন তাদের একজনকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, "ভালভাবে বসো"।

জপ করবার সময়ে পিঠ সোজা রেখে আসন হয়ে বসতে হয় এবং পা ঢাকা দিয়ে রাখতে হয়—পা ছড়িয়ে বসা উচিত নয়। জপ করবার সময়ে শুতে নেই। একখানি আসন পেতে তার উপরে বসতেই বলা হয়।

পবিত্র তুলসী বৃক্ষের সামনে, কিংবা গঙ্গার মতো পবিত্র কোনও নদীর ধারে, মন্দিরে (অথবা যেখানে শ্রীভগবানের আরাধনা হয়ে থাকে) শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীবিষ্ণুর শ্রীবিগ্রহের সামনে জপ অনুশীলন করা উচিত।

অন্ধকার জায়গার চেয়ে যথেষ্ট আলোকিত জায়গায়, এবং অশুদ্ধ জায়গা (যেমন শ্মশান, কবরখানা) প্রভৃতি জায়গার চেয়ে কোনও শুদ্ধ স্থানে বসে জপ করা বিধেয়।

অতি প্রত্যূষে, খুব ভোরে জপ করাই শ্রেষ্ঠ সময়। ভোরবেলা অন্যান্য সেবাকার্য নির্ধারিত থাকলে, সেইগুলি সম্পন্ন করবার ঠিক পরেই যথাশীঘ্র সম্ভব জপ চর্চার কার্যক্রম শুরু করা উচিত।

এই বিষয়ে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ লিখেছেন—

"পূর্ণ মনোনিবেশ সহকারে খুব ভোরে, সম্ভব হলে ব্রাহ্মমুহূর্তে, জপ চর্চা করা উচিত। মহামন্ত্রের ধ্বনিতরঙ্গে পূর্ণ মনঃসংযোগ করতে হয় প্রতিটি মহানাম সুস্পষ্টভাবে উচ্চারণের মাধ্যমে, এবং ক্রমশই সহজ স্বাভাবিকভাবে জপের গতি দ্রুত হতে থাকবে। তাড়াতাড়ি জপ করবার জন্য উদ্বিগ্ন হওয়ার দরকার নেই, সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল মনোযোগ দিয়ে মহামন্ত্রের দিব্যধ্বনিতরঙ্গে শ্রবণের অভ্যাস।" (শ্রীল প্রভুপাদের লেখা ৬ জানুয়ারি ১৯৭২ তাং চিঠি থেকে)

জপ করার সময়ে মনঃসংযোগ

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়বস্তুগুলি থেকে মন ফিরিয়ে রাখবার চেষ্টা করতে হয়, মহামন্ত্রের দিব্য ধ্বনির দিকে বিশেষভাবে নিবিষ্ট হয়ে থাকতে হয়, মহামন্ত্রের ভাবার্থ উপলব্ধির উদ্দেশ্যে আত্মমগ্ন হতে হয়, এবং অন্য কোনও চিন্তা বা বাহ্যিক পরিস্থিতির দ্বারা অবিচলিত হওয়ার চেষ্টা করা চাই। পবিত্র মহানামের শব্দাংশগুলির প্রতি আত্মস্থ হয়ে অভিনিবিষ্ট হতে হতে ক্রমশ শ্রীভগবানের রূপ, গুণাবলী এবং লীলা পরিকরাদি উপলব্ধি হতে থাকে।

পবিত্র নাম জপের ক্ষেত্রে দশটি অপরাধ

পবিত্র নাম জপের ক্ষেত্রে দশটি অপরাধের তালিকা দেওয়া আছে *পদ্মপুরাণে*, যা *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থের আদিলীলা খণ্ডের ৮/২৪ শ্লোকের তাৎপর্য অংশে উদ্ধৃত হয়েছে এইভাবে —

সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমমপরাধং বিতনুতে
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমু সহতে তদ্বিগর্হাম্।

শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদিসকলং
ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ ॥

১) হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র মহিমা প্রচার করছেন যে সমস্ত মহাত্মা, তাঁদের নিন্দা করা নামপ্রভুর চরণে সব চেয়ে গর্হিত অপরাধ। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের মহিমা প্রচারকারী ভক্তের সমালোচনা করা কখনই উচিত নয়। যদি কেউ তা করেন, তা হলে তিনি অপরাধী হন। শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন নামপ্রভু কখনই এই ধরনের নিন্দনীয় কার্যকলাপ সহ্য করবেন না। এমন কি, লোকে যাদের মহাভক্ত বলে মনে করে, তাদেরও এই অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য।

২) শ্রীবিষ্ণুর নাম মঙ্গলময়। বিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ এবং লীলা সবই পরতত্ত্ব। তাই কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবানের দিব্যনাম অথবা তাঁর চিন্ময় রূপ, গুণ এবং লীলাসমূহকে জড় বলে মনে করে তাদের ভগবান থেকে ভিন্ন করার চেষ্টা করে, তা হলে সেটিও একটি অপরাধ। তেমনই, শিব আদি দেবতাদের নাম শ্রীবিষ্ণুর নামের সমপর্যায়ভুক্ত মনে করা, অথবা শিব আদি দেবতাদের ভগবানের বিভিন্ন রূপ বলে মনে করে শ্রীবিষ্ণুর সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে করা, তা হলে সেটিও একটি অপরাধ।

গুরোরবজ্ঞা শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনং
তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনম্ ।
নাম্নোবলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধিঃ
ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হিশুদ্ধিঃ ॥

৩) শ্রীনামপ্রভুর শ্রীচরণে তৃতীয় অপরাধকে বলা হয় গুরোরবজ্ঞা—অর্থাৎ "শ্রীগুরুদেবকে এই জড় জগতের একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে, তাঁর উন্নত পদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হওয়া।"

৪) চতুর্থ অপরাধ হচ্ছে—চতুর্বেদ ও পুরাণাদি শাস্ত্রের নিন্দা করা।

৫) পঞ্চম অপরাধ—হরিনামের মাহাত্ম্যকে অতিস্তুতি মনে করা।

৬) ষষ্ঠ অপরাধ—ভগবানের নাম সমূহকে কল্পনা বলে মনে করা।

৭) সপ্তম অপরাধ—হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের প্রভাবে যেহেতু সমস্ত পাপ মোচন হয়, তাই কেউ যদি নামবলে পাপাচরণ করতে থাকে, তবে সেটি একটি মস্ত বড় অপরাধ। এইভাবে যে চিন্তা করতে অভ্যস্ত, তার পক্ষে কোনও প্রকার ইন্দ্রিয় সংযম ও কঠোর কৃচ্ছ্রতা সাধন, কিংবা যমরাজের বিবিধ শাস্তিবিধানের মাধ্যমেও পরিশুদ্ধি অর্জন করা একেবারেই অসম্ভব হয়ে ওঠে।

ধর্মব্রতত্যাগহুতাদিসর্ব-
শুভক্রিয়াসাম্যমপি প্রমাদঃ ।

অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি
যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ ॥

৮) অষ্টম অপরাধ—ধর্ম, ব্রত, ত্যাগ, বা হোমাদি প্রাকৃত শুভ কর্মের সঙ্গে, অপ্রাকৃত নাম গ্রহণকে সমান বা তুল্যজ্ঞান করাও একটি অপরাধ।

৯) নবম অপরাধ—শ্রদ্ধাহীন বা নাম শ্রবণে বিমুখ মানুষদের কাছে নামের মহিমা প্রচার করা অপরাধজনক।

শ্রুতেঽপি নামমাহাত্ম্যযঃ প্রীতিরহিতো নৃধমঃ ।
অহং মমাদি পরমো নাম্নি সোঽপ্যপরাধকৃৎ ॥

১০) দশম অপরাধ—নামের অপূর্ব মাহাত্ম্য শ্রবণ করা সত্ত্বেও কেউ যদি, এই দেহটি হচ্ছে আমার স্বরূপ এবং দেহ সম্পর্কে সম্পর্কিত সব কিছুই আমার (অহং মমাদি)—এই রকম দেহাত্মবুদ্ধি বিশিষ্ট হয়ে সেই নাম গ্রহণ এবং নাম শ্রবণে প্রীতি বা শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করে, তবে সে হয় নাম অপরাধী।

তুলসী-সেবা

তুলসী মাহাত্ম্য

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থের মধ্যে নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটিতে আমরা তুলসীদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা পাই এইভাবে—

"যাঁর দর্শনে পাপ ও রোগ নাশ হয়,—স্পর্শের ফলে শরীর শুদ্ধ হয়, জল সিঞ্চন করার ফলে ভয় দূর হয়, রোপণ করার ফলে ভগবদ্ভক্তি লাভ হয় এবং শ্রীকৃষ্ণের চরণে অর্পণ করার ফলে পূর্ণ ভগবৎ-প্রেম লাভ করা যায়, সেই তুলসীদেবীর চরণে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।" (স্কন্দ পুরাণ)

পুরাণাদি এবং *পঞ্চরাত্র* গ্রন্থের সর্বত্রই তুলসী মহিমান্বিতা হয়েছেন—সমুদ্রমন্থনকালে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কৃপায় তুলসী সৃষ্টা হয়েছিলেন যাতে জড় জগতের মাঝে জীবাত্মাদের পারমার্থিক উন্নতি হতে পারে। শ্রীভগবানের কাছে লক্ষ্মীদেবীর চেয়ে তুলসীদেবী বেশি প্রিয়তমা, কারণ পতিরূপে শ্রীভগবানের প্রেমপ্রীতি অর্জনের অভিলাষে তুলসীদেবী চরম কৃচ্ছ্রতা সাধন করেছিলেন এবং তাঁর আরাধনা করেছিলেন, আর শ্রীভগবান তাঁর অভিলাষ পূরণ করেছিলেন।

বিপ্র অপেক্ষা শ্রেয় দানগ্রহীতা আর কেউ হতে পারে না, গাভী অপেক্ষা শ্রেয় দান আর কিছু নেই, গঙ্গা অপেক্ষা শ্রেয় তীর্থ নেই, এবং তুলসীপত্রের চেয়ে

শ্রেয় পত্র আর কিছু হয় না। শ্রীভগবানকে একটি মাত্র তুলসীপত্র নিবেদন করে যা পাওয়া যেতে পারে, সব রকমের পত্রপুষ্প নিবেদন করেও তা হয় না। সোনা, মণিমানিক আর হীরেমুক্তো দিয়ে তৈরি পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনও তুলসীপত্র নিবেদনের সমকক্ষ নয়।

শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে তুলসীপত্র নিবেদনের মাধ্যমে ভক্ত তার কোটিজন্মের সঞ্চিত পাপরাশি থেকে মুক্তিলাভ করতে পারেন। যখন ভক্ত শ্রীভগবানের মাথায় তুলসী নিবেদন করেন, তখন ভক্তের সমস্ত অবর্ণনীয় এবং অলক্ষিত পাপরাশি বিনষ্ট হয়ে যায়। শ্রীভগবানের মন্দিরকক্ষে তুলসীপত্র দিয়ে জল সিঞ্চন করলে মানুষ সকল পাপরাশি থেকে মুক্ত হয়ে যায়। মৃত্যুকালে যে মানুষের মুখে বা মাথায় কিংবা শরীরে আমলকী ফল অথবা তুলসীপত্র থাকে, সে অবধারিতভাবেই নরকযন্ত্রণা ভোগ থেকে অব্যাহতি লাভ করে।

তুলসী বন্দনা

প্রাতঃকালে, মঙ্গলারতির পরে (এবং বিশেষ করে সন্ধ্যাকালেও, সন্ধ্যারতির আগে) সমবেত সকল ভক্তমণ্ডলী অবশ্যই তুলসীবন্দনা করবেন এবং শ্রীমতী তুলসীদেবীকে প্রদক্ষিণ করবেন। প্রথমে তিনবার তুলসী প্রণাম মন্ত্র উচ্চারণ সহকারে আমরা তুলসীদেবীকে প্রণতি নিবেদন করে থাকি—

ওঁ বৃন্দায়ৈ তুলসী দেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ।
কৃষ্ণভক্তিপ্রদে দেবি সত্যবত্যৈ নমো নমঃ ॥

"ভগবান শ্রীকেশবের অতি প্রিয় বৃন্দা, শ্রীমতী তুলসীদেবীর উদ্দেশ্যে আমার পুনঃ পুনঃ প্রণতি নিবেদন করি। হে দেবী সত্যবতী, শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে আপনি আমাদের ভক্তি প্রদান করুন।"

তারপরে আমরা তুলসী পূজা কীর্তন করে থাকি, যখন একজন ভক্ত ধূপ, ঘৃতপ্রদীপ ও পুষ্পার্ঘ্য সহকারে তুলসীদেবীর উদ্দেশ্যে আরতি নিবেদন করেন। এই উপকরণাদি নিবেদনের সময়ে, তুলসী আরতি করতে হলে ভক্ত একটি আসনের উপর দাঁড়ানো উচিত এবং তাঁর বাঁহাতে ঘণ্টা বাজাতে থাকবেন। তুলসীদেবীকে নিবেদনের পরে প্রতিটি উপকরণ সমবেত ভক্তবৃন্দের মধ্যে বিতরণ করা যেতে পারে। তুলসীপূজা কীর্তন গান শেষ হয়ে গেলে, সমবেত বৈষ্ণবমণ্ডলী অন্তত চারবার তুলসীদেবীকে প্রদক্ষিণ করবেন এবং কয়েক ফোঁটা জল তাঁর মূলদেশে (কেবলমাত্র প্রাতঃকালীন পূজার সময়ে সন্ধ্যায় নয়) নিবেদন করবেন। প্রদক্ষিণ কালে আমরা এই মন্ত্রটি উচ্চারণ করে থাকি—

যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ।
তানি তানি প্রণশ্যন্তি প্রদক্ষিণ পদে পদে ॥

"যখন মানুষ শ্রীমতী তুলসীদেবীকে প্রদক্ষিণ করতে থাকে, তখন প্রতি পদক্ষেপে তার কৃত সকল পাপকর্ম, এমন কি ব্রহ্মহত্যার পাপও বিনষ্ট হয়ে যায়।"

টীকা : তুলসী গাছের পাত্র বহন করে নিয়ে যাওয়ার সময়ে তাঁকে মাথায় করে বহন করাই ভাল। গাছটি খুব বড় হলে, তাঁকে সামনে বহন করে নিয়ে যেতে হয়। তা ছাড়া, তুলসীদানীটি এমন উঁচু হওয়া যাতে তুলসী গাছটি আরতি নিবেদনরত ভক্তের কোমরের উপরে থাকে। আরও ভাল হয়, যখন ভক্ত তুলসী আরতি নিবেদন করেন, তখন শ্রীবিগ্রহকক্ষে সেবা নিবেদনের সময়ে যেভাবে পোশাক সজ্জা করা হয়ে থাকে, সেইভাবেই তুলসীদেবীর বস্ত্রসজ্জা করা উচিত। প্রকৃত তুলসী বৃক্ষেরই আরাধনা করা উচিত, তবে তা রাখা সম্ভব না হলে, তুলসী বৃক্ষের পরিবর্তে একখানি প্রতিকৃতি রেখেও তাতে প্রণতি নিবেদন, কীর্তন আরতি ও প্রদক্ষিণের মাধ্যমে আরাধনা করা যেতে পারে। অবশেষে, ভাগবত প্রবচনকারী ভাগবত পাঠের সময়ে তাঁর আসনের ঠিক পাশেই তুলসী বৃক্ষটিকে রাখাই রীতি সঙ্গত, যাতে তুলসীদেবীকে সম্মান প্রদর্শন করা যেতে পারে।

বিশদ তুলসী পূজা

অন্যান্য শ্রীবিগ্রহাদির প্রাতঃকালীন পূজা সম্পন্ন হয়ে গেলে, তুলসীদেবীর নিম্নরূপ পূজা উদ্‌যাপন করা যেতে পারে। তা সম্ভব না হলে, প্রাতঃকালে একটু পরে তাঁর পূজা নিবেদন করা চলে। (শ্রীবিগ্রহকক্ষে সেবা নিবেদনের সময়ে যেভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে, সেইভাবে পূজা করা চাই।)

নিচের উপকরণগুলি জোগাড় আছে কিনা, তা ভালভাবে বুঝে নিতে হবে—

- জলসমেত পঞ্চপাত্র
- শঙ্খের মধ্যে বা অন্য কোনও পাত্রে অর্ঘ্যজল (যা শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিবেদিত হয়েছে)
- পুষ্পাদি
- চন্দন
- শ্রীবিগ্রহের চরণামৃত
- প্রসাদী মালা কিংবা প্রসাদীফুল
- তুলসীপত্র রাখার পাত্র

পদ্ধতি নিম্নরূপ

১) প্রথমে নিচের প্রার্থনাটি আবৃত্তি করতে হয়—

নির্মিতা ত্বং পুরা দেবৈরর্চিতা ত্বং সুরাসুরৈঃ।
তুলসি হর মেঽবিদ্যাং পূজাং গৃহ্ণ নমোঽস্তু তে ॥

হে শ্রীমতী তুলসীদেবী, পুরাকালে দেবতাদের দ্বারা আপনি সৃষ্ট হয়ে তাঁদের দ্বারা এবং অসুরদের দ্বারাও অর্চিতা হতেন। হে শ্রীমতী তুলসীদেবী, কৃপা করে আমার অবিদ্যা হরণ করে আমার পূজা গ্রহণ করুন। আমি আপনাকে পুনঃ পুনঃ আমার প্রণতি জানাই।

২) তারপরে, বাঁ হাতে পঞ্চপাত্র ধারণ করে তা থেকে ডান হাত দিয়ে শ্রীমতী তুলসীদেবীকে জল সিঞ্চন করতে করতে নিচের মন্ত্রটি উচ্চারণ করতে হয়—

ওঁ গোবিন্দবল্লভাং দেবীং ভক্তচৈতন্যকারিণীম্।
স্নাপয়ামি জগদ্ধাত্রীং কৃষ্ণভক্তিপ্রদায়িনীম্ ॥

শ্রীগোবিন্দের প্রিয়তমা, জগজ্জননী, সকল ভক্তবৃন্দের চেতনা প্রদায়িনী এবং শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিপ্রদায়িনী শ্রীমতী তুলসীদেবী, আপনাকে আমি স্নানসেবা নিবেদন করছি।

৩) শঙ্খ বা অন্য কোনও পাত্র থেকে অর্ঘ্য জল তুলসী বৃক্ষের মাটিতে ঢেলে মন্ত্রোচ্চারণ করতে হয়—

শ্রিয়ঃ শ্রিয়ে শ্রিয়াবাসে নিত্যং শ্রীধরসৎকৃতে।
ভক্ত্যা দত্তং ময়া দেবি অর্ঘ্যং গৃহ্ণ নমোঽস্তু তে ॥

হে তুলসীদেবী, সকল সৌন্দর্য ও সম্পদের আশ্রয়দাত্রী ও অধিষ্ঠাত্রীরূপে আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। পরমেশ্বর ভগবানও আপনার আরাধনা করেন। হে তুলসী, আমার এই ভক্তি-অর্ঘ্য আপনি কৃপা করে গ্রহণ করুন।

৪) এর পরে যথাযোগ্য মন্ত্রসহকারে নিচের উপকরণাদি নিবেদন করতে হয়—

ইদং সগন্ধপুষ্পম্ ওঁ তুলস্যৈ নমঃ

তুলসীদেবীকে চন্দনাসিক্ত একটি পুষ্প নিবেদন করতে হয়।

ইদং শ্রীকৃষ্ণচরণামৃতম্ ওঁ তুলস্যৈ নমঃ

তুলসীদেবীকে শ্রীভগবানের স্নান অভিষেক বারি নিবেদন করতে হয়।

ইদং মহাপ্রসাদনির্মাল্যাদিকং সর্বং ওঁ তুলস্যৈ নমঃ

তুলসীদেবীকে শ্রীভগবানের প্রসাদী পুষ্পমাল্যাদি নিবেদন করতে হয়।*

ইদং আচমনীয়ম্ ওঁ তুলস্যৈ নমঃ

তুলসীদেবীকে আচমন নিবেদন করতে হয়।

৫) তারপরে নিম্নোক্তভাবে শ্রীমতী তুলসীদেবীকে বন্দনা জানাতে হয়—

মহাপ্রসাদজননী সর্বসৌভাগ্যবর্ধিনী।
আধিব্যাধিহরে নিত্যং তুলসি ত্বং নমোঽস্তু তে॥

হে শ্রীমতী তুলসীদেবী, মহাপ্রসাদের জননীরূপে আপনাকে আমার পুনঃ পুনঃ সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাই। আপনি সকলের সৌভাগ্য বৃদ্ধি করেন এবং সকল প্রকার আদিব্যাধি ও উদ্বেগ উৎকণ্ঠা হরণ করেন।

৬) এবার তুলসী প্রণাম মন্ত্র উচ্চারণ সহকারে, তুলসীদেবীকে ভক্তিপ্রণতি জ্ঞাপন করতে হয়—

(ওঁ) বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ।
কৃষ্ণভক্তিপ্রদে দেবি সত্যবত্যৈ নমো নমঃ॥

ভগবান শ্রীকেশবের অতি প্রিয় বৃন্দা, শ্রীমতী তুলসীদেবীর উদ্দেশ্যে আমার পুনঃ পুনঃ প্রণতি নিবেদন করি। হে দেবী সত্যবতী, শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে আপনি আমাদের ভক্তি প্রদান করেন।

৭) ডান হাত দিয়ে সযত্নে তুলসীপত্র বা কোমল তুলসীমঞ্জরী বৃন্তসহ এক-একটি করে চয়নকালে বারংবার তুলসীচয়ন মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয়—

(ওঁ) তুলস্যমৃতজন্মাসি সদা ত্বং কেশবপ্রিয়া।
কেশবার্থে চিনোমি ত্বাং বরদা ভব শোভনে॥

হে তুলসী, অমৃত থেকে আপনার জন্ম। আপনি নিয়ত ভগবান শ্রীকেশবের অতীব প্রিয়। এখন শ্রীকেশবের পূজার উদ্দেশ্যে আপনার পত্র ও মঞ্জরী আমি সংগ্রহ করছি কৃপা করে আমাকে বরদান করুন।

শ্রীমতী তুলসীদেবীর যাতে কোনও প্রকার ব্যথা সৃষ্টি না হয়, সেই বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হতে হয়। ডান হাত দিয়ে তাঁর পত্র চয়নের সময়ে বাম হাত

* শুকনো ফুল আর চরণামৃতের উপকরণাদিতে আকৃষ্ট পোকামাকড় বা ছত্রকাদি যাতে তুলসীদেবীর কোনও সম্ভাব্য ক্ষতি করতে না পারে, সেই জন্য তুলসীদেবীকে পুষ্পাদি নিবেদনের পরেই তা সরিয়ে নিতে হয় এবং তাঁর চরণতলে মাটির উপরে চরণামৃত ঢেলে দিতে নেই, বরং একটি চামচ দিয়ে তুলসীদেবীকে চরণামৃত নিবেদন করে, তারপরে তা বর্জন করতে হয়।

দিয়ে শাখাটিকে ধরে রাখতে হয় যাতে সেটি ভেঙে না যায়। তুলসীচারা থেকে পাতা কেটে নেওয়ার জন্য কাঁচি কিংবা ছুরির ব্যবহার করতে নেই। কাজ শেষ হলে, ক্ষমা প্রার্থনা মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে তাঁর মার্জনা ভিক্ষা করতে হয়—

চয়নোদ্ভবদুঃখং চ যদ্ হৃদি তব বর্ততে।
তৎ ক্ষমস্ব জগন্মাতঃ বৃন্দাদেবি নমোঽস্তু তে॥

হে তুলসী দেবী, আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাই। হে জগন্মাতা, আপনার পত্র ও মঞ্জরী চয়নকালে যদি আপনার হৃদয়ে দুঃখের উদ্ভব করে থাকি, তবে কৃপা করে আমাকে ক্ষমা করুন।

সকালে সূর্যোদয়ের আগে কিংবা সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের পরে, এবং একাদশীর পরদিন দ্বাদশী তিথিতেও কখনও তুলসীপত্র চয়ন করতে নেই। আগের দিন কিংবা সকালে তোলা তুলসীপত্র শুখিয়ে গেলেও, তা শ্রীবিগ্রহ অর্চনায় ব্যবহার করা চলে।

শাস্ত্রসেবা

শাস্ত্রসেবা বলতে বোঝায় শাস্ত্রে উল্লিখিত উপদেশবাণীর পূজা-অর্চনা, অধ্যয়নচর্চা, শ্রবণ, আবৃত্তি এবং প্রচার।

শাস্ত্র অনুসরণের সংজ্ঞা ও প্রয়োজনীয়তা

শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন—

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদি পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥

ভগবদ্ভক্তি সেবা চর্চার মধ্যে যখন উপনিষদ, পুরাণাদি এবং নারদপঞ্চরাত্রের মতো প্রামাণ্য বৈদিক শাস্ত্রাদি উপেক্ষিত হয়, তখন তা সমাজে নিতান্তই অবাঞ্ছিত উৎপাত হয়ে ওঠে। (*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* ১/২/১০১)

শাস্ত্র-অর্চন

একটি প্রবচনে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ বলেছিলেন :

তখন *ব্রহ্মসংহিতা* পাওয়া যেত না, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন দক্ষিণ ভারতে পরিক্রমা করছিলেন, সেই সময়ে তিনি তালপত্রে হস্তলিখিত একখণ্ড *ব্রহ্মসংহিতা* সংগ্রহ করেন এবং তার অনুলিপি করে নেন। আগেকার দিনে

ছাপাখানা ছিল না। এই সমস্ত দরকারি শাস্ত্রাদি, বৈদিক শাস্ত্রসম্ভার হাতে লিখেই রাখা হত। 'তোমার গ্রন্থ থেকে আমি অনুলিপি করে নিই, আমার বন্ধু আবার আমার গ্রন্থ থেকে অনুলিপি করে নেয়।' এইভাবেই চলত। যাদের আগ্রহ অভিরুচি হত, তারা এমনি করেই গ্রন্থ সংগ্রহ করত। এই সব গ্রন্থাদি সহজলভ্য ছিল না। শুধুমাত্র অতি উচ্চশিক্ষিত ব্রাহ্মণেরাই সাধারণত হাতেলেখা পুঁথি সংরক্ষণ করে রাখতেন, আর সেগুলি মন্দিরে শ্রীবিগ্রহের মতো অর্চন করা হত। এগুলি যে সর্বত্র পাওয়া যেত, তা নয়। এখন ছাপাখানা এসব সহজলভ্য করে দিয়েছে। কিন্তু আমাদের সর্বদা উপলব্ধি করা চাই যে, গ্রন্থাদির পূজা-অর্চনা করা হত ঠিক ভগবানেরই মতো। গ্রন্থ হল শ্রীভগবানেরই শব্দ-অবতার রূপ। তাই *শ্রীমদ্ভাগবত* কিংবা *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* গ্রন্থাদিকে কখনই সামান্য বই মনে করে অবজ্ঞা করা অনুচিত। ভগবানের শ্রীবিগ্রহাদির প্রতি যেভাবে শ্রদ্ধা-যত্ন অবলম্বন করতে হয়, গ্রন্থাদির প্রতিও তাই করা উচিত। *(মুম্বাই শহরে ৬ ডিসেম্বর ১৯৭৪ তারিখে শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শ্রীমদ্ভাগবত (৩/২৫/৩৭) প্রবচন থেকে সংকলিত)।*

ঠিক যেভাবে বিভিন্ন উপাচার সহকারে শ্রীবিগ্রহের পূজা-অর্চনা করা হয়ে থাকে, সেইভাবে আমরা শাস্ত্রাদি, বিশেষত *শ্রীমদ্ভাগবত* এবং *ভগবদ্গীতারও* বিভিন্ন উপাচারে পূজা করতে পারি। তারপরে শাস্ত্রগ্রন্থটিকে পরম শ্রদ্ধাভরে প্রদক্ষিণ করে দণ্ডবৎ প্রণতি জানাতে পারি এবং শ্রীগুরুদেব ও শ্রীল ব্যাসদেবের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানিয়ে শাস্ত্রবাক্য শ্রবণের মাধ্যমে জ্ঞানালোক লাভ করতে পারি।

কোনও শাস্ত্র পাঠ এবং প্রবচন প্রদানের সময়ে গ্রন্থখানি নিজ আসনের থেকে কিছুটা উঁচু জায়গায় যথাযথ গ্রন্থচৌকির উপরে সযত্নে রাখা উচিত। চৌকিটিকে জরীর ঝালর সজ্জিত রেশমী আবরণে ঢাকা দিয়ে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা দরকার।

শাস্ত্রচর্চা

ভগবদ্গীতায় (১৬/২৪) পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

কর্তব্য এবং অকর্তব্য নির্ধারণে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। অতএব শাস্ত্রীয় বিধি ও নিষেধের স্বরূপ জেনে কর্ম করা উচিত যাতে পারমার্থিক উন্নতি লাভ করা যায়।

আর শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ তাঁর বিভিন্ন পত্রাবলীতে লিখেছেন :

আমার গ্রন্থাবলী সম্পর্কে আমি বলি, প্রত্যেকেরই এইগুলি পড়া উচিত। আমিও পড়ি। ২৪ ঘণ্টাই কাজে লেগে থাকা চাই। সেটাই আসল কথা। কতখানি শাস্ত্রচর্চা করা উচিত আর কতখানি অন্যান্য সেবা করা উচিত, তা প্রত্যেক ভক্তকেই নির্ধারণ করে নিতে হবে। খাওয়া আর ঘুমের সময়

কমিয়ে দিতে হবে—একটি মুহূর্তও অপব্যবহার করা অনুচিত। (১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫ তাং শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ)

আমাদের সাহিত্যসম্ভার যাতে স্থানীয় ভক্তরা প্রত্যেকে নিয়মিত পাঠ করে এবং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্ব সহকারে বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা করে এবং কোনও না কোনও ভাবে তারা যাতে কৃষ্ণভাবনাময় জীবনদর্শনের তত্ত্বজ্ঞানে আত্মমগ্ন হয়ে উঠতে পারে, সেই বিষয়ে সুনিশ্চিত হওয়া সকলেরই প্রথম কাজ হওয়া উচিত। তারা যদি আমাদের প্রবর্তিত জীবনদর্শনে পরিপূর্ণভাবে শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারে এবং তারা যদি সমস্ত জ্ঞানরাশি আয়ত্ত করতে পারে আর প্রত্যেক দৃষ্টিকোণ থেকে তার আলোচনা-পর্যালোচনা করে, তবে খুব সহজেই তারা তপস্যা তথা কৃচ্ছ্রতা সাধন করবে, এবং তাতেই তাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনে ক্রমোন্নতি হবে। (১৬ জুন ১৯৭২ তাং শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের চিঠি)

শাস্ত্র অধ্যয়নের মাধ্যমে আমরা আমাদের দিব্যদৃষ্টি আহরণে সক্ষম হই। *শ্রীহরিভক্তিবিলাস* গ্রন্থে শ্রুতি এবং স্মৃতি গ্রন্থগুলিকে বিপ্র অর্থাৎ বিজ্ঞ ব্রাহ্মণের দুটি চক্ষুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এই দুইটির কোন একটিতে কিংবা দুটিতেই যদি আমরা অজ্ঞতা পোষণ করে থাকি, তবে আমরা একটি বা দুটি চোখেই অন্ধত্ব লাভ করি। শাস্ত্র অধ্যয়নের সাহায্যে আমরা ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের পক্ষে যা কিছু অনুকূল তেমন সকল পরিবেশ পরিস্থিতির মাঝেই যথাযথভাবে বিচার সমাধান ও কর্তব্য সমাপন করে চিন্ময় বুদ্ধি বিকাশে সফল হতে পারি। একই সাথে, আমরা 'নিয়মাগ্রহ'-জনিত অধঃপতন থেকে অব্যাহতি পেতে পারি—অর্থাৎ বিধিনিয়মাদি পালনের ঝঞ্ঝাট আছে মনে করার ফলে সেইগুলি অবহেলা করা কিংবা বিধিনিয়মাদির উদ্দেশ্য না বুঝে সেইগুলি লৌকিকভাবে মেনে চলার প্রবৃত্তি থেকে মুক্তি পাই।

শাস্ত্র শ্রবণ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নির্দেশিত 'সাধন-ভক্তি' চর্চার পঞ্চাঙ্গ কর্তব্যকর্মের মধ্যে অন্যতম হল—শাস্ত্রশ্রবণ—বিশেষত *শ্রীমদ্ভাগবত*শ্রবণ। তাই প্রত্যেক ভক্তেরই নিয়মিতভাবে এবং ভক্তিশ্রদ্ধা সহকারে এই কাজটি করা উচিত। পূর্ণ মনোনিবেশ ও মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করাই আবশ্যক এবং শাস্ত্রের বাণী উপলব্ধি তথা আস্বাদনের সজাগ অনুরাগ তার মধ্যে থাকা চাই। প্রবচনকারী যখন প্রশ্ন আহ্বান করবেন, তখন এই লক্ষ্য সাধনের জন্য, প্রণিপাত সহকারে বিনম্রভাবে প্রশ্নাদি উত্থাপন করা যেতে পারে। তাই শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ বলেছেন—

ভাগবতের শ্রোতারা স্পষ্টভাবে তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার জন্য বক্তার কাছে প্রশ্ন করতে পারেন, তবে তা কখনই উদ্ধত মনোভাব নিয়ে করা উচিত নয়। ভাগবতের বক্তা এবং সেই বিষয়ের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল হয়ে বিনীতভাবে প্রশ্ন করা কর্তব্য। (ভাগবত ১/১/৫ তাৎপর্য)

শাস্ত্র আবৃত্তি

শ্রীবিগ্রহ অর্চনায় যিনি নিয়মিত নিয়োজিত থাকেন, তাঁর পক্ষে সুবিধা হলেই শাস্ত্র আবৃত্তি করে শোনানো এবং বৈষ্ণব সমাবেশে সেই বিষয়ে প্রবচন প্রদান করার সুযোগ নেওয়া উচিত। বিশেষ করে দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণদের শাস্ত্রজ্ঞান থাকা উচিত এবং তাঁদের সেই জ্ঞানসম্ভার প্রাণবন্ত পদ্ধতিতে সাবলীলভাবে উপস্থাপনের যোগ্যতা থাকা চাই।

ভক্তরাও যে সমস্ত সংস্কৃত শ্লোকাবলী উচ্চারণ করে থাকেন, সেইগুলি যথাযথভাবে উচ্চারণ করতেও তাঁদের শেখা উচিত। বিভিন্ন উপলক্ষ্যে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ ভক্তদের সংস্কৃত উচ্চারণ সংশোধন করে দিতেন।

শাস্ত্রবাণী প্রচার

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন হল এক মহান প্রচার ব্রত, এবং তাই, এই সংঘের সমস্ত সদস্য প্রত্যক্ষ ভাবেই প্রচার কার্যে অংশগ্রহণে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে রয়েছেন—বিশেষ করে সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী পরিবেশনের মাধ্যমে। এটা শাস্ত্রসেবার এক অপরিহার্য অঙ্গ, কারণ এর ফলেই বদ্ধ জীবাত্মামাত্রই শাস্ত্রের বাণী শ্রবণের সুযোগ লাভ করে যার সাহায্যে শ্রীভগবানের কাছে আত্মসমর্পণের এবং তাঁকে সেবা নিবেদনের ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধিলাভের পর্যায়ে উপনীত হওয়া যায়। আমাদের অবশ্যই মনে রাখা উচিত যে, শাস্ত্র অনুসারে জীবন-যাপনে আমাদের নিজেদের দৃষ্টান্ত যত কার্যকরী হবে, শাস্ত্রানুসারে প্রচারকার্যও তত সাফল্যমণ্ডিত হতে দেখা যাবে। সদাচার সহকারে মানুষ শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে বিবিধ উপচার নিবেদন করতে পারে, আর সেই সদাচার সহকারেই মানুষ প্রচারকার্যে আত্মনিয়োগ করে সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে যাতে অন্যেরাও সদাচারে অভ্যস্ত হয়ে ভগবদ্ভক্তি সেবায় আকৃষ্ট হয়ে ওঠে।

প্রসাদ-সেবা

শ্রীগুর্বষ্টক (৪) থেকে আমরা জানতে পারি—"শ্রীগুরুদেব নিত্য চতুর্বিধ (চর্ব্য, চূষ্য, লেহ্য এবং পেয়) সুস্বাদু অন্নব্যঞ্জন শ্রীভগবানের সেবায় নিবেদন

করে থাকেন। শ্রীগুরুদেব যখন দেখেন ভক্তবৃন্দ সেই চতুর্বিধ ভগবৎ-প্রসাদ চিবিয়ে, চুষে, চেটে এবং পান করে সেবনের মাধ্যমে তৃপ্তি লাভ করছে, তখন তিনি সন্তুষ্ট হন। সেই গুরুদেবের পাদপদ্মে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।"

শ্রীবিগ্রহ আরাধনার একটি অত্যাবশ্যকীয় অংশ হল—শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে উত্তম খাদ্যসামগ্রী নিবেদন এবং তার অবশিষ্টাংশ প্রসাদ তথা শ্রীভগবানের কৃপা স্বরূপ গ্রহণ ও সেবন। শ্রীভগবান সেই নৈবেদ্য গ্রহণের পরে, সেই প্রসাদ প্রথমে শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গ পার্ষদবর্গ এবং শ্রীগুরুদেবকে পরিবেশন করতে হয়, এবং তারপরে বৈষ্ণবগণকে বিতরণ করার পর, সব শেষে সমস্ত অতিথি-অভ্যাগতদের পরিবেশন করতে হয়।

কিভাবে প্রসাদ পরিবেশন করতে হয় এবং কিভাবে প্রসাদের মাহাত্ম্য রক্ষা করতে হয়, তা বৈষ্ণব সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। কেবলমাত্র যখন ভোগ যথাযথভাবে রন্ধন ও নিবেদন করা হয়, তখন ছাড়াও, যখন নিবেদিত প্রসাদ সুষ্ঠুভাবে পরিবেশিত হয় এবং শ্রদ্ধা সহকারে সেবিত হয়, তখনও পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগুরুদেব অতীব সন্তুষ্টি লাভ করেন। শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ অত্যন্ত সচেতন থাকতেন যাতে প্রসাদ যেন উত্তমোত্তম গুণসম্পন্ন হয় এবং ভক্তবৃন্দ ও দর্শনার্থী আকণ্ঠ প্রসাদসেবনে পরিতৃপ্ত হন। প্রত্যেক মন্দিরের কার্যক্রমে অপরিহার্য অঙ্গ স্বরূপ রবিবাসরীয় প্রীতিভোজ প্রথা প্রবর্তন করেছিলেন; তাঁর অভিলাষ ছিল—ভক্তসমাজ ও জনগণের সকলকেই সমানভাবে কৃষ্ণভাবনামৃতের আস্বাদনে পরিতৃপ্ত করে তোলা।

শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন, "*ভক্তের কর্তব্য—পরমেশ্বর ভগবানের প্রসাদ অজ্ঞ জীবনের মধ্যে বিতরণের দ্বারা তাদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করা। যাঁরা ভগবানকে ভোগ নিবেদন করেন, তাঁদের পক্ষে অজ্ঞ জনসাধারণের কাছে প্রসাদ বিতরণ অবশ্য কর্তব্য।*" (ভাগবত ৩/২৯/২৪)

> এছাড়াও শ্রীল প্রভুপাদ অন্যত্র লিখেছেন, "*আমাদের সংকীর্তন আন্দোলনে তথা হরেকৃষ্ণ আন্দোলনে, আমরা শ্রীবিগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রচুর ভোগ নিবেদন করে থাকি এবং পরে সেই ভোগ প্রসাদ ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, এবং পরে সর্বসাধারণকে বিতরণ করে থাকি।*" (ভাগবত ৭/১৪/১৭) তাৎপর্য)
>
> আবার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে তিনি লিখেছেন—
>
> "*যাঁরা গোপালের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করতে এসেছিলেন, তাঁরা গোপালকে নিবেদন করার জন্য সব রকমের খাদ্যদ্রব্য নিয়ে এসেছিলেন। তাদের ভাণ্ডারে যত খাদ্যদ্রব্য ছিল, তা সব নিয়ে এসে তারা শ্রীবিগ্রহকে নিবেদন করেছিলেন, এবং তাঁরা সব কিছু এনেছিলেন নিজেরা*

প্রসাদ গ্রহণ করবেন বলে নয়, সকলকে প্রসাদ বিতরণ করার জন্য। খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করে, তা জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করার পন্থা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন খুবই গুরুত্বপূর্ণভাবে অনুমোদন করে।" (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য ৪/৯৩)

প্রসাদ পরিবেশন

● আদর্শ ব্যবস্থানুসারে, দীক্ষিত বৈষ্ণবগণেরই প্রসাদ বিতরণ বা পরিবেশনে নিয়োজিত হওয়া উচিত। প্রসাদ পরিবেশনকারী বৈষ্ণব-ভক্তকে অবশ্যই দেহ-মনে, আচারে-আচরণে এবং পোশাক-পরিচ্ছদে পবিত্র হতে হবে এবং তৎপরতা, নীরবতা আর পটুতা সহকারে সেই কর্তব্য সাধনে প্রবৃত্ত হতে হবে। যতদূর সম্ভব, উচ্চস্বরে কথা বলা এবং চিত্তবিক্ষিপ্তকারী কোলাহল বা শব্দ পরিহার করা কর্তব্য।

● লক্ষ্য রাখতে হবে যেন প্রস্তুত করা খাদ্যসামগ্রী যা কিছু পরিবেশন করা হবে, যথার্থই সেইগুলি গরম থাকে (কিন্তু ঠাণ্ডা হয়ে গেলে আবার গরম করে আনা নয়।), এবং যেন পরিবেশন জন্য সমস্ত সামগ্রী হাজির করা থাকে কিংবা পরিবেশনের ঠিক সময়মতো হাজির হয়ে যায়। বিভিন্ন খাদ্যপদ পরিবেশনের যথাযথ ক্রমান্বয় ব্যবস্থাটি যেন সকলের ঠিকমতো জানা থাকে (পরবর্তী "প্রসাদের মর্যাদা" অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

● পরিবেশনের পাত্রগুলির কিংবা পরিবেশনকারীর কোনও অংশ যেন প্রসাদসেবনকারীদের থালা, পাতা কিংবা তাঁদের হাত স্পর্শ না করে, কারণ তাতে পরিবেশনকারী এবং পরিবেশনের পাত্রগুলি কলুষিত হয়ে যাবে। যদি এমন কিছু ঘটে যায়, তবে আবার প্রসাদ পরিবেশন চালিয়ে যাবার আগে পরিবেশনকারী অবশ্যই তার হাত এবং পরিবেশনের কলুষিত পাত্রটি জলে ধুয়ে নেবে। ভোজনপাত্রের কোনও একটি ফাঁকা অংশে হালকাভাবে প্রসাদ সামগ্রী ছেড়ে দিতে হয় (দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়—নুনের উপরে কখনই নয়)। প্রসাদসেবনকারীর হাতে সরাসরি প্রসাদ দেওয়া অনুচিত, অবশ্য যদি প্রসাদ ভোজনের সময় ছাড়া অন্য কোনও উপলক্ষ্যে এক মুঠি মহাপ্রসাদ বিতরণের ব্যাপার থাকে, তা হলে অন্য কথা।

● মিষ্টান্ন সামগ্রী, জল (কিংবা অন্য কোনও পানীয়), অথবা শুকনো খাদ্যসামগ্রী ছাড়া, অন্য সব কিছু প্রসাদ একটি চামচ দিয়ে তুলে পরিবেশন করতে হয়। প্রসাদ পরিবেশনের সময়ে শুধুমাত্র ডানহাত দিয়ে প্রসাদ দিতে হয়, এবং সেই সময়ে অন্য কোনও অশুদ্ধ অপবিত্র কিছু (মুখ, পা, চুল, কিংবা দেহের নিম্নাংশ) স্পর্শ করা অনুচিত। তাছাড়া পরিবেশনের সময়ে কখনও হাই তোলা, হাঁচি, কাশি, কিংবা থুথু ফেলা চলে না। প্রসাদ পরিবেশনের পাত্রগুলিতে যেন কারও পা ঠেকে না যায়।

• অল্প পরিমাণে পরিবেশন করা যেতে পারে, তবে যখনই অতিথি একটি পদ শেষ করবেন, তখনই সেই পদটি আবার পূর্ণকরে দেবার জন্যে পরিবেশনকারীকে সদাসতর্ক অবশ্যই থাকতে হবে। অতিথি কোনও একটি পদ যতটা চাইবেন, ততটাই দেবার মতো মুক্তহস্ত হতে হবে। প্রসাদ ভোজনের একেবারে শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত অতিথির ভোজন পাত্র যেন কখনই খালি থাকতে না দেওয়া হয়। পরিবেশনকারী কিংবা ভোজসভার অধিকর্তা প্রসাদ পরিবেশন কালে কোনও বিশেষ পদের চমৎকারিত্ব সম্পর্কে কিছু বর্ণনাও দিতে পারেন যাতে অতিথি সেটি আরও বেশি পরিমাণে সেবনের জন্য বিশেষভাবে উৎসুক হয়ে উঠতে পারেন। পরিবেশনকারী গোষ্ঠীর মধ্যে প্রত্যেকে একই ধরনের পদ পরিবেশনের দায়িত্ব নিয়ে থাকা উচিত—যখন একদল মানুষ একসঙ্গে বসে প্রসাদ সেবন করতে থাকেন, তখন যে-পদটি অন্য কাউকে পরিবেশন করা হয়নি, সেটি শুধুমাত্র একজনকে কখনও যেন পরিবেশন না করা হয়। যাঁদের আহার্য বিধি ভিন্ন ধরনের, তাঁদের পৃথক পংক্তিতে প্রসাদ গ্রহণের বন্দোবস্ত রাখা ভাল। এ ছাড়া, মহাভোজপর্বে যখন শিশুরা থাকে, তখন সবার আগে তাদের প্লেটে প্রসাদ পরিবেশন শুরু করা ভাল।

খাদ্যসামগ্রী পরিবেশনের ক্রম-পরম্পরা

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ যখন প্রসাদ পরিবেশন করেন, তাঁরা তেতো দিয়ে শুরু করেন, যেমন শুক্ত আর শাক, তারপরে ডাল আর ভাজাভুজি (যেমন, পকৌড়া বা আলু ভাজা, বড়া বা বেগুনীর মতো পদ)। তারপরে তাঁরা অন্যান্য সবজি পদগুলি দিতে থাকেন, হালকা ধরনের সবজিপদ থেকে শুরু করে ক্রমান্বয়ে গুরুপাক সবজিগুলি, এবং রসালো সবজি থেকে ক্রমে শুকনো তরকারির দিকে। তারপরে রসালো গুরুপাক সবজি পদ আরও একবার পরিবেশন করা হয়, পরে আসে রায়তা এবং চাটনি। সব শেষে তাঁরা পরিবেশন করেন মিষ্টান্নাদি, ক্রমে অল্প মিষ্টি থেকে বেশি মিষ্টি পদগুলি। অন্ন এবং রুটি-চাপাটি একেবারে প্রথম থেকেই দিতে থাকা উচিত এবং দরকার মতোই তা বারে বারে প্লেট ভরে দেওয়া চাই, যতক্ষণ না প্রসাদসেবনকারীরা সব রকম সবজি পদগুলি ভোজন করছেন। সম্ভব মতো, রুটি-চাপাটিগুলি গরম-গরম পরিবেশন করা উচিত। (গুজরাটিদের প্রসাদ পরিবেশনের ক্রম-পরম্পরা অন্য ধরনের হয়)।

প্রসাদের মর্যাদা

প্রসাদ সেবনের আগে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে নিতে হয়—হাত, পা, মুখ ধুতে হয়। তা ছাড়া শিখা বন্ধন করে নেওয়া দরকার, পুরুষদের মাথায় কোনও আবরণ দিতে নেই, এবং খালি পায়ে প্রসাদ পংক্তিতে বসা উচিত।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, খোলামেলা, শান্ত পরিবেশে প্রসাদ গ্রহণ করতে বসা উচিত। সম্ভব হলে, গাড়িতে চলাকালীন প্রসাদ সেবন না করাই ভাল। ত্রিসন্ধ্যায় (সূর্যোদয়, দ্বিপ্রহর বা সূর্যাস্তে), স্নানের আগে, কিংবা গায়ত্রী জপের আগে, অথবা সকালে শ্রীবিগ্রহ আরাধনার আগে প্রসাদ সেবন অনুচিত। তা ছাড়া, ইতিপূর্বে যে প্রসাদ সেবন করা হয়েছে, তা পরিপাক না হওয়া পর্যন্ত আবার কিছু খাদ্য গ্রহণ করা অনুচিত।

পা ছড়িয়ে না বসে, আসন হয়ে বসে প্রসাদ সেবন বিধেয় এবং প্রসাদপাত্রটি কোলের উপরে রাখা অবিধেয়। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, প্রসাদ সেবনের সময়ে মেঝেতে একটি আসনে পা মুড়ে বসতে হয়, যাতে হজমের কাজটি সহজ হয়। পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়স্ক কোনও মানুষ অবশ্য টেবিলে প্রসাদপাত্র রেখে চেয়ারে বসে প্রসাদ সেবন করতে পারেন।

প্রসাদ সেবনের সময়ে যদি কোনও ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করেন, তবে তৎক্ষণাৎ তাঁকেও প্রসাদ সেবনে বসতে আমন্ত্রণ জানাতে হয়।

প্রসাদের উদ্দেশ্যে ভক্তি নিবেদন

শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থের অন্ত্যলীলা ১১/২০ তাৎপর্য অংশে লিখেছেন—

> *মহাপ্রসাদ শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন। তাই, মহাপ্রসাদ খাওয়ার পরিবর্তে, তার সম্মান করা উচিত। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (অন্ত্যলীলা ১১/২০) শ্লোকে বলা হয়েছে—এত বলি' মহাপ্রসাদ করিলা বন্দন'। হরিদাস ঠাকুরের প্রসাদ বন্দনা। মহাপ্রসাদ গ্রহণ করবার সময়ে, তাই সাধারণ খাবার মনে করা উচিত নয়। প্রসাদ মানে কৃপা। মহাপ্রসাদকে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা বলে মনে করা উচিত।*

ভোজন শুরু করবার আগে প্রসাদের দিকে ভক্তিভরে দৃষ্টিপাত করতে হয়, তার প্রতি ভক্তি নিবেদন করতে হয় যেন সেটি শ্রীভগবানের কৃপার অবদান। শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ লিখেছেন, *"কেউই স্বতন্ত্রভাবে কোনও কার্য করতে পারে না, এবং তাই কর্ম করার জন্য, খাওয়ার জন্য অথবা কিছু বলার জন্য সর্বদাই ভগবানের অনুমতি গ্রহণ করা প্রয়োজন, এবং ভগবানের আশীর্বাদ সহকারে ভক্ত যা কিছু করেন, তা সবই বদ্ধজীবের কৃতকর্মের চারটি স্বাভাবিক দোষ থেকে মুক্ত হয়ে যায়।"* (ভাগবত ২/৪/১১ তাৎপর্য)

শ্রীভগবৎ-প্রসাদের মহিমা কীর্তনের উদ্দেশ্যে নিচের প্রার্থনাটি জপ করা উচিত—

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে ॥

হে রাজন! যাদের পুণ্য অল্প, তাদের হৃদয়ে মহাপ্রসাদে,গোবিন্দ বিগ্রহে, পবিত্র দিব্য নামে এবং বৈষ্ণবগণের প্রতি বিশ্বাস জন্মায় না। (*মহাভারত*)

প্রসাদ-সেবা

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর *গীতাবলী* থেকে নিম্নোক্ত প্রার্থনাটি উচ্চারণের মাধ্যমে, প্রসাদ গ্রহণের কাজটিকে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির ব্যাপার না মনে করে ভগবৎ-সেবার অঙ্গ স্বরূপ ভক্তি নিবেদন করা চলে—

ভাই রে!
শরীর অবিদ্যাজাল, জড়েন্দ্রিয় তাহে কাল,
জীবে ফেলে বিষয়-সাগরে।
তার মধ্যে জিহ্বা অতি, লোভময় সুদুর্মতি,
তাকে জেতা কঠিন সংসারে ॥
কৃষ্ণ বড় দয়াময়, করিবারে জিহ্বা জয়,
স্বপ্রসাদ অন্ন দিলা ভাই।
সেই অন্নামৃত পাও, রাধাকৃষ্ণ-গুণ গাও,
প্রেমে ডাকো শ্রীচৈতন্য-নিতাই ॥

ভোজন ও জল পান করার রীতি

দু'জন বা তারও বেশি লোক একসাথে বসে প্রসাদ সেবনে নিয়োজিত হলে, তাদের মধ্যে জড়জাগতিক কোনও বিষয়ে আলাপন অনুচিত। যে কোনও আলোচনা তখন সীমাবদ্ধ থাকা উচিত কৃষ্ণভাবনামৃত সম্পর্কে কিংবা প্রসাদের মাহাত্ম্য বর্ণনা প্রসঙ্গে মৃদু আলাপনে। ভক্তেরা যদি মনোযোগী হন, তা হলে একজন ভক্ত যিনি প্রসাদ সেবন করছেন না, তিনি প্রসাদ গ্রহণ পর্বে সকলের শ্রবণ সুখার্থে কোনও শাস্ত্র থেকে সোচ্চারে কিছু পাঠ করে শোনাতে পারেন। খাদ্যগ্রহণ বা জলপানের সময়ে, প্রসাদের স্বাদ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কোনও বিরক্তিকর শব্দ সৃষ্টি করা কিংবা স্বাদের ত্রুটি বর্ণনা করা চলে না।

কেবলমাত্র ডান হাতের পাঁচটি আঙুল ব্যবহার করেই খাদ্যসামগ্রী তুলে মুখে দিতে হয়। আঙুলে নাড়াচাড়া করে প্রসাদ গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হয়, তার কারণ আঙুলগুলি দিয়ে খাদ্য সামগ্রীর অনুভূতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে পরিপাক ক্রিয়ার সহায়তা হতে থাকে বলে আয়ুর্বেদে বলা হয়েছে।

বাঁ হাতটি শুধুমাত্র জলপাত্র তুলে ধরবার জন্যই কাজে লাগাতে হয় এবং তারপরে মুখের মধ্যে জল ঢালবার সময়ে ঠোঁট দিয়ে জল পাত্রটি স্পর্শ না করতে পারলেই ভাল হয়। রুটি-চাপাটি-পুরি বা লুচির মতো বড় আকারের আহার্য সামগ্রী ডান হাতের আঙুলগুলি দিয়ে ছিঁড়ে নিয়ে ছোট ছোট টুকরো মুখের মধ্যে দিতে হয়। কখনও একটা বেশ বড় আহার্য সামগ্রী সবটা মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে তারপরে দাঁত দিয়ে টুকরো করবার চেষ্টা করা ভাল নয়।

জলপান করবার রীতি নিম্নরূপ—যখন ডান হাত পরিষ্কার থাকে (প্রসাদ সেবনের আগে), তখন সেই হাতে জলের পাত্রটি ধরে মুখের মধ্যে এমনভাবে জলটুকু ঢালতে হয়, যাতে জল পাত্রটি ঠোঁটে স্পর্শ না হয়। প্রসাদ সেবনের সময়ে ডান হাত দিয়ে মুখ স্পর্শ করতে হয়, তাই জলপাত্রটি তখন বাঁ হাত দিয়ে তুলে ধরে মুখের মধ্যে জল ঢালতে হয়—ঠোঁটে না ঠেকিয়ে। যদি জলপাত্র থেকে সুবিধা মতো জল মুখে ঢালতে না পারা যায়, তা হলে ডান হাতে পাত্রটি ধরে ঠোঁটে ঠেকিয়ে জল পান করে নেওয়া চলে।

আহার্যের পরিমাণ

অতিভোজনে রোগ-ব্যাধি জন্মায় এবং আয়ুক্ষয় হয়। এ ফলে পারমার্থিক প্রগতি ও বিঘ্নিত হয়, পাপ জন্মায়, আর নিন্দামন্দের ভাগী হতে হয়।

শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ লিখেছেন—

কলিযুগের মানুষদের আয়ু অল্প হওয়ার কারণ খাদ্যাভাব নয়, তাঁর কারণ হচ্ছে অনিয়ম এবং অনাচার। সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে জীবন যাপন করলে, সাদাসিধে খাদ্য আহার করলে যে কোনও মানুষ সুস্থ ও সবলভাবে জীবন যাপন করতে পারে। অত্যাচার, অত্যধিক ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, অন্যের করুণার উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা এবং কৃত্রিমভাবে জীবনের মান উন্নত করার চেষ্টা মানুষের জীবনী-শক্তি শোষণ করে নেয়। তাদের আয়ু কমে যায়। (ভাগবত ১/১/১০ তাৎপর্য)

কখনও কখনও দেখা যায় যে, দীক্ষিত ব্যক্তিরা প্রসাদের নামে অত্যন্ত উপাদেয় সমস্ত খাদ্যদ্রব্য আহার করে। তাদের পূর্বকৃত প্রারব্ধ পাপকর্মের ফলে তারা কামদেবের দ্বারা আকৃষ্ট হয় এবং প্রচুর পরিমাণে উপাদেয় গুরুপাক খাদ্যসামগ্রী ভোজন করে থাকে। স্পষ্টভাবে দেখা গেছে যে, কৃষ্ণভক্তির মার্গে নবীন ভক্ত যদি অত্যধিক আহার করে, তা হলে তার অধঃপতন শুরু হয়। (ভাগবত ৪/২৬/১৩ তাৎপর্য)

আদর্শগত প্রথা অনুসারে, অর্ধেক উদর পূর্ণ করে খাদ্যসামগ্রী গ্রহণ করে, বাকি সিকি অংশ জল পান করে এবং বাকিটা বাতাসে পরিপূর্ণ করে রাখাই সমীচীন।

ভোজনপর্বের শেষে

প্রসাদ ভোজন পর্বের শেষে আসন পরিত্যাগ করে সকলে ওঠবার আগে প্রেমধ্বনি (ষষ্ঠ অধ্যায়ে ১১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) উচ্চারণ করা উচিত। প্রসাদ সেবন শেষ হয়ে গেলে, এবং অন্য সকলের প্রসাদ ভোজন শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবার সময়ে, সোচ্চারে বিভিন্ন শ্লোকাবলী এবং ভগবানের মহিমা কীর্তন করতে পারা যায়।

যাঁরা পংক্তিতে প্রসাদ সেবন সম্পূর্ণ করতে পারেননি, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য একই পংক্তিতে উপবিষ্ট বাকি সকলেরই উঠে পড়বার আগে কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করা শোভনীয়! এই বিধির তাৎপর্য এই যে, প্রসাদ সেবনের মর্যাদা রক্ষার্থে শ্রদ্ধাপূর্ণ ভক্তসঙ্গের পরিবেশ রচনার উদ্দেশ্যে কিছুক্ষণ একসাথে বসে থাকা খুবই সৌজন্যমূলক অভিব্যক্তি। প্রসাদ নিবেদন ও সেবন হল ভক্তসঙ্গে প্রেম বিনিময়ের ষড়ঙ্গের (ছয় প্রকার পদ্ধতির) দুটি বিশেষ অঙ্গ (উপদেশামৃত ৪র্থ শ্লোক দ্রষ্টব্য), এবং তাই ভক্ত সমাবেশে প্রসাদ সেবনের উপলক্ষ্যে রচিত মিলনমধুর পরিবেশটিকে আমরা যতখানি সম্ভব অনুকূল করে তুলতে চেষ্টা করা উচিত মনে করি। অবশ্য এই বিধি পালন করতে গিয়ে যেন প্রচারকার্যের কর্মব্যস্ত কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনও বিঘ্ন সৃষ্টি না করে। সচরাচর দৈনন্দিন মন্দির পরিবেশে কিংবা পর্যটন পরিক্রমার কার্যক্রমের ক্ষেত্রে, এই ধরনের বিধি, মেনে চলতে কারও প্রচারকার্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে বলে মনে করা অনুচিত। তবে অন্তত যেখানে সম্মিলিত প্রীতিভোজ অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সেখানে এই বিধি অনুসরণে যত্নবান হওয়ার কথা বিবেচনা করা উচিত।

ভোজনের ফলে মানুষ কলুষতা অর্জন করে, অতএব, আহারের পরে কোনও কিছু করবার আগে নিজেকে পরিশোধন করে নেওয়া অবশ্য কর্তব্য। ভোজনপর্বের শেষে অনতিবিলম্বে হাত ধুতে হয়, তারপরে অন্তত তিনবার মুখ ধুয়ে ফেলতে হয়, এবং সব শেষে পা ধুতে হয়।

প্রসাদ সেবনের ঠিক পরেই বিশ্রাম করা কিংবা পরিশ্রমসাধ্য কোনও কাজ করা ভাল নয়। প্রসাদ গ্রহণের সময়ে যেভাবে পরিপূর্ণ প্রশান্তি সহকারে আহার্য গ্রহণ করা হয়, ঠিক তেমনই স্থির মনে শ্রীভগবানের মহিমা, তাঁর দিব্যনাম এবং দিব্যলীলা স্মরণ করে কিছু সময় অতিবাহিত করতে হয়।

পবিত্র এবং অপবিত্র উচ্ছিষ্ট

শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ তাঁর পত্রাবলীতে লিখেছেন—

প্রসাদ সম্পর্কে জানা দরকার যে, প্রসাদের উচ্ছিষ্ট যদি খারাপ না হয়ে গিয়ে থাকে কিংবা যদি কোনও রোগগ্রস্ত মানুষের স্পর্শ না পেয়ে থাকে,

তা হলে সেই উচ্ছিষ্ট প্রসাদ সর্বদাই গ্রহণযোগ্য থাকে। শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদের অপচয় কখনই আমাদের করা উচিত নয়। সব চেয়ে ভাল হয় যতটুকু প্রয়োজন, ঠিক ততটুকু রান্না করা এবং তারপরে প্রত্যেকে যতটুকু চায়, ঠিক ততটুকুই প্রসাদ পরিবেশন করা।...এইভাবে, কিছুই অপচয় হয় না এবং প্রত্যেকে সন্তুষ্ট হয়। (শ্রীল প্রভুপাদের লেখা ২৭ নভেম্বর ১৯৭১ তাং চিঠি থেকে)

ভক্তেরা এতখানি উন্নত পর্যায়ে উন্নীত না হতেও পারে যে, তারা কোনও কর্মী মানুষের উচ্ছিষ্ট আহার্য সামগ্রী প্রসাদ রূপে গ্রহণ করবে। কর্মীদের এমন বেশি প্রসাদ দেওয়া অনুচিত যাতে তারা অপচয় করতে পারে। (শ্রীল প্রভুপাদের লেখা ৪ অগাস্ট ১৯৭৫ তাং চিঠি থেকে)

প্রসাদ সেবনের ঠিক পরেই, জায়গাটি জল দিয়ে সম্পূর্ণ ধুয়ে ফেলা উচিত, কারণ ঐ অংশটুকু অপবিত্র হয়ে যায়।

শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এই বিষয়ে লিখেছেন—

একটা জিনিস খেয়াল রাখা উচিত যে, সব কিছু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা চাই। এটাই সব আগের কাজ। প্রত্যেকটি ঘর আয়নার মতো ঝকঝকে করে রাখতে হয়। প্রসাদ গ্রহণের ঠিক পরেই প্রসাদ কক্ষটি পরিষ্কার করে দিতে হবে; তা না করলে ইঁদুরের উৎপাত ডেকে আনা হবে। (শ্রীল প্রভুপাদের লেখা ২০ অক্টোবর ১৯৭৩ তাং চিঠি থেকে।)

নামসেবা, তুলসী-সেবা, শাস্ত্রসেবা এবং প্রসাদ-সেবার মতো সেবাকার্যগুলি যদিও নিত্য পালনীয়, তবে বৈষ্ণব-সেবা, অতিথি-সেবা এবং ধাম-সেবার মতো এই তিন ধরনের সেবাকার্যগুলি নিত্য পালনীয় হতেও পারে, আবার নৈমিত্তিক (মাঝে মধ্যে) পালনীয় হতেও পারে।

বৈষ্ণব-সেবা

দেবাদিদেব শিব স্বয়ং পরম বৈষ্ণব রূপে সমস্ত বৈষ্ণব-সমাজের মহিমা বর্ণনা করে যা বলেছিলেন, *পদ্মপুরাণে* তার উল্লেখ আছে—

আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্ ।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চনম্ ॥

"হে দেবী! যদিও বেদশাস্ত্রাদিতে দেবতাদের আরাধনার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, তবু ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনাই সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবদ্-আরাধনা বলে মানতে হবে এবং সব কিছুর শেষে তাঁরই আরাধনা অনুমোদিত

হয়েছে। তবে, শ্রীবিষ্ণুর আরাধনারও ঊর্ধ্বে বৈষ্ণবগণের সেবা অধিকতর ফলপ্রসূ, কারণ তাঁরা সকলেই শ্রীবিষ্ণুর সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত।" (লঘুভাগবতামৃত গ্রন্থের মধ্যে উদ্ধৃত পদ্মপুরাণের অংশবিশেষ)

ভক্ত সান্নিধ্যের আবশ্যকতা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং ভক্ত সান্নিধ্যের আবশ্যকতা সম্পর্কে গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেন—

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ ॥ (*চৈঃ চঃ মধ্য, ২২/৮৩*)

"কৃষ্ণভক্তির মূল কারণ হল সাধুসঙ্গ। এমন কি যখন সুপ্ত কৃষ্ণপ্রেম জাগরিত হয়, তখন ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ অত্যন্ত প্রয়োজন।"

এ ছাড়া নৈমিষারণ্যে সমবেত ঋষিবর্গও এই বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছিলেন—

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥

"ভগবৎসঙ্গীর সঙ্গে নিমেষমাত্র সঙ্গ করার ফলে জীবের যে অসীম মঙ্গল সাধিত হয়, তার সঙ্গে স্বর্গ বা মোক্ষেরও তুলনা করা যায় না, তখন মরণশীল মানুষের জাগতিক সমৃদ্ধির কথা আর কি বলার আছে।" (ভাগবত ১/১৮/১৩)

শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদও লিখেছেন—

"শ্রীল জীব গোস্বামী ভক্তিসন্দর্ভে (২০২) উল্লেখ করেছেন যে, শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি যাজন করাই শুদ্ধ বৈষ্ণবদের একমাত্র উদ্দেশ্য এবং ভক্তসঙ্গে তা সাধন করতে হয়। কৃষ্ণভক্তদের সঙ্গ করার ফলে কৃষ্ণভক্তির বিকাশ হয় এবং তার ফলে ভগবানের প্রেমময়ী সেবার প্রতি অনুরাগের উদয় হয়। এইভাবে ভগবদ্ভক্তির প্রতি ধীরে ধীরে অনুরাগ বিকাশের ফলে ভগবানের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হওয়া যায়। কেউ যদি ভগবানের প্রতি অনন্য ভক্তিলাভ করতে অভিলাষী হয়, তা হলে তাকে অবশ্যই কৃষ্ণভক্তদের সঙ্গ করতে হবে। কারণ, ভক্তসঙ্গের প্রভাবের ফলেই কেবল বদ্ধ জীব অপ্রাকৃত ভগবৎ-প্রেমের স্বাদ গ্রহণ করতে সক্ষম হয় এবং তার ফলে স্বরূপগত স্বাভাবিক বৃত্তি অনুসারে ভগবানের সঙ্গে তার নিত্য সম্পর্কের পুনর্বিকাশ সাধিত হয়।" (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, ১/৩৫) তাৎপর্য)

ভগবৎ মন্দিরেই বৈষ্ণবেরা সমবেত হন এবং সেখানে তাঁরা সমবেতভাবে সংকীর্তন সহযোগে শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করে থাকেন। ঠিক যেভাবে সকলে ভক্তজনের সঙ্গে শ্রীভগবানের পবিত্র নামকীর্তন করেন এবং শ্রীমদ্ভাগবত থেকে পাঠ-প্রবচন শ্রবণ করেন, ঠিক সেইভাবেই তাঁদের সান্নিধ্য সহযোগে সকলে শ্রীভগবানের বিগ্রহাদির উদ্দেশ্যে আরাধনা নিবেদন করা কর্তব্য, কারণ শ্রীভগবান তাঁর প্রীতিবিধানমূলক বিবিধ সেবাকার্যে তাঁর ভক্তমণ্ডলীর সাথে সকলকে সহযোগিতা করতে দেখলে তাঁদের সকলের প্রতি অতীব সন্তুষ্টি লাভ করে থাকেন।*

ভক্তসান্নিধ্য পরিহারের পরিণাম

নিম্নলিখিত তাৎপর্য অংশটির মাধ্যমে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ অভক্ত-সঙ্গের পরিণাম সম্পর্কে আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন—

> মানুষ সামাজিক জীব, এবং কেউ যদি শুদ্ধ ভক্তের সমাজ ছেড়ে চলে যায়, তা হলে তাকে অভক্তদের সঙ্গ (অসৎ সঙ্গ) করতেই হবে। অভক্তদের সঙ্গে ভক্তদের মতো আচরণ করে, তথাকথিত উন্নত ভক্ত অভীমাত্রা অপরাধের শিকার হয়। তার ভক্তিলতা যতটুকু বর্ধিত হয়েছিল, তা এই ধরনের অপরাধের ফলে অচিরেই সমূলে উৎপাটিত হয়। তাই যত্ন করে বেড়া দিয়ে ভক্তিলতাকে আগলে রাখতে হয়। অর্থাৎ বিধি-নিষেধগুলি নিষ্ঠাভরে পালন করে শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গ লাভ করার মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান ভগবদ্ভক্তিকে সুরক্ষিত রাখবার যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হয়। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ১৯/১৫৭, তাৎপর্য)

শ্রীভগবানকে তাঁর শ্রীবিগ্রহরূপের মাধ্যমে যথাযথভাবে আরাধনা করতে হলে, বৈষ্ণবগণের সঙ্গে অবশ্যই নিয়মিত সঙ্গ রেখে চলতে হয়। ভক্তদের পরিহার করে চলার অর্থ এই যে, শ্রীভগবানের প্রতি যে অনুরাগ রয়েছে, তা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার ভেদদর্শী মনোবৃত্তি। এই বিষয়টিকে বর্ণনা করে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ বলেছেন, "ভেদদর্শী হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে তার নিজের স্বার্থ ভগবানের স্বার্থ থেকে ভিন্ন বলে দর্শন করে। মিশ্র ভক্ত, বা রাজসিক ও তামসিক ভক্ত মনে করে যে, ভগবানের কাজ তাঁর ভক্তদের চাহিদা

---

* পরিপূর্ণ উপচার সহকারে সবিস্তারে পূজা-অর্চনার ক্ষেত্রে, যেমন—শালগ্রাম শিলার উদ্দেশ্যে বিশদভাবে সেবা-অর্চনা নিবেদনের সময়ে, শ্রীবিগ্রহের কাছে দুই, তিন কিংবা চারজন ভক্তের সমাগম হওয়ার সুযোগ হতে পারে—প্রত্যেক ভক্ত সেবা-নিবেদনের এক-একটি বিশেষ অঙ্গ নিয়ে মনোনিবেশ করে থাকেন। এই বিষয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

মেটানো। এই ধরনের ভক্তদের উদ্দেশ্য এই যে, তাদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের জন্য ভগবানের কাছ থেকে সবরকম সম্পদ আদায় করে নেওয়া। এটি হচ্ছে ভিক্ষাজীবীর মনোভাব।" (শ্রীমদ্ভাগবত ৩/২৯/৯, তাৎপর্য) বিশ্লেষণ করে, যে সমস্ত ভক্ত নিয়মিত মন্দিরে যেতে পারেন না বলে বাড়িতে শ্রীবিগ্রহ আরাধনা করে থাকেন, তাঁদেরও এই ধরনের ভিক্ষাজীবী মনোভাব সম্পর্কে বিশেষভাবে সতর্ক থাকা উচিত, যাতে শ্রীভগবান অসন্তুষ্ট না হতে পারেন।

শ্রীবিগ্রহ আরাধনার মাধ্যমে বৈষ্ণব চরিত্রের বিকাশ হয়

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁর বিরচিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের মধ্যলীলায় ২২/৭৫ শ্লোকে বলেছেন—

সর্বমহা-গুণগণ বৈষ্ণব-শরীরে।
কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকলি সঞ্চারে ॥

"বৈষ্ণবের শরীরে সমস্ত দিব্য গুণগুলি প্রকাশিত হতে দেখা যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত দিব্যগুণাবলী কৃষ্ণভক্তের মধ্যে ক্রমশ সঞ্চারিত হয়।"

আর, শ্রীমদ্ভাগবতে (৫/১৮/১২) শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজও বলেছেন—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥

"যিনি ভগবান বাসুদেবের প্রতি শুদ্ধ ভক্তি লাভ করেছেন, তাঁর শরীরে সমস্ত দেবতা এবং তাঁদের ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ইত্যাদি সমস্ত সদ্‌গুণ বিরাজ করে। পক্ষান্তরে, যারা ভক্তিহীন এবং জড়জাগতিক কার্যকলাপে লিপ্ত, তাদের মধ্যে কোনও সদ্‌গুণ নেই। তারা যোগ অভ্যাসে পারদর্শী হতে পারে অথবা সদ্‌ভাবে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের ভরণ-পোষণ করতে পারে, কিন্তু তারা অবশ্যই মনোধর্মের দ্বারা পরিচালিত হয়ে অসৎ বহির্বিষয়ে ধাবিত হয় এবং মায়ার দাসত্ব করে। তাদের মধ্যে মহৎগুণের সম্ভাবনা কোথায়?" (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের মধ্যলীলা খণ্ডের ২২/৭৬ শ্লোকের অনুবাদেও এই তাৎপর্য সংক্ষেপে উদ্ধৃত হয়েছে।)

পরমতত্ত্বের চরম লক্ষ্যের মার্গ প্রদর্শন শ্রীকপিলদেবও ভক্তগণের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, "সাধুর লক্ষণ হচ্ছে তিনি সহনশীল, দয়ালু এবং সমস্ত জীবের সুহৃৎ।

তাঁর কোনও শত্রু নেই, তিনি শান্ত, তিনি শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে আচরণ করেন এবং তিনি সমস্ত সদ্‌গুণের দ্বারা বিভূষিত হন।" (শ্রীমদ্ভাগবত ৩/২৫/২১)

যে ভক্ত যথাযথভাবে বিকশিত হতে থাকে, যা থেকে ক্রমে তাঁর পক্ষে বৈষ্ণবোপযোগী ২৬টি গুণাবলী আয়ত্ত করা সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ২২/৭৮-৮০ শ্লোকাবলীর মধ্যে এই ছাব্বিশটি গুণাবলীর তালিকা দ্রষ্টব্য।)

এই প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ লিখেছেন—

"শ্রীবিগ্রহ আরাধনার প্রত্যক্ষ বাস্তব সুফল তোমার আচরণে বিকাশ লাভ করেছে জেনে আমি বিশেষ সন্তুষ্ট হলাম।...শ্রীবিগ্রহ আরাধনা হল ভগবদ্ভক্তির প্রত্যক্ষ অনুশীলন, এবং শ্রীগুরুদেবের মুখনিঃসৃত উপদেশাবলী শ্রবণের মাধ্যমে তোমার সেই ভাবধারা পরিপুষ্ট হয়েছে। কৃষ্ণভাবনামৃত এমনই মধুময় যে, এই অমৃতের আস্বাদন যে কেউ সামান্য মাত্রও করে, সে তার অতীত ও বর্তমান জীবনের পার্থক্য অবশ্যই উপলব্ধি করতে পারে।" (২৭ ডিসেম্বর ১৯৬৮ তাং শ্রীল প্রভুপাদের রচিত পত্র থেকে।)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (মধ্য ১৩/১৩৯) অংশে শ্রীবিগ্রহ আরাধনায় সুফল সম্পর্কে তাৎপর্য অংশে বর্ণনা দেওয়া আছে এইভাবে—

শাস্ত্র ও শ্রীগুরুদেব নির্দিষ্ট বিধি অনুসারে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সেবারত ভক্ত ধীরে ধীরে উপলব্ধি করতে পারেন যে, তিনি পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সরাসরিভাবে সম্পর্কযুক্ত। এইভাবে তিনি তথাকথিত ধ্যান, যোগ এবং জ্ঞানের প্রতি সমস্ত উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন।

'দু'ধরনের বৈষ্ণব'

কোনও অবৈষ্ণবের থেকে এক বৈষ্ণবের বিশেষ পার্থক্য হল এই যে, বৈষ্ণবজন সর্বদাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক কথা ছাড়া এবং শ্রীকৃষ্ণের সেবা ছাড়া অন্য সব কিছুতেই অনাসক্ত হয়ে থাকেন। এই গুণবৈশিষ্ট্য কোনও বৈষ্ণব যতই উন্নতি লাভ করেন, ততই তিনি অগ্রণী হতে থাকেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (৩/২) শ্লোকে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিভিন্ন স্তরের বৈষ্ণবভক্তদের বর্ণনা দিয়েছেন। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে, দু'ধরনের বৈষ্ণব আছেন, যেমন—সাধারণ বৈষ্ণব, আর পারমার্থিক চিন্ময় স্তরে উন্নীত বৈষ্ণব। সাধারণ বৈষ্ণবেরা তিন শ্রেণীর—যাঁরা কৃষ্ণভাবনায় বিশ্বাস করেন, কিন্তু কঠোরভাবে তা মেনে চলেন না, যাঁরা বৈষ্ণবজনের তিলক চিহ্নাদি মেনে নেন

এবং বৈষ্ণবদের শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু নিজেরা কঠোরভাবে তা অভ্যাস করেন না, এবং যাঁরা বৈষ্ণব পরিবার থেকে এসেছেন এবং বৈষ্ণব তিলকচিহ্নাদি ধারণ করেন, কিন্তু বৈষ্ণব আচরণাদি কঠোরভাবে মেনে চলেন না। ভারতে লোকে এই তিন ধরনের সাধারণ বৈষ্ণবদের নমুনা দেখতে পায়। তাঁদের সকলকেই যথার্থ শুদ্ধ বৈষ্ণব-সঙ্গের মাধ্যমে উন্নীত করা চলে।

পারমার্থিক চিন্ময় স্তরে উন্নীত তিন ধরনের বৈষ্ণব

পারমার্থিক চিন্ময় স্তরে উন্নীত বৈষ্ণবেরা তাঁদের জীবনে পবিত্র মহামন্ত্র জপ অনুশীলন, ভগবৎ-বিশ্বাসের গভীরতা এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবানের উপলব্ধি সম্পর্কিত বিকাশ প্রগতি বিচারেই তিনটি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে থাকেন।

১) মহামন্ত্র জপের উন্নতি : *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থে (মধ্যলীলা ১৬/৭২), শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মধ্যম অধিকারী বৈষ্ণবের একটি অত্যাবশ্যক বৈশিষ্ট্যের সংজ্ঞা দিয়েছেন—

কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।
সেই বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ, ভজ তাঁহার চরণে ॥

"যাঁর মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম, তিনি বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ, তাঁর শ্রীপাদপদ্মের ভজনা কর।"

এই শ্লোকটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থের মধ্যে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, *যে বৈষ্ণবের মুখে 'নিরন্তর' শ্রীকৃষ্ণনাম উচ্চারিত হয়, তাঁকে মধ্যম অধিকারী বৈষ্ণব বলে চিনতে হবে। এই স্তরের ভক্ত কোমল শ্রদ্ধা, সম্প্রতি কৃষ্ণনাম উচ্চারণকারী কনিষ্ঠ বৈষ্ণব থেকে শ্রেয়। কনিষ্ঠ ভক্ত কেবল ভগবানের নাম গ্রহণ করার চেষ্টা করেন, কিন্তু উন্নত স্তরের ভক্ত নাম গ্রহণে অভ্যস্ত এবং নাম গ্রহণ করে আনন্দ অনুভব করেন। এই ধরনের উন্নত ভক্তকে বলা হয় মধ্যম ভাগবত, অর্থাৎ তিনি কনিষ্ঠ ও উত্তম ভক্তের মধ্যবর্তী স্তরে অবস্থিত। সাধারণত মধ্যম অধিকারী ভক্ত ভগবানের বাণীর প্রচারক হন। কনিষ্ঠ ভক্ত বা সাধারণ মানুষের মধ্যম ভাগবতের পূজা করা উচিত, যিনি হচ্ছেন মাধ্যম।*

এর দুটি শ্লোক পরেই, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উত্তম অধিকারী বৈষ্ণব ভক্তের বর্ণনা দিয়েছেন—

যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি 'বৈষ্ণব-প্রধান' ॥ (*চৈঃ চঃ মধ্যঃ* ১৬/৭৪)

"যাকে দেখলে মুখে কৃষ্ণনাম আসে, তাকে উত্তম বৈষ্ণব বলে জেনো।"

২) ভগবৎ-বিশ্বাসের গভীরতা : শ্রীল রূপ গোস্বামী ভক্তের অন্তরে ভগবৎ-বিশ্বাসের গভীরতার তারতম্য অনুসারে চিন্ময় পারমার্থিক বিশ্বাসের তিনটি পর্যায়ের পার্থক্য এইভাবে নির্ণয় করেছিলেন—

যো ভবেৎ কোমলশ্রদ্ধঃ স কনিষ্ঠো নিগদ্যতে । (চৈঃ চঃ মধ্য ২২/৭০)

"যিনি কোমল শ্রদ্ধাযুক্ত, তিনি কনিষ্ঠ ভক্ত।"
এই শ্লোকটিও ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১/২/১৯) গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।
যঃ শাস্ত্রাদিষ্বনিপুণঃ শ্রদ্ধাবান্ স তু মধ্যমঃ ॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ২২/৬৮)
"যিনি শাস্ত্রের ভিত্তিতে যুক্তি প্রদর্শন করতে পারদর্শী নন, কিন্তু দৃঢ় শ্রদ্ধাবান, তিনি মধ্যম অধিকারী ভক্ত।"
এই শ্লোকটি ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১/২/১৮) গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।

শাস্ত্রে যুক্তৌ চ নিপুণঃ সর্বথা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ ।
প্রৌঢ়শ্রদ্ধোঽধিকারী যঃ স ভক্তাবুত্তমো মতঃ ॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ২২/৬৬)

"যিনি ভক্তিশাস্ত্রে দক্ষ এবং বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত নিরসনে দৃঢ় যুক্তি পটু,—এই প্রকার গভীর শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিই ভক্তের মধ্যে 'উত্তম অধিকারী'।"

এই শ্লোকটি শ্রীল রূপ গোস্বামী রচিত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১/২/১৭) থেকে উদ্ধৃত।

৩) কৃষ্ণ-উপলব্ধির মাধ্যমে বিকাশ : শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/২/৪৭) কৃষ্ণ-উপলব্ধির তারতম্য অনুসারে তৃতীয়, দ্বিতীয় এবং প্রথম শ্রেণীর ভক্তদের বর্ণনা এইভাবে দেওয়া হয়েছে—

অর্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে ।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥ (চৈঃ চঃ মধ্যঃ ২২/৭৪)

"যিনি লৌকিক ও পারিবারিক প্রথাক্রমে পরম্পরাগত শ্রদ্ধার সঙ্গে অর্চা মূর্তিতে হরিকে পূজা করেন, অথচ শাস্ত্র অনুশীলনের দ্বারা শুদ্ধ ভক্তিতত্ত্ব অবগত না হওয়ায় হরিভক্তদের পূজা করেন না। তিনি—'প্রাকৃত ভক্ত' অর্থাৎ ভক্তিপর্ব আরম্ভ করেছেন মাত্র। তাকে 'ভক্তপ্রায়' বা 'বৈষ্ণবাভাস' বলা হয়।

এই শ্লোকটি শ্রীমদ্ভাগবত (১১/২/৪৭) থেকে উদ্ধৃত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন যে, যিনি ঈশ্বরের প্রতি প্রেম, ভক্তের প্রতি মৈত্রী, ভগবৎ-বিষয়ে অজ্ঞ মানুষদের প্রতি কৃপা এবং ভগবদ্বিদ্বেষী ও ভগবদ্ভক্ত-বিদ্বেষীকে উপেক্ষা করেন,

তিনি শুদ্ধ ভক্তরূপে 'মধ্যম ভক্তে' পরিগণিত হন। পরে ভজন করতে করতে যখন প্রতিটি জীবকে পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশরূপে দর্শন করে, সকলের মধ্যে এক নিবিড় সম্পর্ক অনুভব করেন, তখন তিনি উত্তম ভক্তে পরিণত হন।

প্রাকৃত অর্থাৎ জাগতিক আসক্তি সম্পন্ন ভক্ত উদ্দেশ্যবদ্ধ মানসিকতা নিয়ে শাস্ত্রাদি চর্চা করে না এবং শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির যথার্থ মান উপলব্ধির চেষ্টাও করে না। সেই জন্য প্রধান ভক্তদের যথাযথ সম্মান শ্রদ্ধা জানাতে সে শেখেনি। অবশ্য, তার গুরুদেবের কাছ থেকে শেখা কিংবা তার বাড়ির সকলের বিগ্রহসেবা দেখে দেখে শেখা—এভাবে বিধিবদ্ধ জীবন ধারা মেনে চলতে পারে। ভক্তিমার্গে তার উন্নতির চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও তাকে জাগতিক পর্যায়ে অবস্থিত বলেই বিবেচনা করতে হবে। বৈষ্ণব দর্শনতত্ত্বের কিছুটা আলোকপ্রাপ্ত এই ভক্তকে ভক্তপ্রায় বা ভক্তাভাস বলাও হয়। কিন্তু উন্নত স্তরের ভক্তকে সে সম্মান জানায় না, অন্যদের সমদর্শনে বিবেচনা করে না, তা হলে তাকে জাগতিক আসক্তি সম্পন্ন ভক্ত বলতে হয়।

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেম-মৈত্রী-কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ২২/৭৩)

যে-ভক্ত ঈশ্বরে প্রেম, ভক্তে মৈত্রী, অজ্ঞান ব্যক্তিদের কৃপা এবং বিদ্বেষীদের প্রতি উপেক্ষা করেন, তিনি—'মধ্যম ভক্ত'।

এই শ্লোকটি শ্রীমদ্ভাগবত (১১/২/৪৬) থেকে উদ্ধৃত। শ্রীনারদ মুনি বসুদেবের কাছে ভাগবত ধর্ম কীর্তন প্রসঙ্গে বিদেহরাজ নিমি ও নবযোগেন্দ্রের আলোচনায় এই উদ্ধৃতিটি দেন।

সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ২২/৭২)

"যিনি ভাগবতোত্তম, তিনি সর্বভূতে আত্মার ও আত্মা স্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই দেখেন এবং আত্মার আত্মারূপ শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত জীবকে দেখেন।" এই শ্লোকটি শ্রীমদ্ভাগবত (১১/২/৪৫) থেকে উদ্ধৃত।

ত্রিবিধ বৈষ্ণবসঙ্গ

কিভাবে অন্যান্য বৈষ্ণবদের সঙ্গলাভ করতে হয়, তা অনেকটাই ভক্তের পারমার্থিক প্রগতির স্তর বিশেষে নির্ভর করে থাকে। যথার্থ বৈষ্ণবজন কখনই নিজের উন্নতি সম্পর্কে বেশি উচ্চ ধারণা পোষণ করেন না কিংবা অন্য বৈষ্ণবের সম্পর্কে তুচ্ছতাচ্ছিল্যও করেন না।

কনিষ্ঠ অধিকারীদের সঙ্গ

যেহেতু কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্ত বলতে পারে না—কোন্ ভক্ত প্রবীণ আর কোন্‌জন নবীন, তাই কনিষ্ঠ ভক্ত সদা সর্বদাই গভীর বিশ্বাসে তার শ্রীগুরুদেবের আশ্রিত হয়ে থাকবে এবং তার সাধ্যমতো বিধিনিয়মাদি সব মেনে চলবে আর সমস্ত বৈষ্ণবজনের প্রতি কিভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে হয়, তা শ্রীগুরুদেবের কাছ হতেই সে শিখে নেবে। শ্রীগুরুদেবের কৃপাবলেই কনিষ্ঠ ভক্ত মধ্যম অধিকারীর পর্যায়ে ক্রমান্বয়ে উন্নীত হতে থাকবে।

মধ্যম অধিকারীদের সঙ্গ

মধ্যম পর্যায়ের ভক্তরা বিভিন্ন ধরনের ভক্তদের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে। তাই শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক (১১/২/৪৫) থেকে মধ্যম অধিকারী সাধন ভক্তির পথে তাদের যথাযথভাবে অগ্রণী করে তোলার পথ নির্দেশ পেতে পারে। ভক্তিমার্গে সামান্য অগ্রণী ভক্তদের প্রতি সে করুণা প্রদর্শন করে থাকে, তার সমপর্যায়ের ভক্তদের সাথে বন্ধুত্ব প্রদর্শন করে, আর অগ্রণী ভক্তদের প্রতি সর্বপ্রকার শ্রদ্ধা ও সেবা প্রদান করে থাকে। অভক্তদের সর্বদাই সে পরিহার করে চলে।

> *"শুদ্ধ ভক্তের উচিত গুরুদেব এবং আচার্যদের প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান প্রদান করে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করা। দীনজনদের প্রতি তাঁর কৃপা প্রদর্শন করা উচিত এবং সমতুল্য ব্যক্তিদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করা উচিত, কিন্তু তাঁর সমস্ত কার্যকলাপ ইন্দ্রিয় সংযম এবং বিধি-নিষেধ অনুসরণ করার মাধ্যমে সম্পাদন করা উচিত।* (ভাগবত ৩/২৯/১৭)

শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ লিখেছেন—

> *"শাস্ত্রে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, উন্নত স্তরের ভক্তের সহিষ্ণু হওয়া উচিত, যারা অজ্ঞান অথবা নির্বোধ, তাদের প্রতি পূর্ণ কৃপা প্রদর্শন করা উচিত। প্রচারক ভক্তের কর্তব্য—নির্বোধ সরল ব্যক্তিদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করে, তাদের ভগবদ্ভক্তির স্তরে উন্নীত করা। প্রতিটি জীবই তার স্বরূপে ভগবানের নিত্য দাস। তাই, ভগবদ্ভক্তের কর্তব্য—সকলের কৃষ্ণভাবনা জাগরিত করা। সেটিই তাঁর কৃপা। সতীর্থ ভক্তদের প্রতি তিনি মৈত্রীভাব পোষণ করেন। তাঁর কর্তব্য—প্রতিটি জীবকেই পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশরূপে দর্শন করা।...সাধু ব্যক্তি সর্বদাই সহনশীল এবং দয়ালু হন; তিনি সকলেরই বন্ধু, কারও প্রতি তিনি বৈরীভাবাপন্ন নন, এবং তিনি শান্ত।"* (ভাগবত ৪/১১/১৩ তাৎপর্য)।

এইভাবে মধ্যম অধিকারী ভক্ত আন্তরিক কিন্তু অল্প অগ্রণী ভক্তদের অবশ্যই সমীহ করবে এবং ভগবদ্ভক্তি সেবার বিষয়ে তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে

থাকবে। যারা সমশ্রেণীভুক্ত—অন্যান্য মধ্যম ভক্তদের ক্ষেত্রে—তাদের সঙ্গে পাশাপাশি থাকতে হবে, তাদের সঙ্গে প্রসাদ সেবন করতে হবে, তাদের সঙ্গে ভগবানের নাম জপ করতে হবে, এবং তাদের সঙ্গে কৃষ্ণ-উপলব্ধি বিনিময় করতে হবে। তাকে সদাসর্বদা স্পষ্টবাদী অথচ মৈত্রী ভাবাপন্ন এবং সশ্রদ্ধ হয়ে চলতে হবে।

প্রবীণ ভক্তদের সঙ্গলাভের সময়ে, মধ্যম ভক্ত অবশ্যই তাঁকে অতি শ্রদ্ধাসহকারে সর্বপ্রকার সেবা নিবেদন করবে, এবং তাঁকে যথাসাধ্য পূজা-অর্ঘ্য দিয়ে সন্তুষ্ট করবে। সব থেকে দরকারি হল—প্রবীণ ভক্তের সান্নিধ্যলাভের সময়ে ভক্তিমার্গের শ্রবণ অঙ্গ অভ্যাস অবশ্যই করতে হবে—অর্থাৎ তিনি যখন শ্রীমদ্ভাগবত থেকে প্রবচন প্রদান করবেন, তখন অতীব মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণের অভ্যাস আয়ত্ত করা চাই।

উপদেশামৃত (৫) এই বিষয়ে আরও বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছে—

যে-ভক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম জপ করেন (কনিষ্ঠ অধিকারী), তাঁকে মনের মাঝে শ্রদ্ধার আসন দিতে হয়, যে-ভক্ত দীক্ষা গ্রহণ করেছেন এবং বিগ্রহ-অর্চনা করে থাকেন (মধ্যম অধিকারী), তাঁর উদ্দেশ্যে বিনম্র প্রণতি নিবেদন করতে হয়, এবং যে শুদ্ধ ভক্ত অনন্য ভগবদ্ভক্তি সেবায় অগ্রণী হয়েছেন এবং যাঁর হৃদয় অন্যের নিন্দামন্দের প্রবণতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়েছে, তাঁর সান্নিধ্য নিয়ে মনে-প্রাণে তাঁকে সেবা করতে হয়।

উত্তম অধিকারীদের সঙ্গ

শুদ্ধ ভক্তরা যেহেতু সাধনভক্তি পর্যায় অতিক্রম করে গেছেন, তাঁদের পক্ষে শ্রদ্ধা প্রদর্শনের বিধিনিয়মাদি পালন করে চলার প্রয়োজন হয় না। তা সত্ত্বেও, শুদ্ধ ভক্তের স্বাভাবিক প্রকৃতিবশেই তিনি সকলকেই ভগবানের ভক্ত বলে মানেন, এবং তাই অন্তরের মাঝে সকলের জন্যই শ্রদ্ধাবোধ পোষণ করেন। বাস্তব জগতের প্রয়োজনে, তিনি হয়ত বাহ্যত ভক্ত এবং অভক্তদের মধ্যে পার্থক্য বোঝাতে চান।

বৈষ্ণব-সেবা

বৈষ্ণবগণের সেবা সম্পাদনার চারটি মূল পন্থা আছে—আপ্যায়ন অভ্যর্থনা, পাদপ্রক্ষালন তথা শ্রদ্ধা নিবেদন, বৈষ্ণবসঙ্গ লাভ তথা বাণী শ্রবণ, এবং যে-কোনও ভাবে তাঁর সহায়তার উদ্দেশ্যে সেবা নিবেদন। ভক্ত তাঁর দীক্ষাগুরুর উদ্দেশ্যে তথা অনুরূপ উত্তম বৈষ্ণব-ভক্তগণের উদ্দেশ্যে এই প্রকার সেবায় আত্মনিয়োগ করবেন, সেটাই বাঞ্ছনীয় কর্তব্য।

পারমার্থিক পর্যায়ে অধিষ্ঠিত বৈষ্ণবজন চিন্ময় জ্ঞানে সর্বোত্তম অগ্রণী হয়ে থাকেন, আর তাই, তাঁর বর্ণ, আশ্রম, বয়স, কিংবা অন্যান্য বহিরঙ্গ লক্ষণাদি নির্বিশেষে মান-মর্যাদা, অভ্যর্থনা আপ্যায়ন, সেবা সহযোগিতা, এবং পূজা অর্চনার ক্ষেত্রে তিনি সর্বাধিক যোগ্যতা অর্জন করে থাকেন। ভগবদ্ভক্তি সেবা চর্চার একটি অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ হল বৈষ্ণবসেবা, আর এই সেবাই সাধুসঙ্গ তথা ভক্তসঙ্গ লাভের কার্যকর উপাদান।

বৈষ্ণবগণের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বৈষ্ণবজনের সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন এবং তাঁদের প্রতি আমরা কেমন আচরণ প্রকাশ করব, সেই বিষয়ে বলেছেন—

"অতএব যাঁর মুখে এক কৃষ্ণ নাম।
সেই ত' বৈষ্ণব, করিহ তাঁহার সম্মান॥"

"যিনি হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করেন, তিনি বৈষ্ণব, সুতরাং তাকে সর্বতোভাবে সম্মান করা উচিত।"

শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর শ্রীউপদেশামৃত গ্রন্থে বলেছেন, কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত দীক্ষাস্তি চেৎ—অর্থাৎ, সদ্‌গুরুর কাছ থেকে দীক্ষা লাভ করে যে ব্যক্তি অপ্রাকৃত শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হয়ে মুখে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করেন, মধ্যম অধিকারী তাঁকে মনে মনে আদর করবেন—এটাই বিধি।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন, গৃহস্থদের বৈষ্ণব সেবা করা সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। সেই বৈষ্ণব দীক্ষিত না অদীক্ষিত, তা বিবেচনা করা তার বিষয় নয়। শ্রীবিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত অনেকে তত্ত্বজ্ঞানশূন্যতা বশত মায়াবাদ ইত্যাদি দোষে দূষিত থাকতে পারেন, কিন্তু নামাপরাধশূন্য কৃষ্ণনাম উচ্চারণকারী বৈষ্ণবের সেই সব দোষ থাকবার সম্ভাবনা নেই। মন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তি—বৈষ্ণবপ্রায়, কিন্তু যিনি নিরপরাধে একবার কৃষ্ণনাম করেছেন, তিনি সর্ব কনিষ্ঠ হলেও 'শুদ্ধ বৈষ্ণব'—গৃহস্থ বৈষ্ণব সেই রকম বৈষ্ণবকেই সেবা করবেন। (চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৫/১১১ তাৎপর্য)

বৈষ্ণবগণের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উপযোগিতা সম্পর্কে সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ বলেছেন—

"সাধারণ মানুষ সকলে অবশ্যই সদাসর্বদা শ্রদ্ধা সহকারে সাধুজনকে মান্য প্রদর্শন করবে। শাস্ত্রে অনুশাসন দেওয়া আছে যে, কোনও বৈষ্ণবজন কিংবা কোনও সন্ন্যাসীকে দেখলেও তৎক্ষণাৎ সেই পুণ্যবান

ব্যক্তির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করা উচিত। যদি কেউ এইভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে ভুলে যায়, তা হলে সেই দিনটিতে তার উপবাস পালন করা উচিত। এটা বৈদিক অনুশাসন। কোনও ভক্ত, কিংবা সাধুজনের পাদপদ্মে অপরাধ করার ত্রুটি থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে এইভাবে সকলকেই বিশেষভাবে যত্নবান হতে হয়।" (ভাগবত ৯/৯/৬ তাৎপর্য)*

সমস্ত বৈষ্ণবগণকেই, এমন কি সাধারণ বৈষ্ণবদেরও, শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা উচিত। অবশ্য, ভক্তের পারমার্থিক প্রগতি অনুযায়ী কম-বেশি বিশদ মাত্রায় শ্রদ্ধা প্রদর্শনের আয়োজন করা যেতে পারে। (পরবর্তী পর্যায়ে 'অতিথি-সেবা' পরিচ্ছেদটি দ্রষ্টব্য)। সুতরাং ন্যূনতম প্রগতির পর্যায়ভুক্ত বৈষ্ণবদের উদ্দেশ্যেও বিনম্র সম্ভাষণ নিবেদন করা কর্তব্য, তবে তাদের সঙ্গ পরিহার করে চলা যেতে পারে।

বৈষ্ণব মহাজন শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মহাশয় এই বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন এইভাবে—

বৈষ্ণব হওয়া সত্ত্বেও যদি কারও চরিত্র ভাল না হয়, তা হলে তার সঙ্গ বর্জন করা উচিত, যদিও একজন বৈষ্ণব বলে তাকে শ্রদ্ধা করা যেতে পারে। যিনি বিষ্ণুকে পরমেশ্বর ভগবান বলে স্বীকার করেন, তাঁকেই বৈষ্ণব বলে স্বীকার করা হয়, কিন্তু তা ছাড়াও আশা করা হয় যে, বৈষ্ণবের মধ্যে দেবতাদের সমস্ত সদ্‌গুণগুলি প্রকাশিত হবে। (ভাগবত ৩/২৯/১৬)

অন্যান্য ধরনের বৈষ্ণবদের উদ্দেশ্যে যথাযোগ্যভাবে অন্ততপক্ষে আন্তরিক শ্রদ্ধাবোধ নিবেদন করা এবং সখ্যতা প্রদর্শন করা অবশ্যই কর্তব্য :

---

* কখনও-বা আমরা কোনও বৈষ্ণবকে আঙ্গিকভাবে প্রণতি জানাতে নিরস্ত হতেও পারি যেহেতু তখন প্রণতি জানালে হয়ত তাঁর অস্বস্তি জাগতে পারত। *বৃহন্নারদীয় পুরাণে* অনুশাসন রয়েছে, কোনও বৈষ্ণব স্নান করার সময়ে, যজ্ঞের কাঠ সংগ্রহের সময়ে, পুষ্পচয়নের সময়ে, জল তোলা কিংবা প্রসাদ সেবনের সময়ে, তাঁকে প্রণিপাত জ্ঞাপন করা নিষিদ্ধ। যদি কেউ অশুদ্ধ অবস্থায় থাকে—যেমন, খাদ্য গ্রহণ, স্নান কিংবা জুতা পরা, অথবা মাথায় কিছু ঢাকা দেওয়া থাকে—তা হলে তখন আঙ্গিকভাবে প্রণতি নিবেদন করা অথবা গ্রহণ করা সমীচীন নয়। অবশ্য, মানসভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন নিষিদ্ধ নয়, সেক্ষেত্রে পরে যখনই সুযোগ পাওয়া যায়, তখনই আঙ্গিক প্রণিপাত জানানো যায়। বৈষ্ণব অথবা অবৈষ্ণব, যে কোনও বর্ষীয়ান ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে এই নিয়মাবলী প্রযোজ্য। আরও একটি কথা হল, বরিষ্ঠ ব্যক্তিকে প্রণতি জ্ঞাপনের দুটি সময় আছে—প্রথমে যখনই বরিষ্ঠ ব্যক্তিকে আমরা দেখতে পাই, আবার যখন তিনি আমাদের দেখতে পান।

যখনই দু'জন বৈষ্ণব পরস্পরের দর্শন লাভ করবেন, তাঁরা অবশ্যই অকপটে প্রণিপাত নিবেদন করবেন, কারণ উভয়কেই মনে রাখতে হবে যে, শ্রীবিষ্ণু তাঁদের প্রত্যেকের মাঝেই বিরাজিত রয়েছেন। (তেজোদ্রবিণ পঞ্চরাত্র)

যখন কোন বিদ্বান ব্যক্তি অভ্যর্থনা জানাতে দাঁড়িয়ে ওঠেন কিংবা প্রণিপাত নিবেদন করেন, তখন তিনি প্রত্যেকের অন্তরে অধিষ্ঠিত পরমাত্মাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে থাকেন। সুতরাং দেখা যায় বৈষ্ণবদের মধ্যে যখনই কোনও শিষ্যও তাঁর দীক্ষাগুরুর কাছে প্রণিপাত নিবেদন করে, তৎক্ষণাৎ দীক্ষাগুরুও প্রত্যভিবাদন স্বীকার করে থাকেন, কারণ পরস্পরের প্রতি সেই অভিবাদন দেহের প্রতি নিবেদিত হয় না, বরং পরমাত্মার উদ্দেশ্যেই করা হয়ে থাকে। (ভাগবত ৪/৩/২২ তাৎপর্য) ভগবদ্ভক্তকে দর্শন করা সত্ত্বেও তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে যথাযথভাবে সম্মান প্রদর্শন করতে যে ব্যর্থ হয়, শ্রীভগবান বারো বৎসর যাবৎ তার নিবেদিত কোনও পূজা গ্রহণ করবেন না। (স্কন্দপুরাণ)

ভগবদ্ভক্ত কারও কাছ থেকে সম্মান দাবি করেন না, কিন্তু তিনি যেখানেই যান, সারা জগতের সর্বত্রই প্রত্যেকে তাঁকে পূর্ণ মর্যাদায় সম্মান করে থাকেন। (ভাগবত ৪/৯/৪৭)

দূরাগত ভক্তকে দর্শন করা মাত্র তাঁর কাছে গিয়ে, তাঁকে আলিঙ্গন জানিয়ে, সকলেই সহধর্মী বৈষ্ণবদের সাথে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেন এবং তাঁকে আরাম প্রদান করেন। (বৃহন্নারদীয় পুরাণ)

ভগবদ্ভক্তকে বিষম বিপদাপন্ন এবং উদ্বেগাকুল দেখেও তাঁকে সাহায্য সহযোগিতা করতে যে ব্যর্থ হয়, সে শ্রীভগবানের অসন্তোষ ভাজন হয়। (শ্রীহরিভক্তিবিলাস)

স্কন্দ পুরাণে গৃহস্থদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে—ভক্তরা তাদের বাড়িতে এসে যেন তুচ্ছতাচ্ছিল্য না করা হয়—

কোনও বৈষ্ণবগণ গৃহস্থের বাড়িতে এলে যদি তাঁকে যথাযথভাবে অভ্যর্থনা জানানো না হয়, তা হলে সেই গৃহ শ্মশানের মতো হয়ে যায়—সেখানে আগমনে পিতৃপুরুষেরা দ্বিধাবোধ করেন। দূরাগত কোনও বৈষ্ণবকে সাধ্যমতো অভ্যর্থনা জানাতে যে ব্যর্থ হয়, তার চেয়ে পাপাত্মা আর কেউ হয় না।

বৈষ্ণবদের কিভাবে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করতে হয়, তার উত্তম দৃষ্টান্ত দিয়েছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ—

শ্রীকৃষ্ণ হলেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান, যাঁকে শ্রীনারদ মুনিও আরাধনা করে থাকেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও, যখনই তিনি লক্ষ্য করলেন যে, শ্রীনারদ মুনি প্রাসাদে প্রবেশ করছেন, তখনই শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীর শয্যা থেকে নেমে এলেন এবং তাঁকে সম্মানপূর্বক অভ্যর্থনা জানাতে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত জগতের শিক্ষাদাতা, এবং শ্রীনারদ মুনির মতো সাধুজনকে কিভাবে শ্রদ্ধা জানাতে হয়, তা সকলকে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি মস্তক অবনত করে ভূমিতে তাঁর শিরস্ত্রাণটি স্পর্শ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ শুধুমাত্র অবনত মস্তকে শ্রদ্ধা জানালেন, তাই নয়, তিনি শ্রীনারদ মুনির পাদস্পর্শও করলেন এবং করজোড়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিজ আসনে তাঁকে উপবেশনের অনুরোধ জানালেন।...যখন তিনি শ্রীনারদ মুনির পাদপ্রক্ষালন করলেন এবং সেই জল তাঁর নিজ মস্তকে ধারণ করলেন, তাতে শ্রীনারদ মুনি আপত্তি জানালেন না, কারণ তিনি উত্তমরূপেই অবহিত ছিলেন যে, শ্রীভগবান যা কিছু লীলা প্রদর্শন করছেন, সেই সব কিছুর মাধ্যমেই কিভাবে সাধুজনদের শ্রদ্ধা নিবেদন করতে হয়, তা তিনি সকলকে শেখাতে চাইছেন। (লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থের 'দেবর্ষি নারদের দ্বারকা পরিদর্শন' অধ্যায়)*

বৈষ্ণবগণের অভ্যর্থনার পদ্ধতি

লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থে আমরা দেখতে পাই ভক্তদের অভ্যর্থনা জানাতে হয় কিভাবে, তার নিম্নরূপ বর্ণনা—

মুনি-ঋষিরা উপস্থিত হওয়া মাত্রই রাজন্যবর্গ তাঁদের আসন ত্যাগ করে, অবনতমস্তকে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন। এরপর আসন দান করে ও মুনি-ঋষিদের পাদপ্রক্ষালন করে তাঁদের যথাযথভাবে স্বাগত জানান হল। কৃষ্ণ ও বলরামের নেতৃত্বে সকল রাজারা সুগন্ধি ফুলমালা, চন্দন ও উপাদেয় ফলদ্বারা বিধি অনুসারে মুনি-ঋষিদের পূজা করলেন। (লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থের 'বসুদেব কর্তৃক যজ্ঞানুষ্ঠান' অধ্যায়)

---

* লোকে প্রশ্ন করতে পারে, "কেউ আমায় পা ছুঁতে চাইলে, আমি কিভাবে তার প্রত্যুত্তর দেব?" একটি চিঠিতে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এই ধরনের বহু প্রচলিত প্রশ্নের উত্তরে লিখেছিলেন, "কাউকে পা ছুঁতে দিও না—এটা ভাল আচরণ—তবে কেউ যদি তোমার চরণ স্পর্শ করতেই চায় এবং তা এড়িয়ে চলে যাওয়ার কোনও উপায় না থাকে, তা হলে শুধুমাত্র পূর্বতন আচার্যবর্গ ও গুরুবর্গের স্মরণ করা যেতে পারে এবং তাদের মনোবাঞ্ছা স্বীকার করে চরণস্পর্শ করতে দিয়ে করজোড়ে প্রতিনমস্কার জানাতে হয়। সেটাই বৈষ্ণব শিষ্টাচার।" (*শ্রীল প্রভুপাদের লেখা চিঠি, এবং ৪ এপ্রিল ১৯৭০*)

বষীয়ান বৈষ্ণবদের, সন্ন্যাসীদের, এবং বিশেষ করে নিজের দীক্ষাগুরুর অভ্যর্থনায় সবিশেষ মনোযোগী হওয়া উচিত।* বৈষ্ণব অতিথি পৌঁছনোর আগেই, তাঁর বাসস্থান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে সাজাতে হয় এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র (যেমন, পঞ্চপাত্র বা আচমন বাটি, দর্পণ, তিলক, তোয়ালে, পানীয় জল, এবং পরিচ্ছন্ন শয্যা) সাজিয়ে রাখতে হয়। সম্ভব হলে, শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী রাখা চলে। তা ছাড়া কিছু ধূপ, ধূপদানি এবং দেশলাইও গুছিয়ে রাখা ভাল। অতিথির বাসস্থানটি ফুলদানি, ভক্তিমূলক চিত্রাবলী এবং অনুরূপ সামগ্রীতে সাজানো যেতে পারে।

কোনও বৈষ্ণব অতিথি উপস্থিত হলে, বাইরে গিয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানানো উচিত—সম্ভব হলে কীর্তনাদি, মাল্য চন্দনাদি দিলেও ভাল (বাইরে যদি খুব শীতের ঠাণ্ডা না থাকে)। অতিথিকে প্রণিপাত নিবেদন করে, মিষ্টবাক্যালাপ করতে হয় এবং তাঁকে আসন গ্রহণের জন্যে নিয়ে আসতে হয়, সেখানে তাঁর পাদপ্রক্ষালন করানো যেতে পারে। যদি দীক্ষাগুরুকে অভ্যর্থনা জানাতে হয়, তা হলে (তাঁর অনুমতি সাপেক্ষ) এই সময়ে তাঁকে আরাধনা করা চলে আরতি, পাদপদ্মে পুষ্পার্ঘ্য এবং দণ্ডবৎ প্রণিপাত নিবেদনের মাধ্যমে। অতিথিকে অনতিবিলম্বে প্রসাদ নিবেদনের জন্য প্রস্তুতিও প্রয়োজন, কিন্তু তার আগে প্রথমেই খোঁজ নিয়ে জানতে হবে যে, অতিথি প্রসাদ গ্রহণের আগে প্রথম স্নান বা বিশ্রাম করতে ইচ্ছা করছেন কিনা। যখন উপযুক্ত মনে হবে, তখন অতিথিকে মন্দিরের তথা গৃহস্থ বাড়ির অন্যান্য বাসিন্দাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া উচিত এবং জেনে নিতে হবে, কোনও বিশেষ সেবা সহযোগিতার প্রয়োজন তাঁর আছে কিনা।

অতিথিকে জিজ্ঞাসা করা যেতেও পারে কতক্ষণ তিনি থাকতে ইচ্ছা করেন, তবে এই বিষয়ে যত্নবান হতে হবে যেন অতিথি মনে না করেন যে, তাঁর বিদায়ক্ষণের জন্য গৃহস্থ উদ্গ্রীব হয়ে পড়েছে। বরং মাননীয় অতিথিকে উৎসাহ দেওয়া উচিত যেন তিনি যতদিন চান, ততদিন থাকতে ইচ্ছা করেন। বৈষ্ণব পর্যটকদের থাকতে দেওয়ার নীতি সম্পর্কে প্রত্যেক মন্দির কর্তৃপক্ষ অথবা বৈষ্ণব গোষ্ঠীদের মধ্যে মত পার্থক্য থাকতেই পারে—এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত

---

* নিজের গুরুদেবকে অভ্যর্থনা জানাতে কিংবা সেবা নিবেদন করতে গিয়ে যেন গুরুভ্রাতা ও ভগিনীদের অবহেলা না হয়। আর দীক্ষাগুরুর দিক থেকেও তাঁর শিষ্যবর্গকে শিক্ষা প্রদান করা উচিত যাতে বৈষ্ণবদের, বিশেষ করে নিজের গুরুভ্রাতা ও গুরুভগিনীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও সেবা পরিচর্যার কোনও ত্রুটি না হয়। শ্রীল জীব গোস্বামী তাঁর ভক্তিসন্দর্ভ-টীকা (২১৪) প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করেছেন, "শ্রীগুরুদেবের আদেশক্রমে এবং তাঁর সেবাকার্যের বিঘ্ন না ঘটিয়ে শিষ্য অন্যান্য সম্মানিত বৈষ্ণবদের সেবা সম্পাদন করতে পারলে সেটি শুভ লক্ষণ। এই বিধান অনুসরণ না করলে তাকে অপরাধী হতে হয়।"

নির্ভর করে কতদিন যাবৎ পর্যটন করবেন, বৈষ্ণবজনের প্রধানত, গোষ্ঠীগত কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁর পরিকল্পনা, এবং আরও অন্যান্য অনেক বিষয় নিয়ে বিবেচনা কোনও এক যথাযোগ্য সময়ে, গোষ্ঠীকর্তৃপক্ষ বিনম্রভাবে পর্যটক বৈষ্ণবের সাথে স্থানীয় কর্মনীতি সম্পর্কে আলোচনা করে নেবেন যাতে কোনও বিভ্রান্তি সৃষ্টি না হতে পারে এবং তা থেকে বৈষ্ণব অপরাধ না জাগে।

অতিথি-সেবা

শ্রীমদ্ভাগবতের ৯/২১ অধ্যায়ের সারমর্ম এবং ১০ থেকে ১৩ সংখ্যক শ্লোকগুলির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে কিভাবে যথাযথ মর্যাদায় অতিথিদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করতে হয়—

একদা রাজা রন্তিদেব আটচল্লিশ দিন একাদিক্রমে সম্পূর্ণ নিরম্বু উপবাসে অতিবাহিত করবার পরে, তাঁর সামনে ঘৃতাদি সহ বহুবিধ উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী নিয়ে আসা হল, কিন্তু তিনি সেই সব আহার্য গ্রহণে উদ্যোগী হওয়া মাত্রই এক ব্রাহ্মণ সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। অতএব রন্তিদেব আহার গ্রহণ করলেন না, বরং তৎক্ষণাৎ সেই আহার্যের একাংশ সেই ব্রাহ্মণকে দিয়ে দিলেন। যখন ব্রাহ্মণ চলে গেলেন, এবং রন্তিদেব বাকি আহার্য সামগ্রী ভোজনে বসলেন, অমনি এক শূদ্র এসে উপস্থিত। তাই রন্তিদেব সেই বাকি আহার্য শূদ্রটি এবং নিজের মধ্যে ভাগ করে নিলেন। আবার, যখনই সেই অবশিষ্ট খাদ্যসামগ্রী খেতে উদ্যোগী হলেন, তখন আর এক অতিথি এসে হাজির হলেন। সুতরাং রন্তিদেব বাকি খাদ্যসামগ্রীও সেই নবাগত অতিথিকে অর্পণ করলেন।

তার পরে, শুধুমাত্র খাবার জলটুকু অবশিষ্ট রইল এবং তাও কেবলমাত্র একজন মানুষের তৃষ্ণা নিবারণের পক্ষে যথেষ্ট ছিল, কিন্তু রাজা যখন সেটুকুও পান করতে উদ্যত হলেন, অমনি এক চণ্ডাল উপস্থিত হয়ে বলল, "রাজা, আমি নীচুজাতের মানুষ হলেও আমাকে একটু জল খেতে দিন।" হতভাগ্য ক্লান্ত চণ্ডালটির করুণ কথাগুলি শুনে মহারাজ রন্তিদেব তাকে অমৃতময় বাক্যে বললেন, "আমি অষ্টাঙ্গযোগে সিদ্ধিলাভের জন্য পরমেশ্বর ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাই না, জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত থেকে মুক্তির অভিলাষও করি না। আমি শুধুমাত্র সমস্ত জীবকুলের মাঝে বেঁচে থাকতে চাই আর তাদের সব দুঃখ-দুর্দশা সমভাবে ভোগ করতে চাই যাতে তারা মুক্তিলাভ করতে পারে। এই হতভাগ্য চণ্ডালের জীবনরক্ষার জন্য আমার জলটুকু উৎসর্গ করে তার জীবন সংগ্রামে আমি সহায়তা

করতে পেরেছি বলেই আমার সকল ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি, কম্পন, হতাশা, বিষাদ, দুঃখ আর মায়া থেকে মুক্তি পেয়েছি।"

শ্রীভগবানের মন্দির—প্রকাশ্য স্থানেই হোক বা বাড়িতেই হোক, সেখানে যেন যথা সম্ভব দর্শনার্থীরা মন্দিরের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘে অতিথি অভ্যর্থনা বেশ গুরুত্বপূর্ণ সেবা, কারণ এই সংঘটি ধর্ম প্রচারমূলক সংস্থা। ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য শ্রীল প্রভুপাদের অনুগামী রূপে আমাদের প্রত্যেকেরই বিবেচনা করা উচিত যে, মন্দিরে আগত যে কোনও অতিথিই তাঁর নিজের অতিথি। কোনও অতিথিকে যথাযথভাবে অভ্যর্থনা করতে পারলে একবারের জন্য আসা মন্দির-দর্শনার্থী আর নিয়মিত দর্শনার্থীদের মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। দর্শনার্থীদের অভ্যর্থনা তথা সেবা যথাযথ হলে তারা পরিণামে শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত হয়ে ওঠে।

সংস্কৃত 'অতিথি' শব্দটির অর্থ হল ন (নাই) তিথি (নির্ধারিত দিন) যাহার। সাধারণত অতিথিরা কোনও স্থানে এক দিনের অধিক থাকে না এবং তাদের আগমনও নির্ধারিত দিনে হয় না। এই রকমের অনির্ধারিত অর্থাৎ অপ্রত্যাশিত আগন্তুক তথা অতিথিকে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধিরূপে বিবেচনা করা হয়ে থাকে—যেহেতু তাঁর আগমন হয় অঘোষিত, তাই মনে করা হয় যে, শ্রীভগবান যেন অতিথিরূপে তাঁর ভক্তকে যাচাই করতে চান এবং দেখতে চান—যে কোনও পরিস্থিতিতে ভক্ত তাঁর সেবা পরিচর্যা করতে কতখানি প্রস্তুত। এই শাস্ত্রীয় বিবেচনা অনুসারে, যে কোনও অনাহূত অপ্রত্যাশিত অতিথিকে পরিপূর্ণ সেবা পরিচর্যা সহকারে সন্তুষ্ট করার জন্য সচেষ্ট হতে হয়।

এই কারণেই সাধারণ মানুষদের মধ্যে থেকে অপ্রত্যাশিত কোনও মানুষ অতিথিরূপে বাড়িতে এলে, বা আমন্ত্রিত অতিথিরা এলে, ইসকনের আজীবন সদস্যদের মধ্যে কেউ, বিশিষ্ট কোনও ব্যক্তি, কোনও বৈষ্ণবভক্ত, অথবা বৈষ্ণবজনের কোনও আত্মীয় পরিজনের আগমন ঘটলে—তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে এমনভাবে সদাচরণ করা উচিত যাতে তাঁরা সন্তোষ লাভ করেন এবং আবার ফিরে ফিরে আসতে চান। এই সম্পর্কে একটি সহজবোধ নীতি হল এই যে, আমরা কোথাও অতিথি হলে যে ধরনের পরিচর্যা আশা করে থাকি, ঠিক তেমনভাবেই যেন আমাদের কাছে অতিথি এলে তাঁর প্রীতিবিধানের যথাসাধ্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা করতে পারি।

অবৈষ্ণব জনকে কিভাবে অভ্যর্থনা সমাদর জানাতে হয়, সেই বিষয়ে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ লিখেছেন, "যদি কোনও কর্মীজন তোমার বন্ধু হয়ে আসেন, তা হলে তাঁকে কেবল 'হরেকৃষ্ণ' সম্বোধনে আপ্যায়িত করা উচিত এবং করজোড়ে মাথায় হাত ঠেকিয়ে তাঁকে প্রণাম

জানানো ভাল। যদি কোনও কর্মীজন বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মীয়স্বজন হন, তা হলে হরেকৃষ্ণ মন্ত্রোচ্চারণ করে তাঁর সামনে আভূমি প্রণিপাত জানানো কর্তব্য। আমাদের সংঘের মধ্যে শ্রদ্ধা আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে এই সদাচার প্রতিপালিত হওয়াই বিধেয়।" (১৬ জুন ১৯৬৯ তাং শ্রীল প্রভুপাদের চিঠি থেকে উদ্ধৃত)

অতিথিদের কিভাবে সেবা পরিচর্যা করতে হয়, তা প্রত্যেক ভক্তেরই শেখা উচিত। তবে মন্দিরের যে সব ভক্তবৃন্দ নিয়মিতভাবে শ্রীবিগ্রহ অর্চন করে থাকেন, তাঁদের তো এই বিষয়ে সমধিক বিশেষ নিপুণতা আয়ত্ত করতেই হয়, কারণ মন্দিরের অধ্যক্ষেরই সাক্ষাৎ প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন তাঁরা। মন্দির-অধিবাসীরা যদি কোনও অতিথিকে অবহেলা প্রদর্শন করেন, তা হলে শ্রীবিগ্রহ অর্চনের সর্বোত্তম উচ্চ মানের ঐশ্বর্য মণ্ডিত আয়োজনও সেই অতিথিকে আকৃষ্ট করতে বিফল হবে।

যদিও কোনও বৈষ্ণবজন অপ্রত্যাশিত অতিথি হয়ে আসতে পারেন, তবুও অতিথি-সেবার কার্যক্রমের মধ্যে আমরা বৈষ্ণবদের অন্তর্ভুক্ত করতে চাইব না—বরং তাঁদের বৈষ্ণব-সেবার বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন করতেই ইচ্ছা করব, কারণ বৈষ্ণব-জন অনাহুত অতিথি হোন বা না-ই হোন, তিনি বিশেষ অভ্যর্থনার জন্য অবশ্যই সর্বদা বিবেচিত হবেন। তাই অতিথি-সেবা বলতে বৈষ্ণবজন ছাড়া অন্যান্য অতিথিদের অভ্যর্থনা-আপ্যায়ন করাই বোঝাবে, যদিও অনাহুত অপ্রত্যাশিত অতিথিদের ক্ষেত্রে আপ্যায়নের যে রীতি প্রতিপালিত হয়ে থাকে, তা অবশ্যই অনাহুত যে কোনও বৈষ্ণবজনের অভ্যর্থনার ক্ষেত্রেও প্রতিপালনীয় বটে।

অতিথিদের যথার্থ অভ্যর্থনা করা গৃহস্থের বিশেষ কর্তব্য। যদি কোনও গৃহস্থ অনাহুত অপ্রত্যাশিত অতিথিকে সমাদরে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন না করেন, তা হলে সেই অতিথি যিনিই হোন, তাতে গৃহস্থের পাপ হয়। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৮/১৬/৭) বলা হয়েছে, "যে সমস্ত গৃহ থেকে অনাহুত অপ্রত্যাশিত অতিথিরা একটু জল গ্রহণ না করেও চলে যান, সেই সব গৃহ মাঠের গর্তগহ্বরে শিয়ালের বাসস্থানেরই মতো।" আর *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে* (মধ্যলীলা ৩/৪১, তাৎপর্য) শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ লিখেছেন, "বৈদিক প্রথানুসারে গৃহস্থের গৃহে অন্তত একজন অতিথি সব সময়েই আসেন। আমার শৈশবে বাস্তবিকই আমি দেখেছি যে, আমার পিতৃদেব প্রতিদিনই অন্তত্পক্ষে জনাচারেক অতিথিসেবা করতেন, আর তখনকার দিনে আমার পিতার রোজগারও তেমন বেশি কিছু ছিল না। তা সত্ত্বেও প্রতিদিন অন্তত চার জনকে প্রসাদ সেবনের জন্য কোনও অসুবিধা হত না।"

অবশ্য শুধুমাত্র গৃহস্থেরাই নন, প্রত্যেক আশ্রমভুক্ত এবং বর্ণভুক্ত সকলেরই যথাযথভাবে অতিথি সেবা অভ্যর্থনা করা উচিত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন—

ভোজন সমাপ্ত হৈল, কৈল আচমন।
সবারে পরাইল প্রভু মাল্য-চন্দন ॥

"ভোজন সমাপ্ত হলে, সকলে আচমন করলেন, এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন সকলকে মালা-চন্দন পরালেন।" (*শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা,* ১১/২১০)

অতিথিদের কতখানি বিশদভাবে সেবা-অভ্যর্থনা করতে পারা যায়, গৃহস্থের সামর্থ্য অনুসারে তার মধ্যে তারতম্য হতে পারে—

"ভারতবর্ষে গৃহস্থের বাড়িতে যদি হঠাৎ কোনও অতিথি আসেন এবং তাঁকে যদি আহার্য সামগ্রী না দেওয়া যায়, তা হলে অন্ততপক্ষে তাঁকে এক গ্লাস জলও দিতে হয়। জলও যদি না থাকে, তা হলে অন্তত বসবার আসন বা মাদুরও পেতে দেওয়া যায়। আর যদি মাদুর বা আসনও না থাকে, তা হলে অন্তত ভূমি পরিষ্কার করে, সেখানে অতিথিকে বসতে অনুরোধ করা যায়। ধরা যাক, কোনও গৃহস্থ যদি তাও না করতে পারেন, তা হলে অন্তত হাত জোড় করে 'স্বাগতম্' বলে অতিথিকে অভিনন্দন জানাতেও পারেন। আর তা-ও যদি করতে তিনি না পারেন তো তার নিজের দারিদ্র্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে অশ্রু বিসর্জন করাও যায় এবং স্ত্রী-পুত্র ও পরিবারের সকল সদস্যদের নিয়ে তাঁকে প্রণতি নিবেদন করা যায়।" (শ্রীমদ্ভাগবত, ৪/২২/১০ তাৎপর্য)

অতিথিদের সেবা-অভ্যর্থনার মূল বিষয়গুলি হল—তাঁদের যথাযথ শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং প্রয়োজনীয় আদর আপ্যায়ন, আহার্য এবং জল পানের ব্যবস্থা, বসবার জায়গা দেওয়া, নম্রভাবে কথা বলা, অতিথির আরাম বিধানের জন্য যে কোনও সেবার (যেমন, স্নানের) আয়োজন করে দেওয়া, এবং বিশ্রামের জায়গা করে দেওয়া। যখন অতিথি প্রথমে উপস্থিত হন, তখন বাইরে বেরিয়ে এসে তাঁর সঙ্গে নিজে সাক্ষাৎ করতে হয়, এবং অতিথি যখন বিদায় গ্রহণ করেন, তখন তাঁর সঙ্গে কিছুটা এগিয়ে যেতে হয়, অন্তত বাড়ির বা উঠানের বাইরে পর্যন্ত।

অতিথিদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

কখনও কোনও শত্রুও যদি অতিথিরূপে গৃহস্থের বাড়িতে আসে, তবে তার সাথেও শ্রদ্ধা সহকারে আচরণ করতে হয়—

"বৈদিক প্রথা অনুসারে, গৃহে যদি শত্রুও আসে, তা হলে তাকেও সমস্ত সম্মান সহকারে অভ্যর্থনা করার নির্দেশ দেওয়া আছে। তার সঙ্গে

এমনভাবে আচরণ করা হত যে, তাকে বুঝতে দেওয়া হত না যে, সে তার শত্রুর গৃহে এসেছে।" (শ্রীমদ্ভাগবত ১/১৮/২৭ তাৎপর্য)

অতিথিকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে হয় তাঁর মর্যাদা অনুসারে, ধন-সম্পদ, বয়স এবং আত্মীয় হলে তাঁর সম্পর্ক-সম্বন্ধ অনুসারে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণ অনুসারে, এবং শিক্ষাগুরু, দীক্ষাগুরু প্রভৃতির স্থানের পর্যায় অনুসারে।

শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এই বিষয়ে আমাদের উপদেশ দিয়েছেন, বিশেষত কৃষ্ণভাবনায় বিরূপ কোনও আত্মীয়স্বজনের সঙ্গেও কিভাবে আতিথেয়তা রক্ষা করে চলতে হয়—

"পিতা এবং মাতা হলে, সামাজিক রীতি অনুযায়ী তাঁদের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা উচিত, কিন্তু তাঁদের দেওয়া ভগবদ্-বিদ্বেষী কোনও নির্দেশ স্বীকার করা চলতে পারে না। সব চেয়ে উত্তম পন্থা হল—ভুল বোঝাবুঝি পরিহারের উদ্দেশ্যে, তাঁদের উপদেশ-নির্দেশাদি সম্পর্কে ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক কোনও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত না করে নীরব হয়ে থাকা।" (২৯ মার্চ ১৯৬৮ তাং শ্রীল প্রভুপাদের চিঠি থেকে উদ্ধৃত)

"আমাকে যেভাবে শ্রদ্ধা করো, তোমাদের পিতাকেও সেইভাবে শ্রদ্ধা জানাবে, এমন কি কখনও যদি তোমার সাথে দুর্ব্যবহার করাও হয়, তা সত্ত্বেও সহ্য করা উচিত...শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের দৃষ্টান্ত তোমাদের মেনে চলা কর্তব্য...তোমার পিতার আসুরিক নীতি-বিধানাদিতে তোমরা কখনই সম্মত হবে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও সুশীল সন্তানের মতোই তোমরা বিশ্বস্তভাবে তাঁর সেবা করতে চেষ্টা করবে।" (২২ নভেম্বর ১৯৬৮ তাং শ্রীল প্রভুপাদের চিঠি থেকে)

পঞ্চরাত্রিক-বিধি অনুসারে, শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা যেতে পারে বিবিধ উপায়ে—(১) কোনও বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির আগমনে নিজ আসন পরিত্যাগ করে উঠে দাঁড়ানো (প্রত্যুত্থান), (২) নিজের নাম উচ্চারণ করে পরিচয় প্রদান ও প্রণাম জানানো, (অভিবাদন), (৩) আভূমি প্রণত হয়ে পঞ্চাঙ্গ অথবা সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত নিবেদনের মাধ্যমে এবং বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির পাদমূলে আড়াআড়িভাবে হাত রেখে (অর্থাৎ ডান হাত দিয়ে ডান পা, বাঁ হাত দিয়ে বাঁ পা স্পর্শ করে) প্রণাম বা নমস্কার জানানো, (৪) সরল পদ্ধতি কিংবা বিশদভাবে অর্চন নিবেদন (পূজা)* এবং (৫) বস্ত্র, স্বর্ণাভরণ, অর্থ, বা শস্যাদি উপহার নিবেদন (দান)।

---

* অতিথিকে দুটি উপকরণ দিয়ে অর্চন করা যেতে পারে—যেমন চন্দন এবং পুষ্পাদি বা পুষ্পমাল্য, কিংবা আসন নিবেদন আর পাদ্যার্ঘ্য জল নিবেদন—অথবা পঞ্চ উপচার, দশ উপচার, বা ষোড়শ উপচারেও অর্চন করা চলতে পারে।

সাধারণত নিজের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে, নিজের পরিচয় প্রদান করে, এবং প্রণাম নিবেদন করে বয়োজ্যেষ্ঠদের, পিতা-মাতাদের এবং শিক্ষকদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা উচিত। বিবাহ-অনুষ্ঠানাদি কিংবা যজ্ঞানুষ্ঠানের মতো বিশেষ সময়ে পূজা-অর্চনা এবং উপহার সামগ্রী নিবেদন কেবলমাত্র দীক্ষাগুরুর জন্যই সংরক্ষিত থাকে।

অতিথিরূপে যথাযথ আচরণ

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে (মধ্যলীলা ৮/৪৯ তাৎপর্য) শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ নির্বিচারে নিমন্ত্রণাদি স্বীকারের বিপক্ষে (বিশেষত যদি সেখানে আহার্য গ্রহণের ব্যাপার থাকে), আমাদের সতর্ক করে দিয়ে লিখেছেন—

> *"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এক বেদানুগ ব্রাহ্মণকে বৈষ্ণব জেনে, তাঁর নিমন্ত্রণ স্বীকার করেছিলেন। কেউ যদি সাত্ত্বিক আচরণপরায়ণ ব্রাহ্মণ হন, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামী ভগবদ্ভক্ত না হন, তা হলে তাঁর নিমন্ত্রণ স্বীকার করা উচিত নয়। বর্তমানে মানুষ এত অধঃপতিত হয়ে গেছে যে, তারা বৈদিক-বিধিরও অনুসরণ করে না, বৈষ্ণবোচিত আচরণ করা তো দূরে থাকুক—তারা তাদের ইচ্ছামতো অখাদ্য-কুখাদ্য খায়, তাই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সদস্যদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ বিষয়ে খুব সাবধান হওয়া উচিত।"*

আমন্ত্রণকারী বৈষ্ণব হোন, কিংবা বৈষ্ণব অনুরাগী হোন, বৈষ্ণব-অতিথিকে সেখানে আদর্শ সদাচার প্রদর্শন করতেই হয়। এখানে সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য কয়েকটি সদাচারমূলক বিষয় উল্লেখ করা হল, যা বৈষ্ণব-অতিথিদের পক্ষে অবশ্য পালনীয়—

১) আমন্ত্রিত অতিথি হয়ে কোথাও গেলে, সেখানে আমন্ত্রিত বিষয়ের অতিরিক্ত সময় থাকা অনুচিত। যেমন, আহার্যগ্রহণের জন্য আমন্ত্রিত হলে, আহারাদির পরে পরিপাক কার্যে সহায়তার জন্য অল্প কিছুক্ষণ সেখানে বিশ্রাম গ্রহণ করা চলতে পারে, কিন্তু কোনও প্রকার অনুরোধ না করলে অযথা ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেখানে থেকে কথাবার্তা বলে নিমন্ত্রণকর্তাকে বিব্রত করে রাখা অসমীচীন।

২) নিজের নিমন্ত্রণের খাতিরে নিজ-পরিচিত অন্য অতিথিদের নিয়ে যাওয়া অনুচিত। যদি অন্যান্য অতিথিদের আমন্ত্রণ জানাতে ইচ্ছা হয়, তা হলে নিমন্ত্রণকর্তাকে বলে অনুমতি নেওয়া উচিত।

৩) যদি টেলিফোন, ফ্যাক্স যন্ত্র, কিংবা অন্য কোনও ধরনের সুবিধা ব্যবহার করবার অনুমতি পাওয়া যায়, তবে তার জন্য নির্ধারিত ব্যয়বাবদ অর্থ দিতে আগ্রহ প্রকাশ করা উচিত।

৪) আমন্ত্রিত না হয়েও যদি কোনও বন্ধু কিংবা পরিচিত জনের সাথে সাক্ষাতের ইচ্ছা হয়ে থাকে, তা হলে কখন পৌঁছানো হবে এবং কতক্ষণ সেখানে থাকতে ইচ্ছুক, তা যেন তাঁকে জানানো হয়।

৫) আমন্ত্রিত না হলে, কিংবা যাঁর সান্নিধ্যে যাওয়ার ইচ্ছা তাঁকে না জানিয়ে, মন্দিরে পৌঁছানো, কিংবা সেই ব্যক্তির বাড়িতে দিনদুপুরে অথবা বিকালে পৌঁছানো পরিহার করা উচিত, যেহেতু সেই সময়ে শ্রীবিগ্রহাদি এবং অন্যান্য সকলে মধ্যাহ্ন ভোজনের পরে সাধারণত বিশ্রাম গ্রহণ করতে থাকেন।

৬) যদি কখনও নিমন্ত্রণ কর্তার গৃহে বেশ কিছুদিন থাকতে হয়, তা হলে গৃহকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ কিছু উপহার সামগ্রী অর্পণ করা সমীচিন। (শ্রীল প্রভুপাদ যখন মুম্বাইতে এক আজীবন সদস্যের বাড়িতে কিছুদিন ছিলেন, তখন তাই করেছিলেন।)

ধাম-সেবা

মথুরা, বৃন্দাবন, পুরী অথবা দ্বারকার (ভগবানের ধাম) মতো পবিত্র স্থান এবং যমুনা অথবা গঙ্গার তীরভূমিকে আপনাদের সেবা করা উচিত। এগুলি হচ্ছে সেরকম স্থান যেখানে ভগবান থাকেন এবং অপূর্ব লীলা প্রদর্শন করেন। ধাম সৎ শক্তির (সন্ধিনী-শক্তি) অথবা নিত্য সত্তার প্রকাশ এবং ভগবানের আবির্ভাব ও লীলার সহায়ক। শ্রীবলরামের তত্ত্বাবধানে থাকা ধাম পতিত আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে।

ধাম সেবার বিভিন্ন প্রকার

ধাম সেবা বলতে বোঝায় তার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে শ্রবণ করা, তাকে স্মরণ করা, তার কীর্তন করা, সেখানে দর্শনে যাওয়া, দূর থেকে তার পর্যবেক্ষণ, সেদিকে (উদ্দেশ্যে) এগিয়ে চলা, তাকে পরিক্রমা করা, স্পর্শ করা, আশ্রয়স্থল হিসাবে গ্রহণ এবং ধামের সংস্কার সজ্জা ও পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা।

যদি আপনারা স্থায়ীভাবে ভগবানের ধামে থাকার সৌভাগ্য ও পরিশুদ্ধতা পেয়ে থাকেন তা হলে আপনারা প্রতিদিন বিভিন্ন সেবা করবেন (নিত্য-ধাম-ক্রিয়া)। যদি স্থায়ীভাবে ধামে না থাকেন তাহলে ধামকে দূর থেকে পর্যবেক্ষণ, ধামমুখী হওয়া, পরিক্রমা, আশ্রয়স্থল নির্বাচন এবং তার সংস্করণ, সজ্জিতকরণ ও পরিচ্ছন্নতা মাঝে মাঝে করতে হবে। যদি আপনারা ধামে না থাকেন তবে প্রতিদিন ধামকথা শ্রবণ, কীর্তন করা এবং সেখানে বাস করার ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারেন।

ধামসেবার নিয়মাবলী

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর 'লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ' গ্রন্থে লিখেছেন :

(ধামের) তীর্থযাত্রীরা স্নান করে, বিগ্রহের পূজা দিয়ে দান করবেন। তাঁদের একদিন উপবাস করতেও বলা হচ্ছে। তাঁরা একটি তীর্থে গিয়ে অন্তত তিনদিন থাকবেন। প্রথম দিন উপবাসে কাটবে এবং রাত্রে তাঁরা একটু জল পান করতে পারেন। কারণ জল উপবাস ভঙ্গ করে না। (বিদ্যাধরের মুক্তি)

চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন :

যাঁরা কৃষ্ণে স্বতঃস্ফূর্ত প্রীতি অর্জন করেননি তাঁরা বেশি দিনের জন্য বৃন্দাবনে থাকবেন না। তাঁদের পক্ষে অল্প দিনের ভ্রমণ ভালো হবে। গোবর্ধন গিরিতে গোপাল বিগ্রহ দর্শন থেকেও তাঁদের বিরত থাকতে হবে। (চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৩/৩৯, তাৎপর্য)।

মন্দিরের পূজারীরা বিশেষ করে পবিত্র ধামে গিয়ে বিভিন্ন মন্দিরে যেতে ও শ্রীবিগ্রহ দর্শনে আগ্রহী হবেন। যখন কোন মন্দিরে বা সাধুর কাছে যাবেন তখন আপনারা ফুল, অর্থ, ধূপ, গন্ধদ্রব্য, ঘৃত পলিতা, ফল, রন্ধন না করা শস্য, সবজি, ঘৃত, নতুন বস্ত্র প্রভৃতি দেওয়ার জন্য নিয়ে যাবেন। বিভিন্ন মন্দিরে সাধারণত পাত্র বা ঝুড়ি থাকে এই সব গ্রহণ করার জন্য। শ্রীল প্রভুপাদ বর্ণনা করেছেন :

ব্যবস্থাটি এমন যে যিনি মন্দিরে আসেন তিনি শ্রীবিগ্রহকে কিছু দেওয়ার জন্য নিয়ে আসেন।...এ হচ্ছে প্রেমের সূচনা...কিছু দেওয়া...যদি আমি আপনাকে ভালোবাসি তা হলে আমি আপনাকে কিছু দেবই এবং আপনি আমাকে যা দেবেন আমি তা গ্রহণ করবো। সুতরাং কৃষ্ণকে কিছু দিন এবং তাঁর নির্দেশ নিন। মানুষ এই সুযোগ নিলে স্বাভাবিকভাবেই ভক্ত তথা কৃষ্ণ-প্রেমিক হয়ে পড়বেন। এটা জীবনের সাফল্য। (শ্রীল প্রভুপাদের পত্র, ১৮ই মার্চ, ১৯৭৬)

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ ষড় গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত বৃন্দাবনের সাতটি প্রধান মন্দিরে যাওয়ার জন্য শ্রীল প্রভুপাদ বিশেষ করে বলতেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কিছু মন্দির ও শ্রীবিগ্রহ বাংলাদেশে আছে।

উত্তম বৈষ্ণবের সাহচর্যে আপনারা এই সব মন্দিরে যাবেন। তাদের সঙ্গ ও থা ঐ ভ্রমণের পূর্ণ ফল পেতে সাহায্য করবে। শ্রীমদ্ভাগবতে লোক দেখানো ীর্থযাত্রার বিপদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

যে-ব্যক্তি তিনটি উপাদানে তৈরি তার দেহকে নিজের ভাবে, দেহসৃষ্টদের আত্মীয় মনে করে, জন্মভূমিকে পূজার যোগ্য চিন্তা করে এবং তীর্থস্থানে যায় অপ্রাকৃত জ্ঞান সম্পন্ন মানুষের সঙ্গে মিলিত না হয়ে শুধুমাত্র স্নান সারতে, তাকে গরু বা গাধা মনে করতে হবে। (ভাগবত ১০/৮৪/১৩)

শ্রীমদ্ভাগবতে (২/৩/২২ তাৎপর্য) শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন—

এই সমস্ত পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে ও মন্দিরে কেউ মনে মনে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে যাবেন না। ভগবানের অপ্রাকৃত লীলার জন্য স্মরণীয় এই সমস্ত মন্দির ও পবিত্র স্থানে গিয়ে তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত হবেন। একে অনুব্রজ বলে। অনু অর্থ অনুসরণ। তাই মন্দিরে ও পবিত্র তীর্থস্থানে যেতেও প্রকৃত গুরুর নির্দেশ অনুসরণ করা শ্রেয়।

তীর্থযাত্রী হিসাবে আমরা অবশ্যই বুঝবো যে, পবিত্র কোন ধামে যাত্রা করাটা সেবা থেকে ছুটি নয়। বরং ধামে যে সেবা করা হয় তা ধামের বাইরে করা সেই রকম সেবার চেয়ে শত শত বা হাজার হাজার গুণ বেশী মঙ্গলজনক।

পবিত্র ধাম পরিক্রমা

পবিত্র ধাম পরিক্রমার নিয়ম-বিধি বলে দেয় কখন পরিক্রমা শুরু হবে, কোন্ অবস্থায় বিভিন্ন পবিত্র স্থান ভ্রমণ করা হবে, ধামের বিভিন্ন স্থানে কিভাবে ভগবানের সঙ্গীদের কৃপা লাভ হবে এবং এই রকম আরও কিছু। তীর্থস্থান পরম্পরায় এই নিয়ম বিধি পৃথক হয়। বিশেষভাবে জানার জন্য শুদ্ধ গ্রন্থ পাঠ করতে হবে।

পবিত্র ধামে প্রণতি জ্ঞাপন

ধামে প্রবেশ করে তাকে প্রণতি জানাতে হবে। *লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ* গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন—

শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মের স্পর্শ পাওয়া ধূলিকণা দর্শনের অনাবিল আনন্দে অক্রূর মুখ মাটিতে রেখে পড়ে গেলেন এবং মাটির উপর গড়াতে লাগলেন। অক্রূরের বৃন্দাবন যাত্রা উদাহরণ ব্যঞ্জক। যে ব্যক্তি বৃন্দাবনে যেতে ইচ্ছা করেন তাঁর অক্রূরের আদর্শ পদাঙ্ক অনুসরণ করা এবং ভগবানের লীলা ও কর্মধারা চিন্তা করা উচিত। বৃন্দাবনের সীমানায় পৌঁছে জড়জগতের পদমর্যাদা ও সম্মান চিন্তা না করে তৎক্ষণাৎ তার ধূলি নিজের দেহে প্রলেপ দেওয়া উচিত। (অক্রূরের বৃন্দাবনে আগমন)।

ধামে পরিত্যাজ্য অপরাধসমূহ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর দশবিধ ধাম অপরাধের কথা বলেছেন যেগুলি তীর্থযাত্রায় বা ধামবাসে পূর্ণ ফল পাওয়ার জন্য আমরা সযত্নে পরিহার করবো—

১) শিষ্যের কাছে ধাম প্রকাশকারী গুরুদেবকে অশ্রদ্ধা করা।

২) পবিত্র ধামকে নশ্বর মনে করা।

৩) পবিত্র ধামে বসবাসকারী, অথবা ধামে আগত কোন ব্যক্তির প্রতি রূঢ়তা প্রদর্শন বা তাদের সাধারণ জীব মনে করা।*

৪) পবিত্র ধামে বাস করার সময় নিষিদ্ধ কাজ (জড়কর্ম) করা।

৫) পবিত্র ধামে শ্রীবিগ্রহ পূজার ব্যবস্থা কিংবা সংকীর্তন করে অর্থ উপার্জন করা।

৬) পবিত্র ধামকে কোন দেশ বা প্রদেশের (যেমন বাংলা) অন্তর্গত মনে করা, ভগবানের ধামকে অধিদেবতাদের স্থানের সঙ্গে এক বলে মনে করা, অথবা পবিত্র ধামের সীমা পরিমাপের প্রচেষ্টা করা।

৭) ধামে বসবাসকালে কোন পাপ কাজ করা।

৮) বৃন্দাবনকে নবদ্বীপ থেকে পৃথক মনে করা।

৯) পবিত্র ধামের কীর্তনকারী শাস্ত্রের নিন্দা করা।

১০) বিশ্বাসহীন হওয়া এবং চিন্তা করা যে, ধামের মহিমা কল্পনামাত্র।

---

* শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন—"বৃন্দাবনের সকল বাসিন্দাই বৈষ্ণব। তাঁরা সকলেই পুণ্যাত্মা কারণ যেভাবেই হোক তাঁরা কৃষ্ণের নাম ভজন করেন।" (*চৈঃ চঃ আদি* ৫/২৩২ তাৎপর্য)।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মন্দিরে প্রাত্যহিক গীত ও বৈষ্ণব ভজনাদি

শ্রীশ্রীগুর্বষ্টক

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর

সংসারদাবানল-লীঢ়-লোক-
ত্রাণায় কারুণ্যঘনাঘনত্বম্ ।
প্রাপ্তস্য কল্যাণগুণার্ণবস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ১ ॥

শ্রীগুরুদেব করুণাসিন্ধু থেকে আশীর্বাদ সংগ্রহ করেন। বনজঙ্গলের দাবাগ্নি নির্বাপণের জন্য মেঘ যেভাবে জল বর্ষণ করে, সেইভাবে শ্রীগুরুদেবও সংসারের দুঃখাগ্নি নির্বাপণ করে জড়বদ্ধ জীবদের উদ্ধার করেন। কল্যাণময় গুণাবলীর সমুদ্ররূপে বিরাজমান সেই গুরুদেবের চরণপদ্মে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

মহাপ্রভোঃ কীর্তন-নৃত্য-গীত-
বাদিত্রমাদ্যন্মনসো রসেন ।
রোমাঞ্চকম্পাশ্রু-তরঙ্গভাজো
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ২ ॥

শ্রীগুরুদেব মহামন্ত্র জপ-কীর্তন করে, ভাবোল্লাসে নৃত্য করে, গীতবাদ্য সহকারে সর্বদাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সংকীর্তন আন্দোলনে আনন্দমত্ত হয়ে থাকেন। যেহেতু তিনি অন্তরে শুদ্ধ ভক্তিরস আস্বাদন করেন, তাই ক্ষণে ক্ষণে তাঁর শরীরে রোমাঞ্চ জাগে, কম্পন আসে এবং অশ্রুতরঙ্গ নেমে আসে। এমন গুরুদেবের পাদপদ্মে আমার সশ্রদ্ধ দণ্ডবৎ প্রণতি জানাই।

শ্রীবিগ্রহারাধন-নিত্য-নানা-
শৃঙ্গার-তন্মন্দিরমার্জনাদৌ ।
যুক্তস্য ভক্তাংশ্চ নিযুঞ্জতোঽপি
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ৩ ॥

মন্দিরে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের আরাধনায় শ্রীগুরুদেব নিত্য নিয়োজিত থাকেন। তাঁর শিষ্যবর্গকেও তিনি সেই আরাধনায় নিযুক্ত করেন। তারা সুন্দর বস্ত্রাভরণে শ্রীবিগ্রহাদি সজ্জিত করে, শ্রীভগবানের মন্দির মার্জন করে, এবং নানাভাবে শ্রীভগবানের পূজা-অর্চনা করে থাকে। এমন গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে আমার সশ্রদ্ধ দণ্ডবৎ প্রণতি জানাই।

চতুর্বিধ-শ্রীভগবৎপ্রসাদ
স্বাদ্বন্নতৃপ্তান্ হরিভক্তসঙ্ঘান্ ।
কৃত্বৈব তৃপ্তিং ভজতঃ সদৈব
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ৪ ॥

শ্রীগুরুদেব নিত্য চতুর্বিধ (চর্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, ও পেয়) সুস্বাদু ভোগ নিবেদন করে থাকেন। শ্রীগুরুদেব যখন দেখেন ভক্তবৃন্দ ভগবৎ-প্রসাদ ভোজন করে তৃপ্ত হচ্ছে, তখন তিনি সুখী হন। এমন শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে আমার সশ্রদ্ধ দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্রীরাধিকামাধবয়োরপার-
মাধুর্যলীলা গুণরূপনাম্নাম্ ।
প্রতিক্ষণাস্বাদন-লোলুপস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণাবিন্দম্ ॥ ৫ ॥

শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের অনন্ত মাধুর্যলীলা এবং তাঁদের গুণাবলী, রূপরাশি ও নামমাহাত্ম্য শ্রবণ ও কীর্তনের আস্বাদনে শ্রীগুরুদেব প্রতিক্ষণই লোলুপভাবে আগ্রহী হয়ে থাকেন। এমন শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণকমলে জানাই আমার শ্রদ্ধাবনত প্রণিপাত।

নিকুঞ্জযুনো রতিকেলিসিদ্ধ্যৈ
যা যালিভির্যুক্তিরপেক্ষণীয়া ।
তত্রাতিদাক্ষ্যাদতিবল্লভস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ৬ ॥

শ্রীগুরুদেব আমাদের অতি প্রিয়জন, কারণ বৃন্দাবনের কুঞ্জলীলায় শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের মাধুর্যময় সঙ্গ সার্থক করে তোলার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময়ে গোপিকাগণ যেভাবে নানা উপায়ে অতিপ্রিয় আয়োজনাদি করে থাকেন, সেই লীলাপ্রচেষ্টায় সহযোগিতা ব্রতে শ্রীগুরুদেব অতি দক্ষ। এমন শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে নিবেদন করি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি।

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ-
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ৭ ॥

পরমেশ্বর ভগবানের মতোই শ্রীগুরুদেবের সম্মাননা বিধেয়, কারণ তিনি শ্রীভগবানের অতীব অন্তরঙ্গ সেবক। এই তত্ত্ব সমস্ত শাস্ত্রাদিতে স্বীকৃত হয়েছে এবং সকল সৎ ব্যক্তি মাত্রেই তা মেনে চলেন। সুতরাং শ্রীহরির প্রামাণ্য প্রতিভূ রূপে যিনি শ্রীগুরুদেব হয়েছেন, তাঁর শ্রীচরণপদ্মে জানাই আমার শ্রদ্ধাবনত প্রণতি।

যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদো
যস্যাপ্রসাদান্ ন গতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ৮ ॥

শ্রীগুরুদেবের কৃপায় শ্রীকৃষ্ণকরুণা লাভ হয়। গুরুকৃপা বিনা কারও উন্নতি হয় না। তাই আমি নিয়ত গুরুস্মরণ ও বন্দনা করি। দিনে অন্তত তিনবার আমার শ্রীগুরুদেবের চরণকমলে শ্রদ্ধাবনত প্রণতি নিবেদন করা অবশ্য কর্তব্য মনে করি।

শ্রীনৃসিংহ প্রণাম

নমস্তে নরসিংহায় প্রহ্লাদাহ্লাদ-দায়িনে।
হিরণ্যকশিপোর্বক্ষঃ শিলাটঙ্ক-নখালয়ে ॥

যিনি প্রহ্লাদ মহারাজের আনন্দদাতা এবং যাঁর বাটালির মতো নখ দৈত্য হিরণ্যকশিপুর শিলাসদৃশ বুকে আঘাত হেনেছিল সেই শ্রীনৃসিংহদেবকে আমি প্রণাম করি

ইতো নৃসিংহঃ পরতো নৃসিংহো
যতো যতো যামি ততো নৃসিংহঃ।
বহির্নৃসিংহ হৃদয়ে নৃসিংহো
নৃসিংহমাদিং শরণং প্রপদ্যে ॥

ভগবান নৃসিংহ এখানে আছেন, ওখানেও আছেন। যেখানেই যাই সেখানেই নৃসিংহ। তিনি হৃদয়ে আছেন আবার বাইরেও আছেন। সমস্ত

কিছুর মূল ও পরম আশ্রয় ভগবান শ্রীনৃসিংহদেবের কাছে আমি শরণ নিচ্ছি।

তব করকমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গং-
দলিতহিরণ্যকশিপুতনুভৃঙ্গম্ ।
কেশব ধৃত-নরহরিরূপ
জয় জগদীশ হরে ॥

অর্ধমানব, অর্ধসিংহের মূর্তি ধারণকারী হে কেশব, হে জগদীশ, হে ভগবান হরি, তোমার জয় হোক! কেউ যেমন সহজেই তার নখাগ্রে একটি বোলতাকে পিষ্ট করতে পারে, তেমনই তোমার সুন্দর পদ্মসদৃশ হাতের অদ্ভুত শৃঙ্গাকৃতির নখে তুমি দৈত্য হিরণ্যকশিপুর দেহটিকে ছিঁড়ে ফেলেছিলে।

তুলসী পূজা কীর্তন

নমো নমঃ তুলসী! কৃষ্ণপ্রেয়সী নমো নমঃ ।
রাধাকৃষ্ণ-সেবা পাব এই অভিলাষী ॥
যে তোমার শরণ লয়, তার বাঞ্ছা পূর্ণ হয়,
কৃপা করি কর তারে বৃন্দাবনবাসী ।
মোর এই অভিলাষ, বিলাস-কুঞ্জে দিও বাস,
নয়নে হেরিব সদা যুগলরূপরাশি ॥
এই নিবেদন ধর, সখীর অনুগত কর,
সেবা-অধিকার দিয়ে কর নিজ দাসী ।
দীন কৃষ্ণদাসে কয়, এই যেন মোর হয়,
শ্রীরাধাগোবিন্দ-প্রেমে সদা যেন ভাসি ॥

১) হে তুলসী, কৃষ্ণপ্রেয়সী, আমি বার বার তোমাকে প্রণাম করি, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবার আমি অভিলাষী।

২) যে তোমার শরণ গ্রহণ করে তার মনোবাসনা পূর্ণ হয়। কৃপা করে তুমি তাকে বৃন্দাবনবাসী কর।

৩) বৃন্দাবনধামে বিলাসকুঞ্জে বাস করার আমার অভিলাষ তুমি পূর্ণ কর যাতে নয়নভরে সব সময় আমি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সুন্দর লীলা দর্শন করতে পারি।

৪) আমার প্রার্থনা এই যে, তুমি আমাকে ব্রজের সখীদের অনুগত কর। সেবার অধিকার দিয়ে আমাকে তোমার দাসী কর।

৫) কৃষ্ণের একান্ত পতিত ও দীন সেবক বলছে, "আমি যেন সব সময় শ্রীরাধাগোবিন্দ প্রেমে ভাসতে পারি।"

শ্রীগুরু-বন্দনা

শ্রীগুরুচরণপদ্ম, কেবল ভকতিসদ্ম,
বন্দোঁ মুঞি সাবধান মতে।
যাঁহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিয়া যাই,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাহা হ'তে ॥
গুরুমুখপদ্মবাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য,
আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরুচরণে রতি, এই সে উত্তম-গতি,
যে প্রসাদে পূরে সর্ব আশা ॥
চক্ষুদান দিল যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই,
দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।
প্রেমভক্তি যাঁহা হৈতে, অবিদ্যা-বিনাশ যাতে,
বেদে গায় যাঁহার চরিত ॥
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, অধম-জনার বন্ধু,
লোকনাথ লোকের জীবন।
হা হা প্রভু কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া,
এবে যশ ঘুষুক ত্রিভুবন ॥

১) শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আশ্রয় করলে শুদ্ধভক্তি লাভ হয়। তাঁর পাদপদ্মে আমি সাবধানে প্রণতি জানাই। তাঁরই প্রসাদে মানুষ ভবসংসার থেকে উদ্ধার পেয়ে কৃষ্ণের কৃপা পেতে পারে।

২) আমার শুধু এই আশা যে, শ্রীগুরুদেবের পদ্মমুখ থেকে নিঃসৃত বাক্যে আমার চিত্ত পবিত্র হোক। শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে রতি হলে যে গতি লাভ হয় তাতে সব আশা পূর্ণ হয়।

৩) তিনি আমার চক্ষু উন্মীলন করেছেন এবং আমার হৃদয়ে দিব্যজ্ঞান প্রকাশ করেছেন। তিনি জন্মে জন্মে আমার প্রভু। তিনি প্রেমভক্তি দাতা। তাঁর থেকে অবিদ্যার বিনাশ হয়। বেদে তাঁর চরিত্র গীত হয়েছে।

৪) শ্রীগুরুদেব করুণার সিন্ধু, অধমের বন্ধু আর ভক্তের প্রভু ও জীবন। হে প্রভু, আমাকে দয়া করো। তোমার পাদপদ্মে আমাকে আশ্রয় দাও। তোমার যশ ত্রিভুবনে প্রচারিত হোক।

জয় রাধা-মাধব

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

(জয়) রাধা-মাধব (জয়) কুঞ্জ-বিহারী
(জয়) গোপীজনবল্লভ (জয়) গিরিবরধারী
(জয়) যশোদানন্দন (জয়) ব্রজজনরঞ্জন
(জয়) যমুনাতীর বনচারী।

ভোগ-আরতি কীর্তন

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

ভজ ভকতবৎসল শ্রীগৌরহরি।
শ্রীগৌরহরি সোহি গোষ্ঠবিহারী,
নন্দ-যশোমতী-চিত্তহারী ॥ ১ ॥
বেলা হ'লো, দামোদর, আইস এখন।
ভোগ-মন্দিরে বসি' করহ ভোজন ॥ ২ ॥
নন্দের নির্দেশে বৈসে গিরিবরধারী।
বলদেব-সহ সখা বৈসে সারি সারি ॥ ৩ ॥
শুকতা-শাকাদি ভাজি নালিতা কুষ্মাণ্ড।
ডালি ডাল্‌না দুগ্ধতুম্বী দধি মোচাঘণ্ট ॥ ৪ ॥
মুদ্গবড়া মাষবড়া রোটিকা ঘৃতান্ন।
শষ্কুলী পিষ্টক ক্ষীর পুলী পায়সান্ন ॥ ৫ ॥
কর্পূর অমৃতকেলী রম্ভা ক্ষীরসার।
অমৃত রসালা, অম্ল দ্বাদশ প্রকার ॥ ৬ ॥
লুচি চিনি সরপুরী লাড্ডু রসাবলী।
ভোজন করেন কৃষ্ণ হ'য়ে কুতুহলী ॥ ৭ ॥
রাধিকার পক্ব অন্ন বিবিধ ব্যঞ্জন।
পরম আনন্দে কৃষ্ণ করেন ভোজন ॥ ৮ ॥
ছলে-বলে লাড্ডু খায় শ্রীমধুমঙ্গল।
বগল বাজায়, আর দেয় হরিবোল ॥ ৯ ॥
রাধিকাদি গণে হেরি' নয়নের কোণে।
তৃপ্ত হ'য়ে খায় কৃষ্ণ যশোদা-ভবনে ॥ ১০ ॥
ভোজনান্তে পিয়ে কৃষ্ণ সুবাসিত বারি।
সবে মুখ প্রক্ষালয় হ'য়ে সারি সারি ॥ ১১ ॥
হস্ত-মুখ প্রক্ষালিয়া যত সখাগণে।

আনন্দে বিশ্রাম করে বলদেব সনে ॥ ১২ ॥
জম্বুল রসাল আনে তাম্বুল মসালা।
তাহা খেয়ে কৃষ্ণচন্দ্র সুখে নিদ্রা গেলা ॥ ১৩ ॥
বিশালাক্ষ শিখি-পুচ্ছ চামর ঢুলায়।
অপূর্ব শয্যায় কৃষ্ণ সুখে নিদ্রা যায় ॥ ১৪ ॥
যশোমতী-আজ্ঞা পেয়ে ধনিষ্ঠা-আনীত।
শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ রাধা ভুঞ্জে হ'য়ে প্রীত ॥ ১৫ ॥
ললিতাদি সখীগণ অবশেষ পায়।
মনে মনে সুখে রাধা-কৃষ্ণগুণ গায় ॥ ১৬ ॥
হরি-লীলা একমাত্র যাঁহার প্রমোদ।
ভোগারতি গায় সেই ভকতিবিনোদ ॥ ১৭ ॥

গৌর-আরতি কীর্তন

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

জয় জয় গোরাচাঁদের আরতিকো শোভা।
জাহ্নবী-তটবনে জগমনোলোভা ॥ ১ ॥
দক্ষিণে নিতাইচাঁদ, বামে গদাধর।
নিকটে অদ্বৈত, শ্রীনিবাস ছত্রধর ॥ ২ ॥
বসি' আছে গোরাচাঁদ রত্নসিংহাসনে।
আরতি করেন ব্রহ্মা-আদি দেবগণে ॥ ৩ ॥
নরহরি-আদি করি' চামর ঢুলায়।
সঞ্জয়-মুকুন্দ-বাসুঘোষ-আদি গায় ॥ ৪ ॥
শঙ্খ বাজে, ঘণ্টা বাজে, বাজে করতাল।
মধুর মৃদঙ্গ বাজে পরম রসাল ॥ ৫ ॥
বহুকোটি চন্দ্র জিনি' বদন উজ্জ্বল।
গলদেশে বনমালা করে ঝলমল ॥ ৬ ॥
শিব-শুক-নারদ প্রেমে গদগদ।
ভকতিবিনোদ দেখে গোরার সম্পদ ॥ ৭ ॥

শ্রীনাম-কীর্তন

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

যশোমতী-নন্দন, ব্রজবর-নাগর,

গোকুলরঞ্জন কান।

গোপী-পরাণ ধন, মদন-মনোহর,

কালিয়দমন বিধান ॥ ১ ॥

অমল হরিনাম অমিয়-বিলাসা।

বিপিন-পুরন্দর, নবীন নাগরবর,

বংশীবদন সুবাসা ॥ ২ ॥

ব্রজজন-পালন, অসুরকুল-নাশন,

নন্দ-গোধন-রাখওয়ালা।

গোবিন্দ মাধব, নবনীত-তস্কর

সুন্দর নন্দগোপালা ॥ ৩ ॥

যামুনতটচর, গোপী-বসনহর,

রাস-রসিক, কৃপাময়।

শ্রীরাধাবল্লভ, বৃন্দাবন-নটবর,

ভকতিবিনোদ-আশ্রয় ॥ ৪ ॥

প্রেমধ্বনি

- জয় ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজক আচার্য অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমৎ অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদ কি জয়!
- ইসকন প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীল প্রভুপাদ কি জয়!
- জয় ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজক আচার্য অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমৎ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদ কি জয়!
- জয় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ কি জয়!
- জয় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কি জয়!
- জয় ওঁ বিষ্ণুপাদ বৈষ্ণব সার্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ কি জয়!
- জয় শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ ষড় গোস্বামী কি জয়!
- নামচার্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর কি জয়!
- জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ কি জয়!
- শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, গোপ-গোপীনাথ, শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, গিরি গোবর্ধন কি জয়!
- শ্রীমায়াপুর ধাম কি জয়!

- শ্রীবৃন্দাবন ধাম কি জয়!
- গঙ্গা মাই কি জয়!
- যমুনা মাই কি জয়!
- ভক্তিদেবী কি জয়!
- তুলসীদেবী কি জয়!
- অনন্তকোটি বৈষ্ণববৃন্দ কি জয়!
- শ্রীহরিনাম সংকীর্তন কি জয়!
- গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ভাগবত কি জয়!
- ইসকন বর্তমান গুরুবৃন্দ কি জয়!
- সমবেত ভক্তবৃন্দ কি জয়!
- গৌরপ্রেমানন্দে হরি-হরিবোল।
- সমবেত ভক্তবৃন্দ কি জয়! (তিনবার)
- গুরুগৌরাঙ্গের জয় হোক।
- শ্রীল প্রভুপাদের জয় হোক!

সংযোজন

দৈনন্দিন পূজা-অর্চনার জন্য অতিরিক্ত তথ্য

সংযোজন ১

শ্রীবিগ্রহ অর্চন পদ্ধতি

(শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধের ২৭তম অধ্যায়)

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবিগ্রহ অর্চন পদ্ধতি সংস্থাপিত করেছেন। *ভাগবতে* পঞ্চরাত্রিক বিধির এমন একটি বর্ণনা বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, *ভাগবত* বিধি পঞ্চরাত্রিক বিধির পরিপূরক। *পঞ্চরাত্র প্রদীপের* এই অংশে আমরা ব্যাখ্যাসহ ২৭তম অধ্যায়ের উপস্থাপনা করছি। তা গ্রন্থখানির অন্যস্থানে উল্লিখিত অর্চন পদ্ধতি সহ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বর্ণিত শ্রীবিগ্রহ অর্চন এবং পঞ্চরাত্রিক বিধির অন্য কিছু সাধারণ ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপ্রাপ্ত। এগুলির মধ্যে কিছু ভাগবত অধ্যায়ে বর্ণিত তাৎপর্যের চেয়ে বেশী প্রয়োগমূল্য সম্পন্ন এবং তাৎপর্যগুলির স্থান পরিবর্তন না ঘটিয়ে তাদের সংযোজন রূপে পরিগণিত হয়েছে। অন্যগুলি আরও সাধারণ। সেগুলি দেখায় শ্রীবিগ্রহ অর্চনাদি পদ্ধতির মধ্যে কিভাবে কৃষ্ণচেতনা উপলব্ধি করা যায়। যদিও স্থানাভাবে আমরা এখানে ২৭তম অধ্যায়ের *ভাগবতের* তাৎপর্য উপস্থাপিত করিনি তবুও এই গ্রন্থের পাঠক সেগুলি যত্নসহকারে পড়বেন।

আর একটা কথা : *হরিভক্তিবিলাসের* প্রথম খণ্ডের ২য় অধ্যায় থেকে সংগৃহীত আমাদের ৬৪ উপচারের তালিকার সঙ্গে পদ্ধতি পরম্পরার অমিল কিছু দেখা দিলে বিভ্রান্ত হবেন না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুসরণ করে আমরা *হরিভক্তিবিলাসে* প্রদত্ত গোস্বামীদের নির্দেশ দ্বারা পরিচালিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ অভিলষিত শ্রীবিগ্রহ অর্চন পদ্ধতি ব্যাপকভাবে কাজে লাগাই।

শ্লোক ১ : শ্রীউদ্ধব বললেন, হে প্রভু, ভক্তপ্রাণ, আপনার বিগ্রহরূপকে অর্চন করার নির্ধারিত পদ্ধতি আমাকে বলুন। যে ভক্ত বিগ্রহ অর্চন করেন তাঁর যোগ্যতা কি, কোন্ কারণে এই অর্চন বিধি প্রচলিত এবং অর্চনের নির্দিষ্ট পদ্ধতি কি?

ব্যাখ্যা : বিগ্রহ অর্চন পদ্ধতি গুরু-শিষ্য পরম্পরায় শেখানো হয়। গুরুদেব ও তাঁর প্রতিনিধিদের মাধ্যমে তা শেখানো হয়। গুরুদেব প্রথমে অবশ্যই স্থির করবেন যে, তাঁর শিষ্য ভালো 'পূজারী' হওয়ার যোগ্য কি না। যদি কোন ভক্তকে শুধু এই কারণে বিগ্রহের অর্চন কাজে নিযুক্ত করা হয় যে, সেই কাজ করার কেউ নেই তা হলে তাঁর অপরাধ করার সব রকম সম্ভাবনা থাকে। তার ফলে যাঁরা তার মতো অযোগ্য লোককে অর্চন করতে দিয়েছেন তাঁরা অন্তত আংশিকভাবে অপরাধের জন্য দায়ী হবেন।

শ্লোক ৫ : সব মহাজ্ঞানী বার বার বলেন যে, অর্চন মানুষের জীবনের সব চেয়ে বড় মঙ্গল সূচিত করে। নারদ মুনি, মহান ব্যাসদেব এবং আমার গুরুদেব বৃহস্পতি এই অভিমত পোষণ করেন।

ব্যাখ্যা : প্রথম দুটি শ্লোক *সংহিতা* নামে পরিচিত *পঞ্চরাত্র* শাস্ত্রের দার্শনিক ভাবধারার ইঙ্গিতবাহী। পঞ্চরাত্রের সংহিতা ভাগবতের দার্শনিক মতবাদের ব্যাখ্যা করে। তাতে বলা হয়েছে যে, চিদ্ জগতে শ্রীভগবানের স্বরূপ থেকে তাঁর বিগ্রহ্ রূপ পৃথক নয়। পঞ্চরাত্রের পাঠ অনুসারে পরমেশ্বর ভগবান পাঁচটি রূপে আবির্ভূত হন। চিদ্ জগৎ গোলোক বৃন্দাবনে *পর* ভগবানের মূল রূপ। ব্যূহ শ্রীভগবানের চারটি সহায়ক পরিব্যাপ্তি—বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। *বিভব* বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর নারায়ণের ২৪ প্রকার রূপ। প্রত্যেক জীবের মধ্যে অন্তর্যামী পরমাত্মা রূপে অধিষ্ঠান করেন। জড়জগতে পূজিত হওয়ার জন্য আবির্ভূত ভগবানের বিগ্রহ্ হচ্ছেন অর্চা বিগ্রহ্। অর্চা বিগ্রহে অন্য চার রূপ বর্তমান। তাই তা পরমেশ্বরের সব গুণ সম্পন্ন।

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৩/২৫/৩৫ তাৎপর্য) অর্চা বিগ্রহের গুরুত্ব সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন—

মায়াবাদী ও নাস্তিকেরা মন্দিরের বিগ্রহকে মূর্তিরূপে গ্রহণ করেন। কিন্তু ভক্তরা মূর্তিপূজা করেন না। তাঁরা পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষভাবে অর্চা অবতার রূপে অর্চন করেন। অর্চা সেই রূপে প্রকাশ যা আমরা বর্তমান অবস্থায় অর্চন করতে পারি। বাস্তবিক আমাদের বর্তমান অবস্থায় শ্রীভগবানের চিন্ময় রূপ দেখা সম্ভব নয়। কারণ আমাদের জড় চক্ষু এবং জড় ইন্দ্রিয় চিন্ময় বস্তুকে উপলব্ধি করতে পারে না। এমন কি আমরা আত্মার চিন্ময় রূপও দেখতে পারি না। যখন একজন মানুষ মারা যায় তখন আমরা চিন্ময় সত্তার শরীর থেকে নিষ্ক্রমণ দেখতে পারি না। আমাদের জড় ইন্দ্রিয়ের এই হলো ত্রুটি। আমাদের জড় ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হওয়ার জন্য পরমেশ্বর একটি আকাঙ্ক্ষিত রূপ ধারণ করেছেন যার নাম অর্চাবিগ্রহ। এই অর্চা বিগ্রহকে কখনও কখনও অর্চা অবতার বলা হয়। তা তাঁর থেকে অভিন্ন। যেমন পরমেশ্বর বিভিন্ন অবতার হন তেমনই কাদা, কাঠ, ধাতু আর মণিরদ্বারা তৈরী মূর্তি তিনি গ্রহণ করেন।

ভগবানের রূপ ব্যক্ত করার বহু শাস্ত্রীয় নির্দেশ রয়েছে। এই সমস্ত রূপগুলি জড় নয়। যদি ভগবান সর্বব্যাপী হন, তা হলে তিনি জড় বস্তুতেও আছেন। এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু নাস্তিকরা অন্য চিন্তা করে। যদি তারা প্রচার করে যে, সব কিছুই ভগবান, তা হলেও তারা যখন মন্দিরে যায় ও ভগবানের বিগ্রহ দেখে তারা তখন তাকে ভগবান

> *বলতে অস্বীকার করে। তাদের তত্ত্ব অনুযায়ী সব কিছুই ভগবান। তাহলে বিগ্রহ ভগবান নন কেন? বাস্তবে তাদের ভগবান সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই। ভক্তের দৃষ্টিভঙ্গী আলাদা। তাঁদের দৃষ্টিতে ভগবানের জন্য প্রীতি জড়িত আছে। যে মুহূর্তে তাঁরা ভগবানকে বিভিন্ন মূর্তিতে দেখেন তাঁরা প্রেমে আপ্লুত হয়ে পড়েন। কারণ নাস্তিকদের মতো ভগবানের সঙ্গে মন্দিরে অধিষ্ঠিত বিগ্রহের কোন পার্থক্য তাঁরা দেখেন না। মন্দিরের বিগ্রহের সহাস্য মুখমণ্ডলে ভক্তগণ অপ্রাকৃত ও আধ্যাত্মিক রূপ দর্শন করেন। তাঁর শ্রীঅঙ্গের সাজসজ্জায় ভক্তরা অনুরক্ত হন।*
>
> *গুরুদেবের কর্তব্য কীভাবে মন্দিরের বিগ্রহকে সাজাতে হবে, মন্দির কীভাবে পরিষ্কার করতে হবে এবং বিগ্রহকে কীভাবে অর্চন করতে হবে তা শিক্ষা দেওয়া। বিভিন্ন পদ্ধতি, আইন ও নিয়ম বিষ্ণু-মন্দিরে পালিত হয়। ভক্তরা মন্দিরে গিয়ে বিগ্রহ দর্শন করেন। তাঁরা দিব্যভাবে ভগবানের ঐ রূপ দর্শনেই আনন্দ লাভ করেন। কারণ বিগ্রহগণ বদান্য। ভক্তরা বিগ্রহের কাছে তাঁদের মনের কথা জানান। অনেক ক্ষেত্রে বিগ্রহ তাঁদের উত্তর দেন। কিন্তু পরমেশ্বরের সঙ্গে কথা বলতে হলে উচ্চস্তরের ভক্ত হতে হবে। কখনও কখনও পরমেশ্বর স্বপ্নে ভক্তের কাছে কিছু জানান। বিগ্রহ ও ভক্তের এই ভাব বিনিময় নাস্তিকেরা বুঝবে না। কিন্তু বাস্তবে ভক্তরা তা অনুভব করেন। কপিল মুনি বলেছেন—ভক্তরা কীভাবে বিগ্রহের সজ্জিত অঙ্গ ও মুখমণ্ডল দর্শন করেন এবং ভক্তির পথে কীভাবে তাঁর সঙ্গে কথা বলেন।*

শ্লোক ৩-৪ : হে মহান প্রভু, শ্রীবিগ্রহ অর্চন বিষয়ে নির্দেশগুলি সর্বপ্রথম আপনার মুখপদ্ম থেকে নির্গত হয়। তারপর সেগুলি মহান ব্রহ্মা ভৃগু আদি তাঁর পুত্রদের এবং শিব তাঁর পত্নী পার্বতীকে বলেন। এই পদ্ধতি সমাজের সব কার্যনির্বাহী তথা আধ্যাত্মিক ব্যবস্থার স্বীকৃতি পেয়েছে এবং তাদের উপযুক্ত হয়েছে। তাই আমি মনে করি শ্রীবিগ্রহ রূপে আপনার উপাসনা সর্ব বর্ণ ও সর্বপ্রকার আশ্রমস্থিত ব্যক্তিগণের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা, এমন কি মহিলা ও শূদ্রদের ক্ষেত্রেও তাই।

ব্যাখ্যা : *পঞ্চরাত্র* মূলতঃ পরমেশ্বর ভগবান নিজেই বলেছিলেন। ধীরে ধীরে শিষ্য পরম্পরায় প্রচারের ফলে *পঞ্চরাত্রের* স্বীকৃত পাঠ ১০৮ পর্যন্ত বাড়ে।

বৈদিক পূজা-পদ্ধতির মতো না হয়ে পঞ্চরাত্রিক অর্চন এতই উদার যে, তা কোন সদ্‌গুরুর কাছে পঞ্চরাত্রিক মন্ত্রে যথাযথ দীক্ষিত সমাজের যে কোন স্তরের যে কোন ব্যক্তিকে শ্রীবিগ্রহ অর্চন করার অনুমতি দেয়। শ্রীল প্রভুপাদ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন :

> *আমাদের চিন্ময় স্বরূপে চিন্ময় ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই ভগবানের সচ্চিদানন্দময় অপ্রাকৃত রূপ দর্শন করা যায়। অপ্রাকৃত শব্দতরঙ্গ উচ্চারণ করার ফলে*

আমাদের চিন্ময় স্বরূপের পুনঃপ্রকাশ হয়। এই রকম মন্ত্র ভগবানের আদর্শ প্রতিনিধি সদ্‌গুরুর মাধ্যমে লাভ করা উচিত এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে মন্ত্র জপ করার অনুশীলন করতে হয়। তার ফলে আমরা ধীরে ধীরে পরমেশ্বরের নিকটবর্তী হতে পারি। পঞ্চরাত্রিক বিধি হচ্ছে অপ্রাকৃত ভগবৎ-সেবার সর্বাধিক প্রামাণিক প্রক্রিয়া। (ভাগবত ১/৫/৩৮ তাৎপর্য)

দীক্ষাকে দ্বিতীয় জন্ম মনে করা হয়। কারণ তা মানুষের অস্তিত্বের পরিবর্তন ঘটায়। *হরিভক্তিবিলাসে* বলা হয়েছে—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ ।
তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্ ॥

"যেমন বিশেষ রাসায়নিক পদ্ধতিতে কাঁসার সঙ্গে পারদ মেশালে তা সোনায় পরিণত হয় তেমনই কোন ব্যক্তি যদি কোন সদ্ গুরুর কাছে যথাযথ শিক্ষিত ও দীক্ষা প্রাপ্ত হয় তা হলে সে তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণে রূপান্তরিত হয়।"

শ্রীবিগ্রহ অর্চনের ফল

৪র্থ শ্লোকে উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন, "সমস্ত আধ্যাত্মিক কাজের মধ্যে আপনাকে আপনার বিগ্রহরূপে অর্চন সব চেয়ে বেশী উপকারী বলে আমি মনে করি।" শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন শ্রীবিগ্রহ অর্চনের উপকারিতা অনেক। নীচের উদ্ধৃতিগুলি থেকে জানা যাবে যাঁরা শ্রীবিগ্রহ অর্চন করেন তাঁরা কি কি ফল পেয়েছেন—

অর্চন সিদ্ধি

যদি কেউ শ্রীবিগ্রহ অর্চনে পূর্ণত্ব অর্জন করেন তা হলে তাকে অর্চন সিদ্ধি বলে। অর্চন সিদ্ধির অর্থ হলো এই যে, শুধুমাত্র শ্রীবিগ্রহ অর্চন করে জীবনাবসান মাত্রই কেউ পরমেশ্বরের কাছে ফিরে যেতে পারে। (শ্রীল প্রভুপাদের পত্র, ১৮ই মার্চ, ১৯৬৯)

কৃষ্ণের প্রতি প্রীতির বর্ধন

ঠিক ঠিক নিয়মে যদি তোমরা রাধা-কৃষ্ণের সেবা করতে থাকো তাহলে কৃষ্ণের প্রতি তোমাদের প্রীতি উত্তরোত্তর বেড়ে যাবে। আসলে কৃষ্ণের

কৃপাতে তোমরা এটা দেখতে পারছো। ...আমরা মন্দির অর্চনের নির্ধারিত পদ্ধতি পালন করছি। কারণ এটাই হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধ প্রীতির সর্বশ্রেষ্ঠ পূর্ণতা অর্জনের কার্যকরী পন্থা। (শ্রীল প্রভুপাদের পত্র, ১৬ই জানুয়ারী, ১৯৭০)

শান্তি ও উৎসাহ

শ্রীবিগ্রহকে অবশ্যই খুব সুন্দরভাবে অর্চন করতে হবে, শৃংগার করতে হবে। ভোগ নিবেদন করতে হবে। এই কাজ করলে তোমরা সব সময় শান্তি লাভ করবে ও প্রাণবন্ত হবে। (শ্রীল প্রভুপাদের পত্র, ৮ই জুলাই, ১৯৭৬)

কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার

চমৎকার ভাবে শ্রীবিগ্রহ অর্চিত হওয়ায় অনেক মানুষ নতুন দিল্লীর মন্দিরে আসছে। এটা খুব ভালো। সুন্দরভাবে শ্রীবিগ্রহ অর্চনের এই মান বজায় রাখো। (শ্রীল প্রভুপাদের পত্র, ১১ই জুলাই, ১৯৭৬)

আন্তরিক সেবার প্রমাণ

শ্রীবিগ্রহ আন্তরিক সেবার প্রমাণ। (শ্রীল প্রভুপাদের পত্র, ১০ই নভেম্বর, ১৯৭৫)

বৈকুণ্ঠ বাস

মন্দিরে কার্যবিধির অভ্যাসের মাধ্যমে আমরা এখনই বৈকুণ্ঠে বাস করছি। (শ্রীল প্রভুপাদের পত্র, ৬ই নভেম্বর, ১৯৭৪)

স্বাভাবিক কৃষ্ণ-স্মরণ

আমরা আমাদের মন্দিরে শ্রীবিগ্রহ অর্চন প্রচলনও করেছি যাতে সারাদিন ধরে কেউ স্বাভাবিক ভাবে কৃষ্ণ-স্মরণ করেন। তিনি কত দয়ালু। (শ্রীল প্রভুপাদের পত্র, ৭ই অক্টোবর, ১৯৭৪)

দেহ, মন ও বুদ্ধির শুদ্ধতা সংরক্ষণ

শ্রীবিগ্রহগণের সেবা-সৌকর্যে আমরা দেহ, মন ও বুদ্ধিতে শুদ্ধতা পেতে পারি। (শ্রীল প্রভুপাদের পত্র, ৪ঠা নভেম্বর, ১৯৭৩)

কাম সংবরণ

কাম সংবরণ অন্য ব্যাপার। তোমাদের শ্রীবিগ্রহ অর্চন করতে হবে। কৃষ্ণ মদনমোহন...আমি নিশ্চিত যে, এই পন্থার সঙ্গে নিয়মিত হরিনাম কীর্তন কামের মৃত্যু ঘটাবে। এই ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকো। (শ্রীল প্রভুপাদের পত্র, ৭ই অক্টোবর, ১৯৬৮)

হৃদয়ের সৌন্দর্যবিধান ও অপ্রাকৃত পরম সুখ অনুভব

আমি আনন্দিত যে, তোমরা তোমাদের মন্দির সুন্দরভাবে সাজাচ্ছো। মন্দিরকে যত বেশি সুন্দর করে সাজাবে তোমাদের হৃদয় তত বেশি সুন্দর হবে। উদাহরণ — আসলকে তোমরা যত সাজাবে প্রতিচ্ছবিও ততই স্বাভাবিকভাবে সজ্জিত হবে। আমাদের হৃদয় হলো মূল চেতনা কৃষ্ণের প্রতিচ্ছবি। যতই কৃষ্ণ ও তাঁর সব কিছুকে সাজানো হবে ততই তার প্রতিফলন পড়বে আমাদের হৃদয়ে। তখন তোমরা অপ্রাকৃত পরম সুখ অনুভব করবে। (শ্রীল প্রভুপাদের পত্র, ২৭শে অক্টোবর, ১৯৬৯)

যবন ও ম্লেচ্ছদের আধ্যাত্মিক জীবনে নিয়ে আসা

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচারকেরা বাস্তবে এই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন যে, নারদ মুনির পঞ্চরাত্র বিধি অনুসরণে যবন ও ম্লেচ্ছরাও আধ্যাত্মিক জীবন আরম্ভ করেছে। যখন মনুষ্যসমাজ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুমোদন প্রাপ্ত গুরুশিষ্য পরম্পরা অনুসরণ করছে তখন পৃথিবীর প্রত্যেকে তার সুফল পাবে। (ভাগবত ৪/২৭/২৬ তাৎপর্য)।

প্রত্যক্ষ উৎসাহ লাভ

উদ্ধবকে বদরিকাশ্রমে যেতে উপদেশ দেওয়ার কারণগুলির মধ্যে এটি একটি। সেখানে ভগবান নিজেকে নরনারায়ণ মূর্তিতে প্রকাশ করেছেন। যিনি অপ্রাকৃত স্তরে উন্নীত তিনি মন্দিরের বিগ্রহের কাছে প্রত্যক্ষ উৎসাহ পেতে পারেন। সেই কারণে ভগবানের ভক্ত সব সময় তাঁর একটি সর্বজন স্বীকৃত মন্দিরের আশ্রয় নেন যাতে ভগবানের কৃপায় তিনি অপ্রাকৃত জ্ঞানের একটি বাস্তব অগ্রগতি লাভ করেন। (ভাগবত ৩/৪/৩০ তাৎপর্য)

সর্ব বেদ অধ্যয়ন

যে ব্যক্তি শ্রীবিগ্রহের অথবা মন্দিরে ভগবানের মূর্তির অর্চনে নিযুক্ত থাকেন তিনি প্রতিদিন ২৪ ঘণ্টা বেদ পাঠ করছেন ধরা হয়। শুধুমাত্র মন্দিরে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ সজ্জিত করে একজন সব বৈদিক বিধি সবিশেষ পাঠ করেন। এমনকি একজন নব দীক্ষিত ভক্ত শুধুমাত্র শ্রীবিগ্রহের অর্চনে নিয়োজিত থেকে বৈদিক জ্ঞানের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসেন বলে ধরা হয়। তার স্বীকৃতিতে ভগবদ্গীতায় (১৫/১৫) বলা হয়েছে—বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো—বেদের উদ্দেশ্য হলো তাঁকে অর্থাৎ কৃষ্ণকে জানা। যে ব্যক্তি কৃষ্ণকে প্রত্যক্ষভাবে অর্চন ও সেবা করেন তিনি বেদের সত্য উপলব্ধি করেছেন। (ভাগবত ৪/৭/৪৬ তাৎপর্য)

দারিদ্র্য থেকে মুক্তি

আমরা নারায়ণের (কৃষ্ণ) সঙ্গে লক্ষ্মীর (রাধারাণী) অর্চন করি। আমরা বিভিন্ন স্থানে অর্থ সংগ্রহ করি। কিন্তু সেই অর্থ রাধা-কৃষ্ণ (লক্ষ্মী-নারায়ণ) ছাড়া কারও নয়। যদি লক্ষ্মী-নারায়ণের সেবায় অর্থ নিয়োজিত হয় তা হলে ভক্ত স্বাভাবিকভাবে এক উন্নত পন্থায় জীবন যাপন করেন। (ভাগবত ৫/১৪/২৪ তাৎপর্য)

শ্লোক ৫ : 'হে পদ্মলোচন, হে চরাচরের সর্বেশ্বর, তোমার ভক্তকে কর্মবন্ধন থেকে মুক্তির পথ দেখাও।

ব্যাখ্যা : শুদ্ধ ভক্তি লাভের জন্য জড়কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হবে। নিয়মানুসারে শ্রীবিগ্রহের অর্চন করে নীচে উপস্থাপিত ফললাভ করা যায় :

পৃথক প্রচেষ্টা ছাড়াই মুক্তি

ভগবানের আকর্ষণীয় হাস্যোজ্জ্বল অপূর্ব রূপ দর্শন করে, তাঁর মধুর বাণী শ্রবণ করে শুদ্ধ ভক্ত তাঁর চেতনা হারিয়ে ফেলেন। তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি অন্য সমস্ত কার্যকলাপ থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় মগ্ন হয়। তাঁর মুক্তিলাভের ইচ্ছা না থাকলেও, তিনি আপনা থেকেই মুক্ত হয়ে যান। (ভাগবত ৩/২৫/৩৬)

অপ্রত্যক্ষ মুক্তি

তিন প্রকার ভক্ত রয়েছেন—উত্তম ভক্ত, মধ্যম ভক্ত, এবং কনিষ্ঠ ভক্ত। কনিষ্ঠ শ্রেণীর ভক্তরাও মুক্ত আত্মা। এই শ্লোকে বলা হয়েছে যে,

যদিও তাঁদের জ্ঞান নেই, তবুও শুধু মন্দিরে শ্রীবিগ্রহের সাজসজ্জা দেখে ভক্ত তাঁর রূপে মগ্ন হন আর সব চেতনা হারিয়ে ফেলেন। শুধুমাত্র কৃষ্ণভাবনামৃতে মগ্ন হওয়ার ফলে, ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবদ্‌সেবায় যুক্ত করার ফলে অজ্ঞাতভাবেই তাঁরা মুক্তি লাভ করেন। এমন কি কনিষ্ঠ ভক্ত যিনি পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞানে খুব একটা উন্নত নন, পরম সত্যের জ্ঞান লাভে বেশী দূর অগ্রসর হতে পারেননি, কিন্তু অসীম ভক্তি সহকারে ভগবানকে শুধু প্রণতি নিবেদন করেন, তাঁকে চিন্তা করেন, মন্দিরে অর্চাবিগ্রহ দর্শন করেন আর ফুল ফল সংগ্রহ করে তাঁকে নিবেদন করেন তিনিও অজ্ঞাতসারে মুক্ত। গভীর শ্রদ্ধা সহকারে ভক্তরা শ্রীবিগ্রহকে সম্মান করেন এবং নৈবেদ্য নিবেদন করেন। রাধা-কৃষ্ণ, লক্ষ্মী-নারায়ণ ও সীতা-রামের বিগ্রহ তাঁদের কাছে খুবই আকর্ষণীয়। এমন হয় যে যখন তাঁরা ভগবানকে মন্দিরে সুসজ্জিত দেখেন তখন তাঁরা তাঁর চিন্তায় বিভোর হন। এই হচ্ছে মুক্ত অবস্থা। পক্ষান্তরে এটাই প্রতিপন্ন হয় যে, একজন কনিষ্ঠ শ্রেণীর ভক্তও অপ্রাকৃত স্তরে বিরাজ করেন এবং যাঁরা অনুমান ভিত্তিক বা অন্য পদ্ধতির নির্ভরতায় মুক্তির জন্য চেষ্টা করেন তাঁদের চেয়েও একজন কনিষ্ঠ ভক্ত উন্নত স্তরে অধিষ্ঠিত। এমন কি শুকদেব গোস্বামী ও চার কুমারের মতো নির্বিশেষবাদীরাও মন্দিরে শ্রীবিগ্রহের সৌন্দর্যে ও সাজ-সজ্জায় এবং ভগবানে সমর্পিত তুলসীর সৌরভে আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং ভক্ত হয়েছিলেন। যদিও তাঁরা মুক্ত অবস্থায় ছিলেন তবুও নৈর্ব্যক্তিক বা নির্বিশেষবাদী না থেকে তাঁরা ভগবানের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং ভক্ত হয়েছিলেন। (ভাগবত ৩/২৫/৩৬)

শ্রীবিগ্রহ-স্পর্শে পারমার্থিক দেহ লাভ হয়

অর্চন পদ্ধতিতে শ্রীবিগ্রহের প্রতিদিনের অর্চনে ভগবানের অঙ্গ স্পর্শ করার সুযোগ লাভ হয়। এর ফলে চিন্ময় দেহ লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করে ভগবানের দিব্যধামে ফিরে যাওয়া যায়। শুধুমাত্র ভগবানের অঙ্গ স্পর্শই নয়, তাঁর লীলা শ্রবণ, তাঁর মহিমা কীর্তন, তাঁর শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ এবং তাঁর অর্চনা করার মাধ্যমে অন্য কথায় যে-কোন পন্থায় ভগবানের সেবা করার ফলে জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। পরমেশ্বরকে স্পর্শ করার এই ফল হয়ে থাকে। (ভাগবত ৮/৪/৬ তাৎপর্য)।

শ্লোক ৬ : পরমেশ্বর ভগবান বললেন, হে উদ্ধব! শ্রীবিগ্রহ অর্চনের জন্য অসংখ্য বৈদিক পন্থার কোনও অন্ত নেই; এ বিষয়ে আমি তোমাকে পর্যায়ক্রমে সংক্ষেপে বর্ণনা করব।

ব্যাখ্যা : শ্রীল রূপ গোস্বামী ভক্তির পথে সব নীতি ও তাদের ব্যাপকতার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেছেন। আগের শ্লোকে 'অসংখ্য বৈদিক পন্থা' কথাগুলি শ্রীবিগ্রহ অর্চনের ব্যাপকতার ইঙ্গিত দেয়। *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্চনের নীতিগুলির উপর জোর দিয়েছেন। নীতিগুলির প্রয়োগ পদ্ধতির তারতম্য হতে পারে। নীতিগুলি ভালো করে আয়ত্ত হলে ব্যাপকতাগুলিকে ঠিকঠিক ভাবে যথা সময়ে কাজে লাগানো যায়। শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর *ভক্তিসন্দর্ভ* গ্রন্থে শ্রীবিগ্রহ অর্চনের বিষয়টি আলোচনা করেছেন।

শ্লোক ৭ : বৈদিক, তান্ত্রিক ও মিশ্র এই তিনটি পদ্ধতির মাধ্যমে আমি যজ্ঞফল আস্বাদন করি। তাদের যে কোন একটি নির্বাচন করে আমাকে অর্চন করতে হবে।

ব্যাখ্যা : পঞ্চরাত্র-বিধি বৈদিক ও তান্ত্রিক পদ্ধতির অর্চন। এই বিধিতে বৈদিক অর্চনের সেই বিষয়গুলি রয়েছে যা বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট। আর তাতে আছে তন্ত্রের সেই সব বিষয় যা সাত্ত্বিক। তান্ত্রিক অর্চনের তুলনায় বৈদিক অর্চনে সাধারণত কম কিন্তু বড় বড় ও সহজ মন্ত্র রয়েছে এবং সেগুলির উপলব্ধিও সরল। বৈদিক মন্ত্রগুলিকে সোজাসুজি বৈদিক সংহিতাগুলি (ঋক, সাম, যজু ও অথর্ব) থেকে নেওয়া হয়েছে। তান্ত্রিক মন্ত্রগুলিকে তন্ত্র আগম গুলি (বেদের সংযোজন) থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। বিভিন্ন ঋষি সেগুলিকে বেদের ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক অংশ থেকে আহরণ করেছেন। শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী সংকলিত ও শ্রীল সনাতন গোস্বামী সম্পাদিত *হরিভক্তিবিলাস* গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের জন্য পঞ্চরাত্রবিধির একখানি প্রামাণিক সংক্ষিপ্তসার। এতে বৈদিক তান্ত্রিক ও পঞ্চরাত্রিকার প্রায় দুশোর বেশী শাস্ত্রের উদ্ধৃতি আছে।

> *গোস্বামীরা বৈদিক আচারগুলির চেয়ে পঞ্চরাত্রিক রীতির শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়াকে বেশী পছন্দ করেন। এই শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়া কলিযুগের মানুষদের জন্যই অনুমোদিত। (ভাগবত ১/১২/১৩ তাৎপর্য)*

পঞ্চরাত্র সাহিত্য আর পঞ্চরাত্রিক অর্চন পদ্ধতিকে কখনও কখনও 'বৈষ্ণবতন্ত্র' বলা হয়।

শ্লোক ৮ : এখন মনোযোগ দিয়ে শোনো বৈদিক ধারা অনুযায়ী যাঁর দুবার জন্ম হয়েছে তিনি কিভাবে ভক্তি সহকারে আমার অর্চন করবেন।

ব্যাখ্যা : *হরিভক্তিবিলাস* সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন দ্বিজ প্রত্যাশাসম্পন্ন ব্যক্তির যোগ্যতা কি কি হবে। শ্রীবিগ্রহ অর্চনের আগে যোগ্য গুরুর কাছে প্রকৃত দীক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং সদাচার বা প্রকৃত বৈষ্ণব আচরণ শিক্ষা করতে হবে। গুরুদেবের দায়িত্ব হল শিষ্যকে কৃষ্ণচেতনার সেই সেই বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া যাতে যথার্থ মনোবৃত্তি সহকারে সে শ্রীবিগ্রহ অর্চন করতে পারে। শিষ্য নিজে গুরুদেবের কাছে জেনে নেবে কোন্ আচরণ ও অর্চনে ভগবান সন্তুষ্ট হবেন।

শ্লোক ৯ : দ্বিজ আমাকে অর্থাৎ তার আরাধ্য ভগবানের অর্চন করবে কোন রকম দ্বিচারিতা না করে। পরম ভক্তিতে সে আমার বিগ্রহ রূপকে অথবা ভূমিতে, অগ্নিতে, সূর্যালোকে, জলে বা অর্চনকারীর হৃদয়ে আবির্ভূত বিগ্রহকে যথাযোগ্য উপাচারে অর্চন করবে।

ব্যাখ্যা : ভগবানকে নানা রূপে ও উপাদানে অর্চন করা যায়। এগুলির জন্য প্রদেয় যথাযোগ্য উপচার আছে। ভিক্ষু সন্ন্যাসীরা অনেক সময় মাটিতে যন্ত্র এঁকে ভগবানকে নানা মন্ত্রে ফুল ও জল নিবেদন করে পূজা করে। অগ্নিতে আহুতি দিয়ে, বিশেষত পঞ্চরাত্রিক নিত্যহোম করে প্রতিদিন অনেক মন্দিরে ভগবানের পূজা হয়। রোদে দাঁড়িয়ে ব্রহ্মগায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করে ও অর্ঘ্য দান করে ভগবানের পূজা হয়। জলে দাঁড়িয়ে (পবিত্র নদীতে বা হ্রদে জল দান করে) বা একটি কলসীতে উপচার সাজিয়ে তাঁকে পূজা করা যায়। মনে মনে পূজা দিয়ে কেউ মানস পূজা করতে পারে। কিন্তু সমস্ত পূজার মধ্যে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ অর্চন শ্রেষ্ঠ। কারণ তাতে নিজের আকর্ষক গুণাবলী প্রকাশ করে ভগবান সহজেই তাঁর কৃপা দান করেন এবং সেবক শ্রীবিগ্রহ অর্চনে সব চেয়ে ভালো সেবা সহজেই করে উঠতে পারে।

শ্লোক ১০ : অর্চনকারী প্রথমে দাঁত মেজে ও স্নান করে তাঁর দেহ পরিষ্কার করবেন। এরপর তাঁর শরীরটিকে মাটি দিয়ে মেজে এবং বৈদিক ও তান্ত্রিক মন্ত্র উচ্চারণ করে তিনি দ্বিতীয়বার পরিষ্কৃত হবেন।

ব্যাখ্যা : এখানে উল্লেখিত মাটি কথাটিকে দুভাবে বুঝতে পারা যায় : ১) পৃথ্বী স্নান—শরীরটিকে জলে ভিজিয়ে ডুব দেওয়ার আগে মাটি সাবানের মতো ব্যবহার করা যায়। ২) ঊর্ধ্ব পুণ্ড্র—শরীরে তিলক অঙ্কন। স্নানের পর শরীরে তিলক ব্যবহার দ্বিতীয়বারের শুদ্ধিকরণ বলে মনে করা হয়।

শ্লোক ১১ : আমাতে মন নিবিষ্ট করে দিনে তিনবার গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণের মতো বিভিন্ন নির্ধারিত কর্তব্য পন্থায় আমাকে অর্চনা করতে হবে। এই কার্যবিধি বেদ-নির্দিষ্ট এবং জড় কর্মের প্রতিক্রিয়া থেকে অর্চনকারীকে শুদ্ধতা এনে দেয়।

ব্যাখ্যা : এই শ্লোকটি এবং পূর্বেরটি অভিগমনের সংক্ষিপ্তসার রচনা করেছে। এই অভিগমন পঞ্চাঙ্গ পূজা বা পাঁচ রকমের পূজার প্রথম অঙ্গ।

শ্লোক ১২ : বলা হয়েছে এই জড়জগতে ভগবানের অর্চা শ্রীবিগ্রহ আট রকমের—শিলাময়ী, কাষ্ঠময়ী, ধাতুময়ী, মৃন্ময়ী, চিত্রপটময়ী, বালুকাময়ী, মনোময়ী এবং মণিময়ী।

ব্যাখ্যা : প্রতিষ্ঠা ও অর্চনের জন্য শ্রীবিগ্রহ নির্মাণের আগে বিশেষ কোন বস্তু ব্যবহারের পূর্বে বিভিন্ন বস্তুর স্থায়িত্বের বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। এই শ্লোকে যে সব বস্তুর কথা বলা হয়েছে সেগুলি ছাড়াও শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীবিগ্রহ নির্মাণের

জন্য রাসায়নিক বস্তুর ব্যবহার অনুমোদন করেছেন। দুর্ভাগ্যবশত ইসকনের কয়েকটি শ্রীবিগ্রহ রাসায়নিক বস্তুতে নির্মিত হওয়ার পর প্রমাণিত হয়েছে যে, পূর্বে যা আশা করা গিয়েছিল তার চেয়ে কম সময়ের জন্য ঐ নির্মাণ স্থায়ী হয়েছে।

অর্চন উপযোগী চিত্র : আট রকমের শ্রীবিগ্রহের একটি হল আলেখ্য চিত্রপট।* চিত্র-মূর্তিকেও ভক্ত বিভিন্ন উপচারে অর্চন করতে পারেন। অর্চনকারী এ ক্ষেত্রে সাক্ষাৎভাবে চিত্র-মূর্তির স্নান ও বেশ সম্পন্ন করতে পারেন না। তা না হলেও তিনি সহজ ও পরিপূর্ণ ধারায় প্রথম খণ্ডের ৩-৪ অধ্যায়ে বর্ণিত পদ্ধতিতে অর্চন করতে পারেন। বিশেষ করে ছোট ছোট মন্দিরে ও বাড়িতে যেখানে পঞ্চতত্ত্ব চিত্র আছে সেখানে ভক্ত অর্চন করতে পারেন। যে মন্দিরে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছেন সেখানে ভক্তরা প্রস্তুতির জন্য চিত্র অর্চন করতে পারেন এবং ভবিষ্যতে পূর্ণ শ্রীবিগ্রহের অর্চনের 'অভ্যাস' গড়ে তুলতে পারেন।

শ্লোক ১৩ : জীবের আশ্রয়স্থল ভগবানের শ্রীবিগ্রহ দুইভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায়—অস্থায়ী অথবা স্থায়ী। কিন্তু হে উদ্ধব, যে শ্রীবিগ্রহকে স্থায়ী বলা হয়েছে তা কখনও স্থানচ্যুত করা যায় না।

ব্যাখ্যা : স্থায়িত্বসম্পন্ন বস্তুর দ্বারা নির্মিত শ্রীবিগ্রহ দুই ধরনের—স্থির ও স্থানান্তরযোগ্য। স্থির শ্রীবিগ্রহের ক্ষেত্রে ভগবান একবারই প্রতিষ্ঠিত হন এবং পূজার সময় তাঁকে আহ্বানের (উপস্থিত হতে বলার) প্রয়োজন নেই। কিছু স্থানান্তরযোগ্য মূর্তির ক্ষেত্রে ভগবানকে ঐ একই ভাবে একবারের জন্য প্রতিষ্ঠিত করা হয়। অস্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহের ক্ষেত্রে পূজারী অবশ্যই প্রতিবার অর্চনের আগে ভগবানকে প্রতিষ্ঠা করবেন। বৈষ্ণবরা সাধারণত কোন উপলক্ষ্যে অর্চিত অনুষ্ঠানের শ্রীবিগ্রহের ক্ষেত্রে এ রকম করেন। কখনও কখনও উৎসবের সময় অস্থায়ী বস্তু যেমন মাটি, বালি, গোবর, চন্দনের আঠা, চালের গুঁড়ো, তালমিছরি বা মাখন দিয়ে মূর্তি তৈরী করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, গোবর্ধন পূজার সময় ব্রজবাসীরা প্রথাগতভাবে গোবর দিয়ে গিরিরাজ মূর্তি সম্পূর্ণ করেন।

শালগ্রাম শিলার প্রাণপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজন নেই। শালগ্রাম ভগবানের নিত্য বিগ্রহ। ভক্তরা প্রায়ই ভগবানের মূর্তি পছন্দ করেন। কারণ তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হওয়ায় ভগবানের নিত্য রূপের অপ্রাকৃত সৌন্দর্য উপলব্ধিতে সাহায্য করে এবং তাদের সেবা কাজে উদ্বুদ্ধ করে। শালগ্রাম শিলাকে মণিময়ী শ্রীবিগ্রহের বা রত্ননির্মিত শ্রীবিগ্রহের একটি রূপ ভাবা যেতে পারে যা এই শ্লোকে বর্ণিত আট রকম শ্রীবিগ্রহের একটি।

ছোট আকৃতিযুক্ত স্থানান্তরযোগ্য শ্রীবিগ্রহ : যেহেতু ধাতু নির্মিত ছোট ছোট অর্চামূর্তিকে নানা উপচারে অর্চনের সুবিধা আছে তাই মন্দিরগুলিতে সাধারণত

---

* প্রকৃতপক্ষে শ্রীবিগ্রহের হস্ত অঙ্কিত চিত্রপট অধিক গ্রহণযোগ্য বা অঙ্কিত চিত্রপটের আলেখ্য।

একটি বা তার বেশী ছোট মূর্তির সঙ্গে একটি বড় মূর্তি স্থাপন করা হয়। ঐ (ছোট) মূর্তিকে স্থায়ী বড় মূর্তির সঙ্গে অভিন্ন মনে করা হয়। বড় আকৃতির শ্রীবিগ্রহগুলিকে নানাভাবে পোশাক পরানো ও সাজানো হলেও যে সমস্ত সেবা যেমন, স্নান, ভোগদান, বিশ্রাম ব্যবস্থা বড় আকৃতির শ্রীবিগ্রহের জন্য সম্পাদন করা বিসদৃশ হয়ে পড়ে সেইজন্য সেই ছোট মূর্তি ও শালগ্রাম শিলাকে অর্চনের মাধ্যমে সমাপন করা যায় এবং বিশেষ বিশেষ উৎসবের সময় ছোট বিগ্রহকে বাইরে নিয়ে যাওয়া যায়। যখন দুই বা তার বেশী ছোট বিগ্রহ থাকে তখন প্রত্যেক বিগ্রহকে বিশেষ কোন সেবার ক্ষেত্রে কাজে লাগানো যায়—এক বিগ্রহকে সংশ্লিষ্ট উপচারে স্নান করানো যায়, দ্বিতীয় বিগ্রহকে শোভাযাত্রায় আনা যায় বা ঝুলনযাত্রায় দোলনায় বসানো যায় আর বাকি বিগ্রহ ভোগ গ্রহণ করতে পারেন। এইভাবে অন্যান্য বিগ্রহের ক্ষেত্রে এক-একটা ব্যবস্থা চলবে।

অর্চনের মান : ভূমিকায় আগেই আলোচিত হয়েছে যে, কি ধরনের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার উপর নির্ভর করবে কিভাবে তাঁর অর্চন হবে। শ্রীবিগ্রহটি মূল মন্দিরের কিনা, বা কোন বিশেষভাবে বা বিশেষ উৎসবে তা অর্চিত হচ্ছে কিনা, তা একটি সাধারণ উৎসবের মূর্তি কিনা অথবা তা কোন গৃহস্থ বাড়ীর শ্রীবিগ্রহ কিনা দেখতে হবে। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই অর্চন শ্রীবিগ্রহে ভগবানের উপস্থিতি জ্ঞাপন করবে। তাই সব শ্রীবিগ্রহ অর্চন গুরুদেবের নির্দেশে করতে হবে। গুরুদেব শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন অথবা করান, এবং তাঁর ও তাঁর প্রতিনিধিদের আনুগত্যে নির্দিষ্ট শ্রীবিগ্রহের অর্চন পদ্ধতি অনুসারে পরিচালিত তাঁর শিষ্যদের অর্চন নিজে উপস্থিত হয়ে গ্রহণ করতে তিনি ভগবানকে প্রার্থনা জানান।

শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা : গুরুদেব কর্তৃক শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার উৎসব খুব সাধারণ হবে কিংবা জাঁকজমকপূর্ণ হবে তা নানা বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু প্রতি ক্ষেত্রেই বুঝতে হবে যে, শ্রীবিগ্রহে ভগবানের উপস্থিতি ঘটেছে। প্রতিষ্ঠার সময় অর্চনের যে যে মান নির্দিষ্ট হয়েছে, সেইগুলি অনুসরণে সব সময় শ্রীবিগ্রহকে অর্চন করতে হবে। এমন কি শ্রীবিগ্রহের যদি বৎসরে একটি উৎসবে অর্চন হয় (যেমন রথযাত্রায় জগন্নাথ শ্রীবিগ্রহগুলি) তা হলে ঠিক করে নিতে হবে উৎসবটি প্রতি বৎসর পালন করা যাবে কিনা এবং যখন সেই উৎসব হবে তখন শ্রীবিগ্রহদের কি কি সেবা করা যাবে। যদি কোন ভ্রমণকারী প্রচারক দলের জন্য কোন শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয় তা হলে যাঁরা তাঁর অর্চন করবেন তাঁরা নানা উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কিভাবে তাঁর অর্চন হবে তা ঠিক করবেন।* অর্চনের এই সমস্ত পন্থা অবশ্য লিখিত থাকবে এবং ভবিষ্যতের কাজের সুবিধার্থে রক্ষিত হবে।

* বাস্তবে এমন পরিস্থিতি আসতে পারে যখন সব সাধারণ পদ্ধতি মেনে ভ্রমণকারী শ্রীবিগ্রহের অর্চন অসম্ভব হতে পারে। এই সব শ্রীবিগ্রহের পূজারীদের একটি পরিবর্ত ব্যবস্থা থাকবে। যেমন, শ্রীবিগ্রহের চিত্র অর্চন অথবা অন্ততপক্ষে ভগবানের মানস-পূজা।

শ্লোক ১৪ : অস্থায়ী ভাবে যে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয় তাঁকে ইচ্ছা করলে আহ্বান করে বিসর্জন দেওয়া যায়। যখন মাটিতে শ্রীবিগ্রহের রূপ চিত্রিত হয় তখন এই দুটি রীতি অবশ্যই পালন করতে হয়। মাটি, রং অথবা কাঠের তৈরী শ্রীবিগ্রহগুলির ক্ষেত্রে জল ব্যবহার না করে তাঁদের পরিচ্ছন্নতা সম্পাদন করতে হবে। অন্যান্য ক্ষেত্রে জলে শ্রীবিগ্রহগুলির স্নান করানো হবে।

ব্যাখ্যা : কাঠ, মাটি প্রভৃতি দিয়ে তৈরি শ্রীবিগ্রহের পরিচ্ছন্নতার জন্য তাঁর স্নানের আগে যে ব্যাপক অঙ্গ মার্জন তাকে মূর্তি-শুদ্ধি বলে। শ্রীবিগ্রহ যদি সহজে নষ্ট হয়ে যাওয়া উপাদানে তৈরি হয় তা হলে খুব সামান্য ভিজা এক টুকরো কাপড় দিয়ে প্রথমে তাঁর শ্রীঅঙ্গ ব্যাপকভাবে মার্জন করতে হবে। তারপর ভগবানের সম্মুখে রাখা স্নানপাত্রে একটি শঙ্খ থেকে জল নিয়ে শ্রীবিগ্রহের স্নান করানো যেতে পারে। এ রকম করার সময় পূজারী একটি ঘণ্টা বাজাবেন ও ব্রহ্মসংহিতা থেকে মন্ত্র বলবেন। স্নানপাত্রে তিনি একটি আয়না রাখবেন যাতে ভগবানের অভিন্ন প্রকাশ মূর্তি শ্রীবিগ্রহের চিত্র দেখা যায়। এইভাবে জগন্নাথ বিগ্রহের স্নান করাতে হবে।

শ্লোক ১৫ : সর্বোৎকৃষ্ট পূজা উপচারে আমার শ্রীবিগ্রহের অর্চন করতে হবে। কিন্তু যে ভক্ত সম্পূর্ণভাবে জড়-আকাঙ্ক্ষামুক্ত তিনি যা সংগ্রহ করবেন তাই দিয়ে আমার অর্চন করতে পারেন। এমনকি তিনি মন-উপচারে তাঁর হৃদয় মধ্যে আমার অর্চন করতে পারেন।

ব্যাখ্যা : সাধারণ মন্দিরে বহিরঙ্গে সব সময় বৈধীভক্তি মার্গে অর্চন সম্পাদিত হয়। এমনকি যে ভক্ত স্বতঃ উৎসারিত ভক্তির পথিক তিনিও মন্দিরে অর্চন করার সময় মন্দিরের নিয়ম-কানুন মেনে চলবেন।

পূজা উপচার : সাধারণ মন্দিরের পূজারী সাধ্যমতো শ্রেষ্ঠ উপচার ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদনের চেষ্টা করবেন। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরমেশ্বর ভগবান হলেন শ্রেষ্ঠ ভোক্তা। এই উপলব্ধির বৃদ্ধির জন্য ভক্তগণ ভগবানকে সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু অর্পণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবেন। এর আদর্শ উদাহরণ রাঘব পণ্ডিত। তিনি শ্রীবিগ্রহের বিবেকবান সেবার জন্য শ্রীচৈতন্যের উচ্চ প্রশংসা পেয়েছিলেন।

অর্চনের জন্য বস্তু-নির্বাচন : রাঘব পণ্ডিতের শুদ্ধ ভক্তি

> *শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রত্যেককে তখন জানালেন, "রাঘব পণ্ডিত কৃষ্ণের প্রতি যে শুদ্ধ ভক্তি প্রদর্শন করেছিলেন তা শোনো। বাস্তবিকই রাঘব পণ্ডিতের সেবা অত্যন্ত পবিত্র ও নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা। অন্য সামগ্রীর কথা ছেড়ে তাঁর নারকেল নিবেদনের কথা শোনো। পাঁচ গণ্ডায় একটি নারকেল বিক্রি হতো। যদিও তাঁর শত শত নারকেল গাছ আর হাজার*

হাজার ফল ছিল তবুও কোথায় মিষ্টি নারকেল পাওয়া যায় তা জানার জন্য তিনি ব্যগ্র থাকতেন। কুড়ি মাইল দূর থেকে অনেক কষ্টে তিনি নারকেল সংগ্রহ করতেন আর একটির জন্য চারপণ দিতেন। প্রতিদিন ৫/৭ টি নারকেল ছাড়ানো হতো আর ঠাণ্ডা রাখার জন্য জলে ডুবিয়ে রাখা হতো। ভোগদানের সময় সেই নারকেলগুলি পুনরায় ঘষে পরিষ্কার করা হতো। ফুটো করার পর সেগুলিকে কৃষ্ণের কাছে অর্পিত হতো। কৃষ্ণ নারকেলগুলির জল পান করতেন। কখনও কখনও সেগুলির জল পড়ে যেত। আবার কখনও সেগুলি জলে ভর্তি থাকতো। রাঘব পণ্ডিত যখন দেখতেন যে, নারকেলগুলির জল পান করা হয়েছে তখন তিনি খুব খুশী হতেন। তিনি এবার নারকেলগুলি ভেঙে তা শাঁস বের করে আর একখানি থালায় রাখতেন। ভগবানের উদ্দেশ্যে ঐ শাঁস নিবেদন করে তিনি দরজার বাইরে ধ্যানমগ্ন হতেন। ভগবান কৃষ্ণ শাঁস খেয়ে পাত্রখানিকে খালি করে দিতেন। কখনও কখনও শাঁস খেয়ে তিনি নতুন শাঁস দিয়ে পাত্রখানি ভর্তি করে রাখতেন। এইভাবে রাঘব পণ্ডিতের বিশ্বাস বাড়তে লাগল এবং তিনি প্রেমসাগরে ভাসতে লাগলেন। একদিন হল কি, একজন সেবক শ্রীবিগ্রহকে নিবেদন করার জন্য ১০টি নারকেল যথাযথভাবে ছাড়ালো। যখন সেগুলিকে আনা হল তখন খুব দেরি হয়ে গিয়েছিল এবং অর্পণের জন্য অল্প সময় ছিল। সেবকটি নারকেলের পাত্রখানি ধরে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকল। রাঘব পণ্ডিত দেখলেন যে সেবকটি দরজার উপরের কাঠ যে হাতে স্পর্শ করেছে সেই হাতেই নারকেলগুলি ধরেছে। রাঘব পণ্ডিত বললেন, "দরজাটি দিয়ে সব সময় লোকজন যাতায়াত করছে। তাদের পায়ের ধুলো উড়ে ঐ কাঠে লাগছে। দরজার উপরের কাঠ ছুঁয়ে তুমি নারকেলগুলি স্পর্শ করেছ। এখন সেগুলি আর কৃষ্ণকে অর্পণ করা যাবে না। কারণ সেগুলি দোষযুক্ত হয়েছে।" রাঘব পণ্ডিতের সেবা এই রকম ছিল। তিনি নারকেলগুলি নিবেদন করার জন্য নিলেন না। সেগুলি প্রাচীরের বাইরে ফেলে দিলেন। অবিমিশ্র প্রেমে পূর্ণ ছিল তাঁর সেবা। তা সমস্ত জগৎকে জয় করেছিল। এর পর রাঘব পণ্ডিত আলাদা কিছু নারকেল সংগ্রহ করে পরিষ্কার করে আর ছাড়িয়ে ভগবানের সেবার জন্য অর্পণ করেছিলেন। এইভাবে ভাল ভাল কলা, আম, কমলা লেবু, কাঁঠাল আর উৎকৃষ্ট অন্যান্য ফল বহু দূর দূরান্তের জানা গ্রাম থেকে তিনি সংগ্রহ করতেন। এই সমস্ত ফল তিনি দূরের জায়গা থেকে উচ্চমূল্যে কিনতেন। সেগুলিকে সযত্নে শুদ্ধভাবে পরিশোধিত করে তিনি শ্রীবিগ্রহকে অর্পণ করতেন। এইভাবে অনেক যত্নে ও মনোযোগী হয়ে তিনি শাক, নানা সবজী, মূলা, ফল, চিড়ে, গুঁড়ো চাল আর মিষ্টি প্রস্তুত করতেন। তিনি পিঠা, পরমান্ন, ক্ষীর আরও

অনেক কিছু খুব মনোযোগ সহকারে তৈরী করতেন। রান্না এত পবিত্র হতো যে খাদ্য প্রথম শ্রেণীর ও সুস্বাদু হতো। রাঘব পণ্ডিত কাসুন্দির মতো বস্তু ও আচার ভগবানকে নিবেদন করতেন। তিনি নানা গন্ধদ্রব্য, পোশাক, অলংকার ও সব কিছুর ভাল জিনিসটি ভগবানকে দিতেন। এইভাবে রাঘব পণ্ডিত অতুলনীয় পন্থায় ভগবানের সেবা করতেন। তাঁকে শুধুমাত্র দর্শন করে প্রত্যেকে খুব সন্তুষ্ট হতেন। (শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ১৫/৬৯-৯১)

অর্চনের বিভিন্ন উপচারের বিকল্প

শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্যে শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন—

দেশ-কাল বলতে আমরা বুঝি 'সময় ও দেশ অনুযায়ী'...শ্রীবিগ্রহের বিভিন্ন উপচার যেমন ফুলের মালা, ফল এবং সব্জী দেশ অনুযায়ী ও প্রাপ্তির সুযোগ অনুযায়ী সংগ্রহ করতে হবে। (ভাগবত ৪/৮/৫৫ তাৎপর্য)।

যদি ভগবানের অর্চনে কোন উপচার না থাকে তা হলে তোমরা ফুল, ধান, বার্লি, তুলসী পাতা অথবা বিশুদ্ধ জল বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করতে পারো। (সব চেয়ে সহজলভ্য এবং সাধারণ বিকল্প হল জল ও ফুলের পাপড়ি।) যখন না পাওয়া বস্তুটি অর্পণের সময় আসবে তখন সেই বস্তুটির জন্য নির্দিষ্ট মন্ত্রটি বল এবং বিকল্প বস্তুটি (জল ও অন্য কিছু) অর্পণ করে মূলটির উপস্থিতি চিন্তা কর। তারপর জল বা ফুল পাশে রাখা পাত্রে (বিসর্জন পাত্র) ফেল। এইভাবে যে দরিদ্রের সামান্য কয়েকটি পাত্র, ফুল এবং পবিত্র জল আছে সে মন্ত্র পড়ে, ধ্যান করে আর ভক্তি প্রভাবে ভগবানকে পূর্ণ ঐশ্বর্যভাবে অর্চন করতে পারে এবং তাঁর সর্বোত্তম কৃপা লাভ করতে পারে। আরও জেনে রাখো—যদি কোন বস্তু না থাকে তুমি তার চেয়ে আরও ভালো গুণসম্পন্ন ঐ বস্তু অর্পণ করছো বলে ধ্যান কর। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, ফুলের অভাব থাকায় তুমি একটি ফুল অর্পণ করতে বাধ্য হতে পার—আরতিতে হয়ত ভাল জাতের ফুল অর্পণ করা গেল না—কিন্তু যখন একটি ফুল অর্পিত হচ্ছে তখন তুমি ধ্যানে ভাবতে পার যে তুমি সুগন্ধীযুক্ত এক থালা গোলাপ ভগবানকে নিবেদন করছ। এ রকমের ধ্যান বৃথা যাবে না।

শ্লোক ১৬-১৭ : হে উদ্ধব, মন্দিরের বিগ্রহ অর্চনে সর্বাপেক্ষা সুখকর সেবা হল তাঁর স্নান ও সাজগোজ। কোন পবিত্র ভূমিতে অংকিত বিগ্রহের ক্ষেত্রে তত্ত্ববিন্যাস খুবই মূল্যবান। ঘৃত মাখানো তিলও সব যজ্ঞাগ্নিতে সমর্পণের সবচেয়ে উপযুক্ত বস্তু। উপস্থান ও অর্ঘ্য যোগে অর্চন সূর্য পূজায় খুবই অভিপ্রেত। আমার বারি মূর্তির অর্চনে জল দান করলেই হবে। আসলে শ্রদ্ধাভরে আমার ভক্ত আমাকে যা দেয়—তা যদি সামান্য জলও হয় তবুও তা আমার কাছে মূল্যবান।

ব্যাখ্যা : বিশেষত সাধারণ মন্দিরের অর্চনে পূজারীর ভক্তিতেই শুধু শ্রীবিগ্রহ সন্তুষ্ট হন না। তাই শ্লোকটিতে উল্লেখিত সুন্দর সুন্দর সেবা উপকরণে ভক্তগণ সেখানে তাঁদের অর্চন সম্পন্ন করতে অনলস প্রয়াসী হবেন। শ্রীবিগ্রহের সন্তুষ্টির জন্য তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ গন্ধবস্তু, ফুল, আহার, বস্ত্র ও অলংকার এই পাঁচটি প্রধান জিনিস দিতে হবে বলে শ্রীল প্রভুপাদ নির্দেশ দিয়েছেন। কোন মন্দিরে শ্রীবিগ্রহ অর্চন যত সাধারণ বা আড়ম্বরপূর্ণ হোক না কেন ঐ পাঁচ রকমের উপচার যাতে উঁচু মানের হয় তার জন্য বিশেষ যত্ন নিতে হবে। সাধারণত মন্দিরের চেয়ে বাড়ীর শ্রীবিগ্রহ অর্চন কম জাঁকজমকে হয়ে থাকে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই সব কিছু ভক্তিভরে নিবেদন করতে হবে। শ্লোক ১৫-১৮ উপাদান বা অর্চনের উপচার নির্ণয় ও সংগ্রহের আলোচনায় ব্যাপৃত।

শ্লোক ১৮ : অভক্তজন যদি আমাকে খুব মূল্যবান বস্তু দেয় তা আমাকে সন্তুষ্ট করে না। কিন্তু আমার প্রিয় ভক্তরা যখন আমাকে তুচ্ছতম বস্তুও দেয় তখন আমি খুব সন্তুষ্ট হই। যখন প্রীতিভরে কেউ আমাকে গন্ধ, তৈল, ধূপ, পুষ্প আর উপাদেয় ভোগ নিবেদন করে তখন আমি অবশ্যই খুব সন্তুষ্ট হই।

ব্যাখ্যা : শ্রীবিগ্রহ অর্চনের যথার্থ মনোবৃত্তি জাগাতে ভগবানের সেই সমস্ত লীলা পাঠ, শ্রবণ ও স্মরণ প্রয়োজন যে-গুলিতে তাঁকে তাঁর ভক্তের কাছে কিছু গ্রহণ করতে দেখা যায় ('লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ' নামক গ্রন্থে কিছু ভালো উদাহরণ আছে। যেমন 'যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ-পত্নীদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ' এবং 'সুদামা বিপ্রের কৃষ্ণকৃপা প্রাপ্তি') "স্তবমালার" নীচের প্রার্থনায় শ্রীল রূপ গোস্বামী সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন ভগবানকে কিছু নিবেদন করার সময় কেমন ভক্তির মনোভাব প্রয়োজন হয় :

> *হে মুরারি, তুমি যেমন করে মথুরায় ব্রাহ্মণদের পত্নীগণের নিবেদিত আহার, বিদুরের দেওয়া কলার খোসা, ব্রজের গাভীদের দেওয়া মাখন, ছানা আর দুধ, সখা সুদামার দেওয়া চিড়া, যশোদা মায়ের স্তন্যদুধ, আর ব্রজগোপীদের দেওয়া মিষ্টদ্রব্য গ্রহণ করেছ, তেমনই কৃপা করে আমার দেওয়া সামগ্রী আনন্দে গ্রহণ কর।*

শ্লোক ১৯ : নিজেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নিয়ে এবং সব উপচার সংগ্রহ করে অর্চনকারী পূর্ব দিকে অগ্রভাগ বিশিষ্ট কুশের আসনে বসবেন। পূর্ব বা উত্তর দিকে মুখ রেখে অথবা শ্রীবিগ্রহ কোন স্থানে স্থায়ীভাবে থাকলে অন্য দিকে মুখ করে তিনি তাঁর (শ্রীবিগ্রহের) মুখোমুখি বসবেন।

ব্যাখ্যা : যে মূর্তিকে সরানো যায় তাঁকে স্নান করানোর সময় পশ্চিমদিকে বা দক্ষিণদিকে মুখ করে রাখতে হবে। অথবা তাঁকে এমন ভাবে রাখতে হবে যে ...রী মূল বিগ্রহকে সামনে রাখতে পারেন।

শ্লোক ২০ : মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে ভক্ত তার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ স্পর্শ করে শুদ্ধ বা পবিত্র করবে। আমার বিগ্রহ অর্চনের জন্য তার দেহশুদ্ধিকরণ করতে হবে। তারপর বিগ্রহকে পূর্বদিনে নিবেদিত ফুল ও অন্যান্য দ্রব্যাদি সরিয়ে দিতে হবে। সে উপযুক্তভাবে স্নানঘট ও জল সেচনের পাত্রাদি প্রস্তুত করবে।

ব্যাখ্যা : ১৯ ও ২০ শ্লোকে আছে আত্মশুদ্ধি (নিজেকে পরিষ্কার করা) ও উপাদান (অর্চনের উপচার সংগ্রহ), তার পর আছে আসন-স্থাপন (আসনে বসা), ন্যাস (শরীরের বিভিন্ন অংশ মন্ত্রপূত করা), মূর্তিশুদ্ধি (স্নানের পূর্বে বিগ্রহের পরিচ্ছন্নতা), ঘট-স্থাপন বা কলস-স্থাপন (অর্চনের জন্য বা বিগ্রহের স্নানের জন্য পূর্ণ ঘট স্থাপন) এবং সামান্য-অর্ঘ্য বা প্রোক্ষণীয়-পাত্র-স্থাপন (পবিত্রতার জন্য জল ছিটানোর পাত্র)।

অর্চনের অবস্থা নির্ণয়ে আসন : শ্রীবিগ্রহের স্থান পরিবর্তনে বা অর্চনের অবস্থা পরিবর্তনে উপচার প্রদানকে মাঝে মাঝে নানা ভাগে ভাগ করা হয়। নীচে এমন কিছু ভাগের একটি তালিকা দেওয়া হল। তাদের প্রত্যেকটিকে পঞ্চরাত্র শাস্ত্রে আসন বলা হয়।

১) *মন্ত্রাসন :* ভগবানকে আসন দান করে, স্বাগত জানিয়ে, পাদ্য, অর্ঘ্য, দিয়ে আচমন করে, মধুপর্ক দিয়ে ও পুনঃ আচমন করে বরণ করা হয়। মূলমন্ত্র জপের শেষ অংশ উচ্চারণ, ভগবানকে প্রার্থনা জানানো, অপরাধের জন্য মার্জনা ভিক্ষা, পরিক্রমা করা ও প্রণাম জানানো হয় এই আসনে। মন্ত্রাসন হচ্ছে মূল আসন যার প্রভাবে সাড়ম্বর অর্চনের মাঝে কয়েকবার শ্রীবিগ্রহ প্রত্যাবর্তন করেন।

২) *স্নানাসন :* ভগবানকে পাদুকা দেওয়া হয় ও স্নানের জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি যখন প্রথম জেগেছিলেন তখন যদি তাঁকে দাঁতন কাঠি ও জিভছোলা না দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে সেগুলি এখন দেওয়া হয়। এই সময় তাঁর অঙ্গে তেল মার্জন করা হয়। এবার তাঁকে স্নান করানো হয়, অঙ্গ শুকানোর জন্য গামছা (ভালো সুতোর তোয়ালে) দেওয়া হয় এবং আচমন করানো হয়।

৩) *অলংকারাসন :* ভগবানকে পুনরায় পাদুকা পরিয়ে অলংকারাসনে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁকে পোশাক-পরিচ্ছদ, উপবীত, অলংকার, চন্দনের গন্ধদ্রব্য, ফুলের সাজ ও মালা, ধূপ এবং দীপ দান করা হয়। (পূজারী ধ্যানে ভাবতে পারেন যে, তিনি বিভিন্ন উৎসব উপযোগী পাদুকা কৃষ্ণকে পরিয়ে দিচ্ছেন)।

৪) *যাত্রাসন :* সজ্জিত হওয়ার পর পালকিতে চড়ে ভগবান বাইরে যেতে পারেন। ধ্যান মগ্ন অবস্থায় এ রকম মাঝে মাঝে করা হয়।

৫) *ভোগাসন :* ভগবানকে পুনরায় পাদুকা দান করে ভোগাসনে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁকে আসন, হাত মুখ ধোয়ার জল, পাদ্য, আচমন, অর্ঘ্য দেওয়া হয়। তারপর তাঁকে ভোগ নিবেদন করা হয় এবং পানীয় জল, হাত, মুখ ও পা ধোয়ার জল দেওয়া হয়, আচমন করা হয় ও সর্বশেষে তাম্বূল দান করা হয়।

৬) পর্যঙ্কাসন : দিনের বেলায় পর্যঙ্কাসনে থাকার সময় ভগবান দর্শন দেন। পর্যঙ্ক অর্থ 'পালঙ্ক'। এখানে বিশ্রামরত অবস্থায় তিনি দর্শনার্থীদের প্রদত্ত সব বস্তু গ্রহণ করেন।

৭) শয়নাসন : ভগবানকে বিশ্রামের জন্য কোন শয্যায় সংস্থাপিত করলে তাকে শয়নাসন বলে।

সাড়ম্বর অর্চনে কোন আসনের উপযোগী দ্রব্যগুলি দেওয়ার আগে ভগবানকে ষোড়শোপচারের প্রথম পাঁচটি—আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য ও আচমন—নিবেদন হয়ে থাকে।

ন্যাস : ন্যাস হল মন্ত্রের শব্দগুলিকে বা অংশগুলিকে দেহে সন্নিবিষ্ট করা। দু-রকমের ন্যাস আছে : একটি শব্দের অংশগুলিকে—বর্ণের মাত্রাগুলিকে (মাত্রিকা) অথবা গায়ত্রী মন্ত্রের শব্দাংশগুলিকে কাজে লাগায় এবং অন্যটি ভগবানের নাম, তাঁর পরিকর, শক্তি ও পার্ষদদের কাজে লাগায়। ন্যাসের উদ্দেশ্য হল দেহকে পবিত্র ও পারমার্থিকময় করা। প্রথম অধ্যায়ে আমরা যে ভূতশুদ্ধির (বৈধী ভক্তি বিষয়ে) কথা বলেছি তাতে শুধু দৈহিক পবিত্রতা সৃষ্টি হয়। শব্দকে দেহে সংস্থাপিত করে ন্যাস চিন্ময় অবস্থা সৃষ্টি করে এবং দেহকে ভগবানের অঙ্গের গুণে উন্নীত করে। শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন যে, ন্যাস অর্চনের (বৈধী ভক্তিতে শ্রীবিগ্রহ অর্চন) একটি বৈশিষ্ট্য পূর্ণ উপাদান। অর্চন অধ্যায়ে দু-রকমের ন্যাসের কথা বলা হয়েছে : করন্যাস হাতের জন্য ও অঙ্গন্যাস দেহের জন্য। শ্রীকৃষ্ণ অর্চনের পূর্বে পূজারী তাঁর গুরুদেব ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অর্চন করার পর ঐ দুই রকম ন্যাস করতে পারেন।

শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার সময়েই শুধু ন্যাস করা হয়। যখন ভগবানকে ঘটে (পবিত্র পাত্রে) অথবা বিশেষ অর্ঘ্যে (যেখানে প্রতিষ্ঠা করা হয় সেখানকার বিশেষ অর্ঘ্য) প্রতিষ্ঠা করা হয় তখন ভক্ত ততটুকু ন্যাস করবেন যতটুকু নিজের উপর করেন (শ্লোক ৪৯-এর ব্যাখ্যা দেখুন)। বিশেষভাবে বলা হচ্ছে যে, পবিত্র ঘট, বিশেষ অর্ঘ্য বা শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার আগে পূজারী নিজের উপর ন্যাস করবেন।

শ্লোক ২১ : তারপর, প্রোক্ষণীয় পাত্র থেকে জল নিয়ে ছিটিয়ে শ্রীবিগ্রহ অর্চনের স্থান, সমস্ত উপচার সামগ্রী, এবং নিজের দেহকে পবিত্র করে নিতে হবে। তারপর তিনটি জলপূর্ণ ঘট বিভিন্ন মাঙ্গলিক দ্রব্য দিয়ে সাজিয়ে দিতে হবে।

ব্যাখ্যা : এই শ্লোকে পবিত্র বারি সিঞ্চনের দ্বারা স্থান শুদ্ধি, দ্রব্য শুদ্ধি ও আত্মশুদ্ধির কথা উল্লিখিত হয়েছে। মূল সংস্কৃতে তৈস্তৈঃ কথাটি (যার অর্থ 'লভ্য বস্তুর দ্বারা') নির্দেশ করছে যে, বিশেষ কোনও উপচার পাওয়া না গেলেও পূজারীকে অতি মাত্রায় উদ্বিগ্ন হওয়ার প্রয়োজন নেই। উপাসনার সময় এমনটি হলে অপ্রাপ্য বস্তুর বিকল্প কিছু কিংবা মানসে ঐ বস্তু নিবেদন করা চলে।

শ্লোক ২২ : পূজারী তারপর সেই তিনটি ঘটকে পবিত্র করবেন। ভগবানের পাদ প্রক্ষালনের জন্য জলপূর্ণ ঘটটি ধারণ করে *হৃদয়ায় নমঃ* এই মন্ত্র উচ্চারণ করে ঘটটি পবিত্র করতে হবে। অর্ঘ্য নিবেদনের জন্য জলপূর্ণ ঘটটি *শিরসে স্বাহা* মন্ত্র জপ এবং মুখপদ্ম প্রক্ষালনের জন্য জলপূর্ণ ঘটটি *শিখায়ৈ বষট্* মন্ত্র জপের দ্বারা পবিত্র করতে হবে। এ ছাড়াও এই তিনটি ঘট শুদ্ধ করতে গায়ত্রী মন্ত্রও জপ করা যেতে পারে।

ব্যাখ্যা : এই শ্লোকে পাত্রস্থাপনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। পূজার উপকরণগুলি এমনভাবে সাজিয়ে রাখতে হবে যাতে পূজারী সমর্পিত বস্তু স্পর্শ না করে, সঠিক বস্তুটি সহজেই পেতে পারেন। বাঁদিকে একটি ছোট থালার উপর ঘণ্টাটি রাখতে হবে এবং জল-শঙ্খটি একটি তেপায়ার উপর এমনভাবে রাখতে হবে যাতে এটা সহজেই তোলা যায় এবং বার বার স্থানান্তরিত করা যায়। জল-পাত্র, ফুল, চন্দন এবং তুলসীপত্র হাতের কাছেই রাখতে হবে।

আচমন ও অর্ঘ্য প্রদানের বিসর্জনীয়-পাত্র ব্যবহার করা যেতে পারে, অথবা এই সব তরল পদার্থ নালীযুক্ত স্নানপাত্রেও ঢালা যেতে পারে। ফুলের পাপড়ি, মোছার তুলো ইত্যাদি ফেলবার জন্য দ্বিতীয় বিসর্জনীয় পাত্রও ব্যবহার করা যেতে পারে। স্নানের তোয়ালে—কোন পাত্র, টেবিল বা বেদীর উপর রাখা যেতে পারে। কখনও কোলের উপর বা সরাসরি মেঝের উপর রাখা চলবে না।

শ্লোক ২৩ : পূজারীকে আমার সূক্ষ্মরূপের ধ্যান করতে হবে। পূজারীর নিজদেহাভ্যন্তরেই এই সূক্ষ্মরূপ বিরাজিত। যে বায়ু এবং অগ্নি সকল জীবের মূল উৎস, সেই বায়ু ও অগ্নি দ্বারাই, পূজারীর দেহ এখন শুদ্ধ। পবিত্র অক্ষর 'ওঁ' এর শেষাংশের অনুরণনের মধ্যে ঈশ্বরের রূপ আত্মোপলব্ধ-মুনিঋষিদের দ্বারা জ্ঞাত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : এই শ্লোকটি *প্রাণায়াম* ও *ভূতশুদ্ধি* বিশুদ্ধিকরণ নির্দেশ করছে। এখানে উল্লিখিত প্রাণায়ামে *ওম্ বীজ* বা সনাতন গোস্বামীর নির্দেশ মত *কাম-বীজ* প্রয়োগ করতে পারা যায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা ভূত-শুদ্ধির জন্য এমন একটি প্রণালী অনুসরণ করেন যাতে কেউ পরমেশ্বরের সেবকের শাশ্বত সেবক হিসাবে তার নিজের অবস্থা সম্পর্কে ধ্যান করতে পারে। *দিগ্-বন্ধন* ও *বহ্নি-প্রকারের* আগে ভূত-শুদ্ধি হতে পারে। *দিগ্-বন্ধন* ও *বহ্নি-প্রকারের* আক্ষরিক অর্থ হল "দশদিক বন্ধন" এবং "সূক্ষ্ম অগ্নি সহ (ভক্ত) প্রদক্ষিণ করা"। এই সব ক্রিয়াকলাপ—যাতে শব্দ, মন্ত্র ও ধ্যানের ব্যবহার হয়, ভক্ত যাতে উপাসনায় মনঃসংযোগ করতে পারে, সেজন্য ভক্তের চতুর্দিকে সংরক্ষণ প্রাচীর গড়ে দেয়।

মন যদি বিক্ষিপ্ত হয়, তবে বিভিন্ন প্রকার সূক্ষ্ম নেতিবাচক ব্যক্তিত্বের দ্বারা প্রভাবিত করা হয়। কিন্তু কেউ যদি বিশেষভাবে ধ্যানে নিমগ্ন থাকে তবে তার এই

সব প্রভাবের প্রয়োজন হয় না। সুতরাং তার কাছে এই সব ক্রিয়াকলাপ ঐচ্ছিক বিষয়।

এই শ্লোক এবং পূর্বের চারটি শ্লোক শ্রীবিগ্রহ অর্চনে ছয় প্রকার শুদ্ধিকরণ নির্দেশ করছে।

শ্লোক ২৪ : ভক্ত পরমাত্মার চিন্তা করে। পরমাত্মার উপস্থিতি ভক্তের উপলব্ধির উপযুক্ত আকারে ভক্তের দেহকে সম্পৃক্ত করে। এইভাবে ভক্ত তার পূর্ণ দক্ষতায় ভগবানের উপাসনা করে এবং তাঁর মধ্যে সম্পূর্ণ মগ্ন হয়ে যায়। বিগ্রহের বিভিন্ন অঙ্গ স্পর্শ করে এবং উপযুক্ত মন্ত্রোচ্চারণ করে ভক্ত পরমাত্মার আহ্বান করবে যাতে সে অর্চা মূর্তিতে যুক্ত হতে পারে। তারপর ভক্ত আমার উপাসনা করবে।

ব্যাখ্যা : শ্লোক ২৩ ও ২৪ চিত্ত-শুদ্ধি, ধ্যান (ভগবানের রূপের চিন্তা) এবং মানস-পূজা (মনে মনে উপাসনা করা) বর্ণনা করছে। ২৪নং শ্লোকটি বর্ণনা করছে আবাহন—অর্থাৎ নিজের অন্তর থেকে শ্রীবিগ্রহকে আহ্বান করা। স্থায়ীভাবে স্থাপিত বিগ্রহের ক্ষেত্রে সাধারণত এরূপ করা হয় না। যাই হোক, ভগবানকে অস্থায়ীভাবে স্থাপিত বিগ্রহের মধ্যে, অর্ঘ্যের মধ্যে (*বিশেষ-অর্ঘ্য*—ধ্যান-অর্ঘ্য হিসাবেও পরিচিত), বিগ্রহের স্নান জলের মধ্যে, যজ্ঞের অগ্নির মধ্যে আহ্বান করা হয়। ধ্যান, মন্ত্র এবং মুদ্রার দ্বারা অভীপ্সিত স্থানে ভগবানকে আমন্ত্রণ করা হয় এবং তারপর বিগ্রহের বিভিন্ন অঙ্গ-স্পর্শ করে এবং মন্ত্রজপ করে ন্যাসের দ্বারা সংরক্ষণ করা হয়।

কৃষ্ণ-ধ্যান : কৃষ্ণের অপ্রাকৃত রূপের ধ্যান

শ্রীশিব প্রার্থনা করছেন, 'হে ভগবান! আমি আপনার সেই রূপ দর্শন করতে চাই, যা আপনার অত্যন্ত প্রিয় ভক্তরা আরাধনা করেন। আপনার অন্য বহু রূপ রয়েছে, কিন্তু আমি বিশেষভাবে সেই রূপ দর্শন করতে চাই, যা ভক্তদের অত্যন্ত প্রিয়। দয়া করে আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে, সেই রূপ প্রদর্শন করান, কারণ ভক্তদের আরাধ্য সেই রূপই কেবল ইন্দ্রিয়ের সমস্ত আবেদনগুলি পূর্ণরূপে তৃপ্ত করতে পারে। (ভাগবতে ৪/২৪/৪৪)

ভক্তি-সন্দর্ভে শ্রীল জীব গোস্বামী নির্দেশ করেছেন যে, ধ্যান হতে হবে ভগবান তাঁর নিত্য ধামে যে রূপে অবস্থিত আছেন সেই রূপে, হৃদয়ে ভগবান যে রূপে আছেন সেই রূপে নয়—যেটা যোগীরা করে থাকেন।

নিচের অংশটি *হরিভক্তিবিলাস* থেকে নেওয়া শ্রীকৃষ্ণের বিস্তৃত ধ্যানের অনুবাদ। শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের বিশদ উপাসনার জন্য কেউ মানস পূজার আগেই এই ধ্যান করতে পারে :

বৃন্দাবনের পবিত্র ভূমি বৃক্ষরাজির দ্বারা শীতল। নব পুষ্প মুকুল ও মনোহারী পুষ্প গুচ্ছের ভারে শাখাগুলি আনত। বৃক্ষগুলি সর্বদাই

মধুক্ষরণ করছে আর স্বর্গীয় সুগন্ধিতে সম্পৃক্ত হয়ে আছে। তাদের কাণ্ড উজ্জ্বল পুষ্পগুচ্ছ শোভিত দ্রাক্ষা লতা দ্বারা সুসজ্জিত।

বৃন্দাবনের হৃদয়স্থল ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছির গুঞ্জরণে অনুরণিত। প্রস্ফুটিত ফুলের মধুপানের লোভে এই অলিকুলের আগমন। ঘুঘু, শুক-সারি ও কোকিলের কূজনে বৃন্দাবন মুখরিত। সর্বত্রই ময়ূরের নৃত্য।

মৃদু মন্দ বায়ুতাড়িত যমুনার তরঙ্গোত্থিত সূক্ষ্ম জলকণা এই বৃন্দাবন ধামের সেবা করছে। এই বায়ু প্রস্ফুটিত পদ্মের গর্ভকেশর থেকে পরাগরেণু নিয়ে খেলাচ্ছলে গোপীদের বসনে মাখিয়ে দিচ্ছে। গোপীদের মন তখন প্রভু সঙ্গের আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেলিত হয়ে উঠছে।

বৃন্দাবনের মধ্যস্থলে সর্ব-ইচ্ছাপূরণকারী অত্যুচ্চ কল্পবৃক্ষ দণ্ডায়মান। যার শাখাগুলি প্রবালের, পত্রনিচয় পান্নার, যার কুঁড়ির তোড়া হল হীরে ও মুক্তোর, আর যার ফল হল চুনির। মূর্তিমান ঋতুদের দ্বারা সেবিত হয়ে এটা যুগপৎ সব রকমের ফুল উৎপাদন করে।

সুধা বর্ষণকারী কল্পবৃক্ষের পাদদেশের অঞ্চলটি নিরেট স্বর্ণ-পর্বতের উপর উদিত সূর্যের আলো পড়লে যেমন হয় তেমনি অত্যুজ্জ্বল আলো বিকিরণ করে। মণি-মুক্তা খচিত দ্যুতির দ্বারা এবং স্বর্ণ-রেণুর স্তূপের দ্বারা দীপ্যমান এই স্থানটি শোক-তাপ, ভুল-ভ্রান্তি, জরা-মৃত্যু, ক্ষুধা-তৃষ্ণা সব কিছু থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।

মণিমুক্তা খচিত মেঝেতে প্রভাত রঙিন অষ্টদল পদ্মাসন রূপ নিখুঁত সৌন্দর্যমণ্ডিত একটি আসন আছে। কেন্দ্রস্থলে উদীয়মান সূর্যের মতো দীপ্তিশীল ভগবান মুকুন্দ অনায়াস ভঙ্গীতে বসে আছেন।

গাঢ় নীলকান্ত মণির ন্যায় কাজলের মতো কালো, মৌসুমী বায়ু তাড়িত মেঘের মতো কৃষ্ণবর্ণ, নীল পদ্মের মতো কোমল মুকুন্দের গাত্রজ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। তাঁর কালো উজ্জ্বল কুঞ্চিত কেশে ময়ূরপুচ্ছ সুশোভিত।

শিরে শোভিত ব্যাকুল মৌমাছি বেষ্টিত পারিজাত পুষ্পের ভূষণ, আর কর্ণে শোভা পাচ্ছে অক্লিষ্ট পুষ্পের কর্ণাভরণ। তাঁর ললাটে সুদীর্ঘ লতিকার মতো ভ্রূ-যুগলের মাঝখানে অশাসিত অলকগুচ্ছ দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে উজ্জ্বল পীত বর্ণের উল্লম্ব তিলক শোভা পাচ্ছে। তাঁর বদন মণ্ডল শরতের নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের মতো প্রতিভাত হচ্ছে এবং তাঁর নেত্রদ্বয় পদ্মের পাপড়ির মতো প্রশস্ত। তাঁর দর্পণ সদৃশ গণ্ডদ্বয় তাঁর মকরাকৃতি মুক্তাখচিত কর্ণকুণ্ডলের দ্যুতির দ্বারা ঝিকমিক করছে। তাঁর অনিন্দিত নাসিকা নন্দিত ভঙ্গিমায় উর্ধ্বদিক নির্দেশ করছে, আর তাঁর

কোমল স্মিত হাসি চন্দ্রসদৃশ জুঁই ফুল বা মন্দার পুষ্পের মতো তাঁর সকল বৈশিষ্ট্য বিকশিত করছে।

তাঁর কম্বুকণ্ঠে রক্তবর্ণ পুষ্প ও কিশলয়ের মালা দুলছে। তাঁর স্কন্ধ থেকে পাদপদ্ম পর্যন্ত প্রলম্বিত মত্ত মৌমাছি আশ্লিষ্ট কল্পবৃক্ষ ফুলের মালা। তাঁর প্রশস্ত বক্ষে তারকাপুঞ্জের মতো দীপ্তিমান মুক্তোর মালা। আকাশে সূর্যের মতো উজ্জ্বল কৌস্তুভমণি আর তাঁর বিশেষ চিহ্ন শ্রীবৎস বক্ষস্থলের শোভা বৃদ্ধি করছে।

তাঁর কাঁধদুটি উঁচু, তাঁর সুডৌল ভারী সবল বাহু দুটি আজানুলম্বিত আর তাঁর উদর সামান্য খাঁজকাটা ও উন্নত, আর তার মধ্যস্থলে সুন্দর সুগভীর নাভিমূল। নাভিদেশ থেকে উপরের দিকে প্রসারিত সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ রোমরেখা। তাঁর বাহুতে বাজুবন্ধ, কব্জিতে মণিবন্ধ, কণ্ঠে কণ্ঠহার, পায়ে নূপুর ও কটিতে মুক্তাখচিত কোমরবন্ধ দ্বারা তিনি সজ্জিত। শরীরের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন নকশা দ্বারা চিত্রিত। পরিধানে তাঁর পীত অম্বর।

তাঁর উরু ও জানুদ্বয় সুন্দর, মনোহর গুল্‌ফ এবং মসৃণ কচ্ছপ-আবরণীর থেকেও উজ্জ্বল দ্যুতিময় পদযুগল। তাঁর পদ-নখ পদ্মরাগমণি দর্পণের ন্যায় উজ্জ্বল, আর তাঁর পদাঙ্গুলি হল মুক্তাখচিত পত্রের মতো। তাঁর গোলাপী কর ও পদতলে মীন, অঙ্কুশ, চক্র, ধ্বজা, পদ্ম, বজ্র ও যবের দৃষ্টিনন্দন চিহ্ন বর্তমান। সৌন্দর্যের উৎকৃষ্ট উপাদানে গঠিত তাঁর দেহ কামদেবের দেহাকর্ষণকে পরাজিত করে।

শ্রীকৃষ্ণ হলেন সীমাহীন সুখের সমুদ্র। তাঁর মুখপদ্মের সম্পূর্ণ উপযুক্ত বাঁশী থেকে তিনি সাধারণভাবে অঙ্গুলি চালনা করে অলৌকিক রাগের সৃষ্টি করেন। সেই সব রাগ শুনে সমগ্র প্রাণীকুল ও তাদের শাবকেরা আকর্ষিত ও হতবুদ্ধি হয়, তাদের হৃদয় বিগলিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণ দীর্ঘ সরু লেজযুক্ত ধেনুদ্বারা পরিবেষ্টিত থাকেন। দুগ্ধ পরিপূর্ণ স্ফীত স্তনের জন্য তারা অসংলগ্ন পদক্ষেপে তাঁর সন্নিকটে আসে। তাদের আয়ত চক্ষুগুলি শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্মের সঙ্গে আঠার মতো আটকে থাকে। অর্ধচর্বিত কচি ঘাস তাদের দন্তপ্রান্তে ঝুলতে থাকে। সদ্যোজাত গো-বৎস নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের ক্ষুদ্র ওষ্ঠ ও দন্তপংক্তিতে লেগে থাকা দুগ্ধ ফেনা নিয়ে তারা অত্যাগ্রহে স্ফীত বাঁট থেকে দুগ্ধ নিষ্কাশন করে, এতে তাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। তারা তাদের কচি কান উল্টিয়ে সেই গভীর মনোমুগ্ধকর বাঁশীর সুর শুনতে থাকে। গলায় গলকম্বল ও কচি শিরে ছোট্ট শিং-এর উদ্গম হচ্ছে এমন অপেক্ষাকৃত বয়স্ক বাছুরেরা

লেজ তুলে পরস্পর পরস্পরকে ঢুঁ মারছে, এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করে খেলা করছে এবং অবশেষে শ্রীকৃষ্ণের চারপাশে এসে জড় হচ্ছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ষাঁড় তাদের বিরাট ককুদ নিয়ে উচ্চকিত হাম্বারবে আলস্যভরে তাঁর কাছে আসছে। কিন্তু যখন বাঁশীর তরলিত সুধাময় সঙ্গীত তাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করছে তখন তারা তাদের নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত করছে এবং মাথাকাত করছে।

রাখাল বালকেরা, যারা চরিত্রে, স্বাচ্ছন্দে স্বভাবে, বয়সে, কার্যে, পোশাকে কৃষ্ণেরই সমতুল্য, তাদের বাঁশী ও বীণায় অনুচ্চ সুমিষ্ট সুর লহরী বাজিয়ে চলেছে। বাহু প্রসারিত করে সুদক্ষ ভঙ্গিমায় নাচের সঙ্গে সুন্দর সুরে তারা গান করছে। শিশুরা আধো আধো বোলে, গলায় বাঘনখ ঝুলিয়ে, পায়ে আর স্ফীত উদরে ঘুঙুর বেঁধে কৃষ্ণের সমীপবর্তী হচ্ছে। ত্রিস্তর রেখার দ্বারা চিহ্নিত কটিদেশযুক্ত দৃষ্টি আকর্ষক রাখাল বালিকারাও এগিয়ে আসছে, তারাও তাঁর সেবা করতে উদ্‌গ্রীব। তাদের প্রশস্ত ভারী নিতম্বের ভারে তারা আন্দোলিত হচ্ছে, তাদের মস্তক প্রচুর কেশদামের তলায় নত হয়ে আছে। তাদের দেহের আশাবৃক্ষ তাঁর বংশী নির্গত সুধার দ্বারা সিক্ত হয়েছে। দ্রাক্ষাক্ষেত্রে প্রস্ফুটিত ফুলের মতো বৃক্ষশাখে ঝটপট করে নতুন অঙ্কুর গজাচ্ছে। নন্দনন্দনের চন্দ্রকিরণসদৃশ হাসির জোয়ারে গোপীদের হৃদয়ে প্রেম সায়রের বান ডাকছে আর সেই ধাবমান প্রেম-তরঙ্গের জল চল্‌কে পড়ে কর্মরতা গোপীদের শরীরে বিন্দু বিন্দু ঘামের আকারে দেখা দিচ্ছে। তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিদ্বারা মারাত্মক প্রেমবাণ নিক্ষেপ করে তিনি গোপীদের মর্মে আঘাত করে তাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাচ্ছেন। বিক্ষুব্ধ কিন্তু আত্মসমর্পণে অস্বীকৃত চিত্তে তারা তাদের সর্ব শরীরে বেদনাদায়ক কম্পন চেপে রাখতে চেষ্টা করছে। কিন্তু কৃষ্ণের অতুলনীয় রূপসুধা পান করতে তারা ব্যগ্র। অর্ধনিমিলিত সলজ্জ দৃষ্টিতে তারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অপাঙ্গ দৃষ্টিপাত করছে, আর এইভাবেই তারা প্রেমনদীতে ভেসে চলেছে।

সমবেত গোপীদের বন্ধনমুক্ত অলকদাম থেকে খসে পড়া ফুলের মধু পান করতে অলিকুল ব্যস্ত। প্রচণ্ড উত্তেজনায় গোপীরা অস্ফুট মৃদু শব্দ উচ্চারণ করছে। নিয়ন্ত্রণ অসাধ্য কম্পনের জন্য তাদের কটিবন্ধ ঝুন ঝুন শব্দে আওয়াজ তুলছে। তাদের সূক্ষ্ম সিল্কের পোশাক ভারী শ্বাস-প্রশ্বাসে শিথিল হয়ে তাদের শরীরের দ্যুতিময় অংশ প্রকাশ করছে। তাদের ইতস্ততঃ লঘু পদক্ষেপের মৃদু শব্দ তাদের মুক্তাখচিত নূপুরের ধ্বনি ও চতুর্দিক থেকে উত্থিত প্রতিধ্বনিতে মিশে একাকার হয়ে গেছে।

তাদের অধর স্ফুরিত হচ্ছে, কর্ণকুণ্ডল দীপ্তিদান করছে, সুদৃশ্য অক্ষি-পক্ষ্মে ঘেরা তাদের নেত্র লজ্জায় অর্ধোন্মীলিত হয়ে আছে। গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের বিক্ষোভে তাদের গোলাপী অধর কালো বর্ণ ধারণ করেছে। তাদের কৌতুকপ্রিয় সুকোমল হাতে তারা তাদের প্রাণনাথের জন্য বিভিন্ন উপঢৌকন ধারণ করে আছে। সর্বদাই তারা তাদের প্রাণপুরুষের সেবায় ব্যস্ত।

শ্রীকৃষ্ণ হলেন সকল আনন্দের আধার। গোপীদের কালো চঞ্চল আঁখিরূপ পদ্মের মালা দ্বারা তিনি সজ্জিত। তাদের আঁখি সর্বদাই কৃষ্ণরূপে নিবদ্ধ। প্রেম-পিয়াসী মধুমক্ষিকার মালার মতো সেই চোখগুলি পরম প্রভুর সর্বাকর্ষক বদন-মণ্ডলের তরলিত মধুর পানে মত্ত।

গোপ, গোপী এবং ধেনুগণ কিছুটা দূরত্বে অবস্থিত। কিন্তু দেবতারা ব্রহ্মা, শিব ও ইন্দ্র সহ সম্মুখ সারিতে ইন্দ্রের পরিচালনায় থেকে জড় অর্থ লাভের আশায় শ্লোক আবৃত্তি করছেন। দক্ষিণ পার্শ্বে সম্মিলিত মুনিগণ বৈদিক জ্ঞানের দ্বারা ধর্ম-সংহিতা পরিপূর্ণ করার ইচ্ছায় দণ্ডায়মান। পশ্চাতে শঙ্কর এবং অপরাপর যোগীন্দ্রগণ মোক্ষ লাভের আশায় সমাধি অবস্থায় অবস্থিত। বামপার্শ্বে যক্ষ, সিদ্ধ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর ও চারণেরা কলত্র সহ কিন্নর ও শ্রেষ্ঠ অপ্সরা সমভিব্যাহারে দণ্ডায়মান। আনন্দের অনুসন্ধানে, তারা নৃত্য, গীত ও বাদ্যসঙ্গীতে রত।

শঙ্খের ন্যায় শুভ্র, চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল, জুঁই ফুলের ন্যায় সাদা এবং বজ্রের ন্যায় লঘু নারদমুনি আকাশে দেখা দিলেন। পাকানো চুলের জটায় তিনি সজ্জিত। সকল শাস্ত্রের সিদ্ধান্তের কথা অবগত হয়ে সমস্ত জড় আনন্দ পরিত্যাগ করে অবিচল ভক্তিতে তিনি কৃষ্ণের চরণপদ্মের সেবা করেন। তিনি বিস্ময়কর সুরমূর্ছনা উৎপাদনকারী সুদক্ষ রাগে বাঁধা তাঁর বীণা তুলে নিয়ে পরম প্রভুকে পরিতৃপ্ত করেন।

শ্লোক ২৫-২৬ : পূজারীকে প্রথমে আমার আসনকে ধর্ম, জ্ঞান, আত্মত্যাগ ও সমৃদ্ধি এবং আমার সর্ববিধ চিন্ময় শক্তির মূর্ত বিগ্রহ হিসাবে কল্পনা করতে হবে। তাকে ভাবতে হবে পরমেশ্বরের আসন অষ্ট অষ্টদল পদ্মের। পত্রনুপাবর্তে অবস্থিত জাফরাণী রঙের সূক্ষ্ম অংশ হেতু সেই আসন দীপ্তিশীল। অতঃপর বেদ ও তন্ত্রশাস্ত্রের নিয়মানুসারে পূজারী আমাকে চরণ ও মুখপদ্ম প্রক্ষালনের জল, অর্ঘ্য ও অন্যান্য পূজোপকরণ দান করবে। এই পদ্ধতি অবলম্বনের দ্বারা জড় আনন্দ ও মুক্তি উভয়ই লাভ করতে পারবে।

ব্যাখ্যা : পঞ্চবিংশতি সংখ্যক শ্লোক, যে স্থানে ভগবান তাঁর বিভিন্ন পার্ষদসহ বসেন, সেই স্থানের পূজা অর্থাৎ পীঠ-পূজার বর্ণনা করছে। পীঠ-পূজায় অষ্টদল

পদ্ম চয়ন করে চন্দন লেপন করে শ্রীবিগ্রহের আসপাশে রাখতে হবে। তারপর পুষ্পদল ও মন্ত্র সহযোগে পদ্মের বিভিন্ন অংশে পার্ষদগণের এবং বিভিন্ন শক্তির পূজা করবেন। এই উপাসনা পদ্ধতি যেহেতু বিশদ, সেইহেতু পূজারী তাঁর নিত্য উপাসনায় সব কিছু পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে সম্পাদন করবেন তা আশা করা যায় না। যাই হোক, এই শ্লোকে দেওয়া আছে যে দ্রব্য-সামগ্রী সহযোগে তাঁর উপাসনার পূর্বে কেউ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানের জন্য উপদেশ অনুসরণ করতে পারেন।

বিগ্রহ স্নানের পূর্বে উপচার অর্পণের কথা সপ্তবিংশতি শ্লোকে বর্ণিত আছে। শ্রীবিগ্রহ যখন এক আসন থেকে অন্য আসনে স্থানান্তরিত হচ্ছেন, তখনই পূজারী শ্রীবিগ্রহকে পাদ্য (পদ প্রক্ষালন), অর্ঘ্য (সম্মানীয় অতিথিকে বিভিন্ন মাঙ্গলিক দ্রব্য উপঢৌকন), এবং আচমন (অল্প অল্প পরিমাণে জল পান) আদি অর্পণ করতে পারেন। দিবা ভাগের আসন পরিবর্তনের সঙ্গে চৌষট্টি রকম উপচারের তালিকায় অর্পণের পুনরাবৃত্তি এবং এই সব উপচারের পুনরাবৃত্তি ও অন্য উপচার, দিবাভাগের আসন পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত চৌষট্টি রকম উপচারের তালিকায় দেখা যায়।

আচমনের উপর একটি টীকা : "মুখ ধোয়ার জল" কথাটি প্রকৃতপক্ষভাবে শুদ্ধ নয়। কথাটি বরং হবে আচমন (বা আচমনীয়) মন্ত্র জপের সময় একটু একটু করে জল পান করা। ভক্ত যেমন নির্দিষ্ট কিছু কর্মের পূর্বে ও পরে বিশুদ্ধিকরণের জন্য আচমন কার্য সম্পাদন করেন, ভগবানও ঠিক একই উদ্দেশ্যে আচমন ক্রিয়া করে থাকেন। আহারের পর মুখ ধোয়ার জল (মুখ-প্রক্ষালন) নৈবেদ্য উপচারের অঙ্গ হিসাবে বিবেচিত হয়। বিশদতর উপাসনার ক্ষেত্রে এই উপচার পৃথকভাবে অর্পণ করা যেতে পারে।

শ্লোক ২৭ : পূজারী ক্রমানুসারে পরমেশ্বরের পূজা করবেন। প্রথমে প্রভুর সুদর্শন চক্র, তারপর তাঁর পাঞ্চজন্য শঙ্খ, তাঁর গদা, অসি, ধনুক, তীর, ও হল, তাঁর মুষল অস্ত্র, কৌস্তুভ মণি, ফুলমালা এবং তাঁর বক্ষোপরি কুঞ্চিত শ্রীবৎস রোমরাজীর অর্চনা করবেন।

শ্লোক ২৮ : ভগবানের পার্ষদবৃন্দ নন্দ ও সুনন্দ, গরুড়, প্রচণ্ড ও চণ্ড, মহাবল ও বল এবং কুমুদ ও কুমুদেক্ষণ আদিরও পূজা করতে হবে।

ব্যাখ্যা : মন্দির হল ভগবানের আধ্যাত্মিক আবাসের প্রতিরূপ। শাস্ত্র এর আকৃতি ও বিস্তার সঠিকভাবে নিরূপণ করে। বৈকুণ্ঠের রাজপ্রাসাদের চারটি সদর দরজা। প্রত্যেক ফটকে দুজন করে দ্বারপাল আছে। প্রবেশদ্বারে প্রভুর সহযোগী ও প্রেরণাকারীরা উপস্থিত। ভগবানের কাছে প্রবেশের অনুমতি পেতে ভক্তকে প্রথমে তাঁর রক্ষী বাহিনীর অনুকম্পা লাভ করতে হবে। এদের স্তুতি-বন্দনা করেই ভক্ত তাঁর নিকট প্রবেশের অনুমতি পান। ভগবানের পার্ষদদের পূজা করে ভক্ত উপলব্ধি করেন যে তাঁদের কৃপা ব্যতীত ভগবানের সমীপে পৌঁছানো অসম্ভব। শ্রীমদ্ভাগবতে (৫/১২/১২) বিশদ করে বলা হয়েছে :

হে মহারাজ রহূগণ, মহাভাগবতের চরণরেণুর দ্বারা অভিষিক্ত না হলে, কখনই পরমতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। ব্রহ্মচর্য পালনের দ্বারা, গার্হস্থ্য-জীবনের বিধিবিধান কঠোর নিষ্ঠা সহকারে পালন করার দ্বারা, বানপ্রস্থ-আশ্রমে গৃহত্যাগ করার দ্বারা, সন্ন্যাস-আশ্রম অবলম্বনের দ্বারা অথবা শীতের সময় জলমগ্ন হয়ে অথবা গ্রীষ্মে অগ্নি পরিবেষ্টিত হয়ে কিংবা প্রখর সূর্যকিরণে অবস্থান করে তপস্যা করার দ্বারা তাঁকে জানা যায় না। পরম সত্যকে হৃদয়ঙ্গম করার অন্য পন্থা থাকলেও, মহাভাগবতের কৃপার প্রভাবেই কেবল পরম সত্য প্রকাশিত হয়।

বর্তমানে মন্দিরের গঠন প্রণালী শাস্ত্রীয় বর্ণনানুযায়ী না হলেও এবং আমরা দেখতে না পেলেও ভগবান তাঁর আবাসস্থল মন্দিরে উপস্থিত আছেন। সেইজন্যেই ভক্তরা এখনও ভগবানের দ্বাররক্ষক ও সহযোগীদের আরাধনা করছেন। ভগবৎকক্ষে প্রবেশ করে এবং আসনে উপবেশন করে এখনও ধ্যানের মাধ্যমে এই আরাধনার কাজ চলছে। দিনে প্রথমবার বিগ্রহ কক্ষে প্রবেশ করার সময়ে পূজারী ভগবৎ পার্যদদের নিকট প্রবেশের ও পরম প্রভুর সেবা করার অনুমতি প্রার্থনা করবেন।

শ্লোক ২৯ : *প্রোক্ষণ* উপচারের দ্বারা দুর্গা, বিনায়ক, ব্যাস, বিষ্বক্সেন, গুরু ও অন্যান্য দেবতাদের পূজা করতে হবে। ভগবদ্বিগ্রহের দিকে মুখ করে এই সব দেবদেবীরা তাঁদের যথাস্থানে অবস্থিত থাকবেন।

ব্যাখ্যা : পরমেশ্বর ভগবান কখনই একা নন এবং কেউ তাঁর ভক্তদের প্রথম শ্রদ্ধা নিবেদন করলেই তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেন জেনে, পূজারী যখন বিগ্রহ পূজা আরম্ভ করবেন তখন শুধু ২৭নং থেকে ২৯নং শ্লোকে বর্ণিত সমস্ত ব্যক্তিগত অস্থাবর সম্পত্তি ও ব্যক্তিগত অবস্থা স্মরণ করতে পারেন। রাধা-কৃষ্ণ অর্চনায় এই শ্লোকগুলিতে গোলোক বৃন্দাবনে প্রভুর অনুযঙ্গীদের এবং মহাজনদের স্মরণ বৈকুণ্ঠবাসীদের থেকে অধিকতর পছন্দের যোগ্য। সমস্ত দেবতা যাঁর মধ্যে অধিষ্ঠিত সেই শ্রীগুরুদেবের স্মরণ হল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীল জীব গোস্বামী তাঁর *ভক্তি-সন্দর্ভ* গ্রন্থে এই শ্লোকের উল্লেখ করেছেন। তাতে তিনি নির্দেশ করেছেন যে এখানে উল্লিখিত দেবদেবীগণ প্রকৃতপক্ষে জড় জগতের দেবতা নন। তাঁরা হলেন বৈকুণ্ঠে পরম প্রভুর শাশ্বত অনুযঙ্গী। জড় দেবদেবীদের মতো তাঁদেরও একই নাম। এইরূপে বৈকুণ্ঠের দেবদেবীগণ পরমেশ্বরের শুদ্ধ ভক্তদের মতো উপাস্য।

শ্লোক ৩০-৩১ : পূজারী তাঁর আর্থিক সঙ্গতি অনুসারে বিগ্রহকে প্রতিদিন সুগন্ধ চন্দন, উশীর মূল, কর্পূর, কুমকুম ও অগুরু মিশ্রিত জলে স্নান করাবেন। তিনি নানা বৈদিক স্তোত্রও জপ করবেন। এগুলির মধ্যে *স্বর্ণঘর্ম* নামে পরিচিত

অনুবাক স্তোত্র, মহাপুরুষ বিদ্যা, পুরুষ-সূক্ত ও *সাম বেদের* অন্যান্য গীত, যেমন *রাজন* ও *রোহিণ্য* আদি কীর্তন করবেন।

ব্যাখ্যা : পরমারাধ্য শ্রীবিগ্রহের স্নানের জলকে সুবাসিত করতে বহু প্রকার লতাগুল্মের ব্যবহার করা যেতে পারে। পূজারী সাধারণত শ্রীবিগ্রহের স্নানের জলে কয়েক ফোঁটা গোলাপজল বা কয়েকটি সুগন্ধ পুষ্পদল ফেলেন। যখন শালগ্রাম-শিলা বিগ্রহের পূজা করেন, তখন ভক্তরা সাধারণত *পুরুষ-সূক্ত* প্রার্থনা কীর্তন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ অনুমোদন করেছেন যে বিগ্রহের স্নানের সময় পূজারীও *ব্রহ্মসংহিতা* কীর্তন করতে পারেন।

শ্লোক ৩২ : অতঃপর আমার ভক্ত আমাকে প্রীতিপূর্ণভাবে বস্ত্র, যজ্ঞসূত্র, নানা ধরনের অলঙ্কার, তিলক-চিহ্ন ও মাল্যের দ্বারা সজ্জিত করবে এবং বিধিপূর্ণভাবে দেহে সুগন্ধ তেল লেপন করবে।

ব্যাখ্যা : "সুগন্ধ তেল" এখানে এবং এর পরের শ্লোকে বিশেষ করে গন্ধ বা বিভিন্ন উপাদান মিশ্রিত সান্দ্র চন্দনকে বোঝাচ্ছে। তুলোর ন্যাতায় বা বিগ্রহের পোশাকেও গন্ধদ্রব্য লাগাতে পারা যায়। ভগবানের বাণী হল যথোচিত ভাবে তাঁকে সব পদ সমর্পণ করতে হবে। এতে এটাই বোঝায় যে শাস্ত্রে বিভিন্ন দ্রব্য অর্পণের খুঁটিনাটি দেওয়া আছে, যেমন, বিশুদ্ধকরণ পদ্ধতি ও মন্ত্রের ব্যবহার প্রয়োগ পদ্ধতি যথাসম্ভব মেনে চলতে হবে।

স্নানের পর ভগবান যখন অলংকারাসন বা পোশাক পরিধানের আসনে থাকবেন, তখন পূজারী এই সব দ্রব্য দান করবেন। একই ব্যক্তিত্বের যখন ক্ষুদ্র ও বৃহৎ উভয় প্রকার বিগ্রহ (যেমন রাধা-কৃষ্ণ, গৌর-নিতাই বা জগন্নাথ) থাকবেন তখন ক্ষুদ্র ধাতু নির্মিত বিগ্রহগণ তাঁদের স্নানকার্য করবেন আর সেই সঙ্গে বৃহৎ বিগ্রহগণ দ্বিতীয় পূজারী দ্বারা সাজ-সজ্জার কাজ করতে পারেন। ভগবান যেহেতু অসীম, তাই তিনি একই সঙ্গে বিভিন্ন ভক্তদের কাছ থেকে অনায়াসে সর্ব প্রকার পূজা গ্রহণ করতে পারেন।

শ্লোক ৩৩ : পূজারী বিশ্বস্ততার সঙ্গে আমাকে হাত-মুখ ধোয়ার জল, সুগন্ধ তেল, ফুল ও অখণ্ড শস্যদানা, ধূপ, দীপ ও অন্যান্য অর্ঘ্যসহ দান করবেন।

ব্যাখ্যা : "অখণ্ড শস্যদানা" বা অক্ষত অর্থাৎ সাধারণত অপক্ব আতপ চাল, কুঙ্কুম বা হলুদের সঙ্গে মিশ্রিত করে কৃষ্ণকে নয়, বিষ্ণুকে নিবেদন করা হয়। কারণ কৃষ্ণ সাদা অন্ন অধিকতর পছন্দ করেন। সাধারণত সেই অক্ষত শস্য দানা অল্প অল্প করে বিগ্রহের শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করতে হবে আর পরম প্রভুর ১৬টি অথবা ১০৮টি নাম জপ করতে হবে। (প্রতিবার নামোচ্চারণের পূর্বে *ওম্* এবং নামের পরে সংপ্রদান কারক নির্দেশক *নমঃ* দিয়ে শেষ করতে হবে)। ভারতীয় মন্দিরগুলিতে পূজারীগণ প্রায়ই মন্দিরে আগন্তুক ভক্তদের পক্ষে পূজা নিবেদন

করে থাকেন। ভগবানের বিভিন্ন অনুসঙ্গী বা পার্ষদগণের নাম জপের সময় তাদের পূজাও করা যেতে পারে। (শ্লোক ২৯-এ উল্লেখ মতে)

নিবেদনযোগ্য ও নিবেদনের অযোগ্য ফুল

শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে ভগবান সোনা-মাণিক্যের অর্ঘ্য থেকে প্রথম শ্রেণীর পুষ্পার্ঘ্যে বেশি সন্তুষ্ট হন। তাই উপযুক্ত পুষ্প সংগ্রহে অধিক মনোযোগ দিতে হবে। নিবেদন যোগ্য ফুল হবে সুমিষ্ট সৌরভ যুক্ত, বিশেষ করে সেগুলি শুভ্র অথবা পীত বর্ণের হওয়া চাই। এই প্রকার ফুল পাওয়া না গেলে নিম্নে উল্লিখিত ত্রুটিশূন্য গন্ধহীন বা গাঢ় বর্ণের ফুল অর্পণ করা যায়।

হরিভক্তিবিলাসে নিম্নলিখিত ফুলগুলিকে পূজার যোগ্য বলে নির্দেশিত হয়েছে : জাতি, রক্ত ও শ্বেত পদ্ম, মালতী, কদম্ব, আম্র মুকুল, মল্লিকা, মাধবী (বসন্ত পুষ্প), চম্পক, ফ্রানজিপানি (এক প্রকার ম্যাগনোলিয়া), অশোক, কর্ণিকার, ঝিণ্টিকা, করবী, যূথিকা, মন্দার, পাটল, বকুল, তিল, জপ (চায়না রোজ), বিল্ব, শ্বেত কুটজ, কেতকী, পীটক, টগর, পলাশ এবং কুমুদ (শ্বেত জলপদ্ম)।

হরিভক্তিবিলাসে ভগবানকে নিবেদনের অযোগ্য ফুলের তালিকা নিম্নরূপ : ছিন্ন, জীর্ণ বা শুষ্ক (পদ্ম, চম্পক, তুলসী, অগস্ত্য ও বকুল ব্যতীত), পচা বা কীট দষ্ট, মাটিতে পড়া ফুল (বকুল ব্যতীত), দুর্গন্ধযুক্ত ফুল, গন্ধহীন ফুল (কাশ ব্যতীত), কাঁটাযুক্ত গাছের ফুল (সুগন্ধী ও হাল্কা রঙের না হলে, যদিও যে কোন রঙের গোলাপ গ্রহণীয়), ফুলের কুঁড়ি (জুঁই ব্যতীত), চুল যুক্ত অপবিত্র ফুল, শ্মশান বা কবরখানার ফুল, অপবিত্র বস্তু যেমন শবদেহে স্পর্শিত ফুল, প্রণামকালে হস্তধৃত ফুল, বাম হস্তে চয়ন করা বা ধৃত ফুল, শরীরের নিম্নাঙ্গের বস্ত্রে সংগৃহীত ফুল, মাথায় রাখা, কানে গোঁজা বা নিম্নাঙ্গ স্পর্শ করা ফুল, কারো দ্বারা আঘ্রাত ফুল, জলে ধোয়া ফুল (এতে ফুল গন্ধ হারায় এবং যে প্রকার কাপড়ের স্পর্শ পায় তার দাগ লাগে), দিনের উষ্ণতম ভাগে বা রাত্রিতে চয়ন করা ফুল, গাছের ডাল ভেঙ্গে বা গাছ উৎপাটন করে সংগৃহীত ফুল, অর্ক এবং ধুতুরা ফুল। চুরি করা ফুল ও তেল বা অন্য কোন বস্তু সহযোগে গন্ধযুক্ত করা ফুল বিগ্রহের চরণে অর্পণের অযোগ্য।

শ্লোক ৩৪ : ভক্ত তার সাধ্যানুসারে আমাকে মিছরি, পরমান্ন, ঘি, শষ্কুলী (চালের গুঁড়োর পিঠে), আপূপ (বিভিন্ন রকমের মিষ্টি পিঠে), মোদক (পুলি পিঠে), সংবাব (চিনি ও মশলা মিশ্রিত ঘি ও দুধ দ্বারা তৈরী গমের পিঠে), দই, নিরামিষ ঝোল ও অন্যান্য সুস্বাদু খাদ্য সাজিয়ে দেবে।

ব্যাখ্যা : শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভোগারতি সঙ্গীতে বর্ণিত আছে, ভগবান কৃষ্ণ ও তাঁর রাখাল সখারা বিভিন্ন প্রকার খাদ্যদ্রব্য উপভোগ করছেন আর প্রসাদ হিসাবে তা পেয়ে শ্রীমতী রাধারাণী ও তাঁর সখীরা তার স্বাদ আস্বাদন

করছেন। সাধারণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব মন্দিরগুলোতে প্রথমে শ্রীকৃষ্ণকে এক পাত্র ভোগ নিবেদন করা হয়। তারপর সেই কৃষ্ণপ্রসাদ শ্রীমতী রাধারাণীকে দেওয়া হয়। যাই হোক না কেন, শ্রীল প্রভুপাদ এটাও নির্দেশ করেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমতী রাধারাণীকে একই সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন পাত্রেও ভোগ নিবেদন করা যেতে পারে। যখন পৃথক পাত্রে ভোগ নিবেদন করা হয়, তখন পূজারীকে বুঝতে হবে যে শ্রীমতী রাধারাণী তাঁর পাত্রটি প্রথমে শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করবেন এবং পরম প্রভুর ভোগ গ্রহণের পরই তিনি তা সেবা করবেন। দুটি পৃথক পাত্রের বিকল্প হিসাবে একটি খুব বড় পাত্রে সম্ভব মতো সমৃদ্ধ অর্ঘ্য নিবেদন করা যায়। একটি পাত্রেই হোক বা একের বেশি পাত্রেই অর্ঘ্য নিবেদন করা হোক, ভক্তকে অর্ঘ্য নিবেদন কালে এটাই বুঝতে হবে যে তিনি তাঁর সমস্ত কিছু তাঁর নিজের পারমার্থিক গুরুকে অর্পণ করছেন আর তিনি গুরু পরম্পরার মাধ্যমে ভগবান শ্রীচৈতন্য, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁদের অনুষঙ্গীদের ভোগ নিবেদন করবেন। অতএব ভোগ নিবেদন কালে আমরা শ্রীগুরুদেব, ভগবান শ্রীচৈতন্য ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে প্রণাম মন্ত্র জপ করব আর প্রার্থনা করব তাঁরা যেন আমাদের এই তুচ্ছ নৈবেদ্য গ্রহণ করেন।

শ্লোক ৩৫ : কোন বিশেষ অনুষ্ঠানে কিংবা সম্ভব হলে প্রতিদিন মলম সহযোগে শ্রীবিগ্রহের অঙ্গসংবাহন ও দর্পণ প্রদর্শন করতে হবে। দন্ত মঞ্জনের জন্য ইউক্যালিপ্টাস গাছের ডাল প্রদান করতে হবে। পাঁচ রকমের অমৃত দ্বারা স্নান করিয়ে সব রকমের সমৃদ্ধ আহার্য দ্রব্য অর্পণ করতে হবে এবং নৃত্যগীতের দ্বারা শ্রীবিগ্রহের মনোরঞ্জন করতে হবে।

ব্যাখ্যা : রাজসিক উপাসনার দৃষ্টিকোণ থেকে ভক্ত এখানে তালিকা বদ্ধ বিভিন্ন বস্তু শ্রীবিগ্রহকে অর্পণ করতে পারেন। এইরূপ বস্তু প্রতিদিন অর্পণ করা সম্ভব না হলে, কোন বিশেষ উপলক্ষে অর্পণ করা যেতে পারে। এই শ্লোকের তাৎপর্যে শ্রীল শ্রীধর স্বামী উল্লেখ করেছেন যে শ্রীবিগ্রহের বিশেষ পূজা একাদশী তিথিতেই প্রশস্ত। উদাহরণ স্বরূপ পূজারী প্রতি একাদশীতেই পঞ্চামৃত স্নান করাতে পারেন। সেই দিনেই তিনি প্রভাতকালীন পূজাপাঠের (সম্ভবত দর্শন আরতির পর) শেষে অতিরিক্ত প্রার্থনা কীর্তন করতে পারেন। অথবা একাদশী তিথিতে নিয়মিতভাবে যে সব বস্তু শুধু মন্ত্র, জল বা পুষ্পদল দ্বারা অর্পণ করা হয় সেগুলি দন্তমঞ্জনের কাঠি (দন্ত ধাবন) বা পানসুপারী (তাম্বূল) অর্পণের দ্বারা সরাসরি সমর্পণ করা যায়। তদ্রূপ একাদশীর দিনে তিনি ভগবানের শয্যা ফুলের দ্বারা সজ্জিত করতে পারেন। চৌষট্টি উপচারের মধ্যে এটা ষাট সংখ্যক উপচার।

এই শ্লোকে উল্লিখিত মলম বলতে তিল বাটাকে বোঝাচ্ছে যা কিনা বিগ্রহের স্নানের পূর্বে তাঁর দেহ পরিষ্কার করার জন্য মর্দন করা হয়।

শ্লোক ৩৬ : শাস্ত্রীয় অনুশাসন মতে ভক্ত একটি অঞ্চল ঘিরে পবিত্র বলয়াকৃতি স্থানে, যজ্ঞীয় গহ্বর খুঁড়ে এবং বেদী তৈরী করে যজ্ঞানুষ্ঠান করবেন। ভক্ত নিজ হাতে কাঠ সাজিয়ে সেই হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করবেন।

ব্যাখ্যা : শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী তাঁর *সৎক্রিয়াসার দীপিকায়* কিভাবে যজ্ঞস্থলী তৈরী করতে হয় এবং কিভাবে যজ্ঞক্রিয়া সম্পাদন করতে হয় তার একটা পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন। ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের সপ্তবিংশ অধ্যায়ের ৩৬-৪১ শ্লোকে বিগ্রহ পূজার সমাপন অঙ্গ হিসাবে কিভাবে নিত্য হোম ক্রিয়া সম্পাদন করতে হয় তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। তিরুপতি, শ্রীরঙ্গম ও শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দিরের মতো বড় বড় মন্দিরে ভক্তগণ ভগবানের সুখানুভবের জন্য নিত্য হোমক্রিয়া সম্পাদন করেন। বিশেষ পূজার দৃষ্টিকোণ থেকে ছোট ছোট মন্দিরে একাদশী বা উৎসবের দিনগুলিতে সাধারণ ধরনের হোম হয়ে থাকে।

শ্লোক ৩৭ : ভূমিতে কুশঘাস বিছিয়ে এবং এতে জল ছিটিয়ে নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে অনবধান আচারানুষ্ঠান করতে হবে। অতঃপর নৈবেদ্য হিসাবে সমর্পণের দ্রব্যসমূহ সাজাতে হবে এবং প্রোক্ষণীয় পাত্র থেকে জল ছিটিয়ে তা পবিত্র করতে হবে। তারপর পূজারী হোমাগ্নির মাঝে আমার ধ্যান করবেন।

ব্যাখ্যা : এখানে পূজারীকে হোমাগ্নির মাঝে ভগবানের ধ্যান করতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। শ্রীল জীব গোস্বামী শর্ত আরোপ করছেন যে ভগবানের যে রূপ অনলের মাঝে ধ্যান করা হয়, সেটা শ্রীকৃষ্ণের আসল রূপ হওয়া উচিত নয়। সেটা বরং ভগবানের পরমাত্মারূপ। যখন থেকে ভক্ত কৃষ্ণের কথা ভাবেন তখন থেকে তিনি যে সূক্ষ্ম রূপে

বৃন্দাবনে শাশ্বতভাবে বিরাজিত সেই রূপের কথা ভাবেন—সে রূপ প্রজ্বলিত আগুনের বিষয় নয়।

শ্লোক ৩৮-৪১ : বুদ্ধিমান ভক্ত ভগবানের সেই রূপেরই ধ্যান করবেন যাঁর তরলিত স্বর্ণের মতো গাত্রবর্ণ, যাঁর চতুর্ভুজে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম উজ্জ্বলভাবে দীপ্যমান এবং যিনি সর্বদাই শান্তিপূর্ণ আর যিনি পদ্মকেশর বর্ণের পোশাক পরিহিত। তাঁর শিরস্ত্রাণ, মণিবন্ধ, কোমরবন্ধ, এবং সূক্ষ্ম বাহুর অলংকার উজ্জ্বলভাবে দীপ্তি দিচ্ছে। তাঁর বক্ষোপরি উজ্জ্বল কৌস্তুভমণি ও বনফুলের মালার সঙ্গে শ্রীবৎসের প্রতীক চিহ্ন শোভা পাচ্ছে। ভক্ত কাষ্ঠ খণ্ড যজ্ঞীয় হবিতে চুবিয়ে আগুনে নিক্ষেপ করে ভগবানের পূজা করবেন। নৈবেদ্যের বিভিন্ন পদ ঘি দ্বারা সিক্ত করে আগুনে নিক্ষেপ করে *আঘারের* (যজ্ঞের নাম) আচার সম্পাদন করবেন। অতঃপর ভক্তকে যমরাজ থেকে গুরু করে ষোড়শ উপদেবতাকে প্রত্যেক বিগ্রহের প্রাথমিক মন্ত্র এবং ষোড়শ পদের *পুরুষ-সূক্ত* স্তোত্র আবৃত্তি করে *স্বিষ্টিকৃৎ* নামে নৈবেদ্য দান করতে হবে। *পুরুষ সূক্তের*

প্রতিটি ছত্রের পর একটি নৈবেদ্য নিবেদন করে প্রতিটি বিগ্রহের নামে বিশেষ মন্ত্র উচ্চারণ করতে হবে।

ব্যাখ্যা : হোমের আয়তনের সঙ্গে বিগ্রহ পূজার নৈবেদ্যের আয়তনের অনেক সাদৃশ্য আছে : পুরোহিত পূজা পদ্ধতির প্রয়োজনীয় দ্রব্য (উপাদান) সংগ্রহ করবেন, পূজার স্থানটি শুদ্ধ করবেন (স্থান-শুদ্ধি), এবং তৎপর ভগবানকে অগ্নিতে আহ্বান করবেন (আবাহন)। ভগবানকে আবাহন করার পর, পূজারী ভগবানের রূপের ধ্যান করবেন এবং অবশেষে *পুরুষ-সূক্ত* স্তোত্রের ষোলটি মন্ত্ররূপ ষোড়শ উপচারে পূজা করবেন।

শ্লোক ৪২ : এইরূপে ভগবানকে হোমাগ্নিতে পূজা করে ভক্ত ও ভগবানের অনুষঙ্গীদের মাথা নত করে নমস্কার করবেন এবং তৎপর তাঁদের নৈবেদ্য নিবেদন করবেন। তাঁকে পরমেশ্বর নারায়ণরূপী পরম তত্ত্বকে স্মরণ করে ভগবান-বিগ্রহের মূলমন্ত্র জপ করতে হবে।

ব্যাখ্যা : এই শ্লোকটি যজ্ঞ সমাপন ও বিগ্রহের প্রভাতী পূজা সমাপণ—উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যজ্ঞ সমাপ্তিতে ভক্তকে মূলমন্ত্র হোম সম্পাদন করতে হবে। বিগ্রহ পূজার শেষে যে বিগ্রহের পূজা হচ্ছে তাঁর মূলমন্ত্র ও গায়ত্রীমন্ত্র জপ করতে হবে। এই শ্লোকে ভগবানের অনুষঙ্গীদের যে পূজার কথা উল্লিখিত আছে তা যজ্ঞ-প্রণালীর বৈষ্ণব-হোম এবং আবরণ-পূজা ও বিগ্রহ উপাসনায় ভগবানের অনুষঙ্গীদের মহাপ্রসাদ নিবেদনের দ্বারা সম্পাদিত হয়।

মূল মন্ত্র ও গায়ত্রী মন্ত্র দ্বারা সমাপ্তি পূজা

ভক্ত যখন তাঁর পারমার্থিক গুরুদেবের পূজা করবেন, তখন পূজা সমাপন কালে তাঁকে গুরু মূলমন্ত্র ও গুরু গায়ত্রীমন্ত্র (দ্বিতীয় ও তৃতীয় গুরু প্রদত্তমন্ত্র) জপ করতে হবে। যখন ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও ভগবান নিত্যানন্দ প্রভু উভয়েরই পূজা করবেন, তখন ভক্ত গৌর মূলমন্ত্র ও গৌর গায়ত্রী (চতুর্থ ও পঞ্চম গুরু প্রদত্তমন্ত্র) মন্ত্র দ্বারা পূজা সমাপন করবেন। যখন রাধাকৃষ্ণের পূজা করবেন, তখন তিনি গোপাল মন্ত্র ও কামগায়ত্রী (ষষ্ঠ ও সপ্তম গুরু প্রদত্ত মন্ত্র) মন্ত্র জপের দ্বারা পূজা সমাপ্ত করবেন। অন্য সব বিষ্ণু তত্ত্ব বিগ্রহের ক্ষেত্রে, যথোপযুক্ত মূল মন্ত্র* ও কাম গায়ত্রী (অথবা ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদদের জন্য (গৌর গায়ত্রী) মন্ত্র জপ করতে হবে। নিজের পারমার্থিক গুরু ব্যতীত গুরু পরম্পরার সদস্যদের জন্য ঠিক একইভাবে গুরু-মূল-মন্ত্র ও গুরু-গায়ত্রী জপ করতে হবে।

শ্লোক ৪৩ : পুনরায় (ভক্ত) শ্রীবিগ্রহকে তাঁর মুখ ধোয়ার জল দিতে হবে এবং বিশ্বক্‌সেনকে ভগবানের আহার্যের যৎসামান্য কণা দিতে হবে। এরপর বিগ্রহের মুখশুদ্ধির জন্য সুগন্ধি উপহার দিতে এবং পান সেজে রাখতে হবে।

---

* অন্য বিগ্রহের মূল-মন্ত্রের জন্য ১৬২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ব্যাখ্যা : যে কোন ভোগ নিবেদনের পর, ভক্ত শ্রীবিগ্রহকে আচমন দান করবেন। পরাশর মুনির মতে পাদ্য, অর্ঘ্য ও আচমন, আচমনের অন্তর্ভুক্ত। "সুগন্ধ সৌরভ" মুখবাসকে বোঝায়, বা সুগন্ধি মশলা যেমন মৌরি, এলাচ মুখকে বিশুদ্ধ করে।

শ্লোক ৪৪ : অন্যের সঙ্গে গীত, উচ্চস্বরে কীর্তন, নৃত্য, আমার অপার্থিব আমোদ-প্রমোদের অভিনয় এবং আমার সম্বন্ধে গল্প বলা ও শোনার ফলে ভক্ত এরূপ উল্লাসে কিছু সময়ের জন্য নিজেকে হারিয়ে ফেলে।

ব্যাখ্যা : ভগবানকে একান্তে পূজা করার পর, তিনি তাঁর ভক্তদের ও জনসাধারণকে দর্শন দান করেন। তখন তাঁরা, বিশেষ করে এখানে যে সমস্ত ক্রিয়াকলাপের উল্লেখ করা হয়েছে, তদ্দ্বারা পূজা নিবেদনের সুযোগ পান। শ্রীল প্রভুপাদের বর্ণনানুসারে দর্শন আরতি প্রথমে অবশ্যই ব্রহ্মসংহিতার রেকর্ড করা গোবিন্দ প্রার্থনা সঙ্গীতের অঙ্গীভূত হতে হবে। ভক্তরা সেই রেকর্ড সঙ্গীতের সঙ্গে গাইবে। সেই রেকর্ড করা সঙ্গীতের উপসংহারে হয় সঙ্গে সঙ্গে অথবা কিছু কীর্তনগীতি পরিবেশনের পরে, সমবেত ভক্তবৃন্দ শ্রীল প্রভুপাদের গুরুপূজার পূর্বে নমস্কার জ্ঞাপন করবেন। গুরু-পূজার পর, ভক্ত শ্রীমদ্ভাগবত থেকে শুনবেন মৎ-কথা শ্রাবয়ন্ শৃণ্বন্—"আমার সম্বন্ধে গল্প শোনা ও বলা"। বিশেষ উপলক্ষে শ্রীবিগ্রহের আনন্দবিধানের জন্য ভক্তগণ নাটকাদির অভিনয় করবেন, অবশ্যই সেই সব নাটক রুচিপূর্ণ হতে হবে আর তার উদ্দেশ্য হবে ভগবানের সেবা।

শ্লোক ৪৫-৪৬ : ভক্তগণ পুরাণ ও প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র থেকে এবং সাধারণ পরম্পরা থেকেও সব রকমের স্তব ও প্রার্থনা দ্বারা ভগবানকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবেন, 'হে ভগবান, দয়া করে আমার প্রতি করুণা কর।' এই প্রার্থনা করে ভক্ত দণ্ডবৎ শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন। বিগ্রহের চরণতলে মাথা রেখে জোড় হস্তে ভগবানের সম্মুখে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করবেন, 'হে ভগবান, দয়া করে আমাকে রক্ষা কর, আমি তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করছি। আমি এই জড় সংসার সমুদ্র দেখে খুবই শঙ্কিত। মনে হচ্ছে যেন মৃত্যুর মুখগহ্বরের মধ্যে অবস্থান করছি।'

ব্যাখ্যা : এই দুটি শ্লোক স্তুতি, বা প্রার্থনা নিবেদন এবং আত্মসমর্পণ, বা নিজেকে এবং নিজের ক্রিয়াকলাপসহ পূর্ণ আত্মসমর্পণের কথা বর্ণনা করছে। যদিও প্রার্থনা নিবেদন বিগ্রহ পূজা থেকে পৃথক এক ধরনের ভক্তিপূর্ণ সেবা হিসাবে বিবেচিত হতে পারে, তথাপি প্রার্থনা নিবেদন হল বিগ্রহ পূজার অখণ্ড রূপ। নব প্রকার ভক্তিপূর্ণ সেবার (বন্দনা) তালিকায় এটা আছে। প্রার্থনার লক্ষ্য বস্তু হল সাধারণত ভগবানের বিগ্রহমূর্তি। কিন্তু যে কোন প্রকার প্রার্থনাই ভগবানকে নিবেদন করা হোক না কেন, এর প্রয়োজনীয় উপাদান হল পরমেশ্বরের করুণার জন্য আবেদন করা (প্রসীদ ভগবান), কারণ ভক্ত স্বীকার করেন যে শুধু ভগবানের করুণার দ্বারাই (শ্রীগুরুদেবের করুণার মাধ্যমে) তার সেবা স্বীকৃত হবে। এই রূপে গতভাবে নিবেদিত প্রচলিত প্রার্থনার সঙ্গে আন্তরিক প্রার্থনাও নিবেদিত

হওয়া উচিত। (ভক্তিরসামৃত সিন্ধু, ৯ম অধ্যায় "আত্মসমর্পণ" ও "উল্লেখযোগ্য প্রার্থনা নিবেদন" দ্রষ্টব্য।)

শ্লোক ৪৭ : এইভাবে প্রার্থনা করে, ভক্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে আমার নিবেদিত অবশিষ্টাংশ তার মস্তকে স্থাপন করবে। আর এই নির্দিষ্ট বিগ্রহপূজার পর যদি বাতিল করা হবে বলে স্থির হয়, তাহলে ভক্ত পুনরায় তার হৃদয়পদ্মে শ্রীবিগ্রহের উপস্থিতি স্মরণ করে সেটাই করবে।

ব্যাখ্যা : এই শ্লোকটি নির্মাল্য গ্রহণ অথবা ভগবানের ফুল, তুলসীপত্র ও চরণামৃতের যৎসামান্য অবশিষ্টাংশ গ্রহণ করা বোঝাচ্ছে। ভক্তরা এই সব উচ্ছিষ্টাংশ গ্রহণে খুবই ব্যগ্র। তাঁরা এগুলির বিশুদ্ধিকরণ ক্ষমতার কথা জেনে এইগুলির প্রতি খুব শ্রদ্ধাশীল। (ভক্তিসুধা, নবম অধ্যায়, "চরণামৃত পান" ও "শ্রীবিগ্রহকে নিবেদিত ধূপ ও ফুলের গন্ধ আস্বাদন") বিগ্রহকে শ্রদ্ধা নিবেদনের পর, ভক্ত সেই নিবেদিত ফুল ইত্যাদি কোন জলাশয়—কোন নদী, হ্রদ, বা কোন সমুদ্রে নিক্ষেপ করে মুক্ত হন।

সাধারণত বৈষ্ণবদের পূজিত বিগ্রহ পূজা শেষে বিসর্জন দেওয়া হয় না—যতই ক্ষণস্থায়ী বিগ্রহ (যেমন গোবর্ধন পূজার জন্য গোবর দ্বারা নির্মিত গিরিরাজের মূর্তি) হোক না কেন। এই ভেবে এটা করা যেতে পারে যে পূজিত বিগ্রহ ভেঙ্গে ফেলার পূর্বে ভগবান যাতে নিরাপদে অন্য কারও হৃদয়ে তাঁর জায়গা করে নিতে পারেন।

শ্লোক ৪৮ : কেউ যখন আমার প্রতি, বিগ্রহ হিসাবে আমার রূপের প্রতি বা আমার অন্য কোন প্রকাশিত প্রকৃত রূপের প্রতি তাঁর বিশ্বাস বৃদ্ধি করেন, তখন তিনি আমার সেই রূপের পূজা করতে পারেন। আমি সকল জীবের পরমাত্মা, কারণ আমি অবশ্যই সমস্ত সৃষ্ট জীব এবং পৃথকভাবে আমার মূল রূপ উভয়ের মধ্যেই বিরাজিত।

ব্যাখ্যা : এই শ্লোকের তাৎপর্য এই যে, দ্বিতীয় শ্রেণীর ভক্ত বিগ্রহের প্রতি এতটা বিশ্বাস বাড়িয়ে তুলেছেন যে তিনি ভাবেন ভগবান ও বিগ্রহ অভিন্ন। যখন "বৈষ্ণব সমাজের মধ্যে এই বিশ্বাস বলিষ্ঠ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে," তখন তিনি ভাবেন যে তিনি এখন ভক্তির প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করেছেন এবং সেইজন্য তিনি বিগ্রহ পূজা ত্যাগ করতে পারেন,—এমনটি ভাবা উচিত নয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বিশুদ্ধ ভক্তের ভূমিকায় তাঁর পরিভ্রমণ কালে বিভিন্ন মন্দিরে ঘুরে ঘুরে কৃষ্ণভাবনামৃতের আদর্শ প্রচারকের আচরণ শিক্ষা দিয়েছেন। অধিকন্তু, তাঁর বেশির ভাগ গৃহী পার্ষদদেরই অর্চা বিগ্রহ ছিল। সেই বিগ্রহগুলিকে তাঁরা তাঁদের সারা জীবনভর সেবা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সংকীর্তন আন্দোলন বিগ্রহ উপাসনার নিখুঁত পরিপূরক। কারণ কলিযুগে পরমেশ্বর ভগবানের তুষ্টি বিধানের প্রধান পদ্ধতি

হল সমবেতভাবে তাঁর পবিত্র নাম সংকীর্তন করা। এইভাবে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের জন্য ভাগবত বিধি আদর্শ এবং শ্রীবিগ্রহ পূজার জন্য পঞ্চরাত্রিক আদর্শ ভগবানের বিগ্রহ মূর্তির সম্মুখে সমবেতভাবে ভগবানের মহিমা কীর্তন পরস্পর পরস্পরের সম্পূরক।

শ্লোক ৪৭ : বেদে ও তন্ত্রে উল্লিখিত বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে আমার অর্চনা করে আমার কাছ থেকে ভক্ত এই জীবন ও পরজীবনে তার ইচ্ছানুরূপ পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে।

ব্যাখ্যা : বর্তমান এবং তার আগের শ্লোকটি শ্রীবিগ্রহ পূজার প্রতি বিশ্বাসের পদ্ধতিতে গুরুত্ব আরোপ করেছে। ভগবান তাঁর বিগ্রহ মূর্তিতে বর্তমান—এই বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাসের দ্বারা এবং নির্দিষ্ট পূজা পদ্ধতি অনুসরণের দ্বারা কেউ পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে। বেদ ও তন্ত্রে উল্লিখিত সব পূজাপদ্ধতিই বিশুদ্ধতা, আধ্যাত্মিকতা, মিনতিপূর্ণ আহ্বান ও অর্চনার একটা সাধারণ আদর্শ অনুসরণ করে। এই আদর্শের একটা সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য কাউকে বিগ্রহপূজার পদ্ধতিগত দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করতে সাহায্য করতে পারে।

বিশুদ্ধতা, আধ্যাত্মিকতা, সমিনতি আহ্বান ও অর্চন

ভগবান পরম বিশুদ্ধ এবং সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়। তাঁর কাছে যাওয়ার জন্য আমাদের যথার্থ গুণান্বিত হতে হবে। ভগবানের পূজা আরম্ভের পূর্বে বিশুদ্ধিকরণ (জড় অসম্পূর্ণতা দূরীকরণ) এবং পূজাস্থানের অধ্যাত্মকরণ, (আধ্যাত্মিক পরিচিতির জন্য প্রার্থনা) পূজায় ব্যবহৃত দ্রব্য-সামগ্রী এবং আমরা নিজেরা যারা পূজা করছি তাদের সকলকেই উক্ত পদ্ধতিগুলি সম্পাদন করতে হবে। অধিকন্তু, কতিপয় বস্তুর অধ্যাত্মকরণের পর—যেমন, বিশেষ অর্ঘ্য—ঐসব বস্তুর মধ্যে ভগবানকে আহ্বানের পদ্ধতি আছে। অবশেষে আমরা শুধু ভগবানের পূজাই নয়, অস্থাবর সম্পত্তি এবং ভগবানের অনুষঙ্গীদের বিভিন্ন উপচারে শুধু পূজাই করি। বিশুদ্ধিকরণ, অধ্যাত্মকরণ, সবিনয় প্রার্থনা এবং পূজা, বিভিন্ন বস্তুর সমন্বয়ে, বিভিন্ন পদ্ধতির দ্বারা, জড় উপাদান, ইন্দ্রিয়নিচয়, মন ও বুদ্ধির ব্যবহারে সম্পাদিত হয়। আমরা এই সকল পদ্ধতি খুব বিস্তৃতভাবেই সম্পাদন করি বা সাধারণ ভাবেই করি—উদ্দেশ্য একই—ভগবানকে স্মরণ করা ও আমাদের সেবা দ্বারা তাঁকে তুষ্ট করা।

কার্য পরিচালন প্রণালীর একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ যা বিশেষ করে বিশদভাবে পূজার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে পারে—যেমন, বিশুদ্ধিকরণ, অধ্যাত্মকরণ, সবিনয় আহ্বান এবং বস্তু পূজা নিম্নে দেওয়া হল :

পূজায় ব্যবহৃত দ্রব্য-সামগ্রী বিশুদ্ধকরণের প্রথম শর্ত হল অশুভ সূক্ষ্ম প্রভাব দূরীকরণ এবং প্রোক্ষণ দ্বারা স্পর্শ দূষণ নাশ (পবিত্র জল সিঞ্চন), মন্ত্রজপ

(ওম্ অস্ত্রায় ফট), এবং মুদ্রা প্রদর্শন (চক্র-মুদ্রা) করতে হবে। কোন তরল পদার্থ থেকে অজানা খুবই সামান্য অপবিত্রতা দূর করতে কেউ অতিরিক্ত মুদ্রা হিসাবে গালিনী-মুদ্রা প্রদর্শন করতে পারে। (শক্ত বা আঁটো করে টেনে ধরার যন্ত্র) পূজার দ্রব্য-সামগ্রীকে সুধায় (অমৃত) রূপান্তরিত করতে অতঃপর কেউ ধেনু-মুদ্রা প্রদর্শন করতে পারে।

যখন এর উপর বীজাক্ষর-মুদ্রা প্রদর্শন করে কারও পূজিত বিগ্রহের বীজমন্ত্র নীরবে জপ করে দ্রব্য-সামগ্রীকে অধ্যাত্মকরণ করা হয়, তখন সারাক্ষণ এই চিন্তা করতে হবে যে বীজমন্ত্র দ্বারা এগুলি সিক্ত হচ্ছে।

মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক মিনতিপূর্ণভাবে বিগ্রহের আহ্বান ও বিগ্রহ স্থাপন পরস্পর সম্পর্কিত—বিগ্রহ স্থাপনের সময় ভগবানকে বস্তুর মাঝে উপস্থিত হতে অনুরোধ করতে হয় (বিশেষ করে বিশেষ অর্ঘ্যে বা যজ্ঞাগ্নিতে)। মুদ্রা ও মন্ত্রের মাধ্যমে, ভক্ত ভগবানকে উপস্থিত হতে আহ্বান করবেন, এতটা কাছে আসতে অনুরোধ করবেন যাতে তাঁর প্রতি সেবা নিবেদন তাঁর রূপের আহ্বান এবং ন্যাসের দ্বারা তাঁর প্রতিরক্ষা প্রদান করা যায়। ভগবানকে অনুরোধ করতে হবে যাতে ভক্তের প্রতি তিনি পূর্ণানন্দময় হন এবং তাঁর আশীর্বাদ দান করেন।

ভগবানের পূজার সাধ্যানুযায়ী ষোলটি, বারটি, দশটি, পাঁচটি, তিনটি, দুটি এমন কি একটি উপচারও অবিচ্ছেদ্যভাবে থাকবেই। পূজা উপচারকে চার শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম শ্রেণীটি হল গ্রহণ সংক্রান্ত এবং ষোলটি উপচারের প্রথম সাতটি নিয়ে গঠিত (আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমন, মধুপর্ক ও পুনরাচমন)। দ্বিতীয় শ্রেণী হল স্নান ও পোশাক সংক্রান্ত (স্নান, বস্ত্র ও অলংকার—একে আভরণও বলা হয়।) তৃতীয় শ্রেণীতে এগারো থেকে পনেরো উপচার অন্তর্ভুক্ত (গন্ধ, পুষ্প, ধূপ দীপ ও নৈবেদ্য) এবং বিশেষ করে পূজার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আনুষঙ্গিক বস্তু। শেষ শ্রেণী হল প্রণাম। বিভিন্ন প্রকার প্রার্থনা উচ্চারণ, ভগবানের অনুষঙ্গীদের পূজা, অপরাধ ক্ষমার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা ও ভগবৎসেবায় সব কিছু সমর্পণ করা।

পূজায় হয় প্রকৃত বস্তুর (বস্ত্র, ধূপ, দীপ ইত্যাদি বস্তু) ব্যবহার, অথবা, এগুলোর বিকল্প যেমন—জল, ফুল, অপক্ক আতপ চাল, বা এগুলির সমন্বয়-ব্যবহার করা যেতে পারে। বিকল্প বস্তুর ব্যবহারের সময় আসল বস্তুর চিন্তা করতে হবে।

এই সকল পদ্ধতির মধ্যে আমরা ভক্তিপূর্ণ সেবার তিনটি প্রয়োজনীয় আদর্শ স্বীকার করে নিতে পারি যেমন, সেবক (যে ব্যক্তি সেবা করেন), সেবা (সেবার কাজ) এবং সেব্য (যে ব্যক্তি সেবা গ্রহণ করেন)। ভক্ত (সেবক) যখন পবিত্র ভাবনায় অবস্থিত থাকেন, তখন তিনি ভগবানের সেবায় সব কিছুই সঠিকভাবে নিযুক্ত করতে পারেন। এবং এরূপভাবেই তার সেবার উদ্দেশ্য—(পরমেশ্বর ভগবানকে তুষ্ট করা)—প্রকৃতরূপে পূর্ণ হয়।

শ্লোক ৫০ : ভক্তের উচিত সুন্দর উদ্যান সমন্বিত পূর্ণাঙ্গ মন্দির আরও দৃঢ়ভাবে নির্মাণ করে তাতে আমার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা। এই উদ্যানগুলিকে আলাদা আলাদাভাবে নিয়মিত প্রাত্যহিক পূজার জন্য, বিগ্রহ নিয়ে বিশেষ শোভাযাত্রা, এবং পবিত্র তিথি উদ্‌যাপনের জন্য যাতে ফুল পাওয়া যায় তার জন্য নির্দিষ্ট রাখতে হবে।

ব্যাখ্যা : ভগবানের শ্রীমন্দির দৃঢ়ভাবে নির্মিত হওয়া উচিত, যেহেতু চৌষট্টি উপচারের একটি, এই উপচারটি ভগবানের সুরক্ষা বিধান করে থাকে। ভগবান এবং তাঁর ভক্তের সুরক্ষার জন্য সকল প্রকার সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য। মন্দিরের ম্যানেজারগণকে অগ্নিকাণ্ড ও আসুরিক মানুষের আক্রমণ থেকে মন্দিরকে রক্ষার জন্য বিশেষ ধরনের পূর্ব সতর্কতা গ্রহণ করতে হবে, আর মন্দিরের শ্রীবিগ্রহসমূহকে জীবন দিয়েও রক্ষার জন্য ভক্তগণ প্রস্তুত থাকবেন।

শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করার পূর্বে, মন্দির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ভারপ্রাপ্ত ভক্তগণকে এইটি প্রথমে নিশ্চিত করতে হবে যে বিগ্রহের তত্ত্বাবধানের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকবে। বিগ্রহের জন্য যদি ফুলবাগান করার কোন সুযোগ না থাকে, তাহলে অন্ততঃ তুলসীবাগানে যেন পর্যাপ্ত তুলসী গাছ থাকে, কেননা তুলসী নিবেদিত হলে ভগবান সবচেয়ে বেশি প্রীত হন।

শ্লোক ৫১ : যে ব্যক্তি শ্রীবিগ্রহের নিয়মিত প্রাত্যহিক পূজা এবং বিশেষ উৎসব যাতে চিরকাল চলতে থাকে তার জন্য বিগ্রহকে ভূমি, বাজার, শহর এবং গ্রাম উপহাররূপে অর্পণ করে, সে আমার সমান ঐশ্বর্য লাভ করে।

ব্যাখ্যা : অতীতে রাজাদের মধ্যে একটি প্রথা ছিল বড় বড় মন্দির নির্মাণ করা, তারপর ভূমি, বাজার, শহর প্রভৃতি ঐ সমস্ত মন্দিরের তত্ত্বাবধানের জন্য দান করা। কলিযুগ যত গভীর হচ্ছে, ততই এগুলি অতীতের স্মৃতিতে পরিণত হচ্ছে। তা সত্ত্বেও বিগ্রহের জন্য একটি দানভাণ্ডার গঠন করা এখনো সম্ভব। একটি বিপুল অঙ্কের অর্থ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখা যায়, যার সুদের লভ্যাংশে বিগ্রহ-পূজার ব্যায়ভার মেটানো যেতে পারে। এটাও একটা সাধারণ প্রথা, বিশেষত ভারতে যে মন্দির কর্তৃপক্ষ মন্দিরের বিভিন্ন ধরনের সেবার জন্য বিভিন্ন অঙ্কের নগদ অর্থ নির্ধারণ করতে পারেন এবং ঐ অর্থের বিনিময়ে ঐ দাতার জন্য বিশেষ পূজাদি অনুষ্ঠান সম্পাদন করা যেতে পারে। এই জন্য, বিভিন্ন ধরনের সেবা ও তার জন্য আনুষঙ্গিক ব্যায়ভারের একটি তালিকা মন্দিরে সাধারণ দর্শনার্থীদের দেখানোর উদ্দেশ্যে মন্দিরের গায়ে বিজ্ঞাপিত করা যেতে পারে, আর মন্দিরের কোন একজন কর্মাধ্যক্ষ দানকৃত অর্থ গ্রহণ করতে পারেন।

শ্লোক ৫২-৫৩ : বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করলে সারা বিশ্বের রাজা হতে পারে, ভগবানের মন্দির নির্মাণ করলে ত্রিভুবনের শাসক হতে পারে, বিগ্রহের সেবা-পূজা করলে সে ব্রহ্মলোকে গমন করে, আর যে ব্যক্তি এই তিনটি কার্যই

সম্পাদন করে সে আমার নিজের মতো দিব্য রূপ লাভ করে। কিন্তু যে সকাম কর্মের ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হয়ে কেবলই ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত হয়, সে আমাকেই লাভ করে। আমার দ্বারা বর্ণিত পদ্ধতিতে যে আমার অর্চনা করবে অবশেষে সে আমার প্রতি শুদ্ধ ভক্তিযোগ লাভ করবে।

ব্যাখ্যা : এমন নয় যে বাহ্যিক উদ্দেশ্য ব্যতীতই প্রত্যেকে বিগ্রহ-পূজায় নিয়োজিত হবে কিন্তু তবু শ্রীভগবান যে কোন ভাবে সম্ভব প্রত্যেককে তাঁর সেবায় নিয়োজিত হতে উৎসাহিত করেন কেননা এইভাবে সে শুদ্ধতা লাভ করতে পারে। কিন্তু যারা মন্দিরের শ্রীবিগ্রহের সেবক হিসাবে নিয়োজিত হবেন, তাদেরকে ভগবদ্ভক্তিময় সেবার লক্ষ্যকে সুস্পষ্টভাবে অন্তরে জাগরূক রাখতে হবে এবং এইভাবে তারা তাৎক্ষণিক বা বাহ্যিক লাভের প্রলোভন থেকে নিজেদের দূরে রাখবেন। পূর্ণ সময় বিগ্রহ পূজায় নিয়োজিত থাকা সচরাচর খুব একটা জনপ্রিয় সেবা নয়, কেননা প্রায়ই এটা একটা "ধন্যবাদহীন কাজ"। অন্যকথায়, যারা বিগ্রহ পূজায় নিয়োজিত থাকেন, তাঁরা প্রায়ই অনুভব করেন অন্যান্য ভক্তগণ বিগ্রহসেবাকে যথেষ্টভাবে সমাদর করছে না। কিন্তু একজন সুযোগ্য পূজারী, যিনি কর্মোচিত ফলাদির প্রতি অনাসক্ত হয়ে অবিচলিত নিষ্ঠা সহকারে নিজ সেবা সম্পাদন করতে থাকেন, তিনি উপলব্ধি করতে পারেন যে শ্রীভগবান স্বয়ং ব্যক্তিগতভাবে তাঁর বিগ্রহস্বরূপে শ্রীমন্দিরে উপস্থিত রয়েছেন এবং এইভাবে তিনি পূর্ণ সন্তোষ লাভ করতে পারেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে তাঁর সেবাকর্ম শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচার কার্যের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

শ্লোক ৫৪-৫৫ : নিজে অথবা অন্য কারও প্রদত্ত দেবতা অথবা ব্রাহ্মণদের সম্পত্তি যদি কেউ অপহরণ করে, সে ব্যক্তি দশ কোটি বৎসর ব্যাপী বিষ্ঠার কীট রূপে বাস করবে। কেবলমাত্র সেই চৌর্যকর্মের কর্তাই নয়, যে ব্যক্তি তাকে সহায়তা করবে, সেই কুকর্মে প্ররোচিত করবে, অথবা কেবল তার অনুমোদন করবে, পরবর্তী জীবনে তাকেও প্রতিক্রিয়ার ভাগী হতে হবে। যে, যে পরিমাণে তাতে জড়িত হবে, সে, সেই অনুসারে উপযুক্ত প্রতিফল ভোগ করবে।

ব্যাখ্যা : ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ আরাধনা সংক্রান্ত তাঁর শিক্ষা-নির্দেশ সমাপ্ত করেছেন এক কঠোর সতর্কবাণী দিয়ে : ভগবান বা তাঁর প্রতিনিধিগণের সেবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে এমন কোন কিছু যদি কেউ নিজে নিয়ে নেয়, তাহলে কখনই তাকে ক্ষমা করা হয় না। শ্রীবিগ্রহের প্রতি যেসমস্ত অপরাধ হতে পারে, তার মধ্যে এইটি নিশ্চিতভাবেই সর্বাপেক্ষা গুরুতর। শ্রীবিগ্রহের পূজার্চনায় ব্যবহৃত সামগ্রীও অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলেন —

কোনও ভগবদ্ভক্ত কখনই তার ভক্তিমূলক কার্যকলাপের প্রচার বিজ্ঞাপিত করবে না, সেইভাবেই তার সেবা কার্য থেকে মিথ্যা অহমিকা সৃষ্টি হবে

না। আমার উদ্দেশ্যে নিবেদিত প্রদীপগুলি অন্য কোনও উদ্দেশ্যে আলো জ্বালানোর জন্য ব্যবহৃত হবে না, সেইভাবেই অন্য ব্যক্তিকে নিবেদিত বা অন্য জনের ব্যবহৃত কোনও সামগ্রী কখনই আমাকে নিবেদন করা উচিত নয়। (শ্রীমদ্ভাগবত ১১/১১/৪০-৪১)

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ে বিগ্রহ পূজার তালিকাবদ্ধ অপরাধ এড়িয়ে চলতে হবে। পদ্মপুরাণে প্রদত্ত চার শ্রেণীর অপরাধকে পুনর্বিন্যাস করে নিম্নে দেওয়া হল : ১) পবিত্রতার অভাব, ২) শ্রদ্ধার অভাব, ৩) চেষ্টার অভাব, ৪) বিশ্বাসের অভাব। যদিও সব অপরাধই শ্রদ্ধার অভাব দ্বারাই বোধগম্য, তথাপি স্পষ্টতার জন্যই আমরা এর শ্রেণী বিভাগ করছি। নিচের তালিকায় আমরা যেখানে যেখানে দরকার সেখানে কিছু বিশেষ অপরাধের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা যুক্ত করেছি। এর কিছু ব্যাখ্যা উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত বৈষ্ণবদের কাছে আত্ম ব্যাখ্যামূলক ও স্পষ্ট। আবার কিছু ব্যাখ্যা অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থক প্রতিপন্ন হতে পারে। কিন্তু সাধারণ আদর্শ বোধগম্য হলে যে কেউ নিশ্চয়ই বিগ্রহ সমীপে অপরাধমূলক কাজ এড়াতে পারবে।

অপরাধ সম্পাদিত হয় দেহ, মন ও বচনের দ্বারা এবং প্রায় অধিকাংশই এড়ান যায় ছ'প্রকার প্ররোচনাকে সংযত করে (বাক্য, মন, ক্রোধ, জিহ্বা, উদর ও জননেন্দ্রিয়) শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁর বিগ্রহমূর্তিতে উপস্থিত এই কথা স্মরণ করে ভক্ত সর্বদাই অপরাধ এড়াতে সজাগ। ভগবান পরম পবিত্র হওয়ায় সেবক অপবিত্র অবস্থায় তাঁর নিকট যেতে পারে না। তিনি সর্বাকর্ষক হওয়ায়, ভক্তের এমন পোশাক পরা উচিত নয়, বা এমন কাজ করা বা এমন কথা বলা উচিত নয় যা দ্বারা ভক্ত তার নিজের প্রতি অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে। ভক্তকে সর্বদাই ভৃত্যের অবস্থানে থাকতে হবে, আর ভগবান থাকবেন পরম প্রভুর স্থানে। তাই ভক্তকে সঠিক পূজা দ্বারা ভগবানকে তুষ্ট রাখতে সকল প্রকারে চেষ্টাশীল হতে হবে। গুরুদেব ও শ্রীকৃষ্ণের উপর ভক্তিপূর্ণ সেবার সকল অগ্রগতি নির্ভরশীল বলে ভক্ত এমন কোন কাজে প্রশ্রয় দেবে না যা তার বিশ্বাসকে বিপদাপন্ন করে।

সেবা অপরাধ—পরিহারযোগ্য অপরাধ

শ্রীমদ্ভাগবতে (৪/২৪/৫৯) তাৎপর্যে শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন :

মহামন্ত্র জপের সময় দশটি এবং বিগ্রহ পূজার সময় চৌষট্টিটি অপরাধ কেউ যদি করে তবে তা পরিহার করেই ভক্তিযোগ সম্পাদন করা যায়। কোন ভক্ত যদি কঠোরভাবে নিয়ম-কানুন মেনে চলে, তবে ভক্তিদেবী তার প্রতি অতীব সন্তুষ্ট হন এবং সেই সময় ভক্ত কোন বহিরঙ্গা শক্তি দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় না। ভক্তসঙ্গের দ্বারা যখন কারও হৃদয় পবিত্র হয়, ভগবানের নাম কীর্তন ও পূজার দ্বারা যখন অপরাধ কর্ম পরিহার করা হয়, তখন ভগবানের অপ্রাকৃত নাম, রূপ ও কার্যাবলী ভগবান কর্তৃকই প্রকাশিত হয়।

দেহ ও মনে পবিত্রতার অভাব হেতু অপরাধ

১) হাত-পা না ধুয়ে কারও মন্দিরে প্রবেশ করা উচিত নয়।

২) প্রতিদিন খুবই সযত্নে দন্তমঞ্জন করতে হবে।

৩) সারা গায়ে তেল মেখে বিগ্রহকক্ষে প্রবেশ ও বিগ্রহাঙ্গ স্পর্শ করা উচিত নয়।

৪) স্নান না করে কেউ বিগ্রহ স্পর্শ করবে না।

৫) রজস্বলা নারীকে কেউ স্পর্শ করবে না।

৬) যৌনসহবাসের পর সরাসরি কেউ মন্দিরে ঢুকবে না।

৭) শবদেহ স্পর্শের পর কারও মন্দিরে প্রবেশ করা উচিত নয়।

৮) মৃতদেহ দর্শনের পর মন্দিরে প্রবেশ অনুচিত।

৯) শ্মশানক্ষেত্র পরিদর্শনের পর মন্দিরে প্রবেশ করা উচিত নয়।

১০) অশৌচ অবস্থায় মন্দিরে প্রবেশ নিষিদ্ধ। (বৈদিক শাস্ত্র অনুসারে, কোন পরিবারে কেউ মারা গেলে গোটা পরিবারই অবস্থানুযায়ী কিছুদিনের জন্য অশুচি হয়ে যায়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, "পরিবারটি যদি ব্রাহ্মণ হয় তবে অশৌচ কাল হবে বারদিন, ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্য হলে হবে পনেরো দিন, আর শূদ্রের অশৌচকাল ত্রিশ দিন।") [কোন উত্তেজক বা অশুচিকর অভিজ্ঞতা মনের উপর কিছুকালের জন্য প্রভাব ফেলে। এইরূপ প্রভাব সম্পূর্ণরূপে প্রশমিত না হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তির বিগ্রহ সম্মুখে আসা উচিত নয়, কারণ সে তখন শ্রীবিগ্রহের উপর তার মনের এই ছাপ ফেলতে পারে। ৬ নং থেকে ১০ নং পর্যন্ত অপরাধগুলি এভাবেই বুঝতে পারা যায়।]

১১) ঘর্মাক্ত অবস্থায় ভক্তের বিগ্রহ পূজা করা উচিত নয়। [এটা শ্রীবিগ্রহের সান্নিধ্যে থেকে পূজারী কর্তৃক পূজা করা বোঝাচ্ছে। অবশ্য গ্রীষ্মঋতুতে ঘর্মাক্ত না হয়ে যখন উপায় নেই তখনও শ্রীবিগ্রহের পূজার কাজ চালিয়ে যেতে হবে। পূজা বন্ধ করা উচিত নয়।]

১২) পূজায় নিরত থাকার সময় কারও মূত্রত্যাগ করা বা (পাকস্থলী) খালি করা ঠিক নয়। [খাদ্যাভ্যাস কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যাতে পূজায় বিঘ্ন ঘটিয়ে কাউকে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে না হয়। তথাপি পূজার কাজ অপরিহার্যরূপে বাধাপ্রাপ্ত হলে পূজারীকে মনে মনে ভগবানের কাছে এর জন্য অনুমতি প্রার্থনা করতে হবে এবং পূজা বন্ধ ও পুনরারম্ভের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। শ্রীবিগ্রহের স্নানের সময় কোন রূপ বাধা কঠোরভাবে পরিহার করতে হবে।]

১৩) আঙ্গুল অথবা নখের স্পর্শ পাওয়া জলদ্বারা শ্রীবিগ্রহের পূজা করা যাবে না।

১৪) মন্দিরের অভ্যন্তরে ক্রোধ প্রকাশ চলবে না। [অবশ্য যদি ভক্ত ও ভগবান আক্রান্ত বা আতঙ্কিত হন, তখন তাঁদের রক্ষা করার জন্য সর্ব প্রকারেই ক্রোধ প্রদর্শন করা যেতে পারে।]

শ্রদ্ধার অভাব বশত অপরাধ

১৫) শ্রীবিগ্রহের সামনে ঢেকুর তুলতে নেই। ("সুতরাং খাদ্যবস্তু সম্পূর্ণরূপে জীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সে মন্দিরে প্রবেশ করতে পারবে না।" ভক্তিরসামৃতসিন্ধু অধ্যায় ৮)

১৬) কেউ মোটর গাড়িতে, বা পাল্কীতে বা জুতা পায়ে মন্দিরে প্রবেশ করতে পারবে না। [পিতা বা মাতা তার শিশু সন্তানকে দুদিকে পা ফাঁক করে কাঁধে বসিয়ে কীর্তন কক্ষে শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে উপস্থিত হল, সেটি উচিত নয়। শিশুকে কোন যানবাহনে চড়িয়ে মন্দিরে প্রবেশ করার সমতুল্যই এই ব্যাপারটা। যদি প্রয়োজন হয় তবে ছোট শিশুকে হাত ধরে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। অবশ্য যদি কোন ব্যক্তি খোঁড়া বা দুর্বল হয়, তখন সে হুইলচেয়ার বা তত্তুল্য কোন গাড়ি নিয়ে কীর্তনকক্ষে গেলে অপরাধ হবে না।]

১৭) শ্রীবিগ্রহের সামনে মাথা নত করা অপরিহার্য। [দুবার করে প্রণাম করতে হবে—একবার শ্রীবিগ্রহকে কাছে, আবার সম্মানীয় ব্যক্তি যেমন, গুরুদেব ও সন্ন্যাসীদের : একবার দূর থেকে, যখন কেউ কোন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে প্রথম দেখে, এবং আবার কাছ থেকে, যখন সে কাউকে দেখে। এমন কি কেউ যদি মন্দির গৃহের বাইরে থেকেও শ্রীবিগ্রহকে দেখে, তবে তার তৎক্ষণাৎ নমস্কার প্রদর্শন করা উচিত।]

১৮) এক হাতে ভর দিয়ে মাথা নত করতে নেই। [কেউ যখন কাউকে অবনত মস্তকে প্রণাম জানায়, তখন মনে মনে তার হাতের দ্বারা প্রণম্য ব্যক্তির পদস্পর্শ করা উচিত। অকৃত্রিম শ্রদ্ধা উভয় হাতের দ্বারাই পদস্পর্শ করার দাবি রাখে। কেউ যদি কিছু বহন করে, তবে প্রথমে সেটা উপযুক্ত স্থানে রেখে তারপর প্রণাম জানাবে।]

১৯) শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে কাউকে পরিক্রমা করা উচিত নয়। ("মন্দির পরিক্রমার পদ্ধতি হল শ্রীবিগ্রহের ডান হাতের পাশ থেকে পরিক্রমা শুরু করে ঘুরে আসতে হবে। মন্দির পরিকাঠামোর বাইরে অন্ততপক্ষে প্রতিদিন তিনবার করে এই পরিক্রমণ কার্য সম্পাদন করতে হবে।" ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ৮ম অধ্যায়।) [এই আদেশ ভগবানের সামনে কাউকে প্রদক্ষিণ করে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করা বোঝাচ্ছে। এই নিষেধ মেনে আমরা বিগ্রহের পর্দা টেনে দিয়ে তুলসীদেবীকে পরিক্রমা করি। বিগ্রহের আনন্দবিধানের জন্য বিগ্রহের সম্মুখে বৃত্তাকারে নৃত্য করা অপরাধ নয়। দেখতে হবে শ্রীবিগ্রহ যেন উদ্দাম নৃত্যের দ্বারা বিপদাপন্ন না হন।]

২০) শ্রীবিগ্রহের সামনে কেউ যেন পা ছড়িয়ে না দেয়।

২১) বিগ্রহের সামনে কেউ যেন তার হাতের দ্বারা গোড়ালি, কনুই বা হাঁটু ধরে না বসে। [পদ্মাসন অথবা এরূপ অন্য কোন ভিন্ন আসনে উপবেশন করাই

সবচেয়ে ভাল। যে ব্যক্তি এগুলি পারে না, সে চেয়ার ব্যবহার করতে পারে। তাকে কিন্তু মন্দিরের এক ধারে বসতে হবে যাতে অন্য ভক্তদের কোন বিঘ্ন না ঘটে।]

২২) শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের সামনে কারও শয়ন করা উচিত নয়।

২৩) শ্রীবিগ্রহের সামনে প্রসাদ গ্রহণ অনুচিত। [শ্রীবিগ্রহের বেদী থেকে নিয়ে যৎসামান্য মহাপ্রসাদ পূজারী কর্তৃক বিতরণ করা মাত্রই সেবা করে সম্মান দেখানো যেতে পারে। তাই বলে সেটা সরাসরি শ্রীবিগ্রহের সামনে না করে কোন এক ধারে করা প্রশস্ত। বিগ্রহের সামনে আহার গ্রহণ করা উচিত নয়।]

২৪) শ্রীবিগ্রহের সামনে তাম্বূল চর্বণ করা অনুচিত।

২৫) শ্রীবিগ্রহের সামনে অধঃবায়ু ত্যাগ করা উচিত নয়।

২৬) মন্দির অভ্যন্তরে অধঃবায়ু ত্যাগ করা উচিত নয়।

২৭) শ্রীবিগ্রহের দিকে পিছন ফিরে বসা উচিত নয়।

[শ্রীবিগ্রহের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ানোও অনুচিত। শ্রীল প্রভুপাদ মায়াপুরে অন্ততপক্ষে একটি ক্ষেত্রে এই বিষয়ে কঠোর ছিলেন। যখন দর্শনের জন্য শ্রীবিগ্রহ দৃশ্যমান হন তখন মন্দিরে এই আদেশ জারি থাকত। মন্দিরে পূজারী সাধ্যমতো চেষ্টা করবেন যাতে সেবাকার্য করার সময় বিগ্রহ থেকে যেন মুখ সরে না যায়।]

২৮) শ্রীবিগ্রহের সামনে কোন ভিখারীকে ভিক্ষা দেওয়া উচিত নয়। [ভিক্ষুককে দান করার সময় সেই ব্যক্তির নিজেকে সমগ্র জীবের মিত্র হিসাবে দেখার প্রবণতা জন্মে। এই মনোভাব শ্রীবিগ্রহের সামনে কারও প্রদর্শন করা ঠিক নয়।]

২৯) পূজা-পাঠের সময় নীরবতা ভঙ্গ করা উচিত নয়। [সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত মন্দির দর্শন করার সময়, গৃহীদের সজাগ থাকতে হবে এইজন্য যে তাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যেন শ্রীবিগ্রহের সামনে অন্য ভক্তদের বিঘ্ন না ঘটায়। মন্দিরে যখন কেউ কৃষ্ণকথা, নাম জপ, অথবা কীর্তন করে, তখন যেন মন্দিরের নীরবতা ভঙ্গ না হয়।]

৩০) শ্রীবিগ্রহের সামনে পরস্পর কথোপকথন করা উচিত নয়। [এই আদেশ পূজার্চনা চলাকালীন বিশেষ করে প্রজল্প কথনের বিরুদ্ধে সতর্কীকরণ।]

৩১) বিগ্রহের সামনে অন্য কারও প্রশংসা করা উচিত নয়।

৩২) শ্রীবিগ্রহের সামনে খুব উচ্চস্বরে কথা বলা অনুচিত।

৩৩) শ্রীবিগ্রহের সামনে কারও কান্না বা চিৎকার করা উচিত নয়।

৩৪) শ্রীবিগ্রহ সম্মুখে কর্কশ কথা বলা উচিত নয়।

৩৫) শ্রীবিগ্রহ সম্মুখে কাউকে তিরস্কার করা উচিত নয়।

৩৬) বিগ্রহের সামনে কারও নিন্দাও করতে নেই।

৩৭) ভগবানের নামে শপথ করা উচিত নয়। [বিগ্রহের সম্মুখে ব্রত উদ্‌যাপন করতে গুরুদেবের আদেশ অনুসরণ করতে (আরম্ভ হিসাবে) অথবা

দায়িত্ব গ্রহণ করতে (যেমন বিবাহে) ভক্তরা শ্রীবিগ্রহের সামনে শপথ গ্রহণ করে। কোন কঠোর আত্মসংযমের ব্রত গ্রহণ করা অনুচিত, না এই জন্য সাধনা বাড়িয়ে দিতে হবে যে কেউ তা ধরে রাখতে না পারে, না কারও বিগ্রহের সামনে এমন কোন শপথ করা উচিত নয় যা দ্বারা কোন জড় উদ্দেশ্য বা পরিচালন সংক্রান্ত কোন কৌশলী উদ্দেশ্য লাভ হতে পারে।]

৩৮) কারও বিগ্রহের সামনে কলহ বা লড়াই করা উচিত নয়।

৩৯) বিগ্রহের সামনে নিজের প্রশংসা নিজে করা অনুচিত।

৪০) শ্রীবিগ্রহের সামনে পশুলোমের কম্বল পরা উচিত নয়।

৪১) রক্তবর্ণ অথবা নীল বর্ণের, বা অধৌত পোশাক পরে কারও মন্দিরে প্রবেশ করা অনুচিত। [ভক্তকে এমন কোন পোশাক পরা উচিত নয় যা শ্রীবিগ্রহের পরিবর্তে তাঁর নিজের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। সাধারণভাবে বলা যায় শ্রীবিগ্রহকক্ষে উজ্জ্বলবর্ণের পোশাক পরিহার করা উচিত। অধিকন্তু বলা যায় যে গাঢ় নীল বর্ণের পোশাক শ্রীমতী রাধারাণীর এবং রক্তবর্ণের পোশাক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় পোশাক। অতএব বিশেষ করে সরাসরি বিগ্রহ কক্ষে তাঁদের উপস্থিতিতে এই সব বর্ণের পোশাক পরা অনুচিত।

৪২) কারও ললাটে তিনটি রেখা দ্বারা তিলক অঙ্কিত করা উচিত নয়।

৪৩) অভক্তের সামনে কেউ যেন বিগ্রহপূজা না করে। [শ্রীবিগ্রহ যখন শোভাযাত্রায় বার হন, তখন তিনি উপস্থিত সকলকে দয়া বিতরণ করেন। সেই সময় তাঁর পূজায় কোন সীমাবদ্ধকরণ থাকে না। যাই হোক, ভগবান যখন মন্দিরে থাকেন, তখন তিনি ভক্তদের দ্বারা পূজিত হন। যে সব অতিথি মন্দিরে আসেন তাঁরা আরতি উৎসব দেখতে পান। পূজার অন্যান্য দৃশ্য অবশ্যই বন্ধ পর্দার আড়ালে সম্পাদিত হবে।]

প্রচেষ্টার অভাব হেতু অপরাধ

৪৪) সামর্থ্য অনুযায়ী শ্রীবিগ্রহের পূজা করতে হবে। ["*ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে, কোন ভক্ত যদি তাঁকে একটি পত্র ও এক বিন্দু জল অর্পণ করে, তবে তাতেই ভগবান সন্তুষ্ট হন। ভগবানকৃত এই ব্যবস্থা প্রণালী সর্বজনীনভাবে প্রযোজ্য, এমন কি দরিদ্রতম ব্যক্তির ক্ষেত্রেও। কিন্তু তাই বলে এটা বোঝায় না যে, যার ভগবানকে ভালভাবে পূজা করার মতো যথেষ্ট সঙ্গতি আছে তারও এই পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত এবং শুধুমাত্র জল ও পত্র ভগবানের শ্রীচরণে নিবেদন করে তাঁকে তুষ্ট করার চেষ্টা করা উচিত। যথেষ্ট সঙ্গতি থাকলে, তার ন্দর সজ্জা, সুন্দর ফুল, সুন্দর ভোজ্যদ্রব্য অর্পণ এবং সকল অনুষ্ঠান পালন রা উচিত। এটা এই নয় যে, কারও ভগবানকে শুধু সামান্য জল ও একটি

পর সহযোগে সন্তুষ্টি করতে হবে, এবং তার নিজের জন্য ও নিজের ইন্দ্রিয় উপভোগের জন্য তার সমস্ত অর্থ ব্যয় করতে হবে।"

৪৫) পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য বিভিন্ন প্রকার উৎসব-অনুষ্ঠান যেমন জন্মাষ্টমী ও রথযাত্রা আদি উদযাপনে ব্যর্থ হওয়া উচিত নয়। [মন্দিরে আসন্ন উৎসবাদির তারিখ ঘোষণা প্রধান পুরোহিতের দায়িত্ব। তাঁকে যথার্থ মন্দির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করতে হবে। প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক কাজের জন্য যথেষ্ট সময় বরাদ্দ করতে হবে।]

৪৬) ফুল অর্পণ না করে কোন গন্ধদ্রব্য অর্পণ করা উচিত নয়। [সাধারণ রীতি হল এই যে, পূজারীকে সঠিক মানের গহণা বা অস্থাবর সম্পত্তিদ্বারা পূজা করতে হবে। পূজারী মন্দিরে যে কোন সময়ে ধূপ জ্বালাতে পারেন। কিন্তু আরতির সময় যখন তিনি এটা করবেন, তখন তাঁকে অবশ্যই পুষ্পার্ঘ অর্পণ করতে হবে।]

৪৭) বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন প্রকার ফল ও শস্য শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করতে হবে। [খামারবাড়িতে যখন যেমন ফসল উঠবে প্রথমে তা শ্রীবিগ্রহকে অর্পণ করতে হবে। খামার বাড়ির শ্রীবৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খামারবাসীরাই নির্বাচন করবে শুধু নিজেদের জমিতে উৎপন্ন ফসল নয়, অতিথি প্রদত্ত ফল, শাক-সব্জী ও শস্যদানা শ্রীবিগ্রহকে অর্পণ করা হবে। যদিও এটাও বোঝায় যে কিছু বস্তু যেমন চাল বা আম (উত্তরাঞ্চলের দেশগুলিতে) শ্রীবিগ্রহকে অর্পণের ক্ষেত্রে দুর্লভ। তথাপিও নিজের ঘরে ভক্তিপূর্ণভাবে উৎপন্ন দ্রব্য, সে যত সাধারণই হোক না কেন, অর্পণে নিশ্চিতরূপেই তিনি অধিক সন্তুষ্ট হবেন।]

৪৮) কারও নীরবে গুরুদেবকে নমস্কার জানানো উচিত নয়, বা অন্যভাবে বলা যেতে পারে, গুরুদেবকে প্রণাম নিবেদনের সময় উচ্চস্বরে প্রার্থনা করা উচিত।

৪৯) গুরুদেবের উপস্থিতিতে শ্রীবিগ্রহকে প্রশংসা নিবেদন করতে হবে। [সর্বাবস্থাতেই আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, আমরা যখন শ্রীবিগ্রহের পূজা করি, তখন আমাদের গুরুদেব বা ভগবান উপস্থিত থাকেন এবং ভগবানের সহায়ক হিসাবে আমরা তাঁর সেবা করি।

৫০) শ্রীবিগ্রহ পূজায় কঠোরভাবে নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলতে হবে। [শ্রীবিগ্রহ পূজার নিয়ম শৃঙ্খলা অনুসরণ করতে তাকে অবশ্যই নিয়ম শৃঙ্খলা জানার কষ্ট স্বীকার করতে হবে। নিয়ম মেনে চলার প্রতি (বিশেষতঃ বাস্তবে) একটা শৈথিল্য আছে। এই শৈথিল্যকে আমাদের অবশ্যই ঠেকাতে হবে।]

৫১) শ্রীবিগ্রহের মন্দিরে প্রবেশ করতে হলে প্রথমে কোন শব্দ না করে প্রবেশ করা উচিত নয়। [মৃদু হাততালি দিতে বা ঘণ্টা বাজাতে হয়।]

৫২) অন্ধকার ঘরে শ্রীবিগ্রহকে স্পর্শ করা অনুচিত। [বিগ্রহকক্ষ আলোকিত করতে পূজারীকে বিদ্যুতের উপর নির্ভর করলে চলবে না। শুধু তেল বা ঘি-এর প্রদীপে মন্দিরগৃহ আলোকিত হয় এটাই ঐতিহ্য। বৈদ্যুতিক আলো অবশ্যই

ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু শ্রীবিগ্রহকে অতি উজ্জ্বল আলোকের বিষয়ীভূত করার প্রয়োজন নেই। শ্রীবিগ্রহ-কক্ষ যদি কিছুটা নরম বৈদ্যুতিক আলো, তেল ও ঘি-এর প্রদীপের আলোর সমন্বয়ে সারা কক্ষ সমানভাবে আলোকিত হয়, তখন একটা তৃপ্তিদায়ক পরিবেশের সৃষ্টি হয়। কোন বিশেষ দর্শন-সময়ে যেমন, মঙ্গল-আরতি ও রাত্রিকালীন শয়ন আরতির সময় যদি যথেষ্ট পরিমাণে তেল বা ঘি-এর প্রদীপ লভ্য হয়, তবে বৈদ্যুতিক বাতির সম্পূর্ণ অপসারণ চলতে পারে।]

৫৩) খালি মেঝের উপর বসে ভগবানের পূজা করা উচিত নয়। কোন বসার আসন বা কার্পেটের উপর অবশ্যই বসতে হবে।

৫৪) গন্ধবিহীন, ব্যবহারের অনুপযুক্ত ফুল দ্বারা শ্রীবিগ্রহের পূজা হয় না।

৫৫) অধৌত পাত্রের ফুল অর্পণ করা অনুচিত।

৫৬) অবৈষ্ণবের রান্না করা খাদ্য শ্রীবিগ্রহে অর্পণের অযোগ্য।

৫৭) কুকুর, বিড়াল বা অন্য ইতর প্রাণীর দৃষ্টি পড়েছে এমন খাদ্য শ্রীবিগ্রহে সমর্পণ করা উচিত নয়।

বিশ্বাসের অভাব হেতু অপরাধ

৫৮) শ্রীকৃষ্ণকে প্রথমে নিবেদন না করে কিছু ভক্ষণ করা ঠিক নয়।

৫৯) খাদ্য রন্ধনের পর প্রথমে শ্রীবিগ্রহকে নিবেদন না করে অন্য কাউকে দেওয়া অনুচিত। [বড় বড় উৎসবে শ্রীল প্রভুপাদ কোন অতিথিকে প্রসাদের জন্য অপেক্ষা করাতে চাইতেন না। অতএব যখন অনেক খাদ্য প্রস্তুত হচ্ছে তখন প্রসাদ বিতরণ ত্বরান্বিত করতে, যা প্রস্তুত হয়েছে তার থেকে প্রথমে কিছুটা নিয়ে শ্রীবিগ্রহকে নিবেদন করতে তিনি অনুমতি দিতেন। পরিশিষ্ট পদগুলি তখন সমর্পণযোগ্য হত।]

৬০) শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে দেবদেবীর উপহাস করা উচিত নয়। (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ৭ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য "দেবদেবী"।)

৬১) ভগবানের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে যে শাস্ত্র শিক্ষা দেয় তার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করা উচিত নয়।

৬২) কোন প্রতিবাদী শাস্ত্র কারও প্রবর্তন করা উচিত নয়।

[আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘে শ্রীল প্রভুপাদের পুস্তকাবলীই হল প্রামাণ্য শাস্ত্রীয় গ্রন্থ। অন্য কোন শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে প্রমাণ গৃহীত হলেও এটা ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষার সমর্থনকারী প্রমাণ হিসাবেই শুধু প্রবর্তন করা উচিত।]

৬৩) মারিজুয়ান বা গাঁজিকা সেবন করা উচিত নয়।

৬৪) কারও আফিম বা এর সমতুল্য মাদকদ্রব্য গ্রহণ করা অনুচিত। ভক্তদের জন্য সেটা স্পষ্ট নির্দেশ, অন্য সকলের কাছে সেটা অবশ্যই স্পষ্ট

নয়, বিশেষ করে এই অধঃপতনের যুগে। কৃষ্ণের মন্দির দর্শনকারী ব্যক্তিদের পরিহারযোগ্য অপরাধ সম্বন্ধে জানতে উৎসাহিত করতে হবে, যাতে করে তারা সচেতনভাবে সেগুলি এড়িয়ে চলতে পারে এবং তাদের দর্শন থেকে যথেষ্ট সুবিধা লাভ করতে পারে।]

মাঝে মাঝে আমরা যদিও বিভিন্ন বিগ্রহগণের "করুণার মাত্রা"র পার্থক্য করি (উদাহরণ হিসাবে, আমরা শুনে থাকি যে রাধা-কৃষ্ণ থেকে গৌর-নিতাই "অধিকতর করুণাময়"), কারও ভাবলে চলবে না যে এই সব পার্থক্যগুলি কাউকে অপরাধ করতে স্বেচ্ছামতো কাজ করার অধিকার দিয়েছে। ভগবানের সকল বিগ্রহই সমানভাবে পূজার যোগ্য—এবং সেই কারণেই তাঁরা সমানভাবে উপযুক্ত আচরণ পাবার যোগ্য।

শ্রীবিগ্রহ উপাসনার প্রতিরোধী অপরাধসমূহ

শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন :

সঠিক সেবার পরীক্ষা এটাই। আমরা যদি বিগ্রহকে খুব হাসিখুশি মেজাজে দেখি, তবে সেটাই ভগবানের প্রতি আমাদের সেবার প্রশংসাপত্র। সুতরাং সর্বত্রই আমরা বিগ্রহদের এইরূপ হৃষ্ট মেজাজে দেখব। যখনই আমরা বিগ্রহদের অন্য মেজাজে দেখব, তখনই সঙ্গে সঙ্গে আমরা অবশ্যই আমাদের ত্রুটির কথা বুঝতে পারব।

(শ্রীল প্রভুপাদের চিঠি, ২৭ মে, ১৯৭০)

কেউ অনিচ্ছাকৃতভাবে বিগ্রহের প্রতি অপরাধ করলে তাকে অবশ্যই আন্তরিকভাবে তাঁদের নিকট প্রার্থনা করতে হবে এবং ভবিষ্যতে আর অপরাধ না করতে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। নিম্নলিখিত শ্লোকটি সঠিক মেজাজের বিশদ ব্যাখ্যা করছে :

অপরাধ সহস্রাণি ক্রিয়ন্তেঽহর্নিশং ময়া ।
দাসোঽহম্ ইতি মাং মত্বা ক্ষমস্ব মধুসূদন ॥

হে মধুসূদন, আমি দিনে রাতে হাজার অপরাধ করি। কিন্তু হে প্রভু, অনুগ্রহ করে আমাকে তোমার দাস বলে মনে করে দয়া করে সেগুলো ক্ষমা করে দাও।

পূজাপরাধ থেকে মুক্ত করতে শাস্ত্র কিছু প্রায়শ্চিত্তের নির্দেশ দিয়েছে : কেউ ভগবদ্গীতার একটি অধ্যায় পাঠ করতে, বিষ্ণু সহস্রনাম-স্তোত্র জপ করতে পারে, শ্রীতুলসীদেবীর প্রার্থনা, অথবা তুলসী বীজ বপন করতে পারে। বিগ্রহ পূজার অপরাধ থেকে মুক্তি পাওয়ার অপর পন্থাটি হল শালগ্রাম শিলার অর্চনা। এই সকল কার্যাবলীর প্রয়োজনীয় বিষয় হল সকলকেই ভগবানের সেবক বলে মনে করা।

সংযোজন ২

বিস্তৃত শ্রীবিগ্রহ সেবা

পূজারী যেখানে স্থির, উদ্যমী এবং সুশিক্ষিত সেখানে বিশদ প্রচলিত পূজা পদ্ধতি বিশেষ করে প্রধান বিগ্রহ এবং আরও নির্দিষ্টভাবে বললে শালগ্রাম শিলা পূজা পদ্ধতি প্রবর্তন করা সম্ভব ও সুবিধাজনক। এই প্রচলিত 'বিস্তৃত' পূজা পদ্ধতির মধ্যে প্রাত্যহিক নিবেদিত অধিকাংশ নৈবেদ্যই আছে। যদি সব নাও থাকে, তবে চৌষট্টি প্রকার উপচার ও ভগবানের তৃপ্তিদায়ক অতিরিক্ত বিভিন্ন নৈবেদ্য অবশ্যই থাকবে। পূজার আরও বিস্তৃত প্রস্তুতিও পূর্বাঙ্গকর্ম এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এই বিশদ পূজা পদ্ধতিতে আরও মন্ত্র ও স্তুতি কীর্তন, মুদ্রা প্রদর্শন ও সাধারণ পূজা পদ্ধতির থেকে অধিক সমৃদ্ধ বস্তু অর্পণেরও ব্যবস্থা থাকতে পারে।

আবার, প্রস্তাবনায় আমরা উল্লেখ করেছি আমাদের লক্ষ্য করতে হবে যে, 'অধিকতর ব্যাপক' বলতে 'অধিকতর ভাল' বা, 'অধিকতর উঁচুমানের' বিগ্রহ পূজা বোঝাবে তা নয়। শ্রীকৃষ্ণ সেবা ও ভক্তির গুণমানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, কৃত্রিমতার সঙ্গে নন। তৎসত্ত্বেও, যে মন্দিরে গুণমান ধরে রাখার সুবিধা আছে সেখানে বিগ্রহসেবার মাত্রা বাড়ানোর অবকাশ হতে পারে। শ্রীবিগ্রহসেবা বর্ধিত করার অনেক পন্থা আছে, আর সেগুলির মধ্যে একটা হল মনোযোগের সঙ্গে বিস্তৃতভাবে তাঁদের অর্চনা করা। আমরা এখানে আরও উল্লেখ করতে পারি—যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে—বিগ্রহ পূজা পদ্ধতির মান খামখেয়ালীপূর্ণ ভাবে বাড়ানো (বা কমানো) উচিত নয়। কোন নির্দিষ্ট মন্দিরের জন্য এই পুস্তকের নির্দেশিকা মেনে যেরূপ সমন্বয় সাধনই করা হোক না কেন, সেটা মন্দির কর্তৃপক্ষের দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে এবং মন্দিরের প্রচলিত আদর্শের লিখিত বর্ণনায় সংযোজিত করে প্রসঙ্গ-সূত্রের জন্য নিরাপদে সংরক্ষণ করতে হবে।

শ্রীশালগ্রাম-শিলা অর্চন

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের যে সকল ভক্তরা দৃঢ়ভাবে ও যত্নের ...গ্রাম-শিলার অর্চন করতে পারেন শ্রীল প্রভুপাদ তাঁদের উৎসাহিত

তুলসী পত্র দিয়ে শালগ্রাম শিলার পূজা করা উচিত। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিটি মন্দিরে শালগ্রাম পূজা করার প্রথা প্রবর্তন করা উচিত। শালগ্রাম ভগবানের কৃপার মূর্ত প্রকাশ। চৌষট্টি উপচারে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের পূজা করার যে পন্থা পূর্ববর্তী শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে তা খুবই কঠিন, কিন্তু ভগবান কৃপা করে শালগ্রাম শিলা রূপে অবতীর্ণ হয়ে জীবকে অনায়াসে তাঁর পূজা করার সুযোগ দিয়েছেন। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ২৪/৩৩৬ তাৎপর্য)

ভগবান স্থায়ী ও নিত্যরূপে শালগ্রাম শিলায় অবস্থান করেন। সেইজন্য কোন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা তিথি উদ্‌যাপনের প্রয়োজন নেই। *স্কন্দ পুরাণ* বলছেন—

শালগ্রাম অর্চনায় কোন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা তিথি উদ্‌যাপনের প্রয়োজন নেই। কেউ যখন শালগ্রাম পূজা শুরু করবেন, তখন তাঁকে শুধু বিস্তৃতভাবে বিশেষ পূজা কার্য সম্পাদন করলেই চলবে।

স্কন্দপুরাণ শালগ্রামের বিশেষ মহিমাও ব্যক্ত করেছেন—

ভগবান বহু পূজার্হরূপে বর্তমান, কিন্তু সে সকলের মধ্যে শালগ্রাম রূপই শ্রেষ্ঠ।

বিষ্ণুর বিশেষ রূপ হিসাবে শালগ্রাম শিলাকে চিহ্নের (বিশেষ করে চক্র) দ্বারা সনাক্ত করা গেলেও আপনি ভগবানকে আপনার পছন্দমতো রূপে পূজা করতে পারেন। কারণ শালগ্রাম শিলার মধ্যেই ভগবানের সকল রূপ বর্তমান। আপনি পৃথকভাবে শালগ্রাম শিলার পূজা বা অন্যান্য মূর্তিরূপের সঙ্গেও শালগ্রাম পূজা করতে পারেন। যখন শ্রীবিগ্রহকে সাজ-সজ্জা, অলংকার ইত্যাদি পরাবেন, তখন মন্দির বিগ্রহের পক্ষে আপনি শালগ্রাম শিলার প্রাতঃকালীন স্নান-অনুষ্ঠানও সম্পাদন করতে পারেন।*

হরিভক্তিবিলাসে নির্দেশ আছে যে দ্বারকা শিলার সঙ্গে শালগ্রাম শিলার পূজা করা যায়। একটি ভাল দ্বারকা শিলা হবে শ্বেত, গোলাকার বা, বর্গাকৃতি, অভঙ্গ, নিরন্ধ্র ও সুগঠিত চক্র সমৃদ্ধ।

ভক্ত যাতে বিক্ষিপ্তচিত্ত না হন তজ্জন্য পৃথকভাবে দুটি শালগ্রাম শিলার পূজা করা উচিত—

---

* মন্দির বেদীতে শালগ্রাম শিলা থাকলে, শ্রেষ্ঠ পন্থা হল একই পূজারী প্রতিদিন তাঁর নিত্যসেবা করবেন। মাসিক অশুচিতার জন্য নারীরা অন্য কারও ওপর পূজার ভার অর্পণ করে। সেইজন্য শাস্ত্র নারীদের শালগ্রাম শিলা, বিশেষ করে মন্দিরে স্থাপিত শালগ্রাম শিলার পূজা অনুমোদন করেননি। যাই হোক, শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন যে, যদি কোন গৃহী গৃহদেবতা হিসাবে শালগ্রাম শিলার পূজা করেন এবং তিনি যদি অসুস্থ হন তখন তাঁর স্ত্রী বা পুত্র তাঁর স্থানে পূজা করতে পারেন।

দুটি দ্বারকা শিলা ও দুটি শালগ্রাম শিলার পূজায় তৎক্ষণাৎ মানসিক বিক্ষোভ দেখা দিতে পারে। [মন্ত্র-তন্ত্র-প্রকাশ, হরিভক্তিবিলাসে উল্লিখিত।]

ভক্তের যদি তিন বা ততোধিক শালগ্রাম শিলা থাকে, তিনি তখন একই সঙ্গে তাঁদের পূজা করতে পারেন। এরূপ ক্ষেত্রে, তিনি কেবল একটি প্রধান শিলাকে পূর্ণ পূজা নিবেদন করবেন। অন্যদের তিনি প্রধান শিলার সঙ্গে একত্রে স্নান করাবেন মাত্র, তৎপর তাঁদের তুলসী, চন্দন ও ফুল নিবেদন করবেন।

কিছু ভক্ত অন্যান্য বিগ্রহের পূজা সমাপন করে কিছু বেলা করে শালগ্রাম শিলার পূজা করেন। সেই ক্ষেত্রে, পূজারীকে দুপুরের মধ্যে পূজাপাঠ শেষ করতে হবে। পূজা শেষ না করে কারও কিছু আহার করা উচিত নয়।* শাস্ত্র বলছেন, কেউ যদি তার প্রভাতী শালগ্রাম শিলার পূজা সমাপনের পূর্বে কিছু আহার করে তবে সে ব্রহ্মার একদিনের অবশিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত চণ্ডালের ন্যায় জীবন যাপন করবে।

শালগ্রাম শিলা উপাসনার ক্ষেত্রে, ভগবদ্ বিগ্রহের প্রাথমিক পূজাপদ্ধতিই অনুসরণ করতে হবে। আপনি অবশ্য প্রাথমিক ষোড়শ উপচারের সঙ্গে আরও অতিরিক্ত উপচার যুক্ত করতে পারেন। এই ঐচ্ছিক প্রণালীগুলিই চৌষট্টি রকম উপচারের তালিকানুযায়ী আরও বিস্তৃত পূজার অনুমতি দেয়। এইভাবে মন্দিরের প্রধান বিগ্রহের পক্ষে মন্দিরে স্থাপিত শালগ্রাম শিলা পূর্ণ পূজা গ্রহণ করতে পারেন। সাধারণত এই ঐচ্ছিক উপচারের বিকল্প পুষ্পদল বা বিশেষ অর্ঘ্য বারি অর্পণ করা হয়।

শালগ্রাম শিলাকে একটি একটি করে প্রধান ষোড়শ উপচার অর্পণ করার সময় আপনি *পুরুষ-সূক্ত* থেকে সুর করে শ্লোক আবৃত্তি করতে পারেন। *পুরুষ-সূক্ত* হল একটা বৈদিক স্তোত্র। ত্যাগের পরাকাষ্ঠা ভগবান বিষ্ণুর উপাসনাকালে এই স্তোত্র আবৃত্তি করা হয়। আদর্শগতভাবে সর্ব ও সাম অর্থাৎ উপযুক্ত মাত্রা ও তালে এই *পুরুষ-সূক্ত* কীর্তন করা হয়। বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে অবশ্য এটা জানতে হবে। সাধারণভাবে শালগ্রাম শিলা পূজায় শুধু *পুরুষ-সূক্তের* প্রথম শ্লোকটি আবৃত্তি করলেই চলবে।

মন্দিরে স্থাপিত শালগ্রাম শিলা পূজায় আপনি প্রধান বিগ্রহের মূল-মন্ত্র নতুবা গোপাল-মন্ত্র ব্যবহার করবেন (গুরুদেবের দেওয়া সাতটি মন্ত্রের মধ্যে ষষ্ঠ) অথবা বাসুদেবের জন্য মূল-মন্ত্র (ওঁ *নমো ভগবতে বাসুদেবায়* অথবা ওঁ *নমো নারায়ণায়*)।

---

* প্রয়োজনবোধে পূজার পূর্বে জল গ্রহণ করা যেতে পারে।

শালগ্রাম শিলার বৈশিষ্ট্য

হিমালয় প্রদেশে বর্তমান নেপালে কালী-গণ্ডকী নদীতে আবির্ভূত শালগ্রাম শিলা ভগবানের প্রত্যক্ষ রূপ।

সচরাচর যে সকল শিলা পূজার জন্য নির্বাচিত হয়, সেগুলি হল ক্ষুদ্র, গোলাকার, কৃষ্ণবর্ণ, দ্যুতিময়। চূড়া ও তিলক সহযোগে এগুলি সাজানোর পক্ষে খুব উপযুক্ত আর দর্শনের পক্ষেও অতীব সন্তোষজনক। এরূপ শালগ্রাম শিলা পাওয়া না গেলে যে কোন খাঁটি শালগ্রাম শিলা পূজা করতে পারেন।

পরম পুরুষোত্তম ভগবান সব শালগ্রাম শিলার মধ্যে উপস্থিত আছেন। তাই এঁদের ক্রয় করা বা বিক্রয় করা অথবা তাঁদের ত্রুটিপূর্ণ বলে বিবেচনা করা অপরাধ।

শালগ্রাম শিলার গায়ে যে মূল্য লিখে দেয়, যে সেই শালগ্রাম শিলা বিক্রি করে এবং যে সেই লিখিত মূল্যে কিনতে সম্মত হয়, ভালমন্দ বিচার করে—বিক্রির জন্য শালগ্রাম শিলার দোষগুণ পরীক্ষা করে থাকে—প্রলয়কাল অবধি তারা সকলেই নরকে বাস করে। [বিষ্ণু-ধর্মোত্তর, হরিভক্তিবিলাস উল্লিখিত]

শালগ্রাম শিলাটি ভগ্ন ফাটলযুক্ত বা খণ্ডিত হলেও এঁকে নির্দোষ বলে ভাবতে হবে। যারা ফলের আশায় শালগ্রাম শিলার পূজা করেন তাঁদের কাছে এঁরা নিখুঁত বা কম নিখুঁত বলে গণ্য হন। [ব্রহ্মপুরাণ, হরিভক্তিবিলাস উল্লিখিত]

ভগবানের বিস্তৃত পূজা পদ্ধতি

শালগ্রাম শিলা বা অন্য বিগ্রহ পূজার সময় বিস্তৃত পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে।* শালগ্রাম শিলা অর্চন কালে প্রতিবার উপচার প্রদানের সময় *পুরুষ-সূক্ত* থেকে একটি বিশেষ শ্লোক আবৃত্তি করতে হবে। এই পদ্ধতিতে অন্য বিগ্রহের পূজার সময় *পুরুষ-সূক্তের*** শ্লোক বর্জন করতে হবে। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অর্চনা কালেও উপচার মুদ্রা বর্জনীয়।

(সংযোজন—১ বিশুদ্ধিকরণ, অধ্যাত্মকরণ ও অর্চনাদর্শ শিরোনামে আরও অতিরিক্ত প্রাথমিক পদ্ধতি [পূর্বাঙ্গকর্ম] দ্রষ্টব্য)

---

* পূর্বে বর্ণিত "প্রচলিত গৃহীত পদ্ধতি" অনুসরণে শালগ্রাম শিলাকেও কিছুটা কম বিস্তৃত পন্থায় পূজা করা যেতে পারে। বিকল্পভাবে, এখানে কিছু অধিক বিস্তৃত পন্থা বর্ণিত হয়েছে যেমন, বিশেষ-অর্ঘ্য-স্থাপন বা ভোগ-অর্পণ আদি "প্রচলিত গৃহীত পদ্ধতি" মেনে পূজাকার্য সম্পাদন করা যায়।

** নৃসিংহদেবের পূজার সময় পুরুষ-সূক্তের শ্লোক আবৃত্তি করা যাবে।

পূজা-প্রস্তুতি (পূর্বাঙ্গ-কর্ম)

প্রয়োজনীয় উপকরণাদি

● পূজার কাজে বিঘ্নিত না হওয়ার জন্য পূজারম্ভের পূর্বে নিম্নে উল্লিখিত সব কিছু আছে কিনা দেখে নিতে হবে :

১) থালার উপর একটি ছোট ঘণ্টা;

২) পঞ্চ-পাত্রে সামান্য অর্ঘ্য বারি;

৩) নল ও ঢাকনাযুক্ত একটি পূর্ণ জল-পাত্র;

৪) একটি বিসর্জনীয় পাত্র (বর্জনীয় পাত্র);

৫) পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমন ও মধুপর্কের বাটি;

৬) শ্রীবিগ্রহ গাত্র মার্জনের জন্য কোমল বস্ত্রখণ্ড;

৭) তেল (সুগন্ধি তেল);

৮) তেপায়ার উপর একটি জলশঙ্খ;

৯) একটি স্নানপাত্র (স্নানের থালী);

১০) (পঞ্চামৃত সহ স্নান হলে) পাঁচটি ছোট পাত্র : একটিতে দুগ্ধ, একটিতে দধি, একটিতে ঘৃত, একটিতে মধু, একটিতে চিনির জল;

১১) একটি চরণামৃত পাত্র;

১২) একটি তোয়ালে;

১৩) শিলা-ধারণ বস্ত্র;

১৪) একটি ক্ষুদ্র ঘৃত অথবা তৈলপাত্র (স্নানের পর শিলার অঙ্গসংবাহনের জন্য);

১৫) বস্ত্র-সজ্জা (একটি সাধারণ পাড়বিশিষ্ট বস্ত্র ধুতি হিসাবে শিলার নিম্নাংশে আবরণের জন্য, দ্বিতীয় বস্ত্রটি পশ্চাদভাগের চাদর হিসাবে ব্যবহারের জন্য);

১৬) অলংকার (শালগ্রাম শিলার জন্য : একটি উপবীত সূত্র, একটি বা দুটি কণ্ঠহার, বিশেষ করে মুক্তার মালা বা গুঞ্জামালা, এবং একটি চূড়া);

১৭) গোপীচন্দন (বা প্রচলিত তিলক চন্দন) এবং তুলসী শাখা, বা একটি ক্ষুদ্র স্বর্ণ বা রৌপ্য দণ্ড, বা একটি চিত্রতুলিকা—তিলকের নকশা অঙ্কনের জন্য;

১৮) গন্ধ (বাটা চন্দন);

১৯) পুষ্প ও পুষ্পমাল্য;

২০) তুলসী পত্র ও মুকুল (মঞ্জরী) এবং সম্ভব হলে তুলসী মালা;

১১) একটি ছোট পাত্রে বিন্দু পরিমাণ জল/চন্দন তৈল বা (তিলক, মূর্তি-অলংকরণের জন্য);

১২) ধূপ ও ঘি অথবা কর্পূরের প্রদীপ (গুরুদেব, ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শালগ্রাম শিলার পূজার জন্য প্রত্যেককে এক সেট করে) সেগুলি জ্বালানোর জন্য একটি দীপ বা দেশলাই;

১৩) নৈবেদ্য (ফলাদি অথবা মিষ্টান্ন ও পানীয় জল, গুরুদেব, মহাপ্রভু, এবং অন্যান্য শালগ্রাম শিলার পূজার জন্য প্রত্যেককে একটি করে পাত্রে নৈবেদ্য থাকবে);

১৪) গুরুদেবের একটি আলেখ্য ও তাঁকে নৈবেদ্য অর্পণের পাত্র;

১৫) ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর একটি আলেখ্য অথবা পঞ্চতত্ত্ব ও একটি অর্পণ পাত্র;

১৬) এই নির্দেশিকা বা প্রয়োজন হলে; এই লিখিত নির্দেশ সম্বলিত পুস্তিকা।

প্রণাম নিবেদন (গুরু প্রণাম)

- শ্রীগুরুদেবের প্রণাম বন্দনার সময় শায়িত হয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন।

বিশুদ্ধিকরণের জন্য অল্প অল্প করে জল পান (বৈষ্ণব আচমন)

- ১১৪ পৃষ্ঠায় বৈষ্ণব আচমন সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে।

সামান্য অর্ঘ্য স্থাপন

- ১১৬ পৃষ্ঠায় সামান্য অর্ঘ্য স্থাপন সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্রীবিগ্রহকক্ষে প্রবেশ

- দ্বারপাল ও ভগবানের পার্ষদদের ফুল বা ফুলদল অথবা সামান্য অর্ঘ্য বিকল্পের দ্বারা পূজা করুন :

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দ্বারপালেভ্যোঃ মনঃ ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পার্ষদেভ্যোঃ নমঃ ॥

- এরপর ১১৯ পৃষ্ঠায় দেখুন।

অশুভ প্রভাব দূরীকরণ (ভূতনিবারণ)

- নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্র জপ করুন :

(ওঁ) অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ।
যে ভূতবিঘ্নকর্তারস্তেগচ্ছন্ত্বাজ্ঞয়া হরেঃ ॥

যে সকল অশুভ সূক্ষ্ম সত্তা আমাদের সেবাকার্যে বাধা দিতে পারে ভগবানের আদেশে তা দূরীভূত হোক।

● ওঁ অস্ত্রায় ফট্ মন্ত্র জপ করুন এবং পৃথিবী থেকে সূক্ষ্ম সত্তা দূর করার জন্য আপনার বামগুল্‌ফ মাটিতে তিনবার আঘাত করুন।

প্রধান বিগ্রহের মূল-মন্ত্র জপ করার সময় শ্রীবিগ্রহকে নিবেদিত সমস্ত দ্রব্যাদিচয়ের প্রতি ক্রোধপূর্ণ কটাক্ষ করে উর্ধ্ব দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করবেন। এতে সকল সূক্ষ্ম সত্তা উর্ধ্বরাজ্যে অন্তর্হিত হবে।

● ওঁ অস্ত্রায় ফট্ মন্ত্র উচ্চারণ করে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিগুলি আপনার মস্তকের দশ দিকে স্থাপন করে মটকান (পূর্ব, দক্ষিণপূর্ব, দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিম, ইত্যাদি, উর্ধ্ব ও অধঃ) এবং এইভাবে দশদিক বন্ধন করুন।* একে দিগ্‌বন্ধন বলে।

পূজার আসন স্থাপন

● ওঁ অস্ত্রায় ফট্ মন্ত্র জপ করুন এবং প্রোক্ষণ দ্বারা গৃহতল শুদ্ধ করুন।

● সমবাহু ত্রিভুজাকৃতি একটি মণ্ডল** (আপনার থেকে দূরবর্তী স্থান নির্দেশকারী) দক্ষিণ হস্তের মধ্যমার গাঁট দিয়ে জল বা চন্দন সহযোগে গৃহতলে অঙ্কিত করুন।

● সচন্দন পুষ্পদলে মণ্ডল পূজার সময় এই মন্ত্র জপ করুন :

এতে গন্ধপুষ্পে
ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ
ওঁ অনন্তায় নমঃ
ওঁ কূর্মায় নমঃ

● মণ্ডলোপরি আসন স্থাপন করুন।

---

* বর্তমান ও তার পূর্ববর্তী পর্যায়ের জন্য বিকল্প প্রক্রিয়া চক্রমুদ্রা। ১) ওঁ অস্ত্রায় ফট্ জপ করুন এবং (দুই হাত একত্রে এনে করতালি বাজিয়ে) প্রদর্শন করুন, প্রথমে নীচে (গর্ভোদক সমুদ্রের দিকে) তৎপরে উপরে (বিরজা নদীর দিকে)। ২) ওঁ সাঙ্গাঁয় সসারায় হুং ফট্ নমঃ (বা ওঁ সহস্র রা হুং ফট্) দশবার দশ দিকে পুষ্পদল নিক্ষেপ করতে করতে এই মন্ত্র জপ করুন।

** সাধারণ এক বা একাধিক বিশিষ্ট পুরুষের পূজা করতে অঞ্চলের সীমা নির্দেশকারী গোলাকার প্রতিসম স্থানই হল মণ্ডল।

- আসন স্পর্শ করে বিনিয়োগ* মন্ত্র জপ করুন।

(ওঁ) আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠ ঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ।
কূর্মো দেবতা আসনাভিমন্ত্রণে বিনিয়োগঃ ॥

- প্রণাম মুদ্রায় করতল যুক্ত করে জপ করুন :

পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা।
ত্বং চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং চাসনং কুরু ॥

হে ধরিত্রি মাতা! হে মঙ্গলময়ি! তুমি সমগ্র বিশ্বজনকে প্রতিপালন করছ এবং ভগবান বিষ্ণু তোমাকে উজ্জীবিত রেখেছেন। দয়া করে আমাকে অবিরাম সমর্থন দাও এবং এমন একটি পবিত্র আসন আমাকে দাও যার উপর বসে আমি ভগবানের উপাসনা করতে পারি।

- আসনের উপর (আপনার থেকে এক বিন্দু দূরে) জল দিয়ে (বা শুধু আঙ্গুলের গাঁট দিয়ে), একটি ত্রিভুজ অঙ্কিত করুন। তৎপরে পুষ্পদল ও চন্দন দ্বারা এই মণ্ডল পূজা করুন। পূজার সময় এই মন্ত্র জপ করুন :

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, ওঁ কমলাসনায় নমঃ।

- পূজা সম্পাদনের জন্য একটি আসনে বসে গুরুদেবকে মনশ্চক্ষুর সম্মুখে স্পষ্টভাবে উদ্ভাসিত করার পর আপনার নিজের আসনে উপবেশন করুন।

পূজার নিমিত্ত পাত্র স্থাপন

- ১৩৫ পৃষ্ঠায় পাত্র স্থাপন সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে।

গুরুদেব ও প্রাক্তন আচার্যদের আশীর্বাদের জন্য অনুরোধ (গুরু পঙ্ক্তি নমস্কার)

- *এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ* এবং গুরুমূল-মন্ত্র উচ্চারণ করে গুরুদেবকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করুন। তারপর প্রাক্তন আচার্যদের

---

* বৈদিক মন্ত্র, যেমন, *পৃথ্বি ত্বয়া*...মন্ত্রটি সর্বদাই একটি বিনিয়োগ মন্ত্রের পরে উচ্চারিত হবে। এই বিনিয়োগ মন্ত্র ও ঋষি অভিন্ন—যে ঋষি মন্ত্রকে সংরক্ষিত ও প্রকাশিত করেছে। দেবতা—শ্রীবিগ্রহ মন্ত্র ও ছন্দের দ্বারা বিনীতভাবে আহ্বায়িত হচ্ছেন। এই প্রথার উদ্দেশ্য হল নিশ্চয়তা দেওয়া যাতে কেউ মন্ত্রের অর্থ, কার্যকারিতা, বংশগতি গুণাগুণ ও বিশুদ্ধ স্বরভঙ্গি উপলব্ধি করতে পারে। এই ক্ষেত্রে ঋষি হলেন মেরুপৃষ্ঠ, দেবতা হলেন কূর্ম, এবং ছন্দ সুতল হিসাবে পরিচিতি।'

প্রতি আপনার গুরুদেবের সেবার ধ্যান করে প্রণাম-মুদ্রা প্রদর্শন করুন ও জপ করুন :

শ্রীগুরো পরমানন্দ প্রেমানন্দ ফলপ্রদাঃ।
ব্রজানন্দ প্রদানন্দ সেবায়াং মা নিয়োজয় ॥

হে পরমানন্দ-প্রেমানন্দ ফল প্রদাতা শ্রীগুরুদেব, আপনি দয়া করে আমাকে সেই ব্রজের আনন্দ প্রদানকারী শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত করুন।

নিচের মন্ত্রটি আবৃত্তি করুন :

জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য, শ্রীগদাধর, শ্রী শ্রীবাস এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত ভক্তবৃন্দের জয় হোক।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

কর-শুদ্ধি

● জলপাত্রের জল দ্বারা হস্ত প্রক্ষালন করুন এবং হালকাভাবে চন্দন লেপন করুন।

পুষ্প শুদ্ধি

● *ওঁ অস্ত্রায় ফট্* মন্ত্র জপ করুন এবং সামান্য অর্ঘ্যবারি দ্বারা ফুলদল সিঞ্চিত করুন। তারপর পুষ্পোপরি চক্র ও ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন করুন। (সংযোজন ৪ তে মুদ্রা দ্রষ্টব্য।)

● বীজাক্ষর মুদ্রায় আপনার দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিদ্বারা ফুলসমূহ স্পর্শ করে এই মন্ত্র জপ করুন :

ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পসম্ভবে।
পুষ্পে চয়াবাকীর্ণে চ হুং ফট্ স্বাহা ॥

হে মুকুলিত লতা থেকে আবির্ভূত মহান মঙ্গলজনক পুষ্পরাজি, তোমরা পবিত্র হও।

● তারপর ফুলের উপর মৎস্যমুদ্রা প্রদর্শন করুন।

দ্রব্য শুদ্ধি

● *ওঁ অস্ত্রায় ফট্* জপ করুন এবং পূজোপকরণে সামান্য-অর্ঘ্য বারি সিঞ্চন করুন। তারপর দ্রব্যের উপর চক্র এবং ধেনুমুদ্রা গুলি প্রদর্শন করুন।

● বীজাক্ষরমুদ্রা প্রদর্শন করে প্রতিটি দ্রব্যের উপর আটবার নীরবে কাম-বীজ (ক্লীং) জপ করুন।

আত্ম-শুদ্ধি

● সামান্য অর্ঘ্য বারি হাল্কাভাবে নিজ শরীরে ছিটিয়ে প্রোক্ষণ সম্পাদন করুন আর নীরবে একবার গোপাল-মন্ত্র (গুরুপ্রদত্ত ষষ্ঠ মন্ত্র) জপ করুন।

দিক্‌বন্ধন (সূক্ষ্ম প্রভাব থেকে আত্ম-সংরক্ষণ)

● *ওঁ অস্ত্রায় ফট্* জপ করুন এবং আপনার ডান হাতের তর্জনী ও মধ্যমা দ্বারা বাম হাতের তালুতে তিনবার আঘাত করুন। সেই সঙ্গে আপনার হাত উপরে তুলুন।

● চক্র-মুদ্রা প্রদর্শন করুন এবং পূর্বদিক থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণাবর্তভাবে দশদিকে আপনার ডান হাতের আঙ্গুল মটকান।*

বহ্নিপ্রাকার (বহ্নি-প্রাচীন দ্বারা আত্মরক্ষা)

● অগ্নিবীজ (রং) জপ করুন এবং অগ্নি প্রাচীরের ধ্যান করুন, যা কিনা আপনার চতুর্দিকে ও মস্তকোপরি ছড়িয়ে পড়ে আপনাকে ও আপনার বিগ্রহ কক্ষকে সকল অশুভ প্রভাব থেকে রক্ষা করছে। একই সঙ্গে অগ্নি-বীজাক্ষর মুদ্রা প্রদর্শন করুন। এই মুদ্রা প্রদর্শন কালে আপনার দক্ষিণ তর্জনী সোজা রাখুন, ডান হাতের অবশিষ্ট আঙ্গুল দ্বারা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠকে দৃঢ়মুষ্ঠিবদ্ধভাবে আঁকড়িয়ে ধরুন এবং ডান হাত দক্ষিণাবর্তভাবে আপনার মাথার চতুর্দিকে সম্পূর্ণ বৃত্তাকারে ঘোরান।

ভূত-শুদ্ধি (শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সেবক হিসাবে নিজেকে অভিন্নরূপে গণ্য করে ভৌতিক দেহের বিশুদ্ধকরণ)

● গভীরভাবে অর্থের চিন্তা করে নিম্নের প্রার্থনা সমূহ আবৃত্তি করুন :

---

* এর একান্তর ক্রম ও পূর্বের ধাপ : ১) আপনার ডান হাতের আঙ্গুল—একবার আপনার ডান হাঁটুর উপর, একবার ডান কাঁধের ও একবার মাথার উপর তিনবার মটকান। তারপর ডান হাতের তর্জনী ও মধ্যমা দ্বারা আপনার বাম হাতের তালুতে একবার আঘাত করুন। ২) ডান হাতের আঙ্গুল দশ দিকে মটকান এবং তৎপর আপনার চতুর্দিকে নেমে আসা প্রতিরক্ষা চক্রের ধ্যান করে চক্রমুদ্রা প্রদর্শন করুন।

স্বরূপতঃ আমি কৃষ্ণের নিত্য দাস। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যের ফলে আমি স্মরণাতীত কাল থেকে তাঁর প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। এইভাবে আমি আমার দেহের সঙ্গে অভিন্ন এবং এই জড় জগতে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে অবিরাম আবর্তিত হয়ে ত্রিতাপ দুঃখ ভোগ করছি। এখন কোন অভাবনীয় সৌভাগ্যের ফলে শ্রীগুরুদেবের কৃপায় আমি শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সেবক রূপে আমার পরিচয় বুঝতে পেরেছি। স্থূল ও সূক্ষ্ম জড় শরীর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক আমি হলাম ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র চিৎকণা। অতএব শ্রীগুরুদেবের আদেশে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীশ্রীরাধা-শ্যামসুন্দরের (অথবা কারও পূজিত বিগ্রহদের নাম) শ্রীপাদপদ্ম সেবার অধিকার অর্জন করেছি।

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নোবনস্থো যতির্বা ।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্তুপদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ ॥

আমি ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয় নই, বৈশ্য বা শূদ্র নই। আমি ব্রহ্মচারীও নই, গৃহী, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসীও নই। আমি হলাম গোপীদের রক্ষক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের দাসানুদাসানুদাস। তিনি নিখিল পরমানন্দ ও অমৃত সমুদ্রের উৎসস্বরূপ। (*পদ্যাবলি* ৭৪)

দিব্যং শ্রীহরিমন্দিরাঢ্যতিলকং কণ্ঠং সুমালান্বিতম্
বক্ষঃ শ্রীহরিনামবর্ণসুভগং শ্রীখণ্ডলিপ্তং পুনঃ ।
পূতং সূক্ষ্মং নবাম্বরং বিমলতাং নিত্যং বহন্তীং তনুম্
ধ্যায়েৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মনিকটে সেবোৎসুকং চাত্মনঃ ॥

শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মের নিকটে বসে আত্মস্থ হয়ে ধ্যান করতে হবে, পবিত্র দেহ সূক্ষ্ম ও নতুন বস্ত্রে আবৃত করতে হবে। বক্ষঃস্থল পবিত্র নামের দ্বারা চিহ্নিত করতে হবে এবং চন্দনের মণ্ড শরীরে লেপন করতে হবে আর গলায় থাকবে একটি মালা।

প্রাথমিক পূজা

ঘণ্টা পূজা

- পুষ্পদল চন্দনে ডুবিয়ে ঘণ্টায় উৎসর্গ করার সময় জপ করতে হবে :

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ জয়ধ্বনি-মন্ত্রমতাঃ স্বাহা।

● ঘণ্টার গায়ে চন্দনমাখা ফুলের পাপড়ি লাগিয়ে দিতে হবে। তারপর অল্প সময় বাঁ হাতে ঘণ্টাটি বাজিয়ে একটি পাত্রের উপর রাখতে হবে। সারাক্ষণ ঘণ্টাকে ভগবানের দাস বলে ভাবতে হবে। তারপর হাত জোড় করে জপ করতে হবে :

সর্ববাদ্যময়ি ঘণ্টে দেবদেবস্য বল্লভে।
ত্বাং বিনা নৈব সর্বেষাং শুভং ভবতি শোভনে॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ঘণ্টা, তুমি সব সঙ্গীতের মিষ্ট স্বরের মূর্ত প্রতীক। তুমি বিনা কারও মঙ্গল নেই।

শঙ্খ-পূজা

● ভগবানের স্নান-শঙ্খকে সচন্দন ফুলদলে পূজার সময় এই মন্ত্র জপ করতে হবে :

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হুং হুং হুং নমঃ মহাশঙ্খায় স্বাহা।

নিচের স্তুতি আবৃত্তি করুন :

ত্বং পুরা সাগরোৎপন্নো বিষ্ণুনা বিধৃতঃ করে।
মানিতঃ সর্বদেবৈশ্চ পাঞ্চজন্য নমোঽস্তুতে॥

হে পাঞ্চজন্য, সমুদ্রজাত তোমাকে প্রণাম। বহুপূর্বে ভগবান বিষ্ণু তোমায় তাঁর হস্তে ধারণ করেছিলেন এবং সেই কারণে সকল দেবতা তোমাকে শ্রদ্ধা করেন।

তব নাদেন জীমুতা বিত্রাস্যন্তি সুরাসুরঃ।
শশাংকাযুত-দীপ্তাভ পাঞ্চজন্য নমোঽস্তুতে॥

চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল কিরণ বিকিরণকারী হে পাঞ্চজন্য, তোমায় প্রণাম। তোমার গর্জনে পর্বত, মেঘ, দেবতা ও অসুরেরা ভয়ে কম্পিত হয়।

গর্ভা দেবারিনারীণাং বিলয়ন্তে সহস্রধা।
তব নাদেন পাতালে পাঞ্চজন্য নমোঽস্তুতে॥

হে পাঞ্চজন্য, তোমাকে প্রণাম! তোমার গর্জন পাতালে বসবাসকারী অসুর-ঘরণীদের গর্ভভ্রূণকে সহস্রধা বিদীর্ণ করে দেয়।

গুরু-পূজা

- ১৩৮ পৃষ্ঠায় গুরু-পূজা দ্রষ্টব্য।

গৌরাঙ্গ-পূজা

- ১৪১ পৃষ্ঠায় গৌরাঙ্গ-পূজা দ্রষ্টব্য।*

শ্রীশালগ্রাম পূজা

ভগবানের রূপের ধ্যান

- আপনার পূজিত শ্রীবিগ্রহের ধ্যান-মন্ত্র জপ করুন এবং তাঁর রূপের ধ্যান করুন। শালগ্রাম-পূজায় ভগবান নারায়ণের ধ্যানের জন্য নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্রের জপ করুন :

(ওঁ) ধ্যেয় সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্তী
নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ।
কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটী
হরির্হিরন্ময়বপুর্ধৃতশঙ্খচক্রঃ ॥

ভগবান নারায়ণ সূর্যগোলকের মধ্যে পদ্মাসনে উপবিষ্ট রয়েছেন। তাঁর শিরে মুকুট, কর্ণে স্বর্ণ কুণ্ডল এবং তাঁর হেমকান্তি শরীরে অনন্তভূষণ। তাঁর হস্তে ধারণ করেছেন শঙ্খ ও চক্র। এই সব বৈশিষ্ট্য তাঁকে চির আকর্ষণীয় করেছে। এভাবেই ভগবান সর্বদা ধ্যেয়।

মানস পূজা

- ষোড়শ বা ততোধিক উপচারে মনে মনে ভগবানের পূজা করুন।

করন্যাস ও অঙ্গন্যাস

- ন্যাস-মুদ্রা প্রদর্শনের সময় একবার গোপাল-মন্ত্র জপ করুন।

কর-ন্যাস

- *ক্লীং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ* জপ করুন এবং আপনার তর্জনীদ্বয় বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দুটির দৈর্ঘ্য বরাবর মূল থেকে ডগা পর্যন্ত সঞ্চালন করুন।

---

* গুরুপূজা ও গৌরাঙ্গপূজায় স্নান, বস্ত্র ও নৈবেদ্য প্রদানের পর আপনি অতিরিক্ত আচমন প্রদান করতে পারেন।

● *কৃষ্ণায় তর্জনীভ্যাং স্বাহা* জপ করুন এবং আপনার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠদ্বয় দুটি তর্জনী বরাবর মূল থেকে ডগা পর্যন্ত সঞ্চালন করুন।

● *গোবিন্দায় মধ্যমাভ্যাং বষট্* জপ করুন এবং আপনার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠদ্বয় মধ্যমা দুটির দৈর্ঘ বরাবর মূল থেকে ডগা পর্যন্ত চালনা করুন।

● *গোপীজন অনামিকাভ্যাং হুম্* জপ করুন। আপনার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠদ্বয় আপনার অনামিকা দুটির দৈর্ঘ বরাবর মূল থেকে ডগা পর্যন্ত চালনা করুন।

● *বল্লভায় কনিষ্ঠিকাভ্যাং বৌষট্* জপ করুন এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠদ্বয় আপনার কনিষ্ঠ অঙ্গুলি দুটির দৈর্ঘ বরাবর মূল থেকে ডগা পর্যন্ত চালনা করুন।

● *স্বাহা অস্ত্রায় করতল-করপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্* জপ করুন এবং বাম হস্তের পৃষ্ঠদেশ দিয়ে দক্ষিণ হস্তের করতল ও বাম হস্তের করতল দক্ষিণ হস্তের পৃষ্ঠদেশ দ্বারা স্পর্শ করুন।

অঙ্গ-ন্যাস

● *ক্লীং হৃদয়ায় নমঃ* জপ করুন এবং দক্ষিণ করতল দিয়ে হৃদিস্থল স্পর্শ করুন।

● *কৃষ্ণায় শিরসে স্বাহা* জপ করুন এবং দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলির প্রান্তভাগ দিয়ে ব্রহ্মতালু স্পর্শ করুন।

● *গোবিন্দায় শিখায়ৈ বষট্* জপ করুন এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ঘাড়ের নিম্ন দিকে নির্দেশ করে মুষ্ঠিবদ্ধ ডান হাতের দ্বারা শিখা স্পর্শ করুন।

● *গোপীজন কবচায় হুম্* জপ করুন এবং ডান হাতের আঙ্গুলের ডগা দিয়ে বাম হাতের ঊর্ধ্ববাহু এবং বাম হাতের আঙ্গুলের ডগা দিয়ে ডান হাতের ঊর্ধ্ববাহু স্পর্শ করুন।

● *বল্লভায় নেত্রাভ্যাং বৌষট* জপ করুন এবং ডান হাতের মধ্যমা ও তর্জনী দ্বারা আপনার নেত্রপল্লব স্পর্শ করুন।

● *স্বাহা অস্ত্রায় ফট্* জপ করুন এবং আপনার মস্তকের চতুষ্পার্শে দক্ষিণহস্ত দক্ষিণাভিমুখে আবর্তন করে তিনবার আঙ্গুল মটকান।

● দুই হাতে করতালি বাজিয়ে চক্র-মুদ্রা প্রদর্শন করুন।

● প্রণাম-মুদ্রা প্রদর্শনের সময় জপ করতে পারেন।

সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥

সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর হৃষীকেশের সেবা করার নাম ভক্তি। এই সেবার দুটি 'তটস্থ' লক্ষণ—যথা, এই শুদ্ধভক্তি সমস্ত

উপাধি থেকে মুক্ত এবং কেবল শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত হবার ফলে নির্মল। (নারদ পঞ্চরাত্র, চৈঃ চঃ মধ্য ১৯/১৭০ থেকে উদ্ধৃত)

বিশেষ অর্ঘ্য স্থাপন

অর্ঘ্য প্রদানের বিস্তৃত পদ্ধতিই হল বিশেষ অর্ঘ্য। একের বেশি শঙ্খ পাওয়া না গেলে সেটা ভগবানের স্নানের জন্য সংরক্ষিত রাখতে হবে। বিশেষ-অর্ঘ্য পাত্র সোনা, রূপা, তামা, বা মাটিতে হতে পারে। বিকল্প মতে একই শঙ্খ বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। অর্ঘ্য উপচার সমর্পণের পর, এটাকে স্নানপাত্র হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। অথবা, দুটি বা তিনটি ভিন্ন শঙ্খ থাকলে, একটিকে বিশেষ অর্ঘ্যের জন্য, একটিকে স্নানের জন্য, এবং একটিকে বিলোম-অর্ঘ্য প্রদানের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।*

শঙ্খ স্থাপনের স্থান নির্ধারণ

● সামান্য অর্ঘ্য পাত্র থেকে জল অথবা চন্দন দ্বারা একটি ক্ষুদ্র সমবাহু ত্রিভুজ অঙ্কিত করুন। এর একটা কোণ আপনার দিকে থাকবে। একই ভাবে ত্রিভুজটির চারধারে একটি বৃত্ত এবং বৃত্তের চারদিকে একটি বর্গক্ষেত্র অঙ্কিত করুন।

শঙ্খাধার এবং শঙ্খের বিশুদ্ধিকরণ ও সংস্থাপন

● *ওঁ অস্ত্রায় ফট্* জপ করুন এবং সামান্য-অর্ঘ্য বারি শঙ্খাধারে সিঞ্চন করুন।

● *ওঁ আধার-শক্তয়ে নমঃ* জপ করুন ও শঙ্খাধারটি মণ্ডল মাঝে স্থাপন করুন।

● *ওঁ অস্ত্রায় ফট্* জপ করুন এবং সামান্য-অর্ঘ্য বারি ছিটিয়ে শঙ্খটিকে শঙ্খাধারে স্থাপন করুন।

● *ওঁ হৃদয়ায় নমঃ* জপ করুন এবং পুষ্পদল ও চন্দন শঙ্খে স্থাপন করুন।

● *ওঁ শিরসে স্বাহা* জপ করুন এবং জলপাত্র থেকে শঙ্খে জল ঢালুন।

● শঙ্খের উপর প্রথমে চক্র-মুদ্রা, পরে গালিনী মুদ্রা ও তৎপরে ধেনু-মুদ্রা প্রদর্শিত করুন।

● অঙ্কুশ-মুদ্রা প্রদর্শনের দ্বারা শ্রীগঙ্গা ও অন্যান্য পবিত্র নদীসমূহকে আবাহন করুন ও আবৃত্তি করুন :

---

* ২৮৮ পৃষ্ঠায় বিলোম অর্ঘ্য দ্রষ্টব্য।

গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্মদে সিন্ধো কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥

গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্মদা, সিন্ধু ও কাবেরীর পবিত্র বারিধারা দয়া করে সমুপস্থিত হোন।

• পূজিত বিগ্রহের মূল-মন্ত্র বারিমধ্যে আবাহন করুন। শঙ্খের উপর বীজাক্ষর-মুদ্রা ধারণ করে নীরবে আটবার মন্ত্র জপ করুন। তৎপর মৎস্য-মুদ্রা প্রদর্শন করুন।

শঙ্খদানী, শঙ্খ ও জলমধ্যে অবস্থিত অগ্নি, সূর্য ও চন্দ্র মণ্ডলের (দশ, বার ও ষোল বিভাগ সহ) অর্চনা

• এতে গন্ধপুষ্পে *ওঁ মাং বহ্নি-মণ্ডলায় দশ-কলাত্মনে নমঃ* মন্ত্রটি জপ করুন এবং চন্দন-চর্চিত পুষ্পদল শঙ্খদানীতে নিবেদন করুন, তারপর ফুল-দলটি শঙ্খদানীর গায়ে লাগিয়ে দিন।

• এতে গন্ধপুষ্পে *ওঁ অং অর্ক-মণ্ডলায় দ্বাদশ-কলাত্মনে নমঃ* মন্ত্রটি জপ করুন এবং চন্দন-চর্চিত পুষ্পদল শঙ্খে অর্পণ করুন, তারপর পুষ্পদলটি শঙ্খগাত্রে লাগিয়ে দিন।

• এতে গন্ধপুষ্পে *ওঁ উং সোম-মণ্ডলায় ষোড়শ-কলাত্মনে নমঃ* মন্ত্রটি জপ করুন এবং তারপর জল সন্নিকটে শঙ্খের গায়ে ফুল দলটি লাগিয়ে দিন।*

বিশেষ অর্ঘ্যে ভগবানের আবাহন

• আবাহনী মুদ্রা প্রদর্শন কালে পূজিত বিগ্রহের (যথা, শ্রীকৃষ্ণ) নাম এবং *ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ* (বিশেষ অর্ঘ্যে ভগবানকে আহ্বান করে) মন্ত্র জপ করুন।

• স্থাপনী-মুদ্রা প্রদর্শন কালে *ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ* (ভগবানকে উপবেশনের আসন দিয়ে এবং তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে) মন্ত্র জপ করুন।

• সন্নিধাপনী-মুদ্রা প্রদর্শন কালে *ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিধেহি* (ভগবানের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে এবং তাঁর সন্নিকটবর্তী হতে প্রার্থনা করে) মন্ত্র জপ করুন।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/১৪/৪২) উদ্ধবের নিকট শ্রীকৃষ্ণ যোগ-প্রণালী বর্ণনায় সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নিকে হৃদিপদ্মের মূলাবর্তে স্থাপিত করে এঁদের ধ্যানের কথা সুপারিশ করেছেন। তারপর, "আমার অপার্থিব রূপ অগ্নি মধ্যে স্থাপন করে সকল মঙ্গলজনক লক্ষ্যের ধ্যান করতে হবে।" অর্চনার একই রকম প্রণালী বিশেষ অর্ঘ্য স্থাপনেও দেখা যায়।

● সন্নিরোধনী মুদ্রা প্রদর্শন কালে *ইহ সন্নিরুধ্যস্ব ইহ সন্নিরুধ্যস্ব* (উপাসনা কালে ভগবানকে উপস্থিত থাকতে বলে) মন্ত্র জপ করুন।

● সম্মুখীকরণ-মুদ্রা প্রদর্শন কালে *ইহ সম্মুখো ভব ইহ সম্মুখো ভব* (ভগবানকে আপনার মুখোমুখি হতে বলে) মন্ত্র জপ করুন।

বারিমধ্যে শ্রীবিগ্রহের অঙ্গে মূল-মন্ত্রের অক্ষর স্থাপন (অঙ্গ-ন্যাস)

● *ইহ সকলী-কুরু* জপ করুন, তৎপর, ন্যাস-মুদ্রা প্রদর্শন কালে, একবার গোপাল-মন্ত্র জপ করুন।

● ডান হাত ধরে জলের উপর তালু নিম্নমুখী করে এবং বারিমধ্যে অবস্থিত শ্রীবিগ্রহের হৃদয় স্পর্শ করে *ক্লীং হৃদয়ায় নমঃ* জপ করুন।

● দক্ষিণ হস্তের আঙ্গুলের অগ্রভাগ দিয়ে শ্রীবিগ্রহের মস্তক স্পর্শ করে *কৃষ্ণায় শিরসে স্বাহা* মন্ত্র জপ করুন।

● ডান মুষ্ঠি দ্বারা শ্রীবিগ্রহের শিখা স্পর্শ করে *গোবিন্দায় শিখায়ৈ বষাট্* মন্ত্র জপ করুন।

● ডান ও বাম হাতের আঙ্গুলের ডগা দিয়ে শ্রীবিগ্রহের বাহুদ্বয় স্পর্শ করে *গোপীজন কবচায় হুম্* মন্ত্র জপ করুন।

● ডান হাতের তর্জনী ও মধ্যমার দ্বারা শ্রীবিগ্রহের নেত্রদ্বয় স্পর্শ করে *বল্লভায় নেত্রাভ্যাং বৌষট্* জপ করুন।

● *স্বাহা অস্ত্রায় ফট্* জপের সঙ্গে ডান হাতের আঙ্গুল তিনবার মটকান এবং যুগপৎ শ্রীবিগ্রহের মাথার চারপাশে হাত ঘোরান। তারপর *ইহামৃতি-কুরু* মন্ত্র জপের সময় (শ্রীবিগ্রহের নাম) চক্রমুদ্রা জপ করুন।

● ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন করে ভগবানকে তাঁর পরমানন্দরূপে প্রকাশিত হতে এইভাবে অনুরোধ করুন।

● মহামুদ্রা প্রদর্শন কালে *ইহ পরমী কুরু মন্ত্র* জপ করুন এবং এইভাবে ভগবানের আশীর্বাদ কামনা করুন।

বিশেষ অর্ঘ্যে ভগবানের পূজা

● পাঁচটি বা দুটি উপচারের দ্বারা ভগবানের বিশেষ-অর্ঘ্য পূজা করুন। প্রকৃত উপচারের বিকল্প হিসাবে আপনি ফুল-দল বা সামান্য-অর্ঘ্য বারি ব্যবহার করতে পারেন। তখন এই মন্ত্র জপ করুন :

এষ পুষ্পাঞ্জলীঃ ও শ্রীবিগ্রহ মূলমন্ত্র
এষ গন্ধঃ ও বিগ্রহ মূলমন্ত্র
এতানি পুষ্পানি ও বিগ্রহ মূলমন্ত্র
এষ ধূপঃ ও বিগ্রহ মূলমন্ত্র
এষ দীপঃ ও বিগ্রহ মূলমন্ত্র
ইদং *নৈবেদ্যম্* ও বিগ্রহ মূলমন্ত্র
ইদং *আচমনীয়ম্* ও বিগ্রহ মূলমন্ত্র

● শঙ্খ থেকে সামান্য বিশেষ-অর্ঘ্যবারি পঞ্চপাত্রে ঢালুন, এইভাবে অবশিষ্ট সামান্য-অর্ঘ্যকে বিশেষ-অর্ঘ্যে রূপান্তরিত করুন। অতঃপর পঞ্চপাত্র থেকে কিছু বিশেষ অর্ঘ্য বারি আপনার ডান হাতে ঢালুন। প্রদান বিগ্রহ পূজার সময় নিজ দেহে ও সকল পূজা-পাত্রের উপর পবিত্র বারি সিঞ্চন করুন।

সপার্ষদ ভগবানের পীঠস্থান পূজা (পীঠপূজা)

● শ্রীবিগ্রহ স্নানের জন্য যে স্থানে দাঁড়াবেন সেই পীঠে তর্জনী ও মধ্যমার চন্দন লাগিয়ে পদ্মাকৃতি মণ্ডল অঙ্কিত করুন। তারপর (পুনরায় চন্দন দ্বারা) মণ্ডলের কেন্দ্রস্থলে পূজিত বিগ্রহের মূলমন্ত্রের বীজাক্ষর ও কামবীজ (ক্লীং) লিখুন। (সম্ভব হলে দেবনাগরী অক্ষর ব্যবহার করবেন)।

● এখন ঘণ্টা বাজিয়ে সচন্দন পুষ্পদল নিম্ন নির্দেশমতে অর্পণ করুন।

● মণ্ডলের বামপার্শ্বে পুষ্পদল অর্পণ করুন এবং জপ করুন :

এতে গন্ধ-পুষ্পে (এবং গুরু-মূল মন্ত্র)
এতে গন্ধপুষ্পে ওং গুরুভ্যো নমঃ (পূর্বতন আচার্যদের জন্য)
এতে গন্ধপুষ্পে ওং সর্ববৈষ্ণবেভ্যো নমঃ

● মণ্ডল মাঝে ফুল-দল অর্পণ করুন এবং জপ করুন :

এতে গন্ধপুষ্পে ওম্ আধার-শক্তয়ে নমঃ
এতে গন্ধপুষ্পে ওম্ অনন্তায় নমঃ
এতে গন্ধপুষ্পে ওং গোলোক-ধাম্নে নমঃ

বিভিন্ন উপচারে শালগ্রাম পূজা (বাহ্য পূজা)

বিভিন্ন উপচারে শালগ্রাম-শিলা পূজা কালে পুরুষ-সূক্তের শ্লোক আবৃত্তি করুন। ষোড়শ উপচারের প্রতিটি উপচার প্রদানের পূর্বে আপনি সঠিক উপচার মুদ্রা প্রদর্শন করতে পারেন।

● *এষ পুষ্পাঞ্জলীঃ* ও বিগ্রহ মূলমন্ত্র জপ করুন এবং ভগবানের শ্রীচরণ কমলে পুষ্পদল অর্পণ করুন।

♦ (১) আসন

● *ইমে পাদুকে* ও বিগ্রহ মূল-মন্ত্র জপ করুন, এবং ভগবানকে পাদুকা প্রদান করুন।

● জপ করুন :

সহস্রশীর্ষ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাদ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠাদ্ দশাঙ্গুলম্ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপের সহস্র শির, সহস্র অক্ষি, এবং সহস্র পদ, কারণ সকল জীবই তাঁর অভ্যন্তরে অবস্থিত। নিজের অস্তিত্ব প্রকাশে তিনি গোটা বিশ্বকে সম্পূর্ণরূপে পরিব্যাপ্ত করেছেন এবং স্বাধীন হওয়ার জন্য তিনি নিজেকে প্রসারিত করে এই ব্রহ্মাণ্ড থেকে দশ আঙ্গুল বেশি, অতিক্রম করেছেন।

● আসনমুদ্রা প্রদর্শন কালে *ইদম্ আসনম্* ও বিগ্রহ মূলমন্ত্র জপ করুন। তৎপর স্নানপাত্রের পশ্চাতে (আপনার দূরবর্তী) শ্রীবিগ্রহকে (তাঁর সিংহাসনের উপর) আনয়ন করুন।

♦ (২) স্বাগত

● জপ করুন :

পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ ভূতং যচ্চ ভব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদ্ অন্নেনাতিরোহতি ॥

নিখিল ব্রহ্মাণ্ডসহ—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান—পরমেশ্বর ভগবানের পুরুষ বিস্তারের প্রকাশ ছাড়া কিছু নয়। তিনি অমরত্বের প্রভু হলেও এই ব্রহ্মাণ্ডে নিজেকে পুরুষ হিসাবে প্রকাশ করেছেন, যাতে জীব জাগতিক কর্ম ভোগ করতে পারে।

● *স্বাগতং সু-স্বাগতম্* ও বিগ্রহ মূল-মন্ত্র জপ করুন এবং ভগবানকে সাদর অভ্যর্থনা করে তাঁকে স্বস্তি দান করে স্বস্তি-মুদ্রা প্রদর্শন করুন।

♦ (৩) পাদ্য

● জপ করুন :

এতাবান্ অস্য মহিমা অতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্ব ভূতানি ত্রি-পাদস্যামৃতং দিবী॥

ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান বিশ্বনিচয় ভগবানের শক্তির প্রকাশ, কিন্তু ভগবান নিজে অতি বিশাল। বিশ্বের সকল জীব তাঁর এক চতুর্থাংশ মাত্র, এবং চিদাকাশে নিত্য প্রকৃতি তিন চতুর্থাংশে পরিব্যাপ্ত।

● *এতৎ পাদ্যম্* ও বিগ্রহের মূল মন্ত্র জপ করুন এবং পাদ্যমুদ্রা প্রদর্শন করুন, অতঃপর ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম ধৌত করার জন্য পাদ্যবারি প্রদান করুন এবং এই ব্যবহৃত ধৌত-বারি স্নান-পাত্রে নিক্ষেপ করুন।

● *ইদম্ অঙ্গ-বস্ত্রম্* ও বিগ্রহের মূল মন্ত্র জপ করুন এবং প্রভুর পদযুগল মোছার জন্য তোয়ালে প্রদান করুন।

● *এষ গন্ধঃ* ও বিগ্রহের মূল মন্ত্র জপ করুন এবং চন্দন ফুল-দল ভগবানের চরণ কমলে অর্পণ করুন।

● *এষ পুষ্পাঞ্জলীঃ* ও বিগ্রহের মূল মন্ত্র জপ করুন এবং ভগবানের চরণ কমলে ফুল-দল উৎসর্গ করুন।

♦ (৪) অর্ঘ্য

● জপ করুন :

ত্রিপাদূর্ধ্ব উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহভবাৎ পুনঃ।
ততো বিশ্বঙ্ ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি॥

ভগবানের তিন চতুর্থাংশ জড় অংশকে উৎকর্ষে ছাপিয়ে গেছে। এক চতুর্থাংশে ভগবান পুনরায় বিশ্ব প্রকাশ করেছেন। তিনি পূর্বে বারবার এরূপ করেছেন। এক চতুর্থাংশের ঈশ্বর সর্বত্র গমন করে, সকল প্রাণীবাচক ও অপ্রাণীবাচক পদার্থের রূপ ধারণ করে সৃষ্টিকার্য শুরু করেছিলেন।

● *ইদম্ অর্ঘ্যম্* ও বিগ্রহের মূল-মন্ত্র জপ করুন এবং অর্ঘ্য-মুদ্রা দর্শন করান, তারপর ভগবানের ডান হাতে অর্ঘ্য প্রদান করুন যাতে তিনি এই অর্ঘ্য তাঁর মাথায় ছিটাতে পারেন। স্নান-পাত্র বা বিসর্জনীয় পাত্রে এই অর্ঘ্য নিক্ষেপ করুন।

♦ (৫) আচমন

● জপ করুন :

তস্মাদ্ বিরাদ্ অজায়ত বিরাজো অধি পুরুষঃ ।
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ ভূমিম্ অথো পুরঃ ॥

ভগবান থেকে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি এবং সেই ব্রহ্মাণ্ডেই বিরাট-পুরুষ, বিশ্বের পরমাত্মা জন্মেছেন। তারপর সেই বিরাট-পুরুষ বৃদ্ধি পেয়েছেন, পৃথিবী ও জীবদেহ উৎপন্ন করেছেন।

● *ইদম্ আচমনীয়ম্* ও বিগ্রহের মূল মন্ত্র জপ করুন এবং আচমনীয় মুদ্রা প্রদর্শন করুন। তৎপর ভগবানকে আচমনের জল প্রদান করুন এবং আচমনান্তে বিসর্জনীয় পাত্রে তা ফেলে দিন।

♦ (৬) মধুপর্ক

● জপ করুন :

যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞম্ অতন্বত ।
বসন্তোঽস্যাসীদ্ আজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ ধাবিঃ ॥

প্রথম প্রকাশিত প্রাণী দেবতাগণ সৃষ্টিকার্য সম্পূর্ণ করতে মানস-যজ্ঞ সম্পাদন করেন। এই যজ্ঞে তাঁরা অর্ঘ্য হিসাবে বিরাট পুরুষের (জড় জগতের স্থূল উপাদান) ব্যবহার করেছিলেন। এই যজ্ঞের ঘি ছিল বসন্ত ঋতু, গ্রীষ্ম ছিল সমিধ এবং অর্ঘ্য ছিল শরৎ ঋতু।

● *এষ মধুপর্কঃ* ও বিগ্রহের মূলমন্ত্র জপ করুন এবং মধুপর্ক মুদ্রা প্রদর্শন করুন, তারপর ভগবানের ডান হাতে এক পাত্র মধুপর্ক অর্পণ করুন।

♦ (৭) পুনরাচমন

● জপ করুন :

সপ্তাস্যাসন পরিধয়ঃ ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ ।
দেবা যদ্ যজ্ঞং তন্বনা অবধ্নন্ পুরুষং পশুম্ ॥

এই যজ্ঞে আগুনের চারধারে (রাক্ষসদের থেকে পরিত্রাণের জন্য) বৃত্তাকারে সাতটি (সাতটি বৈদিক ছন্দ) ও একুশখানা সমিধের (বার মাস, পঞ্চ ঋতু, ত্রি-ভুবন ও সূর্য) প্রয়োজন। মানস যজ্ঞ সম্পাদনকারী দেবতাগণ বিরাট পুরুষকে বেঁধে যজ্ঞের পশু হিসাবে উৎসর্গ করেছিলেন।

● *ইদং পুনরাচমনীয়ম্* ও বিগ্রহের মূল-মন্ত্র জপ করুন এবং ভগবানকে অল্প অল্প পানের জন্য আচমন বারি প্রদান করে সেই জল বিসর্জনীয় পাত্রে ফেলুন।

♦ (৮) স্নান

স্নানের পূর্বে শ্রীবিগ্রহ মার্জন (মূর্তি-শুদ্ধি)

● শালগ্রাম শিলা-গাত্রে শঙ্খের চোখ, রজত তিলক, যজ্ঞসূত্র, মুকুট বা অন্যান্য আভরণ থাকলে এখন সে সব খুলে ফেলুন।

● গরম জলে ভিজানো নরম কাপড় বা স্পঞ্জের দ্বারা শ্রীবিগ্রহকে পরিষ্কার করুন। এইভাবেই চন্দন, তুলসীপত্র ও ফুলদল বিগ্রহ গাত্র থেকে তুলে ফেলুন। সতর্ক থাকবেন, আপনার বাম হাত যেন সরাসরি বিগ্রহ গাত্র স্পর্শ না করে। কোনভাবেই যাতে তা না হয় তার জন্য আপনার বাম হাত রুমাল বা তোয়ালের দ্বারা আবৃত করে নেবেন।

● স্নান-পাত্রে যে আসনে স্নানের জন্য শ্রীবিগ্রহকে বসানো হবে তার উপর চন্দন চর্চিত তুলসীপত্র ও ফুল-দল স্থাপন করুন।*

● *ইমে পাদুকে* ও বিগ্রহ মূল-মন্ত্র জপ করুন এবং ভগবানকে পাদুকা অর্পণ করুন। তারপর হস্তমুদ্রার দ্বারা স্নানপাত্রে তাঁকে সংরক্ষণ করুন।

● *ইদম্ অঙ্গ-বস্ত্রম্* ও বিগ্রহের মূল-মন্ত্র জপ করুন এবং গামছা হিসাবে ফুল-দল ও চন্দন অর্পণ করবেন। ফুল-দল বিসর্জনীয় পাত্রে ফেলে দেবেন।

দন্ত-ধাবন (ভগবানের দন্ত-মঞ্জন)

মঙ্গল-আরতির পূর্বে অর্পিত না হলে নিম্নোল্লিখিত উপচার অর্পণ করবেন। (এগুলি অপ্রাপ্য হলে বিকল্প হিসাবে পঞ্চপাত্র থেকে বিশেষ-অর্ঘ্য বারি অর্পণ করতে পারেন।)

● *এষ দন্ত-কাষ্ঠঃ* ও বিগ্রহের মূল-মন্ত্র জপ করুন এবং প্রভুর দন্ত-মঞ্জনের জন্য ক্ষুদ্র বৃক্ষশাখা অর্পণ করুন।

● *এতজ্জিহ্বোল্লেখনী* ও বিগ্রহের মূল-মন্ত্র জপ করুন এবং একটি জিব-ছোলা প্রদান করুন।

● *ইদং গণ্ডূষম্* ও বিগ্রহের মূল-মন্ত্র জপ করুন এবং মুখ প্রক্ষালনের জল প্রদান করুন।

---

* যেখানেই শালগ্রাম শিলা রাখা হবে সেখানে তুলসী অবশ্যই থাকবেন।

● *ইদং হস্তমুখ-প্রক্ষালনম্* ও বিগ্রহের মূল-মন্ত্র জপ করুন এবং ভগবানের হস্ত-মুখাদি ধৌতের জন্য জল প্রদান করুন।

● *এতৎ পাদ্যম্* ও বিগ্রহের মূল-মন্ত্র জপ করুন এবং ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম ধৌত করার জন্য পাদোদক প্রদান করুন।

● *ইদম্ অঙ্গ-বস্ত্রম্* ও বিগ্রহের মূল-মন্ত্র জপ করুন এবং প্রভুর হস্ত, পদ ও মুখমণ্ডলের জল মোছার জন্য বস্ত্রখণ্ড দান করুন।

● *ইদম্ আচমনীয়ম্* ও বিগ্রহের মূল-মন্ত্র জপ করুন এবং আচমনের জল দিন।

● *এষ দর্পঃ* ও বিগ্রহের মূল-মন্ত্র জপ করুন এবং ভগবানকে দর্পণ প্রদর্শন করুন।

● *ইদং তাম্বূলম্* ও বিগ্রহের মূল-মন্ত্র জপ করুন এবং ভগবানকে তাম্বূল দান করুন।

● *ইদং সুগন্ধ-তৈলম্* ও বিগ্রহের মূল-মন্ত্র জপ করুন এবং ভগবান-বিগ্রহকে বামহাতে একটি বস্ত্রখণ্ডে রেখে সুবাসিত তেলের দ্বারা অঙ্গসংবাহন করুন।

ভগবানের অবগাহন ও বিশোষণ (স্নান ও গাত্রবারি বিলোপন)

● জপ করুন :

তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং যাতম্ অগ্রতঃ ।
তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে ॥

দেবতারা, সাধ্যগণ ও ঋষিরা বিশ্বের প্রথম প্রাণী বিরাট-পুরুষকে কুশ ঘাসের উপর স্থাপন করলেন ও বিশুদ্ধি-করণের জন্য বারি সিঞ্চন করলেন। এইভাবে বিরাট-পুরুষের ব্যবহার করে তাঁরা মানস যজ্ঞের পরিচালনা করেন।

● *ইদং স্নানীয়ম্* ও বিগ্রহের মূল-মন্ত্র জপ করুন এবং স্নানমুদ্রা প্রদর্শন করুন। তারপর ব্রহ্মসংহিতার গোবিন্দ স্তুতি ও অন্যান্য স্তুতি আবৃত্তি করতে করতে শঙ্খ থেকে জল বর্ষিত করে ভগবানকে স্নান করান। শঙ্খটি অন্তত পক্ষে তিনবার জল পূর্ণ করুন।

● অতঃপর শ্রীবিগ্রহকে পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান করাতে পারেন। এইভাবে (একটির পর একটি) দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু ও চিনির জল দ্বারা স্নান করানোর সময় নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্র জপ করুন :

ইদং ক্ষীর-স্নানীয়ম্ ও বিগ্রহের মূল-মন্ত্র,
ইদং দধি-স্নানীয়ম্ ও বিগ্রহের মূল-মন্ত্র,
ইদং ঘৃত-স্নানীয়ম্ ও বিগ্রহের মূল-মন্ত্র,
ইদং মধু-স্নানীয়ম্ ও বিগ্রহের মূল-মন্ত্র,
ইদং সীত-স্নানীয়ম্ ও বিগ্রহের মূল-মন্ত্র,

● ভগবান শালগ্রাম শিলাকে পঞ্চামৃতে স্নান করানোর পর পুনরায় তাঁকে উষ্ণবারিতে স্নান করাবেন। এইভাবে শিলা গাত্রে লেগে থাকা অবশিষ্ট বস্তু বিদূরিত করবেন।

● *ইদম্ অঙ্গ-বস্ত্রম্* ও বিগ্রহের মূল-মন্ত্র জপ করুন এবং কোমল বস্ত্রের দ্বারা গাত্রবারি বিলেপন করুন (সতর্ক থাকবেন যেন আপনার বাম হাতের স্পর্শ শ্রীবিগ্রহ গাত্রে না লাগে)।

● শ্রীঅঙ্গের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করতে সুবাসিত তেল অথবা ঘৃত দ্বারা বিগ্রহগাত্রে প্রলেপ দিন।

● অতঃপর শঙ্খ-খোল অথবা ধাতু নির্মিত চক্ষু বিগ্রহগাত্রে সংযোগ করুন (মোমের ব্যবহারই অধিকতর প্রশস্ত)

● *ইদম তিলকম্* ও বিগ্রহের মূল-মন্ত্র জপ করুন এবং শ্রীবিগ্রহকে তিলক সজ্জায় সজ্জিত করুন। (বিকল্প ব্যবস্থা : বস্ত্রদানের পর তিলক সজ্জা করবেন। শঙ্খ-খোল বা ধাতুনির্মিত চোখ না থাকলে গোপী-চন্দন বা চন্দন দ্বারা চোখ আঁকবেন।)

● শ্রীবিগ্রহকে সিংহাসনে স্থাপন করুন।

● *ইদম্ আচমনীয়ম্* ও বিগ্রহের মূল-মন্ত্র জপ করুন এবং আচমন বারি প্রদান করুন।

♦ (৯) বস্ত্র

● জপ করুন :

তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্বহুতঃ সম্ভৃতং পৃষদাজ্যম্।
পশূন্ তাংশ্চক্রে বায়ব্যান্ অরণ্যান্ গ্রাম্যাশ্চ যে ॥

যে স্থানে বিশ্বের সব কিছু উৎসর্গীকৃত হয়েছিল, সেই উৎসর্গ থেকেই দধি ও ঘৃত এবং নিশ্চিতই সব পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদিত হয়েছিল। এর ফলেই আকাশ থেকে প্রাণী, অরণ্য ও গ্রামের সৃষ্টি হয়েছিল।

● *ইদং বস্ত্রম্, ইদম্ উত্তরীয়ম্* ও বিগ্রহের মূল-মন্ত্র জপ করুন এবং বস্ত্র-মুদ্রা প্রদর্শন করুন, তৎপর দেবতাকে নতুন বিশুদ্ধ বস্ত্রাদি অর্পণ করুন।

(শালগ্রাম-শিলার নীচে নিম্নবস্ত্র ও বিগ্রহের পশ্চাদভাগে চাদর জড়িয়ে দিতে পারেন।)

● ইদম্ আচমনীয়ম্ ও বিগ্রহের মূল-মন্ত্র জপ করুন এবং আচমন বারি প্রদান করুন।

● উপবীত মুদ্রা প্রদর্শন কালে ইদম্ উপবীতম্ ও বিগ্রহের মূল-মন্ত্র জপ করুন এবং তৎপরে শ্রীবিগ্রহকে যজ্ঞ-সূত্র প্রদান করুন।

● ইদম্ আচমনীয়ম্ ও বিগ্রহের মূল-মন্ত্র জপ করুন এবং আচমন বারি প্রদান করুন।

♦ (১০) আভরণ

● জপ করুন :

তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্বহূত ঋচঃ সামানি জজ্ঞীরে ।
ছন্দাংসি জজ্ঞীরে তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদ্ অজায়ত ॥

সেই পরম যজ্ঞ বা, সবহূতা থেকে বেদের সপ্ত ছন্দ সহ ঋক্ (স্তোত্র), সাম (সঙ্গীত) ও যজু (গদ্য) বেদের নীরস অংশ জাত হয়েছে।

● ইমানি আভরণানি ও বিগ্রহের মূল-মন্ত্র আভরণ-মুদ্রা প্রদর্শনের সঙ্গে জপ করুন। তারপর শ্রীবিগ্রহকে মুকুট ও অন্যান্য আভরণ প্রদান করুন।

♦ (১১) গন্ধ

● জপ করুন :

তস্মাদ্ অশ্বা অজায়ন্ত যে কে চোভয়াদতঃ ।
গাবো হ জজ্ঞীরে তস্মাৎ তস্মাজ্জাতা অজাভয়ঃ ॥

সেই যজ্ঞ থেকে অশ্ব, দুই পংক্তি দন্ত যুক্ত প্রাণী যেমন, গর্দভ ও অশ্বেতর প্রাণীর উদ্ভব হয়েছিল। ছাগল ভেড়া সহ গরুও সেই যজ্ঞ থেকে জন্ম নিয়েছিল।

● *এষ গন্ধঃ* ও বিগ্রহের মূল-মন্ত্র গন্ধ-মুদ্রা প্রদর্শন সহ জপ করুন। তৎপর ঋতু অনুযায়ী অগুরু-চন্দন আদি গন্ধ দ্রব্য দান করুন।

♦ (১২) পুষ্প

● জপ করুন :

যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্ ।
মুখং কিম্ অস্য কৌ বাহূ কাবূরূ পাদ উচ্যেতে ॥

মানস যজ্ঞে যখন তারা বিরাট-পুরুষকে বিভক্ত করেছিল তখন কয়টি অংশে তারা বিভক্ত করেছিল? তাঁর মুখমণ্ডল, বাহু, উরু ও পদ যুগল সম্বন্ধে কি বলা হয়েছে?

● *এতানি পুষ্পানি* ও বিগ্রহের মূল-মন্ত্র জপ করুন, তৎসঙ্গে পুষ্প মুদ্রা প্রদর্শন করুন। তারপর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সুগন্ধি পুষ্প প্রদান করুন।

● *এতানি তুলসীপত্রানি* ও বিগ্রহের মূল-মন্ত্র জপ করুন এবং ভগবানের পাদপদ্মে তুলসীপত্র ও মঞ্জরী অর্পণ করুন। শিলার পাদদেশ বা পৃষ্ঠদেশে পত্র মঞ্জরী লাগিয়ে দিন। শিলার মুখমণ্ডল থাকলে তাঁর মস্তকে বা গণ্ডে সেগুলি যুক্ত করবেন না। মুখমণ্ডল না থাকলে শিলার যে কোন স্থানে এগুলি লাগাতে পারেন।

● *ইমে মাল্যে* ও বিগ্রহের মূল-মন্ত্র জপ করুন এবং ফুলমালা ও তুলসীমালা শ্রীবিগ্রহে অর্পণ করুন। (একটি মালার জন্য *ইদং মাল্যম্* জপ করুন।) বিকল্পভাবে, আভরণ দানের ঠিক পরেই বা, ষোড়শ উপচার প্রণামের পূর্বে মাল্যদান করতে পারেন।

♦ (১৩) ধূপ

● জপ করুন :

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখম্ আসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ ।
ঊরু তদ্ অস্য বৈশ্যঃ পদভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥

(বিরাট-পুরুষের মুখমণ্ডল থেকে) ব্রাহ্মণের উদ্ভব, তাঁর দুই বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, ঊরু থেকে বৈশ্য ও পদ থেকে শূদ্রের উদ্ভব হয়েছে।

● ধূপ-মুদ্রা প্রদর্শন কালে *এষ ধূপঃ* ও বিগ্রহের মূল-মন্ত্র জপ করুন। তৎপর শ্রীবিগ্রহকে ধূপ দান করুন।

♦ (১৪) দীপ

● জপ করুন :

চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্যো অজায়ত ।
মুখাদ্ ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্ বায়ুরজায়ত ॥

তাঁর মন থেকে চন্দ্র, দুটি আঁখি থেকে সূর্য, বায়ু থেকে শ্বাস-প্রশ্বাস ও মুখগহ্বর থেকে ইন্দ্র ও অগ্নির উৎপত্তি হয়েছে।

● *এষ দীপঃ* ও বিগ্রহের মূল-মন্ত্র দীপ-মুদ্রা প্রদর্শন কালে জপ করুন। তৎপরে শ্রীবিগ্রহকে ঘিয়ের প্রদীপ অর্পণ করুন।

● এরপর একটি ক্ষুদ্র পাত্রে কিছু সরিষা ও নিম্বপত্র শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে আরতি সদৃশ আন্দোলিত করে দৃষ্টি অপসরণ ক্রিয়া (অশুভ-লক্ষণ দূরীকরণ) সম্পাদন করতে পারেন। (পরে সেগুলি কক্ষের বাইরে পুড়িয়ে ফেলবেন)।

♦ (১৫) নৈবেদ্য

● *ইদম্ আসনম্* ও গুরু-মূল-মন্ত্র জপ করুন এবং আপনার শ্রীগুরুদেবকে আসন দান করুন।

ভোগ-বিশুদ্ধিকরণ (কিছু ফল অথবা মিষ্ট দ্রব্য ও জল)

● *ওম্ অস্ত্রায় ফট্* জপ করুন এবং ভোগে বিশেষ অর্ঘ্য বারি সিঞ্চন করুন। চক্র-মুদ্রা প্রদর্শন করুন। পানীয় জলের উপর গালিনী-মুদ্রা প্রদর্শন করুন।

● দক্ষিণ হস্তের তালুতে কিছু জল নিয়ে *যং* মন্ত্র (বায়ুবীজ) আটবার জপ করুন।

● ধ্যানে খাদ্যবস্তুর দোষক্ষালনের জন্য ভোগের উপর বারি সিঞ্চন করুন।

● বীজাক্ষর-মুদ্রা প্রদর্শন করে (হস্ততালু ঊর্ধ্বে তুলে) দক্ষিণ হস্তের তালুতে *রং-এর* (অগ্নি-বীজ) ধ্যান করুন এবং তৎপর ত্রুটি নাশ করার জন্য ভোগের উপর সেই অগ্নি-বীজ বর্ষণ করুন।

● বীজাক্ষর-মুদ্রা (হস্ত তালু ঊর্ধ্বে তুলে) আপনার বাম হস্ততালুতে *থং-* এর (অমৃত-বীজ) ধ্যান করুন এবং তৎপরে ভোগের উপর তা বর্ষণ করুন।

● ধেনু-মুদ্রা প্রদর্শন করে অমৃত সদৃশ খাদ্যের ধ্যান করুন।

● ডান হাতে কিছু জল নিয়ে আটবার শ্রীবিগ্রহের মূল-মন্ত্র জপ করুন এবং তৎপর সেটা ভোগের উপর ছিটিয়ে দিন।

● পুনরায় ভোগের উপর মূল-মন্ত্র জপ করুন ও তৎসহ বীজাক্ষর-মুদ্রা প্রদর্শন করুন। এরপর মৎস্য-মুদ্রার দ্বারা ভোগ সংরক্ষণ করুন।

● ভোগের উপর তুলসী পত্র দিন।

● *ইদম্ আসনম্* ও বিগ্রহের মূল-মন্ত্র জপ করুন এবং শ্রীবিগ্রহকে আসন দান করুন।

● *এতদ্ পাদ্যম্* ও বিগ্রহের মূল-মন্ত্র জপ করুন এবং শ্রীবিগ্রহের চরণ-পদ্ম ধৌত করার জন্য পাদ্যার্ঘ্য দান করুন।

● *ইদম্ আচমনীয়ম্* ও বিগ্রহের মূল-মন্ত্র জপ করুন এবং আচমনের জল প্রদান করুন।

পরিশেষণ — প্রাণের প্রতি অর্ঘ্য নিবেদন

● *ওম্ অমৃতোপস্তারণম্ অসি স্বাহা* জপ করুন ও খাদ্যের জন্য অমৃতপীঠ হিসাবে শ্রীবিগ্রহকে আচমনীয় বারি প্রদান করুন।

● ডান হাত দ্বারা ভোগের উপর প্রাণ-মুদ্রা প্রদর্শন করে জপ করুন :
ওং *প্রাণায় স্বাহা* (অনামিকা ও কনিষ্ঠা দ্বারা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠকে স্পর্শ করে);
ওম্ *অপানায় স্বাহা* (মধ্যমা ও তর্জনী দ্বারা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠকে স্পর্শ করে);
ওঁ *ব্যানায় স্বাহা* (অনামিকা ও মধ্যমা দ্বারা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করে);
ওম্ *উদানায় স্বাহা* (অনামিকা, মধ্যমা ও তর্জনী দ্বারা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠকে স্পর্শ করে);
ওং *সমানায় স্বাহা* (চারটি অঙ্গুলি দ্বারা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠকে স্পর্শ করে)।

ভোগ অর্পণ :

● জপ করুন :

নাভ্যা আসীদ্ অন্তরিক্ষং শীর্ষ্ণোঃ দ্যয়ুঃ সামবর্তত ।
পদ্ভ্যাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাৎ তথা লোকান্ অকল্পয়ন্ ॥

তাঁর নাভি থেকে উত্থিত হয়েছে স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যবর্তী স্থান, মস্তক থেকে স্বর্গ, পদযুগল থেকে পৃথিবী, আর কর্ণ থেকে দিগ্মণ্ডলের উদ্ভব হয়েছে। এইভাবেই সৃষ্টি হয়েছে বিশ্বের।

● ইদং *নৈবেদ্যম্* ও বিগ্রহের মূলমন্ত্র জপ করুন এবং শ্রীবিগ্রহকে ভোগ নিবেদন করুন।

● ইদং *পানীয়ম্* ও বিগ্রহের মূল-মন্ত্র জপ করুন এবং শ্রীবিগ্রহকে এক পাত্র পানীয় জল অথবা অন্য উপযুক্ত পানীয় অর্পণ করুন।

● *নিবেদয়ামি ভবতে জুষণেদং হবির হরে* জপ করুন, আপনার অর্ঘ্য গ্রহণের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করুন এবং পাত্রটি উভয় হস্তদ্বারা অল্পক্ষণের জন্য তুলে ধরুন (সমর্পণের ভঙ্গিমায়)। তারপর গ্রাস-মুদ্রা প্রদর্শন করুন।

● ঘণ্টা বাজিয়ে তিনবার প্রণাম-মন্ত্র জপ করবেন। একবার আপনার শ্রীগুরুদেবের উদ্দেশ্যে, একবার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে এবং একবার শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে। (এরপর চতুর্থ অধ্যায় ১২৪-১২৫ পৃষ্ঠায় দেখুন।)

● চক্ষু মুদ্রিত করে গোপাল মন্ত্র ও কাম-গায়ত্রী মন্ত্র জপ করুন এবং ভগবানের সপার্ষদ ভোজনের জন্য ধ্যান করুন। প্রভুর ভোজনের জন্য কিছু সময় অপেক্ষা করে চোখ খুলুন।

ভোজনের পর

● তিনবার হাততালি দিয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে নিম্ন-কথিত উপচারগুলি অর্পণ করুন :

● *ওম্ অমৃতাপিদানম্ অসি স্বাহা* জপ করুন এবং বিগ্রহের খাদ্যের জন্য অমৃতের আবরণী হিসাবে বিগ্রহকে আচমন বারি দান করুন।

● *ইদং গণ্ডূষম্* ও বিগ্রহের মূলমন্ত্র জপ করুন ও বদন মণ্ডল ধৌত করার জল অর্পণ করুন।

● *ইদম্ হস্তমুখ প্রক্ষালয়নম্* ও বিগ্রহের মূলমন্ত্র জপ করুন এবং শ্রীবিগ্রহের হস্ত ও মুখমণ্ডল প্রক্ষালনের জন্য বারি দান করুন।

● এতদ্ পাদ্যম্ ও বিগ্রহের মূলমন্ত্র জপ করুন এবং ভগবানের পাদ্যার্ঘ দান করুন।

● *ইদম্ অঙ্গ বস্ত্রম্* শ্রীবিগ্রহের মুখ, হাত ও পা মোছার জন্য বস্ত্র দান করুন এবং বিগ্রহের মূলমন্ত্র জপ করুন।

● *ইদম্ আচমনীয়ম্* ও বিগ্রহের মূলমন্ত্র জপ করুন এবং আচমন বারি অর্পণ করুন।

● *এষ গন্ধঃ* ও বিগ্রহের মূলমন্ত্র জপ করুন এবং ভগবানের হাত-মুখ বিশুদ্ধ করতে চন্দন অর্পণ করুন।

● *ইমে মাল্যে* ও বিগ্রহের মূলমন্ত্র জপ করুন এবং অতিরিক্ত পুষ্পমাল্য ভগবানকে অর্পণ করুন। (একটি মালার ক্ষেত্রে *ইদং মাল্যম্* জপ করুন)।

● *ইদং মুখবাসম্* ও বিগ্রহের মূলমন্ত্র জপ করুন এবং ভগবানের মুখ সুগন্ধির জন্য সুমিষ্ট মশলা প্রদান করুন।

● ইদং *তাম্বূলম্* ও বিগ্রহের মূলমন্ত্র জপ করুন এবং ভগবানকে তাম্বূল অর্পণ করুন।

● *ইদং সর্বম্* ও বিগ্রহের মূলমন্ত্র জপ করুন এবং ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করুন। ভগবানের আনন্দদায়ক যে কোন বস্তুর বিকল্প হিসাবে ফুল দেওয়া যেতে পারে।

♦ (১৬) প্রণাম—সমাপন ক্রিয়া

● জপ করুন :

বেদাহম্ এতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্য বর্ণং তামসস্তু পারে।
সর্বাণি রূপাণি বিচিন্ত্য ধীরো
নামানি কৃত্বাভিবদান্ যদাস্তে ॥

জড় সৃষ্টির অন্ধকার সীমার বাইরে সূর্যের ন্যায় অত্যুজ্জ্বল দণ্ডায়মান বিরাট পুরুষকে আমি চিনি। সকল জীবের আকৃতি ও নাম দান করে তিনি তাদের বিষয় পরিচালনা করেন।

মন্ত্র জপ :

● মন্দিরের প্রধান বিগ্রহের মূলমন্ত্র ও গায়ত্রী মন্ত্র প্রত্যেকটি দশবার করে জপ করুন।

● ভগবানকে মন্ত্র-জপ অর্পণ হিসাবে ফুল-চন্দন সহ বিশেষ অর্ঘ্যবারি (অর্ঘ্যপাত্র থেকে শঙ্খ বা চামচ দ্বারা অথবা কেবল পঞ্চপাত্র থেকে) ভগবানের-হস্তে অর্পণ করে জপ করুন :

গুহ্যাতি গুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহানাস্মৎকৃতং জপম্।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎপ্রসাদাৎ ত্বয়ি স্থিতে ॥

হে আমার প্রভু, তুমি গোপনের গোপন ও গোপনের রক্ষক। দয়া করে আমার জপ গ্রহণ কর। তোমার সেবায় নিযুক্ত ব্যক্তিরা যে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে আমাকে তুমি করুণা করে সেই পরিপূর্ণতা দান কর।

হোম :

সুবিধা হলে এই সময়ে বিগ্রহের মূলমন্ত্র প্রয়োগ করে *পুরুষ সূক্ত-হোম* ও *বৈষ্ণব-হোম* সম্পাদন করতে পারেন।

ভগবানের ব্যক্তিগত বস্তু (উপাঙ্গ-পূজা) পার্ষদদের (আবরণ--পূজা) অর্চন

১৫২-১৫৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ভগবানের পার্ষদদের প্রসাদ নিবেদন

নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্র দ্বারা ভগবানের প্রসাদাবশিষ্ট আপনার শ্রীগুরুদেব ও ভগবানের পার্ষদদের অর্পণ করুন :

● জপ করুন :

ইদং মহাপ্রসাদং নির্মাল্যাদিকম্ (এবং গুরুমূল মন্ত্র)
ইদম্ আচমনীয়ম্ (এবং গুরুমূল মন্ত্র)
ইদম্ মহাপ্রসাদং নির্মাল্যাদিকম্ (এবং গুরুমূল মন্ত্র)
ইদং মহাপ্রসাদং নির্মাল্যাদিকম্ ওং সর্বসখীভ্যো নমঃ
ইদং মহাপ্রসাদং নির্মাল্যাদিকম্ ওং শ্রীপৌর্ণমাস্যৈ নমঃ
ইদং মহাপ্রসাদং নির্মাল্যাদিকম্ ওং সর্বব্রজবাসিভ্যো নমঃ
ইদং মহাপ্রসাদং নির্মাল্যাদিকম্ ওং সর্ববৈষ্ণবেভ্যো নমঃ

স্তুতি

● জপ করুন :

ধাতা পুরস্তাদ যমুদজহার
শক্রঃ প্রবিদ্ধান্ প্রদিষশ্চ তস্রঃ ।
তমেবং বিদ্বান্ অমৃত ইহ ভবতি
নান্যঃ পন্থা অয়নায় বিদ্যতে ॥

ব্রহ্মা ইন্দ্রকে তাঁর পূর্ণ উপলব্ধির কথা ব্যাখ্যা করেছেন। চতুর্দিকের সকল জীব ইন্দ্রের পরিচিত। ব্রহ্মার উপলব্ধির কথা তিনি অন্য সকলকে ব্যাখ্যা করেছেন। বিরাট-পুরুষের প্রকৃতি যিনি জানেন, তিনি পৃথিবীতে এই জীবনেই অমর হন। অমরত্ব লাভের এ ছাড়া আর অন্য কোন পথ নেই।

যজ্ঞেন যজ্ঞম্ অযজন্ত দেবা-
স্তানি ধর্মানি প্রথমান্যাসন্ ।
তে হা নাকং মহীমানঃ সচন্তে
যত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবঃ ॥

এইভাবে দেবতাগণ এই বিশ্বে বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হওয়ার জন্য বিরাট-পুরুষের মানস যজ্ঞ সম্পাদন করেন। সেই যজ্ঞের দ্বারা প্রাকৃতিক নিয়ম ও আচরণের প্রথম অপার্থিব নিয়মাবলী উভয়েরই উদ্ভব হয়েছিল। মহাত্মাগণ একই রকম মানসিক পূজার দ্বারা অমরত্বের স্থান লাভ করেছিলেন। প্রথম পূজারী—সাধ্য ও দেবতাগণ এই অমরধামেই বাস করেন।

কর্ম-সমর্পণ

● নিম্নের সংস্কৃত গদ্য প্রার্থনাটি অথবা এর অনুবাদ আবৃত্তি করে আপনার সকল কার্য শ্রীকৃষ্ণকে সমর্পণ করুন :

ইতঃ পূর্বং প্রাণবুদ্ধি ধর্মাধিকারতো জাগ্রত-
স্বপ্ন-সুষুপ্তি-অবস্থাসু মনসা বাচা কর্মণা
হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যাম্ উদারেণ শিশ্না যৎ স্মৃতং যদ্
উক্তং যৎ কৃতং তৎ সর্বং শ্রীকৃষ্ণার্পণং ভবতু
স্বাহা। মাং মদীয়ং চ সকলং হরয়ে সমর্পয়ামি।
ওং তৎ সৎ।

জীবের যেহেতু প্রাণ আছে, বুদ্ধি আছে, দেহ আছে, এবং শুদ্ধ-অশুদ্ধ নির্বাচনের ক্ষমতা আছে, তাই আমি আমার জাগরিতাবস্থায়, তন্দ্রায় বা গভীর নিদ্রায় মনের দ্বারা যে চিন্তা করেছি, বাক্যে যা বলেছি, হাত-পা, পাকস্থলী ও জননেন্দ্রিয়ের দ্বারা সম্পাদন করেছি সবই শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করছি। পরম পিতা পরমেশ্বরকে নিজেকে সহ সব কিছুই সমর্পণ করছি।

বিলোম-অর্ঘ্য

কর্ম-সমর্পণ অর্ঘ্য হিসাবে আপনি বিলোম-অর্ঘ্য প্রদান করতে পারেন। নিম্নে উল্লেখ মতে বিলোম-অর্ঘ্য স্থাপন করুন (হয় বিশেষ-অর্ঘ্য স্থাপনের পর অথবা, কর্ম সমর্পণের পর) :

● শঙ্খদানীতে শঙ্খ জলপূর্ণ করুন, প্রোক্ষণ সম্পাদন করুন, অঙ্কুশ-মুদ্রার দ্বারা গঙ্গার আবাহন করুন; চক্র, গালিনী ও ধেনু মুদ্রা প্রদর্শন করুন। এরপর আবৃত্তি করতে পারেন :

নারায়ণাদুদ্ভূতোঽয়ং বর্ণক্রমঃ

ভগবান নারায়ণ থেকেই সংস্কৃত বর্ণমালা সম্প্রসারিত হয়েছে। (হরিনামামৃত-ব্যাকরণ—শ্রীল জীব গোস্বামী)

● বীজাক্ষর-মুদ্রা প্রদর্শন করুন এবং জলের উপর সংস্কৃত বর্ণমালা অবরোহক্রমে আবৃত্তি করুন (বিলোম) :

ক্ষং হং সং ষং শং বং লং রং যং
মং ভং বং ফং পং

নং ধং দং থং তং
ণং ঢং ডং ঠং টং
ঞং ঝং জং ছং চং
ঙং ঘং গং খং কং
ঔং ওং ঐং এং ৯ং
ৠং ঋং ঊং উং ঈং
ইং আং অং।

● মৎস্য মুদ্রা প্রদর্শন করুন।

● বিলোম-অর্ঘ্য প্রদানের সময় ঘণ্টা বাজিয়ে নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্র উচ্চারণ করে আরতির ভঙ্গিমায় ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের প্রতি শঙ্খ দোলাবেন :

পাদত্রয়ক্রমক্রান্ত ত্রৈলোক্যেশ্বর কেশব।
ত্বৎ-প্রসাদাদ্ ইদং তোয়ং পাদ্যং তেঽস্তু জনার্দন ॥

হে কেশব, জনার্দন, ত্রিবিক্রম, ত্রিভুবন পতি, তিন পদক্ষেপে ত্রিভুবন অতিক্রমকারী, দয়া করে এই বারি দ্বারা আপনার শ্রীচরণকমলকে ধৌত করুন।

● বিলোম-অর্ঘ্য বারি বিসর্জনীয়-পাত্রে বর্ষিত করুন।

আত্ম সমর্পণ

● জপ করুন :

অহং ভগবতোঽংশোঽস্মি সদা দাসোঽস্মি সর্বথা।
ত্বৎকৃপাপেক্ষকো নিত্যম্ ইত্যাত্মানং সমর্পয়ে ॥

আমি সম্পূর্ণরূপে আত্মনিবেদন করছি, আমি সদা তোমার কৃপা প্রার্থী এবং নিজেকে আমি তোমার নিত্য অংশ বলে ভাবি।

প্রণাম

● জোড় হস্তে জপ করুন :

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

গো-ব্রাহ্মণের হিতকারী, জগতের উপকারী ব্রহ্মণ্যদেব গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পুন পুন প্রণাম নিবেদন করি।

অপরাধ শোধন

- জপ করুন :

> *অঙ্গহীনং ক্রিয়াহীনং বিধিহীনং চ যদ্ ভবেৎ*
> *অস্তু তৎ সর্বম্ অচ্ছিদ্রং কৃষ্ণকার্ষ্ণপ্রসাদতঃ*
> *যৎ কিঞ্চিৎ বৈগুণ্যং জাতং তদ্ দোষপ্রশমনায়*
> *শ্রীকৃষ্ণস্মরণং করোমি ।*

আমাদের পূজাবিধি পালনে ও পূজাকার্য সম্পাদনে যে সকল ত্রুটি হয়েছে কৃষ্ণ ও তাঁর ভক্তবৃন্দের কৃপা যেন সে সমস্ত বাতিল করে দেন। যদি কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে থাকে সে সব প্রশমিত করতে আমি এখন শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করছি। [*সৎক্রিয়া-সার-দীপিকা*] (অতিরিক্ত অপরাধ-শোধন মন্ত্র পরে উল্লেখ করা হয়েছে)

> *হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।*
> *হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥*

তারপর দর্শন-আরতি, প্রদক্ষিণ ও নির্মাল্য গ্রহণ সম্পাদন করুন। প্রদক্ষিণের পর পারমার্থিক গুরু ও ভগবানের উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করুন।

সংযোজন ৩

ভগবৎ-স্তুতি

শ্রীব্রহ্মসংহিতা

"শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁর প্রিয় শিষ্যদের এই স্তোত্রটি শিখিয়েছেন। স্তোত্রটিতে বৈষ্ণব দর্শনের সব অপার্থিব সত্যই বিধৃত আছে। পাঠকবর্গকে নিত্যকার কর্ম হিসাবে অতি যত্ন ও মনোযোগের সঙ্গে এই স্তোত্রের মর্মে প্রবেশ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।" *(ব্রহ্মসংহিতা ৫/২৪, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের তাৎপর্য)*

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥ ১ ॥

ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ হলেন পরমেশ্বর ভগবান। সন্ধিনী-সম্বিৎ-হ্লাদিনী—স্বরূপ শক্তির এই বৃত্তিত্রয় সমন্বিত আদিরহিত সকলের মূলরূপ। তিনি সমস্ত কারণেরও কারণ গোবিন্দ।

চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্ ।
লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ২৯ ॥

লক্ষ-লক্ষ-কল্পবৃক্ষে আবৃত চিন্তামণিকর গঠিত গৃহসমূহে সুরভি অর্থাৎ কামধেনুগণকে যিনি পালন করছেন এবং শত সহস্র লক্ষ্মীগণ কর্তৃক সাদরে পরিসেবিত হচ্ছেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

বেণুং ক্বণন্তমরবিন্দদলায়তাক্ষং
বর্হাবতংসমসিতাম্বুদসুন্দরাঙ্গম্ ।
কন্দর্পকোটিকমনীয়বিশেষশোভং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৩০ ॥

মুরলীগান-তৎপর, কমলদলের ন্যায় প্রফুল্লচক্ষু, ময়ূর-পুচ্ছ শিরোভূষণ, নীলমেঘবর্ণ সুন্দর শরীর, কোটিকন্দর্প মোহন বিশেষ শোভা-বিশিষ্ট সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

আলোলচন্দ্রক লসদ্বনমাল্যবংশী-
রত্নাঙ্গদং প্রণয়কেলিকলাবিলাসম্।
শ্যামং ত্রিভঙ্গললিতং নিয়তপ্রকাশং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৩১ ॥

দোলায়িত চন্দ্রক শোভিত বনমালা যাঁর গলদেশে, বংশী ও রত্নাঙ্গদ যাঁর করদ্বয়ে, সর্বদা প্রণয়কেলিবিলাসযুক্ত যিনি, ললিত ত্রিভঙ্গ শ্যামসুন্দর-রূপই যাঁর নিত্যপ্রকাশ, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি
পশ্যন্তি পান্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি।
আনন্দচিন্ময়সদুজ্জ্বলবিগ্রহস্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৩২ ॥

সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি, তাঁর বিগ্রহ— আনন্দময়, চিন্ময় ও সন্ময়, সুতরাং পরমোজ্জ্বল; সেই বিগ্রহগত অঙ্গসকল প্রত্যেকেই সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি বিশিষ্ট এবং চিদচিৎ অনন্ত জগৎসমূহকে নিত্যকাল দর্শন, পালন এবং কলন করেন।

অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপ-
মাদ্যং পুরাণপুরুষং নবযৌবনঞ্চ।
বেদেষু দুর্লভমদুর্লভমাত্মভক্তৌ
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৩৩ ॥

বেদেরও অগম্য কিন্তু শুদ্ধ আত্মভক্তিরই লভ্য সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি। তিনি অদ্বৈত, অচ্যুত, অনাদি, অনন্তরূপ, আদ্য, পুরাণ-পুরুষ হয়েও সর্বদা নব যৌবনসম্পন্ন সুন্দর পুরুষ।

পন্থাস্তু কোটিশতবৎসরসংপ্রগম্যো
বায়োরথাপি মনসো মুনিপুঙ্গবানাম্।
সোঽপ্যস্তি যৎ প্রপদসীম্ন্যবিচিন্ত্যতত্ত্বে
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৩৪ ॥

সেই প্রাকৃত-চিন্তাতীত তত্ত্বে গমনেচ্ছু প্রাণায়ামগত যোগীদিগের বায়ু-নিয়মনপথ অথবা অতন্নিরসনকারী নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানকারী মুনিশ্রেষ্ঠদিগের জ্ঞানচর্চারূপ পন্থা শতকোটি বৎসর গিয়েও যাঁর চরণারবিন্দের অগ্রসীমামাত্র প্রাপ্ত হয়, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

একোঽপ্যসৌ রচয়িতুং জগদণ্ডকোটিং
যচ্ছক্তিরস্তি জগদণ্ডচয়া যদন্তঃ।
অণ্ডান্তরস্থপরমাণুচয়ান্তরস্থং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৩৫ ॥

শক্তি ও শক্তির অধিকারীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই বলে আমি সেই নির্বিশেষ সত্তা আদিপুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি। তাঁর এই লক্ষ লক্ষ বিশ্ব সৃষ্টির মধ্যে তাঁর শক্তি তাঁর নিজের থেকে অবিচ্ছেদ্য। তাঁর মধ্যেই সকল ব্রহ্মাণ্ডের অবস্থিতি এবং একই সঙ্গে সকল ব্রহ্মাণ্ডে বিক্ষিপ্ত প্রতি অণুর মাঝে তিনি পূর্ণরূপে বর্তমান। এইরূপ আদি পুরুষকেই আমি পূজা করি।

যদ্ভাবভাবিতধিয়ো মনুজাস্তথৈব
সংপ্রাপ্য রূপমহিমাসনযানভূষাঃ।
সূক্তৈর্যমেব নিগমপ্রথিতৈঃ স্তুবন্তি
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৩৬ ॥

যাঁর প্রশংসায় মানুষ ভক্তিতে অনুপ্রাণিত হয়ে বেদের অন্তর্গত মন্ত্র-সূক্ত গান করে আর তদ্দ্বারা যথাযোগ্য সৌন্দর্য, মহত্ত্ব সিংহাসন, যানবাহন ও অঙ্গাভরণ লাভ করে, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি।

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৩৭ ॥

যিনি পরমাত্মারূপে প্রত্যেকের হৃদয়ে বসবাস করছেন, রাধাসহ নিজ গোলোকে নিত্য বাস করছেন, যিনি তাঁর আপন চিন্ময়রূপের সদৃশ এবং যিনি পরমানন্দদায়ক হ্লাদিনী শক্তির মূর্ত বিগ্রহ, সেই আদি পুরুষ

গোবিন্দের পূজা করি। তাঁদের সঙ্গিনীরাই তাঁর বিশ্বাসের পাত্রী, যাঁরা তাঁর দেহাকৃতিরই প্রসারণ এবং যাঁরা নিত্য আনন্দপূর্ণ, চিৎ রসের দ্বারা পরিব্যাপ্ত।

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৩৮ ॥

যিনি শ্যামসুন্দর, স্বয়ং কৃষ্ণ, যিনি অজস্র অচিন্ত্যগুণের অধিকারী এবং যাঁকে প্রেমাঞ্জন রঞ্জিত ভক্তিচোখের দৃষ্টিতে বিশুদ্ধ ভক্তরা তাঁদের অন্তরের অন্তস্তলে অবলোকন করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি।

রামাদিমূর্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্
নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৩৯ ॥

যিনি স্বয়ং কৃষ্ণরূপে প্রকটিত এবং এই বিশ্বের বহু অবতার যেমন রাম, নৃসিংহ ও বামন রূপে প্রকাশ করেছেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। এঁরা সকলেই তাঁর স্বাংশ কলা।

যস্য প্রভাপ্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদ্ ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪০ ॥

মহা শক্তিসম্পন্ন আদি পুরুষ গোবিন্দের অপার্থিব রূপের প্রখর দীপ্তিপূর্ণ অত্যুজ্জ্বল আলো হল নিরাকার ব্রহ্ম। তিনি স্বয়ম্ভু, পূর্ণ ও অসীম এবং তিনি কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন সমৃদ্ধিসহ বিভিন্ন প্রকার অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্রের প্রদর্শন করে থাকেন। সেই শক্তিধর আদি পুরুষ গোবিন্দের ভজন করি।

মায়া হি যস্য জগদণ্ডশতানি সূতে
ত্রৈগুণ্যতদ্বিষয়বেদবিতায়মানা।

সত্ত্বাবলম্বিপরসত্ত্ববিশুদ্ধসত্ত্বং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪১ ॥

সকল অস্তিত্বের সহায়ক রূপে চূড়ান্ত সত্তা হিসাবে যিনি স্বাধীন স্বতন্ত্র নীতি, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি। তাঁর বাহ্য শক্তি তিন প্রকার গুণের দ্বারা সৃষ্ট—সত্ত্ব, রজ ও তম—এবং তিনি জড় জগৎ সম্পর্কে বৈদিক জ্ঞান বিকীর্ণ করেন।

আনন্দচিন্ময়রসাত্মতয়া মনঃসু
যঃ প্রাণিনাং প্রতিফলন্ স্মরতামুপেত্য ।
লীলায়িতেন ভুবনানি জয়ত্যজস্রং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪২ ॥

যাঁর গৌরব তাঁর আমোদ-প্রমোদ দ্বারা জড় জগতের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি। কারণ তিনি অতীন্দ্রিয় আত্মার মনে নিত্য আনন্দময় জ্ঞান-রসের অপ্রাকৃত সত্তা হিসাবে প্রতিফলিত।

গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য
দেবী-মহেশ-হরি-ধামসু তেষু তেষু ।
তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪৩ ॥

যিনি জড় জগৎ দেবীধাম, শিবের আবাস মহেশ ধাম, হরির আবাস হরিধাম—এই তিন রাজ্যের শাসকদের তাদের স্বীয় অংশ বণ্টন করে দিয়েছেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি। এই সব ধামের উপরে অবস্থিত কৃষ্ণের নিজের ধাম গোলোক।

সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্তি দুর্গা ।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪৪ ॥

চিৎ শক্তির ছায়া, প্রকৃতির বহিঃশক্তি মায়া এই জড় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের দেবী দুর্গা হিসাবে সকলের দ্বারা পূজিতা হন। যাঁর ইচ্ছানুসারে দুর্গা আচরণ করেন সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে পূজা করি।

ক্ষীরং যথা দধি বিকারবিশেষযোগাৎ
সঞ্জায়তে ন হি ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্যাদ্
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪৫ ॥

আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। দুধে দই-এর সাঁজা দিলে দুধ দই-এ পরিণত হলেও মূলত উপাদানগত ভিত্তিতে দই দুধ ছাড়া অন্য কিছু নয়, তেমনি পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দও বিশেষ জাগতিক কর্মব্যপদেশে ভগবান শিবের রূপ ধারণ করেন।

দীপার্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য
দীপায়তে বিবৃতহেতুসমানধর্মা।
যস্তাদৃগেব হি চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪৬ ॥

একটি মোমের শিখা থেকে অন্য একটি মোমবাতি প্রজ্বলিত করে যখন ভিন্ন স্থানে রাখা হয়, তখন সেই দীপ শিখাটি কিন্তু পৃথকভাবেই জ্বলতে থাকে এবং এর শিখা মূল প্রদীপ শিখার মতোই শক্তিশালী হয়। ঠিক তদ্রূপ, পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দও নিজেকে বিষ্ণুর বিভিন্ন রূপের মধ্যে বিরাজিত করেছেন। আর সেই রূপ গুলোও তাঁর মতো সমান দীপ্তিশীল, শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ। সেই পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দের ভজনা যেন আমি করতে পারি।

যঃ কারণার্ণবজলে ভবতি স্ম যোগ-
নিদ্রামনন্তজগদণ্ডসরোমকূপঃ।
আধারশক্তিমবলম্ব্য পরাং স্বমূর্তিং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪৭ ॥

যাঁর রোমকূপসমূহে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড বিদ্যমান, যিনি আধার শক্তিস্বরপ নিজমূর্তি অনন্তশেষকে অবলম্বন করে কারণসমুদ্রে যোগনিদ্রা উপভোগ করছেন সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি।

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলোজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪৮ ॥

ব্রহ্মা ও জড় জগতের অন্যান্য দেবতা মহা-বিষ্ণুর রোমকূপ থেকে উদ্ভূত হয়ে মহাবিষ্ণুর এক নিঃশ্বাসের সময়কাল পর্যন্ত জীবিত থাকেন। পূর্ণাঙ্গ স্বরূপ মহাবিষ্ণু যাঁর অংশের অংশ, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি।

ভাস্বান্ যথাশ্মশকলেষু নিজেষু তেজঃ
স্বীয়ং কিয়ৎ প্রকটয়ত্যপি যদ্বদত্র ।
ব্রহ্মা য এষ জগদণ্ডবিধানকর্তা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪৯ ॥

আমি আদিপুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি। সূর্য যেমন রত্ন ভূষিত ঔজ্জ্বল্যে প্রকাশিত হন, তেমনি পরমেশ্বর ভগবানের মূল যে গোবিন্দ, ধার্মিক জীবের মধ্যে তাঁর বিশেষ শক্তি প্রকাশিত করেন। তিনি ব্রহ্মা হয়ে ব্রহ্মাণ্ডের বিষয় পরিচালনা করেন।

যৎপাদপল্লবযুগং বিনিধায় কুম্ভ-
দ্বন্দ্বে প্রণামসময়ে স গণাধিরাজঃ ।
বিঘ্নান্ বিহন্তুমলমস্য জগত্রয়স্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৫০ ॥

গণেশ ত্রিজগতের বিঘ্ন বিনাশ করবার উদ্দেশ্যে তৎকার্যকালে শক্তিলাভের জন্য যাঁর পাদপদ্ম স্বীয় মস্তকের কুম্ভযুগলের উপর নিয়ত ধারণ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

অগ্নির্মহী গগনমম্বু মরুদ্দিশশ্চ
কালস্তথাত্মমনসীতি জগত্রয়াণি ।
যস্মাদ্ভবন্তি বিভবন্তি বিশন্তি যঞ্চ
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৫১ ॥

অগ্নি, ক্ষিতি, আকাশ, জল, বায়ু, দিক, কাল, আত্মা ও মন এই নয়টি পদার্থের দ্বারা ত্রিজগৎ সৃষ্টি হয়েছে। যাঁর থেকে এগুলি উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হয়ে যাঁর মধ্যে অবস্থিতি করে এবং প্রলয়কালে যাঁর মধ্যে প্রবেশ করে, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

যচ্চক্ষুরেষ সবিতা সকলগ্রহাণাং
রাজা সমস্তসুরমূর্তিরশেষতেজাঃ ।

যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সংভৃতকালচক্রো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৫২ ॥

গ্রহসকলের রাজা, অশেষ-তেজো বিশিষ্ট, সুরমূর্তি সবিতা বা সূর্য—জগতের চক্ষুস্বরূপ, তিনি যাঁর আজ্ঞায় কালচক্রারূঢ় হয়ে ভ্রমণ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

ধর্মোঽথ পাপনিচয়ঃ শ্রুতয়স্তপাংসি
ব্রহ্মাদিকীটপতগাবধয়শ্চ জীবাঃ।
যদ্দত্তমাত্রবিভবপ্রকটপ্রভাবা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৫৩ ॥

ধর্ম, অধর্ম অর্থাৎ পাপসকল, শ্রুতিগুলি, তপঃ সমূহ এবং ব্রহ্মা থেকে কীট-পতঙ্গ পর্যন্ত জীবসকল যাঁর প্রদত্তমাত্র বিভবকর্তৃক প্রকটিতপ্রভাব হয়ে বর্তমান আছে, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

যস্ত্বিন্দ্রগোপমথবেন্দ্রমহো স্বকর্ম-
বন্ধানুরূপফলভাজনমাতনোতি।
কর্মাণি নির্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৫৪ ॥

'ইন্দ্রগোপ'-নামক ক্ষুদ্রকীটই হোন, বা দেবতাদিগের ইন্দ্রই হোন, কর্মমার্গি-জীবদের যিনি পক্ষপাতশূন্য হয়ে তাদের স্ব-স্ব কর্মবন্ধানুরূপ ফলভাজন করছেন অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ভক্তিমানদের কর্মসকল সমূলে দহন করছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

যং ক্রোধকামসহজপ্রণয়াদিভীতি-
বাৎসল্যমোহগুরুগৌরবসেব্যভাবৈঃ।
সঞ্চিন্ত্য তস্য সদৃশীং তনুমাপুরেতে
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৫৫ ॥

ক্রোধ, কাম, সখ্যরূপ সহজ প্রণয়, ভয়, বাৎসল্য, মোহ, গুরু গৌরব ও সেব্যভাবদ্বারা যাঁকে চিন্তা করে তদনুশীলনকারিগণ তত্তদ্ভাবনা-যোগ্য রূপ-গুণ-লাভ-তারতম্যের সঙ্গে তুল্য-তনু প্রাপ্ত হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্ ।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ ॥ ৫৬ ॥
স যত্র ক্ষীরাব্ধিঃ স্রবতি সুরভীভ্যশ্চ সুমহান্
নিমেষার্ধাখ্যো বা ব্রজতি ন হি যত্রাপি সময়ঃ ।
ভজে শ্বেতদ্বীপং তমহমিহ গোলোকমিতি যং
বিদন্তস্তে সন্তঃ ক্ষিতিবিরলচারাঃ কতিপয়ে ॥ ৫৭ ॥

যে-স্থলে চিন্ময়ী লক্ষ্মীগণ কান্তারূপা, পরমপুরুষ কৃষ্ণই একমাত্র কান্ত, বৃক্ষমাত্রই কল্পতরু, ভূমিমাত্রই চিন্তামণি অর্থাৎ চিন্ময় মণিবিশেষ, জলমাত্রই অমৃত, কথামাত্রই সঙ্গীত, গমন-মাত্রই নাট্য, বংশী-প্রিয়সখী, জ্যোতি-চিদানন্দময়, পরম চিৎপদার্থমাত্রই আস্বাদ্য বা ভোগ্য, যে-স্থলে কোটি কোটি সুরভী থেকে চিন্ময় মহা-ক্ষীরসমুদ্র নিরন্তর স্রাবিত হচ্ছে, তথা অতীত, ও ভবিষ্যদ্রূপ খণ্ডরহিত চিন্ময়কাল—নিত্য-বর্তমান, সুতরাং নিমেষার্ধ ও ভূতধর্ম প্রাপ্ত হয় না, সেই শ্বেতদ্বীপ রূপ পরম পীঠকে আমি ভজন করি। সেই ধামকে সেই জড়জগতে বিরলচর অতি স্বল্পসংখ্যক সাধুব্যক্তিই গোলোক বলে জানেন।

বিবিধ অতিরিক্ত শ্লোক

নিম্নের শ্লোকটি আবৃত্তি করে স্তুতি শুরু করা যেতে পারে :

আরিরাধয়িষুঃ কৃষ্ণং বাচং জিগদীশামি যং ।
তয়া ব্যাসসমাসিন্যা প্রিয়তং মধুসূদনঃ ॥

কৃষ্ণভজনেচ্ছায় আমি কতিপয় স্তুতি আবৃত্তি করতে উৎসুক। সংক্ষিপ্তই হোক বা বিস্তৃতই হোক শ্রীমধুসূদন যেন এই স্তবে সন্তুষ্ট হন।

নিম্নের এই শ্লোকের দ্বারা স্তুতি সমাপ্ত করা যেতে পারে :

ইতি বিদ্যা তপোযোনিরযোনিবিষ্ণুরীরিতঃ ।
বাগযজ্ঞেনার্চিতো দেবঃ প্রিয়তং মে জনার্দনঃ ॥

হে জনার্দন, অযোনিভূত বিষ্ণু, তুমি সকল জ্ঞান ও তপশ্চর্যার কারণ, তুমি বাগ্-যজ্ঞের দ্বারা পূজিত হচ্ছ। আমার প্রতি তুমি সদয় হও।

বিষ্ণু-স্মরণ

পূর্বাঙ্গ কর্ম সম্পাদনের পর ও গুরু অর্চনার পূর্বে নিম্নের শ্লোকাবলী আবৃত্তি করা যেতে পারে। মঙ্গল-শান্তিও আবৃত্তি করা যেতে পারে।

(ওঁ) যং ব্রহ্মা বেদান্তবিদো বদন্তি
পরে প্রধানং পুরুষং তথান্যে।
বিশ্বোদ্গতেঃ কারণমীশ্বরং বা
তস্মৈ নমো বিঘ্নবিনাশনায় ॥

যিনি সকল বিনাশক, যিনি বেদান্তবিদ, যিনি পরম ব্রহ্ম এবং যাঁকে অপরে প্রধান অথবা সম্পূর্ণরূপে জড় উপাদান বলে বর্ণনা করে তাঁকে প্রণতি জানাই। কেউ বা তাঁকে পরম ব্যক্তিত্ব বা পুরুষ বলে, আবার অন্যেরা তাঁকে পরমেশ্বর ভগবান এবং বিশ্বসৃষ্টির কারণ বলে বর্ণনা করে। [বৃহৎ বিষ্ণু-পুরাণ]

(ওঁ) তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা
পশ্যন্তি সুরয়ো দিবীব চক্ষুরাততম্।
তদ্ বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ
সমিন্ধতে বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্ ॥

সূর্যরশ্মি যেমন জড়দৃষ্টি পর্যন্ত বিস্তৃত, ঠিক তেমনি জ্ঞানী ও বিজ্ঞ ভক্তরা নিয়ত ভগবান বিষ্ণুর পরম আবাস অবলোকন করেন। কারণ উচ্চ প্রশংসিত ও অধ্যাত্ম চেতনায় জাগ্রত ব্রাহ্মণেরা চিন্ময় জগৎ দর্শনে সক্ষম। তাঁরা ভগবান বিষ্ণুর পরম আবাস প্রকাশিত করতেও সক্ষম। [ঋক্ বেদ]

(ওঁ) মাধবো মাধবো বাচি মাধবো মাধবো হৃদি।
স্মরন্তি সাধবাঃ সর্বে সর্ব-কার্যেষু মাধবম্ ॥

ভগবান মাধব কারও বাক্যে, ভগবান মাধব কারও হৃদয়ে অবস্থিত। সকল সাধুপুরুষেরা লক্ষ্মীপতি ভগবান মাধবকে তাঁদের সকল কার্যে স্মরণ করেন। [নৃসিংহ পুরাণ]

(ওঁ) কৃষ্ণো বৈ সচ্চিদানন্দঘনঃ
কৃষ্ণ আদিপুরুষঃ কৃষ্ণঃ পুরুষোত্তমঃ।

কৃষ্ণো হ্যা উ কর্মাদিমূলং
কৃষ্ণঃ স হ সর্বৈঃ কার্যঃ ॥
কৃষ্ণঃ কাশং কৃদাদিশোমুখপ্রভুঃপূজ্যঃ ।
কৃষ্ণোঽনাদিস্তস্মিন্নজাণ্ডান্তর্বাহ্যে
যন্মঙ্গলং তল্লভতে কৃতী ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হলেন সচ্চিদানন্দঘন, তিনি হলেন আদি পরমপুরুষ। তিনি সকল কার্যের মূল এবং সকলের মধ্যে এক ও অদ্বিতীয় ভগবান। তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের নিয়ামক, শ্রেষ্ঠ দেব-দেবীদের পূজার্হ প্রভু। কৃষ্ণ হলেন অনাদি। এই বিশ্বের অভ্যন্তরে বা বাইরে যা কিছু মঙ্গলময় বলে দৃষ্ট হয় সে সবই ভক্ত শুধু শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেই পেয়ে থাকেন। [কৃষ্ণ উপনিষদ, ঋক্ বেদ]

(ওঁ) হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

মঙ্গল-শান্তি

ডানহাতে কুঙ্কুম বা হলুদ মেশানো চাল অথবা গন্ধপুষ্প ধারণ করে নিম্ন লিখিত মন্ত্রটি পাঠ করে শেষে সেই চাল কাঁধের উপর দিয়ে নিক্ষেপ করুন।

(ওঁ) স্বস্তি নো গোবিন্দঃ স্বস্তি নোঽচ্যুতানন্তৌ
স্বস্তি নো বাসুদেবো বিষ্ণুর্দধাতু ।
স্বস্তি নো নারায়ণো নরো বৈ
স্বস্তি নঃ পদ্মনাভঃ পুরুষোত্তমো দধাতু ।
স্বস্তি নো বিশ্বক্সেনো বিশ্বেশ্বরঃ
স্বস্তি নো হৃষীকেশো হরির্দধাতু ॥
স্বস্তি নো বৈনতেয়ো হরিঃ
স্বস্তি নোঽঞ্জনাসুতো হনুর্ভাগবতো দধাতু ।
স্বস্তি স্বস্তি সুমঙ্গলৈকেশো মহান্
শ্রীকৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দঘনঃ সর্বেশ্বরেশ্বরো দধাতু ॥

হে গোবিন্দ অচ্যুত অনন্ত, হে বাসুদেব বিষ্ণু, আমাদের মঙ্গল বিধান করুন। হে নর-নারায়ণ, পদ্মনাভ, পুরুষোত্তম, বিশ্বক্সেন, বিশ্বেশ্বর, হৃষীকেশ, শ্রীহরি আমাদের মঙ্গল বিধান করুন। হে বিনতানন্দন

গরুড়দেব, অঞ্জনাসুত ভাগবত হনুমান আমাদের মঙ্গল করুন। হে সুমঙ্গলের একমাত্র বিধাতা, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, সকল দেবদেবীর পরম ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, আমাদের সার্বিক মঙ্গল বিধান করুন। [কৃষ্ণ উপনিষদ, ঋক্‌বেদ]

করোতু স্বস্তি মে কৃষ্ণঃ সর্বলোকেশ্বরঃ।
কার্ষ্ণাদয়শ্চ কুর্বন্তু স্বস্তি মে লোকপাবনাঃ॥

হে সমস্ত দেব দেবীদের প্রভু, সমস্ত বিশ্বের তত্ত্বাবধায়ক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমার মঙ্গল করুন। হে লোকপাবন কৃষ্ণভক্তগণ আমার মঙ্গল করুন। [সম্মোহন তন্ত্র]

কৃষ্ণো মমৈব সর্বত্র স্বস্তি কুর্যাৎ শ্রিয়া সমম্।
তথৈব চ সদা কার্ষ্ণিঃ সর্ববিঘ্নবিনাশনঃ॥

প্রিয়তমা শ্রীরাধাসহ শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা সকল বিষয়ে আমার মঙ্গল করুন। সেইভাবে সর্ববিঘ্নবিনাশে সক্ষম কৃষ্ণভক্তগণও সর্বদা আমার মঙ্গল করুন। [বিষ্ণুযামল-সংহিতা]

(ওঁ) হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

শ্রীগুরুদেবের আরাধনার জন্য অতিরিক্ত শ্লোকাবলী

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎ কৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্॥

যাঁর কৃপায় মূকব্যক্তিও বাগ্মী হয়, পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘন করতে সক্ষম হয়, সেই দীনতারণ মুক্তিদাতা শ্রীগুরুদেবকে আমি বন্দনা করি।

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রম্ অত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজম্ উরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥

অহো! যাঁর অপার করুণায় এই জগতে সকল ভগবৎ নাম মন্ত্রের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম ও মন্ত্র, শ্রীশচীনন্দন, শ্রীস্বরূপ, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, বিশাল মথুরামণ্ডল বা মথুরাপুরী, গোষ্ঠবাটিকা বৃন্দাবন, রাধাকুণ্ড, গোবর্ধন গিরি এবং শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবার আশা প্রাপ্ত হয়েছি সেই শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে প্রণতি জানাই।

হে গুরো জ্ঞানদ দীনবন্ধো
স্বানন্দদাতঃ করুণৈকসিন্ধো।
বৃন্দাবনাসীন হিতাবতার
প্রসীদ রাধাপ্রণয়-প্রচার ॥

হে শ্রীগুরুদেব, হে দিব্যজ্ঞান প্রদাতা, হে দীনবন্ধু, হে স্বীয় আনন্দ প্রদানকারী করুণাসিন্ধু, শ্রীবৃন্দাবনে বাস করেও আপনি আমার মনে পতিত জনদের উদ্ধার করবার জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন। আপনি কৃষ্ণপ্রেমময়ী শ্রীরাধারাণীর ভক্তিভাব প্রচার করছেন। আপনি কৃপা করে আমার প্রতি প্রসন্ন হোন।

আত্মসমর্পণ

অংশো ভগবতোঽস্ম্যহং সদা দাসোঽস্মি সর্বথা।
তৎ কৃপাপেক্ষকো নিত্যং তৎপ্রেষ্ঠসাৎ করোমি স্বম্ ॥

পরমেশ্বর ভগবানের আমি এক ক্ষুদ্র অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমি সর্বদা ও সর্বতোভাবে তাঁর নিত্য সেবক। যেহেতু আমি নিয়ত তাঁর করুণা ভিক্ষা করছি, তাই তাঁর প্রিয় পরিচারক আমার শ্রীগুরুদেবের চরণে আত্মনিবেদন করছি।

গুরুপ্রণাম

রাধাসন্মুখসংশক্তিং সখীসঙ্গনিবাসিনীম্।
ত্বমহং সততং বন্দে মাধবাশ্রয়বিগ্রহাম্ ॥

যিনি শ্রীরাধারাণীর সান্নিধ্যে আসক্ত, যিনি সখীসংসর্গে অবস্থিত, সেই শ্রীকৃষ্ণভক্তির আশ্রয় বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবকে আমি সর্বদা বন্দনা করি।

বৈষ্ণব প্রণাম

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

বাঞ্ছাকল্পতরু, কৃপাসিন্ধু পতিত পাবন বৈষ্ণববৃন্দকে বারংবার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আরাধনার জন্য সংযোজিত শ্লোকাবলী

নবদ্বীপ-ধ্যান

স্বর্ধুন্যাশ্চারুতীরে স্ফুরিতম্ অতিবৃহৎকূর্মপৃষ্ঠাভগাত্রং।
রম্যারামাবৃতং সন্মণিকনকমহাসদ্ম-সঙ্ঘৈঃ পরীতং॥
নিত্যং প্রত্যালয়োদ্যৎ-প্রণয়ভর-লসৎ-কৃষ্ণসংকীর্তনাঢ্যং।
শ্রীবৃন্দাটব্যভিন্নং ত্রিজগদনুপমং শ্রীনবদ্বীপমীড়ে॥

যে নবদ্বীপ ধাম শ্রীবৃন্দাবনের সঙ্গে সম্পূর্ণ অভিন্ন এবং ত্রিজগ সমন্বিত জড় জগৎ থেকে ভিন্ন সেই পবিত্র ধাম নবদ্বীপের প্রশস্তি করি। অনুপম কুঞ্জবন ও উদ্যানে আচ্ছাদিত গঙ্গার মনোরম কূলে এই ধাম অবস্থিত। বিশাল কূর্ম পৃষ্ঠের মতো প্রতিভাত হচ্ছে এই ধাম। এখানে অনেক রত্নখচিত প্রাসাদোপম স্বর্ণগৃহ অবস্থিত। মহানন্দ প্রেমের প্রফুল্লতায় এখানে সর্বদা কৃষ্ণ-সংকীর্তন সংঘটিত হয়ে থাকে।

গৌরাঙ্গ-স্তুতি

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্ঠদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥

হে প্রণতজনপালক! হে পরম পুরুষোত্তম মহাপ্রভো! নিরন্তর ধ্যানযোগ্য, অন্যাভিলাষ-কর্ম-জ্ঞান যোগাদি-কেবলভক্তিবিরোধি মার্গসমূহের পরাভবকারী, কৃষ্ণপ্রেম-প্রদ, শ্রীগৌড়-ক্ষেত্র

ব্রজমণ্ডলাদি-তীর্থ-সকলের আশ্রয়স্বরূপ অথবা ব্রহ্ম সম্প্রদায়াচার্য শ্রীমদানন্দতীর্থানুগত শ্রৌতপথাশ্রিত শ্রীরূপানুগ মহাভাগবতগণের আশ্রয়স্বরূপ, শিবাবতার শ্রীমদদ্বৈতপ্রভু এবং ব্রহ্মাবতার শ্রীমন্নামাচার্য হরিদাস প্রভু কর্তৃক স্তুত, সকল আশ্রিতগণের আশ্রয়যোগ্য, স্বভৃত্য কুষ্ঠবিপ্রের আর্তিনাশন, সার্বভৌম-প্রতাপরুদ্রাদির মুমুক্ষা-বুভুক্ষারূপ ভবসাগরের পরপার লাভের পোতস্বরূপ তোমার শ্রীপাদপদ্ম আমি বন্দনা করি। (শ্রীমদ্ভাগবত ১১/৫/৩৩)

ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্মিষ্ঠ আর্যবচসা যদগাদরণ্যম্ ।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥

হে মহাপুরুষ, আমি তোমার চরণকমল ভজনা করি। তোমার এক পলক দৃষ্টিপাত মহান দেবদেবীদের নিকট আকাঙ্ক্ষিত এবং তুমি ত্যাগের অযোগ্য কঠোর অনুরাগ, হে মহাপ্রভু, তুমি ভাগ্যদেবী লক্ষ্মীপ্রিয়াকে পরিত্যাগ করেছ। ব্রাহ্মণের অভিশাপকে কার্যকরী করতে তুমি বনগমন করেছ। এইরূপে যে অসহায় জীবেরা অলীক শক্তি মায়াকে অনুসরণ করছে, তাদের প্রতি তোমার মহান করুণা দেখাতে তোমার নিজস্ব ভক্তিপূর্ণ সেবা দান করতে তুমি তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেছ। অতএব তোমার চরণকমলে আমি আমার বিনীত প্রণাম অর্পণ করছি।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১/৫/৩৪)

পঞ্চতত্ত্ব-প্রণাম

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্ ।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্ ॥

ভক্তরূপ, ভক্তস্বরূপ, ভক্তাবতার, ভক্ত এবং ভক্তশক্তি—এই পঞ্চ-তত্ত্বাত্মক শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণকমলে প্রণতি নিবেদন করি। (*চৈতন্যচরিতামৃত* আদি ১/১৪)

গৌরাঙ্গ প্রণাম

আনন্দলীলাময়বিগ্রহায় হেমাভদিব্যচ্ছবিসুন্দরায় ।
তস্মৈ মহাপ্রেমরসপ্রদায় চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে ॥

পরমেশ্বর ভগবানের সর্বোচ্চ পরিণত প্রেমদাতা, আনন্দময় বিনোদনের প্রতিমূর্তি এবং স্বর্ণদ্যুতি সদৃশ সুন্দর শ্রীচৈতন্যচন্দ্র, তোমাকে প্রণাম।

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥

হে মহাবদান্য, কৃষ্ণপ্রেম প্রদাতা, কৃষ্ণস্বরূপ, কৃষ্ণচৈতন্য নামক গৌরাঙ্গ রূপধারী প্রভু, তোমাকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। (*চৈঃ চঃ মধ্য* ১৯/৫৩)

নিত্যানন্দ প্রণাম

নিত্যানন্দমহং নৌমি সর্বানন্দকরং পরম্।
হরিনামপ্রদং দেবম্ অবধূতশিরোমণিম্ ॥

সকলকে পরম আনন্দদানকারী, পবিত্র নাম প্রদানকারী এবং সকল অবধূতের শিরোমণি পরম প্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে প্রণাম করি। (নিত্যানন্দ প্রভুর আরও প্রার্থনা *চৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলা* ১/৭-১১ শ্লোকে দেখুন।)

গৌর-নিতাই প্রণাম

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ ॥

গৌড়দেশের পূর্ব দিগন্তে একই সময়ে অতি বিস্ময়করভাবে সূর্য ও চন্দ্রের মতো যাঁরা উদিত হয়েছেন, সেই পরম মঙ্গল প্রদাতা এবং অজ্ঞান ও অন্ধকার নাশক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে আমি বন্দনা করি।

(*চৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলা* ১-২)

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের আরাধনার সংযোজিত শ্লোকাবলী

রাধাকৃষ্ণ ধ্যান

সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্।
দ্বিভুজং জ্ঞানমুদ্রাঢ্যয়ং বনমালিনম্ ঈশ্বরম্ ॥

দিব্যালঙ্কারণোপেতং সখীভিঃ পরিবেষ্টিতম্ ।
চিদানন্দঘনং কৃষ্ণং রাধালিঙ্গিতবিগ্রহম্ ॥
শ্রীকৃষ্ণং শ্রীঘনশ্যামং পূর্ণানন্দকলেবরম্ ।
দ্বিভুজং সর্বদেবেশং রাধালিঙ্গিতবিগ্রহম্ ॥

আমি সেই পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করি, যাঁর অক্ষিযুগল পদ্মের ন্যায়, নবজলধরের ন্যায় গাত্রবর্ণ, বিদ্যুতের মতো দ্যুতিময় পোশাক, যাঁর দুটি বাহু এবং যাঁর গলে সুন্দর বনমালা আর যিনি হাতের জ্ঞান মুদ্রা প্রদর্শনের দ্বারা দিব্য জ্ঞান নির্দেশ করছেন। সেই শ্রীকৃষ্ণ সমুজ্জ্বল ভূষণের দ্বারা সজ্জিত এবং শ্রীমতী রাধারাণীর সকল গোপ সখীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আছেন। শ্রীমতী রাধারাণী কর্তৃক আলিঙ্গিত হয়ে তাঁর আনন্দঘন রূপ প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিভুজাকৃতি ঘন নীলাভ কৃষ্ণবর্ণের শ্রীকৃষ্ণ সকল দেবদেবীদের ঈশ্বর এবং অপার্থিব আনন্দে পরিপূর্ণ তাঁর কলেবর।

কৃষ্ণ-প্রণাম

ওঁ নমো বিশ্বরূপায় বিশ্বস্থিত্যন্তহেতবে ।
বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

ভগবান ব্রহ্মা মহামুনি ও দিব্যাত্মা পুরুষদের সঙ্গে কথা বলে ভগবান কৃষ্ণ-সকাশে নিম্নরূপ প্রার্থনা করছেন—যিনি ধেনুগণের আনন্দদাতা, যাঁর বহিরঙ্গা আকৃতিই হল ব্রহ্মাণ্ডের রূপ, যিনি জড় জগতের পালন ও ধ্বংসের কারণ এবং যিনি ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করছি।

নমো বিজ্ঞানরূপায় পরমানন্দরূপিণে ।
কৃষ্ণায় গোপীনাথায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

যিনি ধেনুকুলের আনন্দদাতা, গোপীদের যিনি প্রভু এবং যিনি অসীম জ্ঞান ও চরম আনন্দের প্রতিমূর্তি, সেই ভগবান কৃষ্ণকে প্রণতি জানাই।

নমঃ কমলনেত্রায় নমঃ কমলমালিনে ।
নমঃ কমলনাভায় কমলাপতয়ে নমঃ ॥

পদ্মাক্ষ, সুগন্ধ পদ্মমাল্য শোভিত, পদ্মনাভ, গোপীনাথ, পদ্মসদৃশ সুন্দর শ্রীকৃষ্ণকে আমার প্রণাম নিবেদন করি।

বর্হাপীড়াভিরামায় রামায়াকুণ্ঠ-মেধসে।
রমা-মানসহংসায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

শিখিপাখা শিরে ধৃত, নয়নাভিরাম ভগবান গোবিন্দকে প্রণাম জানাই। তাঁর পূর্ণ প্রকাশ হলেন ভগবান রামচন্দ্র। তাঁর বুদ্ধি নিত্য ও সদা পবিত্র এবং তিনি লক্ষ্মীদেবীর মনসায়রে সন্তরণকারী হংস।

কংসবংশবিনাশায় কেশিচাণূরঘাতিনে।
বৃষভধ্বজবন্দ্যায় পার্থসারথয়ে নমঃ ॥

রাজা কংসের নেতৃত্বাধীন দৈত্যকুল নিধনকারী শ্রীকৃষ্ণ, যিনি কেশি দৈত্য ও মল্লযোদ্ধা চাণূর নিধনকারী যিনি বৃষভধ্বজ শিব দ্বারা বন্দিত এবং যিনি পৃথার পুত্র অর্জুনের সারথি, তাঁকে আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করি।

বেণুবাদনশীলায় গোপালায়াহি-মর্দিনে।
কালিন্দীকূললোলায় লোলকুণ্ডল-বল্লবে ॥

কালীয়দমনকারী বংশীধারী গোপাল, যাঁর কানে দুলছে কুণ্ডল, যমুনার কূলে কূলে ঘুরে বেড়াতে যিনি অনুরাগী, সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমি সভক্তি প্রণাম নিবেদন করছি।

বল্লভীবন্দনাম্ভোজমালিনে নৃত্যশালিনে।
নমঃ প্রণতপালায় শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥

গোপীদের অধরপদ্মের চুম্বনমাল্য পরিহিত, নৃত্যবিশারদ ও সমর্পিত আত্মার রক্ষক শ্রীকৃষ্ণকে আমি বারংবার প্রণাম জ্ঞাপন করছি।

নমঃ পাপপ্রণাশায় গোবর্ধনধরায় চ।
পূতনাজীবিতান্তায় তৃণাবর্তাসুহারিণে ॥

পতিতপাবন, গোবর্ধনধারী, পূতনা রাক্ষসী ও তৃণাবর্ত রাক্ষস নিধনকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।

নিষ্কলায় বিমোহায় শুদ্ধায়াশুদ্ধবৈরিণে।
অদ্বিতীয়ায় মহতে শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥

যিনি মায়ার অতীত এবং মায়ার উৎস, যিনি পরম পবিত্র অসুরারি এবং যিনি অদ্বৈত, সেই মহান ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আমি বারংবার আমার বিনীত প্রণতি নিবেদন করছি।

প্রসীদ পরমানন্দ প্রসীদ পরমেশ্বর।
আধিব্যাধিভুজাঙ্গেন দষ্টং মামুদ্ধার প্রভো॥

হে পরম প্রভু, হে প্রবল আনন্দের আধার, আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমি দেহ-মনের যন্ত্রণারূপ বিষধর সাপের দ্বারা দংশিত হয়েছি। অতএব, হে প্রভু, অনুগ্রহ করে আমাকে মুক্তি দাও।

শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকান্ত গোপীজনমনোহর।
সংসার-সাগরে মগ্নং মাম্ উদ্ধর জগদ্গুরো॥

হে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, হে রুক্মিণীরঞ্জন, হে গোপীদের চিত্তচোর, দয়া করে আমাকে উত্তোলন কর। হে জগৎ গুরু আমি জন্মমৃত্যুর সাগরে নিমজ্জিত হয়ে আছি।

কেশব ক্লেশহরণ নারায়ণ জনার্দন।
গোবিন্দ পরমানন্দ মাং সমুদ্ধর মাধব॥

হে ভগবান কেশব, হে ত্রিতাপ ক্লেশহারক, হে জনার্দন নারায়ণ, হে গোবিন্দ, হে পরমানন্দ মাধব, আমাকে তুমি উদ্ধার কর।

রাধা-প্রণাম

রাধারাসেশ্বরী রম্যা রামা চ পরমাত্মনঃ।
রাসোদ্ভবা কৃষ্ণকান্তা কৃষ্ণবক্ষঃস্থলস্থিতা॥

সুন্দরী শ্রীমতী রাধারাণী রাসনৃত্যের রাণী ও উৎস। তিনি সকলের হৃদয়স্থিত পরমাত্মারূপ কৃষ্ণের হ্লাদিনী। তিনি কৃষ্ণবল্লভা ও সর্বদা কৃষ্ণবক্ষে অবস্থিতা।

কৃষ্ণপ্রাণাধিদেবী চ মহাবিষ্ণোঃ প্রসূরপি।
সর্বাদ্যা বিষ্ণুমায়া চ সত্যা নিত্যা সনাতনী॥

তিনি কৃষ্ণের প্রাণাধিদেবী সকল পুরুষের আদি ভগবান বিষ্ণুর শক্তি, সত্যের প্রতিরূপ—তিনি সনাতনী ও চিরযৌবনা।

ব্রহ্মস্বরূপা পরমা নির্লিপ্তা নির্গুণা পরা।
বৃন্দা বৃন্দাবনে ত্বং চ বিরজাতটবাসিনী॥

ব্রহ্মস্বরূপা তিনি, সেইজন্য তিনি অপার্থিব ও জড় গুণের অতীত। তিনি দৈব শক্তি ও নির্লিপ্ত। হে রাধে, বৃন্দাবনে তুমি গোপীদের নেত্রী, তুমি বিরজা নদীতটবাসিনী।

গোলোকবাসিনী গোপী গোপীশা গোপমাতৃকা।
সানন্দা পরমানন্দা নন্দনন্দনকামিনী॥

তিনি গোলোক বৃন্দাবনবাসিনী গোপী। তিনি গোপীদের রাণী ও গোপবালকদের গোপমাতা। তিনি সানন্দা এবং নিয়তই পরমানন্দা। তিনি নন্দ-নন্দনের হৃদয়ে আকুল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলেন।

বৃষভানুসুতা শান্তা কান্তা পূর্ণতমা তথা।
কাম্যা কলাবতীকন্যা তীর্থপূতা সতী শুভা॥

মহারাজ বৃষভানু সুতা রাধা। তিনি খুব শান্ত ও সুন্দর। তিনি সম্পূর্ণ পরিতুষ্ট ও পরিপূর্ণ, খুবই মনোরমা ও কলাবতীর কন্যা। তিনি তীর্থ পবিত্রকারিণী, সর্বসুলক্ষণা ও চরিত্রবতী।

সংসারসাগরে ঘোরে ভীতং মাং শরণাগতম্।
সর্বেভ্যোঽপি বিনির্মুক্তং কুরু রাধে সুরেশ্বরি॥

হে রাধে, আমি জন্ম-মৃত্যুর ভয়ঙ্কর সমুদ্রে নিপতিত এবং ভীতত্রস্ত। আমি তোমার শরণাগত। হে সুরেশ্বরি, কৃপা করে সর্বভীতি থেকে আমাকে মুক্ত কর।

ত্বৎপাদপদ্মযুগলে পাদপদ্মালয়ার্চিতে।
দেহি মহ্যং পরাং ভক্তিং কৃষ্ণেন পরিসেবিতে॥

হে রাধিকে, কৃপা করে আমাকে তোমার শ্রীপাদপদ্মের অপার্থিব ভক্তিপূর্ণ সেবা করতে দাও। ব্রহ্মা এবং লক্ষ্মী, এমন কি ভগবান শ্রীকৃষ্ণও তোমার পদসেবা করেন।

তপ্তকাঞ্চন-গৌরাঙ্গি রাধে বৃন্দাবনেশ্বরি।
বৃষভানুসুতে দেবি প্রণমামি হরিপ্রিয়ে॥

হে তপ্তকাঞ্চনবর্ণা গৌরাঙ্গি রাধারাণি, তোমাকে প্রণতি জানাই। হে দেবি, তুমি বৃন্দাবনেশ্বরি, বৃষভানুনন্দিনী এবং ভগবান কৃষ্ণের অতি প্রিয়।

মহাভাবস্বরূপা ত্বং কৃষ্ণপ্রিয়াবরীয়সি ।
প্রেমভক্তিপ্রদে দেবি রাধিকে ত্বং নমাম্যহম্ ॥

হে শ্রীমতী রাধারাণি, তুমি মহাভাবের উন্নত রূপ। সেইজন্য তুমি কৃষ্ণের অতীব প্রিয়। হে দেবি, তুমি একাই পরম পুরুষের প্রতি বিশুদ্ধ প্রেম প্রদানে সক্ষম। অতএব আমি তোমাকে আমার বিনীত শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

প্রদক্ষিণ-মন্ত্রাবলী

(বিগ্রহ প্রদক্ষিণকালে এই প্রার্থনাগুলি আবৃত্তি করা যেতে পারে।)

যানি কানি চ পাপানি জন্মান্তরকৃতানি চ ।
তানি তানি বিনশ্যন্তু প্রদক্ষিণঃ পদে পদে ॥

পূর্বজন্মে ও এই জন্মে আমি যে সমস্ত পাপ সঞ্চয় করেছি আমার প্রদক্ষিণের প্রতি পদে সে সকলের যেন বিনাশ হয়।

প্রদক্ষিণত্রয়ং দেব প্রযত্নেন ময়া কৃতম্ ।
তেন পাপানি সর্বাণি বিনাশায় নমোঽস্তুতে ॥

হে প্রভু, তোমাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করছি, তুমি আমার সকল পাপ বিনষ্ট কর। তোমার প্রতি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।

দামোদর পদ্মনাভ শঙ্খচক্রগদাধর ।
প্রদক্ষিণং করিষ্যামি কল্পসাধনং হে প্রভো ॥

হে দামোদর, হে পদ্মনাভ, হে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারি, এইভাবে তোমাকে পরিক্রমা করতে অনুমতি দাও।

চরণামৃতগ্রহণ-মন্ত্রাবলী :

(চরণামৃত গ্রহণকালে এই মন্ত্রগুলি আবৃত্তি করা যেতে পারে।)

অকালমৃত্যুহরণং সর্বব্যাধি-বিনাশনম্।
বিষ্ণোঃ পাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারয়াম্যহম্॥

সর্ব ব্যাধিহর, অকালমৃত্যু বিদূরণকারী-শ্রীবিষ্ণুর পাদোদক পান করে শিরে ধারণ করছি।

অশেষক্লেশ-নিঃশেষকারণং শুদ্ধভক্তিদম্।
গুরোঃ পাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারয়াম্যহম্॥

বিশুদ্ধ ভক্তিপূর্ণ সেবা দানকারী এবং অশেষ ক্লেশ নিঃশেষকারী শ্রীগুরুদেবের পাদোদক পান করে সেই জল মস্তকে স্থাপন করি।

অশেষক্লেশ নিঃশেষকারণং শুদ্ধভক্তিদম্।
গৌরপাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারয়াম্যহম্॥

শুদ্ধ ভক্তিপূর্ণ সেবাদানকারী ও অশেষ ক্লেশ বিদূরণকারী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পাদোদক পান করে সেই জল আমার শিরে ধারণ করি।

উপচার মন্ত্রাবলী

- **শঙ্খ :**

(শঙ্খ স্থাপন কালে বা স্নান ও আরতির সময় শঙ্খ বাজানোর পূর্বে শঙ্খের জপ করা যেতে পারে।)

ত্বং পুরা সাগরোৎপন্নো বিষ্ণুনা বিধৃতঃ করে।
মানিতঃ সর্বদেবৈশ্চ পাঞ্চজন্য নমোঽস্তুতে॥

হে পাঞ্চজন্য, তোমাকে সভক্তি প্রণাম। পুরা কালে তুমি সাগর থেকে উৎপন্ন হয়ে ভগবান বিষ্ণুকরে বিধৃত হয়েছ। এইজন্য তুমি সকল দেবতুল্য ব্যক্তিদের দ্বারা সম্মানিত হয়েছ।

তব নাদেন জীমূতা বিত্রস্যন্তি সুরাসুরাঃ।
শশাংকযুতদীপ্তাভ পাঞ্চজন্য নমোঽস্তুতে॥

হে পাঞ্চজন্য, তোমাকে সশ্রদ্ধ প্রণাম। তুমি চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল বর্ণ সমৃদ্ধ। তোমার গম্ভীর নাদে পর্বত, মেঘ, দেবদেবীগণ ও অসুরকুল সকলেই ভয়ে কম্পিত।

গর্ভা দৈত্যারিনারীনাং বিলয়ন্তে সহস্রধা ।
তব নাদেন পাতালে পাঞ্চজন্য নমোঽস্তুতে ॥

হে পাঞ্চজন্য, তোমাকে প্রণাম। তোমার বজ্র নির্ঘোষে পাতালে অসুর ঘরনীদের গর্ভ বিদীর্ণ হয়ে সহস্র টুকরো হয়।

● ঘণ্টা :

(ঘণ্টা স্থাপনের সময় পূজার পূর্বে বা আরতির সময়
ঘণ্টা ব্যবহারের পূর্বে ঘণ্টার জপ করা যেতে পারে।)

সর্ববাদ্যময়ি ঘণ্টে দেবদেবস্য বল্লভে ।
ত্বাং বিনা নৈব সর্বেষাং শুভং ভবতি শোভনে ॥

হে অভিরাম ঘণ্টে, হে দেবতাদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ঘণ্টে, তুমি সকল সঙ্গীতের সুমিষ্ট স্বরের মূর্তরূপ। তোমা বিনা কারও কোনও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান হতে পারে না।

উপচার প্রদানের পূর্বে, উপযুক্ত উপচার মন্ত্র জপ করা যেতে পারে।

● আসন :

সর্বান্তর্যামিনে দেব সর্ববীজামীদং ততঃ ।
আত্মস্থায় পরং শুদ্ধমাসনং কল্পয়াম্যহম্ ॥

হে সকল জীবের পরমাত্মা, হে মুক্ত ভগবান, আমি তোমাকে এই সকল কিছুর বীজ, পবিত্রতম আসন প্রদান করছি।

● স্বাগত :

কৃতার্থোঽনুগৃহীতোঽস্মি সফলং জীবিতং তু মে ।
যদ্ আগতোঽসি দেবেষ চিদানন্দময়াব্যয় ॥

হে মহাপ্রভু, হে চিদানন্দ, তুমি এসেছ বলে আমার জীবন সার্থক হয়েছে।

• পাদ্য :

যদ্ভক্তিলেযসম্পর্কাৎ পরমানন্দসংপ্লবঃ।
তস্য তে পরমেশান পাদ্যং শুদ্ধায় কল্পতে॥

হে পরমেশ্বর, আমার বিশুদ্ধির জন্য আমি এই পাদ্য রচনা করেছি। তোমার প্রতি এক বিন্দু ভক্তির জন্য পরমানন্দের বন্যা বয়ে যায়।

• অর্ঘ্য :

তাপত্রয়হরং দিব্যং পরমানন্দলক্ষণম্।
তাপত্রয়াবিমোক্ষায় তবার্ঘ্যং কল্পয়াম্যহম্॥

ত্রিতাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমি তোমাকে অর্ঘ্য নিবেদন করছি। দিব্য আনন্দে পূর্ণ এই অর্ঘ্যের ত্রিতাপ জ্বালা দূরীকরণের ক্ষমতা আছে।

• আচমন :

বেদানামপি বেদায় দেবানাং দেবতাত্মনে।
আচমনং কাল্পয়ামীশ শুদ্ধানাং শুদ্ধিহেতবে॥

বেদের মূর্ত স্বরূপ ও দেবতাদের প্রভুর প্রতি আমি শুদ্ধকে বিশুদ্ধ করতে এই আচমন প্রদান করছি।

• মধুপর্ক :

সর্বকল্মষহানায় পরিপূর্ণং স্বধাত্মকং।
মধুপর্কমিমং দেব কল্পয়ামি প্রসীদ মে॥

সমস্ত অপবিত্রতা ধ্বংস করতে হে পরমেশ্বর, আমি এই যথাযথ ও পবিত্র মধুপর্ক প্রদান করছি। আমার প্রতি করুণা কর।

• পুনরাচমন :

উচ্ছিষ্টোঽপ্যশুচির্বাপি যস্য স্মরণমাত্রাতঃ।
শুদ্ধিমাপ্নোতি তস্মৈ তে পুনরাচমনীয়কম্॥

যাঁর স্মরণে একজন অপবিত্র ব্যক্তিও পবিত্রতা লাভ করে সেই তোমাকে আমি এই আচমন সমর্পণ করছি।

● **স্নান :**

পরমানন্দবোধাব্ধিনিমগ্ননিজমূর্তয়ে ।
সংগোপঙ্গমিদং স্নানং কল্পয়াম্যহমিশ তে ॥

সকল অর্ঘ্যের সমষ্টি যে স্নানার্ঘ্য হে পরমানন্দ ও বোধের সাগর—স্বমূর্তিতে নিমগ্ন, তোমাকে আমি এই স্নানার্ঘ্য নিবেদন করছি।

● **বস্ত্র :**

ময়া চিত্রপতাচ্ছান্ন-নিজ গুহ্যোরু-তেজসে ।
নিরাভরণবিজ্ঞান বাসংতে কল্পয়াম্যহম্ ॥

হে পরমেশ্বর, যাঁর, দীপ্তিশীল নিম্নাঙ্গ আকর্ষণীয় মোহ বস্ত্রে আবৃত, তাঁকে আমি এই স্পষ্ট জ্ঞান বস্ত্র অর্পণ করছি।

● **উত্তরীয়-বস্ত্র (ঊর্ধ্বাঙ্গবাস)**

যমাশ্রিত্য মহামায়া জগৎ সম্মোহনী সদা ।
তস্মৈ তে পরমেশায় কল্পয়ামুত্তরীয়কম্ ॥

যাঁর আশ্রয়ে থেকে মহামায়া জীবকে সম্মোহন করেন, সেই পরম পুরুষকে আমি এই উত্তরীয় বস্ত্র অর্পণ করছি।

● **উপবীত :**

যস্য শাক্তিত্রয়েণেদং সম্প্রোতমখিলং জগৎ ।
যজ্ঞে সূত্রায় তস্মৈ তে যজ্ঞসূত্রং প্রকল্পয়েৎ ॥

এই যজ্ঞ-সূত্র আমি তোমাকে অর্পণ করছি। যে সূত্র ও তোমার ত্রি-শক্তি দ্বারা তুমি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত ও নিয়ন্ত্রিত করছ সেই সূত্র তুমিই।

● আভরণ :

স্বভাবসুন্দরাঙ্গায় সত্যাসত্যাশ্রয়ায় তে।
ভূষণানি বিচিত্রানি কল্পয়াম্যমরার্চিত ॥

নিত্য ও অনিত্যের শরণ ও স্বভাবতই সুন্দর দেহধারী হে পরমেশ্বর ভগবান, আমি এই অনিন্দ্য সুন্দর অলঙ্কারগুলি তোমাকে প্রদান করছি।

● গন্ধ :

পরমানন্দ-সৌরাভ্য-পরিপূর্ণ-দিগন্তরম্।
গৃহাণ পরমং গন্ধং কৃপয়া পরমেশ্বর ॥

কৃপা করে চতুর্দিক আমোদিত এই পরমানন্দময় সুগন্ধ গ্রহণ কর।

● তুলসী ও পুষ্প :

তুরীয়গুণসম্পন্নং নানাগুণমনোহরম্।
আনন্দসৌরভং পুষ্পং গৃহ্যতামিদমুত্তমম্ ॥

নানা গুণে মনোহর তুরীয়গুণ সম্পন্ন এই পুষ্প (তুলসী পত্র) অনুগ্রহ করে গ্রহণ কর।

● ধূপ :

বনস্পতি রসোৎপন্নো গন্ধাঢ্যো গন্ধ উত্তমঃ।
আঘ্রেয়ঃ সর্বদেবানাং ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥

বনস্পতি রসোৎপন্ন সর্বোৎকৃষ্ট সকল দেব-দেবীকে সুমিষ্ট গন্ধ দানকারী যে সৌরভ, হে প্রভু কৃপা করে তা গ্রহণ কর।

● দীপ :

স্বপ্রকাশো মহাতেজঃ সর্বতস্তিমিরাপহঃ।
সবাহ্যাভ্যন্তরজ্যোতির্দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥

হে পরম প্রভু, কৃপা করে, এই মহা তেজোদীপ্ত, বাহ্যাভ্যন্তরে প্রদীপ্ত সর্ব তিমিরাপহারক প্রদীপ গ্রহণ কর।

- **নৈবেদ্য :**

(ওঁ) নিবেদয়ামি ভবতে গৃহাণেদং হবির্হরে।
হে শ্রীহরি, কৃপাপূর্বক এই অর্ঘ্য গ্রহণ কর।

- **তাম্বূল :**

তাম্বূলং চ সকর্পূরং সুগন্ধদ্রব্যমাশ্রিতম্।
নাগবল্লীদলৈর্যুক্তং গৃহাণ বরদো ভব ॥

নাগবল্লীর পাতায় গন্ধদ্রব্য জড়ানো কর্পূর মিশ্রিত তাম্বূল গ্রহণ কর। কৃপা করে তোমার আশীর্বাদ প্রদান কর।

- **পঞ্চামৃত-মন্ত্রাবলী**

(বিগ্রহকে স্নানের পূর্বে বিগ্রহের মূল-মন্ত্র জপের পর পঞ্চামৃতের নির্দিষ্ট আধারের উপর আটবার এই গদ্য মন্ত্র জপ করা যেতে পারে।)

- **দুগ্ধ :**

ওঁ পয়ঃ পৃথিব্যাম্ পয় ওষধীষু পয়ো দিব্যান্তরিক্ষে।
পয়োধা পয়স্বতী প্রদিশঃ সন্তু মহ্যম্ ॥

- **দধি :**

ওঁ দধিক্রাব্ণো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ।
সুরভিনো মুখাকরৎ প্রাণ আয়ুংষি তারিষৎ ॥

- **ঘি :**

ওঁ ঘৃতং ঘৃতপাবানাঃ পিবত বসম্ বসা
পাবানঃ পিবতান্তরীক্ষস্য হবিরাসি স্বাহা।
দিশঃ প্রদিশা আদীশো বিদিশা উদ্দিশো দিগ্‌ভ্যঃ স্বাহা ॥

- **মধু :**

ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবো মাধ্বীর
নঃ সন্ত্ব ওষধীর্মধুনক্তমুতোষসো মধুমৎ
পার্থিবং রজঃ মধু দ্যয়ুরস্তু নঃ পিতা মধুমান্ নো
বনস্পতির্মধুমানস্তু সূর্যো মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ
ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু ॥

- **চিনির জল :**

ওঁ অপাং রসমুদ্বয়সং সূর্যে শান্তং সমাহিতম্
অপাং রসস্য যো রসস্তং বো গৃহ্নাম্যুত্তমূপায়াম
গৃহীতোঽষীন্দ্রায় যুষ্টং গৃহ্নাম্যেষ তে যোনিরিন্দ্রায় তে যুষ্টতমম্ ॥

বিশেষ বিগ্রহ অর্চনের জন্য সংযোজিত শ্লোকাবলী

সীতা-রাম প্রণাম

রামায় রাম-ভদ্রায় রামচন্দ্রায় মেধষে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়ৈ পতয়ে নমঃ ॥

সীতাদেবীর পতি, রঘুবংশের নাথ, সর্ব মঙ্গলময় ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে আমি শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করছি।

ললিতা-বিশাখা প্রণাম

শ্রীকৃষ্ণং রাধিকাঞ্চৈব ললিতাঞ্চ বিশাখিকাং।
সখীভিরন্বিতাং নিত্যং প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ ॥

ললিতা ও বিশাখাদি সখীবৃন্দদ্বারা নিত্য পরিবৃত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকে বারে বারে প্রণতি নিবেদন করি।

নিত্যানন্দ ধ্যান

মায়াতীতে ব্যাপি বৈকুণ্ঠলোকে
পূর্ণৈশ্বর্যে শ্রীচতুর্ব্যূহমধ্যে।
রূপং যস্যোদ্ভাতি সঙ্কর্ষণাখ্যং তং
শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে॥

মায়াতীত বৈকুণ্ঠলোকে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহের মধ্যে সঙ্কর্ষণ নামে যাঁর একটি স্বরূপ প্রকাশ পাচ্ছে এবং যিনি ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ও সর্বব্যাপক, আমি সেই নিত্যানন্দরূপী বলরামের শ্রীচরণকমলে প্রপত্তি করি।

(চৈতন্যচরিতামৃত আদি ১/৮)

কৃষ্ণ-বলরাম ধ্যান

দদর্শ কৃষ্ণং রামং চ ব্রজে গোদোহনং গতৌ।
পীতনিলাম্বরধরৌ শরদম্বুরুহেক্ষনৌ॥
কিশোরৌ শ্যামলশ্বেতৌ শ্রীনিকেতৌ বৃহদ্ভুজৌ।
সুমুখৌ সুন্দরবরৌ বালদ্বিরদবিক্রমৌ॥
ধ্বজবজ্রাংকুশাম্ভোজৈশ্চিহ্নিতৈরাঙ্ঘ্রিভির্ব্রজম্।
শোভয়ন্তৌ মহাত্মানৌ সানুক্রোশস্মিতেক্ষণৌ॥
উদাররুচির ক্রীড়ৌ স্রগ্বিণৌ বনমালিনৌ।
পুণ্যগন্ধানুলিপ্তাঙ্গৌ স্নাতৌ বিরজবাসসৌ॥
প্রধানপুরুষাবাদ্যৌ জগদ্ধেতূ জগৎপতী।
অবতীর্ণৌ জগত্যর্থে স্বাংশেন বলকেশবৌ॥
দিশো বিতিমিরা রাজন্ কুর্বাণৌ প্রভয়া স্বয়া।
যথা মারকতঃ শৈলো রৌপ্যশ্চ কনকাচিতৌ॥

অনন্তর তিনি ব্রজমধ্যে গো দোহনস্থানে শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবকে দেখতে পেলেন। তাঁদের পরিধানে পীত ও নীলবর্ণ বসন, নয়নযুগল শরৎকালীন প্রস্ফুটিত কমলতুল্য, দুজনেই কৈশোর দশায় উপনীত, বর্ণ শ্যাম ও শ্বেত, উভয়েই পরম সৌন্দর্যের আধার, ভুজদ্বয় আজানুলম্বিত, বদন প্রসন্ন, অতএব দুজনেই পরম সুন্দর এবং করি-শিশুর ন্যায় বলশালী, ধ্বজ-বজ্র-অঙ্কুশ ও পদ্মচিহ্নিত চরণ দ্বারা ব্রজের শোভা সম্পাদন করছেন। উভয়েই মহাত্মা এবং তাঁদের দৃষ্টিপাত সদয় ও মন্দহাস্য

বিভূষিত। উভয়েই উদার ও মনোরম বিলাসশীল, রত্নমালায় ও বনমালায় বিভূষিত, পবিত্র চন্দনাদি অনুলেপন-দ্রব্যে লিপ্তদেহ, স্নাত, নির্মল-বসনধারী, জগতের প্রধান পুরুষ, আদিভূত, কারণস্বরূপ এবং অধিপতি, কেবলমাত্র পৃথিবীর ভারহরণের জন্য মূর্তিভেদে শ্রীবলদেব ও শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। হে রাজন, তখন তাঁরা দুজনে নিজ কান্তিদ্বারা দিঙ্মণ্ডলের অন্ধকার দূরীভূত করে সুবর্ণ পরিব্যাপ্ত মরকত পর্বত ও রৌপ্য-পর্বতের ন্যায় প্রকাশ পাচ্ছিলেন।

[ভাগবত ১০/৩৮/২৮-৩৩]

উগ্র-নৃসিংহ ধ্যান

মীমাংসমানস্য সমুত্থিতোঽগ্রতো
নৃসিংহরূপস্তদলং ভয়ানকম্।
প্রতপ্তচামীকরচণ্ডলোচনং
স্ফুরৎসটাকেশরজৃম্ভিতাননম্॥
করালদংষ্ট্রং করবালচঞ্চল-
ক্ষুরান্তজিহ্বং ভ্রূকুটীমুখোল্বণম্।
স্তব্ধোর্ধ্বকর্ণং গিরিকন্দরাদ্ভুত-
ব্যাত্তাস্যনাসং হনুভেদভীষণম্॥
দিবিস্পৃশৎকায়মদীর্ঘপীবর-
গ্রীবোরুবক্ষঃস্থলমল্পমধ্যমম্।
চন্দ্রাংশুগৌরৈশ্ছুরিতং তনূরুহৈ-
র্বিষ্বগ্ ভুজানীকশতং নখায়ুধম্॥
দুরাসদং সর্বনিজেতরায়ুধ-
প্রবেকবিদ্রাবিতদৈত্যদানবম্।

হিরণ্যকশিপু তার সম্মুখে দণ্ডায়মান নরসিংহরূপী ভগবানকে দর্শন করে বিচার করার চেষ্টা করে তিনি কে। তাঁর সেই রূপ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর—তাঁর ক্রোধান্বিত নয়নযুগল উত্তপ্ত স্বর্ণের মতো উজ্জ্বল, তাঁর দীপ্ত কেশর তাঁর ভয়ঙ্কর মুখমণ্ডলকে বিস্তার করেছে, তাঁর দন্তপঙ্ক্তি ভয়ানক, এবং তাঁর ক্ষুরধার জিহ্বা খড়্গের মতো চঞ্চল। তাঁর উন্নত কর্ণযুগল নিশ্চল, এবং তাঁর মুখ ও নাসিকাবিবর পর্বতের গুহার মতো। তাঁর হনুদেশ ভয়ঙ্করভাবে বিদীর্ণ এবং তাঁর শরীর আকাশকে স্পর্শ করছে। তাঁর গ্রীবা হ্রস্ব এবং স্থূল, বক্ষ বিশাল, উদর

কৃশ, এবং তাঁর দেহের লোম চন্দ্রকিরণের মতো শুভ্র। তাঁর অসংখ্য বাহু সেনাবাহিনীর মতো চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়ে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম এবং অন্যান্য স্বাভাবিক অস্ত্রের দ্বারা দৈত্য, দানব এবং নাস্তিকদের বিনাশ করে।

(ভাগবত ৭/৮/১৯-২২)

নৃসিংহ-স্তুতি

শ্রীনৃসিংহ, জয় নৃসিংহ, জয় জয় নৃসিংহ।
প্রহ্লাদেশ জয় পদ্মামুখপদ্মভৃঙ্গ ॥

শ্রীনৃসিংহদেবের জয়! প্রহ্লাদ মহারাজের ঈশ্বর শ্রীনৃসিংহদেবের জয়, ভ্রমরের মতো তিনি নিরন্তর তাঁর বক্ষবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবীর মুখপদ্ম দর্শন করেন।

(চৈঃ চঃ মধ্য ৮/৫)

বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি।
যস্যাস্তে হৃদয়ে সম্বিত তং নৃসিংহমহম্ ভজে ॥

বিদ্যার দেবী সরস্বতী ভগবান নৃসিংহদেবের নিয়ত সহায়। তিনি সর্বদাই লক্ষ্মীদেবীকে বক্ষে ধারণ করে আছেন। ভগবান নৃসিংহদেব নিজের জ্ঞানেই পূর্ণ। ভগবান নৃসিংহদেবকে আমি বারবার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।

[শ্রীমদ্ভাগবত ১০/৮৭/১ শ্লোকে শ্রীধর স্বামীর মন্তব্য থেকে]

প্রহ্লাদহৃদয়াহ্লাদং ভক্তাবিদ্যাবিদারণম্।
শরদিন্দুরুচিং বন্দে পারীন্দ্রবদনাং হরিম্ ॥

প্রহ্লাদ মহারাজের হৃদয়ে নিয়ত জ্ঞানদানকারী এবং ভক্তের অজ্ঞানতা নিধনকারী ভগবান নৃসিংহদেবকে আমার সভক্তি প্রণতি জানাই। তাঁর করুণা চন্দ্রকরের মতো বিচ্ছুরিত এবং তাঁর বদনমণ্ডল হল সিংহের মতো। আমি বারম্বার তাঁর শ্রীচরণে প্রণাম নিবেদন করছি।

[শ্রীমদ্ভাগবত ১/১/১ শ্লোকে শ্রীধর স্বামীর মন্তব্য থেকে]

জগন্নাথাষ্টক

কদাচিৎ কালিন্দীতট-বিপিনসঙ্গীততরলো
মুদাভীরীনারী-বদনকমলাস্বাদ-মধুপঃ।

রমাশম্ভুব্রহ্মামরপতি গণেশার্চিতপদো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ১ ॥

মাঝে মাঝে প্রভু জগন্নাথদেব যমুনাপুলিনে কুঞ্জবনে মহানন্দে তাঁর উচ্চৈঃস্বরে বংশীবাদন করেন। তিনি ভ্রমরের ন্যায় ব্রজের গোপকন্যাদের মনোরম মুখমণ্ডল সুধা আস্বাদন করেন। লক্ষ্মী, শিব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও গণেশের ন্যায় মহান ব্যক্তিরা তাঁর চরণকমল ভজনা করেন। সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়নপথগামী হোন।

ভুজে সব্যে বেণুং শিরসি শিখিপুচ্ছং কটিতটে
দুকূলং নেত্রান্তে সহচরকটাক্ষং বিদধতে।
সদা শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনবসতিলীলাপরিচয়ো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ২ ॥

প্রভু জগন্নাথ বাম হস্তে বেণু, শিরে শিখিপুচ্ছ, কটিতে পীত রেশমী বসন ধারণ করেছেন। তিনি তাঁর প্রিয় ভক্তদের প্রতি অপাঙ্গ দৃষ্টিক্ষেপ করছেন এবং শ্রীধাম বৃন্দাবনে তাঁর আনন্দঘন লীলার মধ্যে তিনি নিয়তই প্রকাশ করছেন। সেই শ্রীজগন্নাথস্বামী আমার নয়ন পথের পথিক হোন।

মহাম্ভোধেস্তীরে কনকরুচিরে নীলশিখরে
বসন্ প্রসাদান্তঃ সহজ-বলভদ্রেণ বলিনা।
সুভদ্রামধ্যস্থঃ সকল-সুর-সেবাবসরদো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৩ ॥

মহাসমুদ্রতটে উজ্জ্বল স্বর্ণবর্ণের নীলাচল পর্বতশীর্ষে বিশাল প্রাসাদে বলশালী ভ্রাতা বলভদ্র ও মধ্যে ভগিনী সুভদ্রাকে নিয়ে ভগবান জগন্নাথদেব সকল দেবতুল্য আত্মার প্রতি ভক্তিপূর্ণ সেবার সুযোগ দান করছেন। সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়নপথের পথিক হোন।

কৃপাপারাবারঃ সজল-জলদ-শ্রেণীরুচিরো
রমাবাণীরামঃ স্ফুরদমলপঙ্কেরুহমুখঃ।
সুরেন্দ্রৈরারাধ্যঃ শ্রুতিগণশিখা-গীতচরিতো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৪ ॥

প্রভু জগন্নাথ হলেন করুণার সিন্ধু এবং কৃষ্ণাভ জলধর শ্রেণীর ন্যায় সুন্দর। তিনি লক্ষ্মী ও সরস্বতীর আনন্দ ভাণ্ডার। তাঁর বদন মণ্ডল

নিষ্কলঙ্ক প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো। তিনি শ্রেষ্ঠ দেবদেবী ও মুনিদের দ্বারা পূজিত হন। উপনিষদগুলি তাঁর গৌরব কীর্তন করে। সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়নপথগামী হোন।

রথারূঢ়ো গচ্ছন্ পথি মিলিত-ভূদেব-পটলৈঃ
স্তুতি-প্রাদুর্ভাবং প্রতিপদমুপাকর্ণ্য সদয়ঃ।
দয়াসিন্ধুর্বন্ধু সকল-জগতাং সিন্ধুসদয়ো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৫ ॥

রথে আরোহণ করে গমন করতে থাকলে পথিমধ্যে ব্রাহ্মণগণ যাঁর স্তব করতে থাকেন এবং সেই স্তব শ্রবণ করে যিনি পদে পদে প্রসন্ন হন, যিনি দয়ার সাগর, যিনি নিখিল জগতের বন্ধু এবং যিনি সমুদ্রের প্রতি সদয় হয়ে তদুপকূলে বিরাজ করছেন, সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক হোন।

পরব্রহ্মাপীড়ঃ কুবলয়দলোৎফুল্লনয়নে
নিবাসী নীলাদ্রৌ নিহিত চরণোঽনন্তশিরসি।
রসানন্দো রাধাসরসবপুরালিঙ্গন সুখো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৬ ॥

তিনি ভগবান ব্রহ্মার শিরোভূষণ এবং প্রস্ফুটিত পদ্মদল সদৃশ তাঁর চক্ষুযুগল। তিনি নীলাচল পর্বতে বাস করেন এবং তাঁর দুটি চরণপদ্ম অনন্তদেবের মস্তকে স্থাপিত। প্রেমের মাধুর্যের দ্বারা জগন্নাথদেব অভিভূত এবং তিনি শীতল পল্বল সদৃশ শ্রীমতী রাধারাণীর দেহালিঙ্গনে আনন্দিত হন। আমার নয়নপথগামী হোন, হে প্রভু জগন্নাথদেব!

ন বৈ যাচে রাজ্যং ন চ কনকমাণিক্যবিভবম্
ন যাচেঽহং রম্যাং সকলজন-কাম্যাং বরবধূম্।
সদা কালে কালে প্রমথ-পতিনা গীতচরিতো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৭ ॥

আমি রাজ্যধন সোনা-দানা সম্পদের জন্য প্রার্থনা করিনা। সকলের ন্যায় পরমোৎকৃষ্ট ও সুন্দরী স্ত্রী চাই না। আমি শুধু সেই প্রভু জগন্নাথদেবকে চাই, যাঁর গৌরবগাঁথা প্রতিনিয়ত ভগবান শিবের দ্বারা কীর্তিত, তিনি যেন অবিরাম আমার নয়নপথের পথিক হন।

হর ত্বং সংসারং দ্রুততরম্ অসারং সুরপতে
হরত্বং পাপানাং বিততিম্ অপরাং যাদবপতে।
অহো দীনেঽনাথে নিহিতচরণো নিশ্চিতমিদং
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৮ ॥

হে দেব-দেবীগণের ভগবান, কৃপা করে সত্বর অসার সংসার থেকে উদ্ধার কর। যে যদুপতি, আমার দুঃসহ পাপভার বিমোচন কর। অহো, এটা নিশ্চিত যে, ভগবান জগন্নাথ ছাড়া যাদের অন্য গতি নেই, প্রভু জগন্নাথের চরণকমল তারাই প্রাপ্ত হয়। সেই প্রভু জগন্নাথদেব যেন আমার নয়ন-পথের পথিক হন।

পবিত্র ধাম স্তুতি

নবদ্বীপ-প্রণাম

নবীন-শ্রীভক্তিং নব-কনক-গৌরাকৃতি-পতিং
নবারণ্যশ্রেণীনবসূরসরিদ্বাত-বলিতং।
নবীন-শ্রীরাধাহরি-রসময়োৎকীর্তন-বিধিম্
নবদ্বীপং বন্দে নবকরুণামাদ্যন্ নবরুচিং ॥

বনাচ্ছাদিত গঙ্গার নির্মল বায়ুদ্বারা সদাশীতল দিব্যভূমি, যেখানে সোনার বরণ ভগবানের নজীরবিহীন কৃপা দ্বারা নবজাত ভক্তি প্রকাশিত এবং যা রাধা-কৃষ্ণের মহাভাবে চিরবিশুদ্ধ উচ্চ মহিমা প্রদান করছে, সেই শ্রীনবদ্বীপধামকে প্রপত্তি করি।

বৃন্দাবন প্রণাম

আনন্দবৃন্দপরিতুন্দিলম্ ইন্দিরায়া
আনন্দবৃন্দ-পরিনন্দিত-নন্দপুত্রং।
গোবিন্দসুন্দরবধূপরিনন্দিতং তদ্
বৃন্দাবনং মধুরমূর্তম্ অহম্ নমামি ॥

নন্দমহারাজ সুতের চির বর্ধমান, উদ্বেল আনন্দস্থল শ্রীমতী রাধারাণীর বাসস্থান শ্রীবৃন্দাবনের ভজনা করি। ব্রজের সুন্দরী তরুণীবৃন্দ ভগবান গোবিন্দের আনন্দ অধিক বৃদ্ধি করে শ্রীবৃন্দাবনকে সকল মাধুর্যের প্রতিমূর্তি করে গড়ে তুলেছে।

যমুনা-স্নান-মন্ত্র

কলিন্দ-তনয়ে দেবি! পরমানন্দ-বর্ধিনি ।
স্নামি তে সলিলে সর্বান্ অপরাধান্ বিমোচয় ॥

ভগবানের আনন্দবর্ধক হে কলিন্দ তনয়ে, তোমার সলিলে আমি অবগাহন করি, কৃপা করে তুমি আমাকে সর্বাপরাধ থেকে মুক্ত কর।

গঙ্গা-প্রণাম

সদ্যঃ পাতক-সংহন্ত্রী সদ্যো দুঃখবিনাশিনী ।
সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ ॥

হে গঙ্গে, অবিলম্বে সকল পাপ ও দুঃখ বিনাশ কর। তুমি পরম আশ্রয়, তাই চরম সুখ ও পরম গতি দান কর।

অপরাধ-ক্ষমার জন্য অনুরোধপূর্ণ শ্লোকাবলী

(অপরাধ-শোধনমন্ত্র)

মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং জনার্দন ।
যৎ পূজিতং ময়া দেব পরিপূরণং তদস্তু মে ॥

হে প্রভু জনার্দন, যা কিছু সামান্য পূজা বা ভজনা আমি করেছি, তা ভক্তিহীন, মন্ত্রহীন, ক্রিয়াহীন। কৃপা করে তুমি তা পূর্ণ কর।

যদ্-দত্তং ভক্তি-মন্ত্রেন পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্ ।
আবেদিতং নিবেদ্যন্ তু তদ্ গৃহাণানুকম্পয়া ॥

ভক্তি সঙ্গে যা কিছুই অর্পিত হোক—পত্র, পুষ্প, জল, ফল, আহার্য—কৃপা করে তোমার অহৈতুকী করুণাবশে সে সব গ্রহণ কর।

বিধিহীনং মন্ত্রহীনং যৎ কিঞ্চিদ্ উপপাদিতম্ ।
ক্রিয়ামন্ত্রবিহীনং বা তৎ সর্বং ক্ষন্তুমর্হসি ॥

মন্ত্রের সঠিক জপ ব্যতীত বা সঠিক পদ্ধতি ছাড়া যা কিছু ঘটেছে, অনুগ্রহ করে সে সব ক্ষমা কর।

অজ্ঞানাদ্ অথবা জ্ঞানাদ্ অশুভং যন্ময়া কৃতম্ ।
ক্ষন্তুমর্হসি তৎ সর্বং দাস্যেনৈব গৃহাণ মাম্ ॥
স্থিতিঃ সেবা গতির্যাত্রা স্মৃতিশ্চিন্তা স্তুতির্বচঃ ।
ভূয়াৎ সর্বাত্মনা বিষ্ণো মদীয়ং ত্বয়ি চেষ্টিতম্ ॥

অজ্ঞানতা বশত যা কিছু অশুভ কাজ আমি করেছি, কৃপা করে সেসবকিছু ক্ষমা কর এবং আমাকে তোমার তুচ্ছ ভৃত্য করে নাও। আমার স্থিতি সেবা, গতি, যাত্রা, আমার স্মৃতি, চিন্তা, আমার কথা তোমার স্তুতি হোক। হে বিষ্ণু, সকল কায়-মন ও আত্মার দ্বারা কৃত আমার সকল কাজ তোমার সেবায় নিয়োজিত হোক।

অপরাধসহস্রাণি ক্রিয়ন্তেঽহর্নিশং ময়া ।
দাসোঽহম্ ইতি মাং মত্বা ক্ষমস্ব মধুসূদন ॥

অহর্নিশি আমি হাজার হাজার অপরাধ করছি। কিন্তু হে মধুসূদন, আমাকে তোমার ভৃত্য ভেবে সেসব ক্ষমা কর।

প্রতিজ্ঞা তব গোবিন্দ ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ।
ইতি সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য প্রাণান্ সন্ধারয়াম্যহম্ ॥

হে গোবিন্দ, তোমার ভক্তের কখনও বিনাশ নেই—এই তোমার পণ। এ কথাটাই বার বার স্মরণ করে আমি আমার প্রাণবায়ু ধারণে সক্ষম হয়েছি।

সংযোজন ৪

অতিরিক্ত টীকাসমূহ

পূজা-কর্ম—এক নজরে প্রভাতী পূজা-পদ্ধতি

লক্ষ্য করুন অধিকাংশ পদ্ধতিগুলিই তিনটি বিশেষ মানে সম্পাদিত হয়। প্রধানত প্রত্যেক পদ্ধতির খুঁটিনাটি পদ্ধতির মানের সরলতা বা জটিলতা নির্ণয় করে।

	বিস্তৃত	সাধারণ	সরলীকৃত
পূর্বাঙ্গ কর্ম			
পাত্র সংগ্রহ	×	×	×
গুরু-প্রণাম	×	×	×
আচমন	×	×	×
সামান্য-অর্ঘ্য	×	×	•
দ্বার-পূজা	×	•	•
প্রবেশ	×	×	×
ভূত-নিবারণ	×	•	•
আসন-স্থাপন	×	×	×
পাত্র-স্থাপন	×	×	×
গুরু-পঙ্ক্তি-নমস্কার	×	×	×
কর-শুদ্ধি	×	×	×
পুষ্প-শুদ্ধি	×	×	×
দ্রব্য-শুদ্ধি	×	×	×
আত্ম-শুদ্ধি	×	×	×
দিগ্‌-বন্ধন	×	•	•
বহ্নি-প্রকার	×	•	•
ভূত-শুদ্ধি	×	×	×
প্রাথমিক পূজা			
ঘণ্টা-পূজা	×	×	•
শঙ্খ-পূজা	×	×	•
গুরু-পূজা	×	×	×
ধ্যান	×	×	×
মানস-পূজা	×	×	×
বাহ্য-পূজা	×	×	×

	বিস্তৃত	সাধারণ	সরলীকৃত
গৌরাঙ্গ-পূজা	×	×	×
ধ্যান	×	×	×
মানস-পূজা	×	×	×
বাহ্য-পূজা	×	×	×
প্রধান পূজা			
ধ্যান	×	×	×
মানস-পূজা	×	×	×
কর-ন্যাস	×	•	•
অঙ্গ-ন্যাস	×	•	•
বিশেষ-অর্ঘ্য-স্থাপন	×	•	•
পীঠ-পূজা	×	•	•
১. আসন			
পাদুকা	×	×	×
আসন	×	×	×
২. স্বাগত			
স্বাগত	×	×	×
৩. পাদ্য			
পাদ্য	×	×	×
অঙ্গ-বস্ত্র	×	•	•
গন্ধ	×	•	•
পুষ্পাঞ্জলি	×	•	•
৪. অর্ঘ্য			
অর্ঘ্য	×	×	×
৫. আচমন			
আচমন	×	×	×
৬. মধুপর্ক			
মধুপর্ক	×	×	×
৭. পুনর-আচমন			
পুনর-আচমন	×	×	×
৮. স্নান			
পাদুকা	×	×	×
অঙ্গ-বস্ত্র (গামছা)	×	×	×

	বিস্তৃত	সাধারণ	সরলীকৃত
দন্ত-দাবন			
দন্ত-কাষ্ঠ	×	×	•
জিহ্বা-উল্লেখন	×	×	•
গণ্ডূষ	×	•	•
হস্ত-মুখ-প্রক্ষালন	×	•	•
পাদ্য	×	•	•
অঙ্গ-বস্ত্র (অঙ্গ-শোষণ-বস্ত্র)	×	×	•
আচমন	×	×	•
দর্প	×	•	•
তাম্বূল	×	•	•
মূর্তি-শুদ্ধি			
উজ্জ্বল ধাতু বিগ্রহ	×	×	×
তৈল	×	×	×
স্নান			
জল স্নান	×	×	×
পঞ্চামৃত-স্নান	×	•	•
অঙ্গ-বস্ত্র	×	×	×
তিলক (উর্ধ্ব-পুণ্ড্র)	×	×	×
আসন	×	•	•
আচমন	×	×	
৯. বস্ত্র			
বস্ত্র-উত্তরীয়	×	×	×
আচমন	×	•	•
উপবীত	×	×	×
আচমন	×	×	•
তিলক	×	×	×
কুঙ্কুম	×	×	×
১০. আভরণ			
আভরণানি	×	×	×
১১. গন্ধ			
গন্ধ	×	×	×
১২. পুষ্প			

	বিস্তৃত	সাধারণ	সরলীকৃত
পুষ্পানি	×	×	×
তুলসী-পত্রানি	×	×	×
পুষ্প-মালা	×	×	×
তুলসী-মালা	(×)	(×)	•
১৩. ধূপ			
ধূপ	×	×	×
১৪. দীপ			
দীপ	×	×	×
১৫. নৈবেদ্য			
পরিশেষণ	×	•	•
পাদ্য	×	×	×
আচমন	×	×	×
নৈবেদ্য	×	×	×
পানি	×	×	×
পাদ্য	×	×	•
গণ্ডূষ	×	•	•
হস্ত-মুখ-প্রক্ষালন	×	•	•
অঙ্গ-বস্ত্র	×	•	•
গন্ধ	×	•	•
আচমন	×	×	×
মাল্য	×	×	•
মুখ-বাস	×	×	•
তাম্বূল	×	×	•
সর্ব-দ্রব্য	×	×	×
১৬. প্রণাম—সমাপ্তি ক্রিয়া			
মন্ত্র-জপ	×	×	×
উপাঙ্গ-পূজা	×	×	•
আভরণ-পূজা	×	×	•
হোম	×	•	•
মহাপ্রসাদ	×	×	•
অতিরিক্ত পূজা পাত্র	×	×	•
স্তুতি	×	×	×

	বিস্তৃত	সাধারণ	সরলীকৃত
কর্ম-সমর্পণ	×	×	•
বিলোম-অর্ঘ্য	×	•	•
আত্ম-সমর্পণ	×	×	•
অপরাধ-শোধন	×	×	×
দর্শন আরতি	×	×	×
প্রদক্ষিণ	×	×	×
প্রণাম	×	×	×
নির্মাল্য গ্রহণ	×	×	×

নির্ধারিত বিগ্রহের ভোগ নিবেদনের নির্দেশিত খাদ্য-তালিকা

নৈবেদ্য	সাধারণ মান	বিস্তৃত মান	সরল মান
বাল্য ভোগ	রসগোল্লা	রসগোল্লা/রসমালাই	সন্দেশ
	সন্দেশ	সন্দেশ	ক্ষীর
	বরফি	বরফি	
	ক্ষীর	ক্ষীর	
পূজা ভোগ	২-৪ ফলাদি	২-৪ ফলাদি	১ ফল
		সন্দেশ	
প্রাতর্ভোগ	দধি বা ঘোল	ফলের স্যালাড্	ফলের স্যালাড্
	ছোটি-মটর	ভাজী	ছোটি মটর
	১ সবৃজী	১ সব্জী/উপমা	১ সব্জী/হালুয়া
	ইড্লী/দোকলা	চাটনি	
	চাটনি	পুরী/পরোটা	
		হালুয়া	
		সন্দেশ	
		দুগ্ধ/রস	
রাজভোগ	ফলের রস	ফলের রস	ফলের রস
	২ সব্জি	৬ সব্জি	১ সব্জি
	ভাত ও ডাল	ভাত ও ডাল	ভাত ও ডাল
	পকৌড়া/সমোসা	ভাজী	চাপাটি
	চাপাটি	চাপাটি	পরমান্ন

নৈবেদ্য	সাধারণ	বিস্তৃত মান	সরল মান
	মিষ্টি-চাটনি	টম্যাটো-চাটনি	
	মিষ্টি	পরমান্ন	
		সন্দেশ	
		দই ভাত	
বৈকালিক ভোগ	লস্যি	লস্যি	লস্যি
	ফলের রস	ফলের রস	
	ফলের স্যালাড্	ফলের স্যালাড্	ফলের স্যালাড্
	বাদাম ভাজা	ভাজা বাদাম	
	মিষ্টি পকৌড়া	মিষ্টি পকৌড়া	
		কেক	
		মধু	
		ফেটানো নবনী (মথিত)	
সান্ধ্য ভোগ	১ সব্জী	২ সব্জী	ফলের রস
	ভাত	ভাত	ফলাদি
	চাটনি	পুরী	মিঠাই
	পুরী	চাটনি	
		গোলাপ-জাম	
রাত্রি-কালীন ভোগ	দুগ্ধ	দুগ্ধ	দুগ্ধ
	হালুয়া	৪ সব্জী	
	১ সব্জী	কেক	
	পুরী	নিমকী	
		পুরী	
ঘন-দুগ্ধ	ক্ষীর	ক্ষীর	
		তাম্বূল	

শ্রীবিগ্রহ সেবার নিত্য সময় সারণী

কার্য	সময় (গ্রীষ্মকালে)	সময় (শীতকালে)
বিগ্রহ জাগরণ	ভোর ৩.৪৫	ভোর ৪.০০
বাল্যভোগ	ভোর ৪.০৫	ভোর ৪.২০
মঙ্গল-আরতি	ভোর ৪.১৫	ভোর ৪.৩০

কার্য	সময় (গ্রীষ্মকালে)	সময় (শীতকালে)
দর্শন-আরতি	সকাল ৭.১৫	সকাল ৭.১৫
প্রাতর্ভোগ	সকাল ৮.১০	সকাল ৮.১০
ধূপ-আরতি	সকাল ৮.৩০	সকাল ৮.৩০
রাজ ভোগ	সকাল ১১.৩০	সকাল ১১.৩০
রাজ ভোগ আরতি	দুপুর ১২.০০	দুপুর ১২.০০
বৈকালিক জাগরণ	বিকাল ৩.৪৫	বিকাল ৩.৪৫
বৈকালিক ভোগ	বিকাল ৪.১০	বিকাল ৪.১০
ধূপ-আরতি	বিকাল ৪.৩০	বিকাল ৪.৩০
সান্ধ্যভোগ	সন্ধ্যা ৬.১০	সন্ধ্যা ৫.৪০
সন্ধ্যা আরতি	সন্ধ্যা ৬.৩০	সন্ধ্যা ৬.০০
রাত্রিকালীন ভোগ	রাত ৮.১০	রাত ৭.৫৫
শয়ন আরতি	রাত ৮.৩০	রাত ৮.১৫
বিগ্রহের বিশ্রাম	রাত ৯.৩০	রাত ৯.১৫

গুজরাটী রাজভোগের বিশদ খাদ্য-তালিকা

দকোর নামে গুজরাটে একটি শহর আছে। ভগবান কৃষ্ণ সেখানে রণছোড়জী রূপে পূজিত হন। মথুরার যুদ্ধক্ষেত্রে নৃপ জরাসন্ধের সৈন্যদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময়ে তিনি রণক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেন। সেইজন্য তাঁকে রণছোড় নাম দেওয়া হয়। প্রতিদিন দ্বিপ্রহরে ভগবান রণছোড়জীকে ছাপান্ন রকম পদ দিয়ে ভোগ দেওয়া হয়। তন্মধ্যে ছত্রিশটি পদ হল বিভিন্ন প্রকার নিরামিষ পদ।

থালা ও টেবিল স্থাপন

একই আকৃতি ও রঙ বিশিষ্ট ছোট চিতানো টেবিলগুলির প্রতিটির মাঝখানে ফাঁক রেখে স্থাপন করতে হবে। টেবিলের ওপরে ফাঁক ফাঁক করে থালা সাজাতে হবে। থালাগুলোর চারধারে চালবাটা দিয়ে আলপনা দিলে ভাল হয়। প্রতি থালার বামদিকে একপাত্র জল এবং হাত মোছার জন্য প্রতি থালার ডান দিকে একটি করে গামছা রাখতে হবে।

থালা পরিবেশন

থালার বাম দিক থেকে দক্ষিণাভিমুখে নিম্নলিখিত মতে পরিবেশন শুরু করতে হবে।

১। লবণ;

২। লম্বা করে কাটা লেবুর ফালি;

৩। গরম চাটনি (লতাগুল্ম—যেমন-টাটকা ধনে, আদা, লঙ্কা, লবণ ও অন্যান্য মশলা);

৪। আম অধানু (আমের তেল আচার);

৫। লিম্বো না অধানু (লেবুর আচার);

৬। মেথি আম অধানু (মেথি দিয়ে আমের আচার);

৭। মর্চা না অধানু (লেবুর রসে জারিত লম্বা লঙ্কা);

৮। রছুম্বার (টম্যাটো, টাটকা স্যালাড্, শশা, টাটকা ধনে সবগুলোই খুব ছোট ছোট করে কাটা);

৯। রায়েতু (শশা, খোল, টাটকা ধনে, ভাজা ভুঁই জিরে গুঁড়ো, টাটকা আদা, লঙ্কা, লবণ ও সামান্য চিনি। পাকা কলা থেকেও রায়েতু তৈরি করা যায়);

১০। সক্ (পূর্ণ ওকরা সক্ বা অন্য প্রকার সক);

১১। কারেল বতাকা সক (আলুর সঙ্গে তেতো খরমুজ);

১২। মশলা (ছন্না মশলা) দিয়ে রান্না করা শুষ্ক ছোট মটর শুঁটি (বা অন্য রকমের শিম);

১৩। পুরী বা রুটী (লবণের ডান দিকে পরিবেশিত); পুরী বা রুটির পরে দু'রকমের সবজী বা সক দিতে হবে। সবজী যদি ঝোল থাকে, তবে একটি ছোট্ট বাটিতে করে দিতে হবে। ভোজন কালে বাড়তি গরম পুরী বা রুটি পরিবেশন করতে হবে।

১৪। রন্ধনকার্যে ব্যবহৃত কিছু সুগন্ধ লতাপাতা, যেমন—ধোকলা, সমোসা, কচুরি (থালার মাঝখানে পরিবেশন করতে হবে);

১৫। কারি বা ডাল (বাটিতে করে থালার ডান পাশে রাখতে হবে);

১৬। দুধ পাক (পরমান্ন) (বাটিতে করে থালার ডান পাশে রাখতে হবে);

১৭। পাঁপড় (বাম দিকে অর্ধাংশ থালার মধ্যে এবং বাকী অর্ধাংশ থালার বাইরে রাখতে হবে; ভাজা পাঁপড়ই সর্বোৎকৃষ্ট);

১৮। শ্রীখণ্ড (বাটিতে করে ডান পাশে রাখতে হবে);
১৯। আম রস (আমের ঘন রস) বাটিতে করে ডান পাশে পরিবেশন করতে হবে;
২০। কাবল (অন্ন) (সবশেষে এবং গরম গরম পরিবেশন করতে হবে)।

একাদশীতে ভোগ নিবেদন

হরিভক্তিবিলাসে একাদশী উদ্‌যাপনের অনেক নিয়মের উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে আমরা ইসকনে বিগ্রহ পূজার সাধারণ মান সংশ্লিষ্ট একাদশী সম্পর্কিত মাত্র কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করব।

পারমার্থিক গুরু ও ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবকে শস্য নিবেদন :

কথোপকথন কালে শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন একাদশী তিথিতে পারমার্থিক গুরু অথবা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁর পার্ষদদের শস্যদানা অর্পণ করা অনুচিত।

ভক্ত : একাদশী তিথিতে আমরা কি শ্রীবিগ্রহকে শস্য দানা অর্পণ করতে পারি?

শ্রীল প্রভুপাদ : হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। কিন্তু গুরুকে নয়। জীব-তত্ত্ব দ্বারা একাদশী পালিত হয়, বিষ্ণুর দ্বারা নয়। আমাদের জাগতিক রোগ দূরীকরণের জন্য আমরা উপবাস করি, কিন্তু রাধা-কৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু...শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকেও শস্য দানা দেওয়া যাবে না। কারণ তিনি ভক্তের ভূমিকা পালন করছেন। শুধু রাধা-কৃষ্ণ, প্রভু জগন্নাথদেবকে শস্য দানা অর্পণ করা যাবে। পক্ষান্তরে, গুরু-গৌরাঙ্গকেও শস্য দানা দেওয়া যাবে না। আর প্রসাদও কেউ গ্রহণ করতে পারবে না। পরের দিনের জন্য এটা (প্রসাদ) রেখে দেওয়া যেতে পারে। (২২ এপ্রিল, ১৯৭২, টোকিওতে শ্রীল প্রভুপাদের নিজ কক্ষে কথোপকথন)

সকল বিগ্রহের জন্য যদি একটা থালায় নৈবেদ্য দেওয়া হয় এবং প্রধান বিগ্রহ যদি শ্রীকৃষ্ণ বা প্রভু জগন্নাথ হন তবে অন্যান্য স্বাভাবিক দিনের মতো দানা শস্য অর্পণ করা যাবে। প্রধান বিগ্রহ যদি গৌর-নিতাই হন, তাহলে শুধু দানা-বিহীন নৈবেদ্য অর্পণ করতে হবে।* সচরাচর অর্পিত দানাযুক্ত নৈবেদ্যর পরিবর্তে দানা-বিহীন নৈবেদ্য অর্পণ করাই শ্রেয়। এতে স্বাভাবিক দিনগুলির মতো একই সংখ্যক

* রেস্টুরেন্টে একাদশীর দিনেও দানাশস্যের খাবার পরিবেশন করা হয়, তখন গৌর-নিতাইকে এই মর্মে দানা-ভোগ নিবেদন করা যেতে পারে যে, তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে ভোগ অর্পণ করবেন।

পদ হবে। যদি দানাশস্যের ভোগ শ্রীকৃষ্ণ বা প্রভু জগন্নাথের জন্য প্রস্তুত করা হয়, তবে গুরুদেব ও গৌর-নিতাইয়ের জন্য অতিরিক্ত দানা বিহীন ভোগ রন্ধন অসুবিধাজনক হতে পারে। সেইক্ষেত্রে বেশি পরিমাণে দানা-বিহীন ভোগ পারমার্থিক গুরু ও গৌর-নিতাইকে নিবেদন করতে হবে এবং শ্রীকৃষ্ণ ও প্রভু জগন্নাথদেবের জন্য অন্যান্য স্বাভাবিক দিনের মতো নৈবেদ্যর থালা প্রস্তুত করতে হবে।

কিরূপ শস্য একাদশীতে নিষিদ্ধ?

শ্রীল প্রভুপাদ খাদ্যশস্য ও শিম (ডাল) একাদশীতে খাদ্য হিসাবে নিষিদ্ধ করেছেন। রন্ধনকার্যে সর্ষে বাদে অন্য মশলা ব্যবহার করা যায়।** গুঁড়ো হিঙ্ ব্যবহার করা যাবে না, কারণ এর ভিতর দানা আছে (বৃক্ষ-নির্যাস)। *ষট্‌-তিলা* একাদশী ব্যতীত অন্য একাদশীতে তিল শস্যও বর্জনীয়। একমাত্র *ষট্‌-তিলা* একাদশীতেই তিলশস্য অর্পণ করা এবং ভক্ষণ করা যায়।

শস্যদানার সঙ্গে মিশ্রিত করা যায় এরূপ রন্ধন-উপকরণ ব্যবহার্য নয়। যেমন ঘি, যা কিনা পুরী ভাজতে ব্যবহৃত হয়, অথবা চাপাটীর ময়দার সঙ্গে হাতের দ্বারা স্পর্শ করা মশলার ব্যবহার করা যাবে না।

একাদশীর মহাপ্রসাদ

বৈষ্ণব বিধানের গোঁড়া অনুগামীগণ একাদশীতে শস্য দানা সমন্বিত কোন নৈবেদ্য গ্রহণ করেন না। শাস্ত্রে বলে একাদশী তিথিতে পাপ-পুরুষ শস্য-দানায় আশ্রয় নেয়, সেই কারণে আমরা সর্ব প্রকারে ঐদিন কোন দানা-শস্য ভক্ষণে বিরত থাকি। শুধু তাই নয়, শস্যবিহীন মহাপ্রসাদ নৈবেদ্য থালা থেকে গ্রহণের ঝুঁকিও নিই না। কারণ মহাপ্রসাদও দানা কবলিত হয়। একাদশী মহাপ্রসাদ পরের দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যেতে পারে। তা যদি সম্ভব না হয়, তবে বৈষ্ণবের কড়া অনুশাসন না মেনে সকল মানুষ ও পশুর মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া যেতে পারে। বস্তুত, একাদশী তিথিতে পাপ-পুরুষের উপস্থিতি সত্ত্বেও মহাপ্রসাদ তার পবিত্রতা রক্ষা করে। আর সেই জন্যেই, যে এই মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করবে সেই

** একাদশীর গোঁড়া উদ্‌যাপককে লঙ্কা, খনিজ লবণ ও জিরে ব্যতীত সকল প্রকার মশলাই পরিহার করতে হবে। তাকে আরও কিছু নির্দিষ্ট সব্‌জী, যেমন, টম্যাটো, ফুলকপি, বেগুন ও পত্রবহুল শাক-সব্‌জী পরিহার করতে হবে। মন্দিরের পাকশালায় এই কঠোর নিয়মানুবর্তিতা মানার প্রয়োজন নেই। কারণ শ্রীল প্রভুপাদ সেগুলির প্রবর্তন করেন নি। স্বতন্ত্র ভক্তরা পছন্দ করলে এই নিয়মাবলী পালন করতে পারেন, একাদশীতে তারা হয় তাঁদের নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই করবেন, রান্না করবেন, না হয় অরন্ধিত খাদ্য খাবেন যেমন, ফলাদি, অথবা পূর্ণ উপবাস উদ্‌যাপন করবেন। এই সকল ব্যবস্থা যেন মন্দিরের রন্ধন তালিকায় হস্তক্ষেপ না করে।

পবিত্র হবে। তৎসত্ত্বেও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামীরা, বৈষ্ণব অনুশাসনের গোঁড়া অনুসারী হওয়ার জন্য, ঐ দিনটিতে মহাপ্রসাদ ভক্ষণ পরিহার করেন। তার কারণ পাপ-পুরুষের উপস্থিতির দ্বারা তাঁদের কঠোর সাধনা ব্যাহত হবে।

শ্রীবিগ্রহ পূজা সম্পর্কিত জিবিসি নিয়মাবলী

● **বিগ্রহ সংরক্ষণ :** বিগ্রহ সংরক্ষণের জন্য প্রতিটি মন্দিরে বেদীর সম্মুখে ধাতুনির্মিত দরজা থাকা উচিত।

● **আচার্যদের আলেখ্যাবলী :** কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ, শ্রীল গৌর কিশোর দাস বাবাজী, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং পরম শ্রদ্ধেয় জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ। ইসকনের সকল মন্দির বেদীতেই এঁদের আলেখ্য থাকা উচিত।

● শ্রীল প্রভুপাদ কর্তৃক ব্রতী না হওয়া পূজারী আরতিদান কালে তাঁর গুরুদেবের আলেখ্যও বেদী'পরে রাখতে পারবেন। আলেখ্যটি অবশ্যই পূর্ববর্তী আচার্যদের তুলনায় ছোট এবং গুরু-শিষ্য পরম্পরার ক্রম অনুযায়ী থাকতে হবে। অথবা চিত্রটি যদি আদপেই ছোট না হয় তবে সেটাকে অপেক্ষাকৃত নিচু স্থানে রাখতে হবে। আরতি পর্বের শেষে আলেখ্যটি বেদী থেকে সরিয়ে নিতে হবে।

● **শ্রীবিগ্রহ স্থাপন :** বিগ্রহ সমূহ স্থাপনের পূর্বে অন্তত এক বৎসর কাল মন্দিরটি প্রচারকেন্দ্র হিসাবে কার্যকরী থাকতে হবে।

● **বন্ধ মন্দির :** মন্দিরে একবার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হলে তা আর কখনও বন্ধ করা যাবে না।*

● **প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের সম্পত্তি :** ভগবানের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের কোন ভূ-সম্পত্তি জি বি সির অনুমোদন ব্যতিরেকে বিক্রয় করা যাবে না।**

● **মন্দিরের পুনরবস্থান :** প্রতিষ্ঠিত ইসকন বিগ্রহ যদি নতুন ভূ-সম্পত্তিতে পুনরবস্থিত করা হয়, তবে জি বি সি'র নির্দেশানুসারে বিগ্রহরে মূল ভূ-সম্পত্তির ট্রাস্টিগণ পুনরবস্থানের দেখাশোনা করার জন্য দায়ী থাকবেন। তাঁদের নিশ্চিত হতে হবে :

> *ইসকন সম্পত্তি বিক্রি করে গড়ে ওঠা তহবিল ভুলভাবে ব্যবহৃত হয়ে বা ভিন্নপথে চালিত হয়ে শ্রীবিগ্রহের লগ্নীপত্র সমূহ হ্রাস পাচ্ছে কিনা এবং নতুন সম্পত্তি বিগ্রহের ও সম্প্রদায়ের প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট কিনা।*

---

* জি বি সির অনুমোদনক্রমে কোন মন্দির একই অঞ্চলে স্থানান্তরিত করা যেতে পারে।

** এইটি ও পরবর্তী ধারা সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ এবং বিগ্রহের পুনরবস্থান সংক্রান্ত গ্রন্থের অধিকতর বিস্তৃত অংশ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

● **দান :** যথাসম্ভব কোন দান বিনাশর্তে ইসকন সংস্থা কর্তৃক গৃহীত হবে। কোন সীমিত শর্তসাপেক্ষেও দান গ্রহণ করা যেতে পারে। যে শর্তগুলি একটা সাধারণ শ্রেণী বা সাধারণ ব্যবহার নিরূপণ করে সেগুলিই হল গ্রহণীয় শর্ত। যেমন, বিগ্রহপূজা, শিক্ষা, নির্মাণ আদি, যা একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থান বা কর্ম-পরিকল্পনা স্থির করে, অথবা যা দাতাকে একটি পরিমিত পরিমাণ স্বীকৃতি দান করে। ইসকন পরিচালকবৃন্দ অবশ্যই গৃহীত শর্তানুসারে সেই দানের ব্যবহার করবেন। গ্রহণ অযোগ্য শর্তগুলি হল :

ক) দাতাকে কিছু অধিকার দিতে হবে, যাতে তিনি ভবিষ্যতে আংশিক অথবা সম্পূর্ণ দান পুন দাবি করতে পারেন। সকল দানই হল ইসকনের পবিত্র সম্পত্তি; এতে বিচ্ছিন্নতাবোধের কোন সম্ভাবনা নেই।

খ) যে শর্তগুলি অস্পষ্ট বা দ্ব্যর্থক এবং ভাষান্তরের জন্য ভবিষ্যতে বিতর্কের ঝুঁকি থাকে।

গ) অন্যভাবে যাতে ভবিষ্যতে মামলা বা বিতর্কের ঝুঁকি থাকে, অথবা যা ইসকনের সুনাম নষ্ট করতে পারে।

ঘ) শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশ ও ইসকনের আইন অনুসারে এর সম্পত্তি ব্যবহারের সামর্থের ওপর ইসকনের অধিকার সম্পর্কে যা আপস-মীমাংসা করে।

● **বিগ্রহসমূহের সম্মুখে বিবাহ উৎসব :** দীক্ষিত কৃষ্ণ ভক্তগণ যাঁরা তাঁদের আরব্ধ ব্রত কঠোরভাবে পালন করছেন শুধুমাত্র তাঁরাই বৈষ্ণবীয় রীতিতে শ্রীবিগ্রহ সম্মুখে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হতে পারেন।

● ইসকনের ভক্ত পুরোহিত যদি যুক্তিসহ নিশ্চিত হন যে বিবাহকারী ভক্ত চারিটি নিয়ামক আদর্শে নিয়মিত নিযুক্ত এবং চারিটি আদর্শ থেকে বিচ্যুত, তবে তিনি অদীক্ষিত ভক্তের জন্য যজ্ঞাগ্নির সম্মুখে বিবাহ উৎসব সম্পাদন করতে পারেন। এটা অধিকতর পছন্দযোগ্য যে অন্যান্য সুবিধা থাকলেও এই উৎসব মন্দির কক্ষে যেন অনুষ্ঠিত না হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বিগ্রহ পূজার উল্লেখ

শ্রীমদ্ভাগবত ও *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* উল্লেখিত বিগ্রহ পূজা সম্পর্কিত তালিকাটি মোটের ওপর পরিপূর্ণ হলেও সম্পূর্ণ নয়।

টীকা : সূত্রগুলি হল তালিকাবদ্ধ শ্লোক বা শ্লোকের তাৎপর্য অথবা উভয়ই।

শ্রীমদ্ভাগবত

৩.১৬.৪	বিষ্ণু যোগ্য ব্রাহ্মণদের বিগ্রহ
৩.১৯.২৪	ভক্তরা অচিন্ত্যনীয়, অপরিমেয় বিগ্রহকে বহন করেন
৩.২০.২৫	ভক্তের সন্তুষ্টির জন্য অসংখ্য বিগ্রহরূপ নিত্য প্রকাশিত
৩.২১.৩২	ক্ষমতার দিক থেকে বিগ্রহ ও স্বয়ং ভগবান অভিন্ন
৩.২২.৩৩	মঙ্গল-আরতি বর্ণনা করেছে; রাজকীয় প্রাসাদ অভ্যন্তরে মন্দিরাবলী
৩.২৫.৩৫	ভক্তরা বিগ্রহ দর্শন করেন এবং তাঁদের সঙ্গে প্রেমালাপ করেন; গুরুকে ভক্তদের অবশ্যই বিগ্রহ পূজা শেখাতে হবে
৩.২৫.৩৬	বিগ্রহ দর্শনে সমাধি; মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের সুপারিশ মতে অর্চনা
৩.২৭.৩৮	ভক্তের বান্ধব, স্বজন, পুত্র, গুরু ও উপকারক হিসাবে বিগ্রহ
৩.২৬.৪৬	মাটির দ্বারা ভগবানের মূর্তি গঠন
৩.২৮.৪	পুরুষার্চনম্—যোগাভ্যাস অপরিহার্য
৩.২৮.১৮	ভগবানের নিত্যরূপের ধ্যান
৩.২৮.১৯	ভগবানকে মনশ্চক্ষুর সম্মুখে দৃষ্টিগোচর করতে হবে
৩.২৮.২০-৩৩	পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ভগবানের রূপের ধ্যান
৩.২৮.২৪	বিগ্রহ ভগবানের শাস্ত্রীয় রূপের প্রতিরূপ প্রকাশ করে
৩.২৮.২৯	ভগবানের সকল রূপই হল একটি অসীম অদ্বিতীয় রূপ
৩.২৮.৩০	ভক্ত কখনও ভগবানের রূপ কল্পনা করে না
৩.২৮.৩১	ভগবানের এক পলক দৃষ্টি অসীম কৃপাপূর্ণ
৩.২৮.৩২	যৌনাকাঙ্ক্ষা জয় করতে ভগবানের ভ্রূ-যুগলের ধ্যান করতে হবে
৩.২৮.৩৩	বিষ্ণুর হাসি
৩.২৯.১৬	শ্রীকপিলদেবের সুপারিশক্রমে বিগ্রহ পূজন
৩.২৯.২১	অন্য জীবের প্রতি শ্রদ্ধাশূন্য বিগ্রহপূজাই হল অনুকরণ
৩.২৯.২২	ভগবানের সর্বত্র উপস্থিতির জ্ঞান বিগ্রহ পূজার প্রাথমিক পর্ব
৩.২৯.২৪	বিগ্রহ পূজা প্রেম ও কৃতজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে
৩.২৯.২৫	বিগ্রহ পূজা সম্বন্ধ-জ্ঞানের পথ প্রদর্শন করে
৪.৭.১৭	বিগ্রহপূজা হল বিষ্ণু-যজ্ঞ
৪.৮.৪৫	ভগবানের সুন্দর আনন
৪.৮.৪৬	শ্রীবিগ্রহ হলেন করুণা-সিন্ধু

৪.৮.৪৭-৫০	ভগবানের রূপ
৪.৮.৫১	ভক্তকে অবশ্যই অবিরাম বিগ্রহের ধ্যান করতে হবে; শ্রীবিগ্রহে মনোসংযোগ করলে কখনও কারও পতন হয় না
৪.৮.৫২	বিগ্রহ পূজার ফলাফল
৪.৮.৫৪	বর্ণিত বিগ্রহপূজা পদ্ধতি
৪.৮.৫৫	বিগ্রহ পূজার প্রয়োজনীয় বস্তু
৪.৮.৫৬	ভগবানের রূপের তালিকাবদ্ধ শারীরিক উপাদানসমূহ
৪.৮.৫৮	শ্রীবিগ্রহের মানস পূজা
৪.১২.১৭	বিগ্রহ পূজার দ্বারা সমাধি
৪.১২.২৯	মন্দিরে বাস করার অর্থ বৈকুণ্ঠে বাস করা
৪.১৩.৪	পঞ্চরাত্রিক বিধি
৪.২১.১৩	অর্চে বিষ্ণৌ শিলা-ধীর.....
৪.২৩.২৯	শ্রীবিগ্রহ গৃহকে বৈকুণ্ঠে পরিণত করতে পারেন
৪.২৪.৪৪	বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি পূজা
৪.২৪.৪৫-৪৬	পঞ্চরাত্রিক বনাম ভাগবত বিধি
৪.২৪.৪৭-৫২	ভগবানের সৌন্দর্য
৪.২৭.২৪	বিগ্রহ পূজা এটি বৈদিক আদর্শ
৪.৩০.২৭	বিগ্রহ পূজা—প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান আশীর্বাদ
৪.৩০.২৮	ভগবানের সম্প্রসারিত রূপ হিসাবে শ্রীবিগ্রহ
৪.৩০.২৯	অর্চনার সাহায্যে সফলতা লাভ করা যায়
৬.২.৪১	ভগবান হরির সৌন্দর্য বর্ণনা
৬.৫.৩৬	ব্রাহ্মণের কর্তব্য বিগ্রহ পূজা
৬.৮.১৭	কিভাবে বিগ্রহের প্রতি অপরাধ পরিহার করা যায়
৬.৮.২৩-২৬	ভগবান বিষ্ণুর প্রয়োজনীয় পাত্রের স্তব
৬.১৬.৩১	শ্রীবিগ্রহ দর্শন
৬.১৯.৫	ভগবানের পূজারীর প্রতি তাঁর সদয়তা
৭.৫.২৩-২৪	অর্চনা সেবার অংশ
	অপরাধের প্রতিকার; মানস পূজা
৭.৭.৩১	গুরু, শাস্ত্র, সাধুর মতানুসারে অর্চনা
৭.১১.১৪	ব্রাহ্মণের অবস্থা ও বৃত্তিমূলক কর্তব্য
৭.১৪.২৯	বৈষ্ণব মন্দির সর্বাপেক্ষা পবিত্র
৭.১৪.৩৩	মন্দির সম্প্রদায় হল বৈকুণ্ঠ; গৃহপূজা

৭.১৪.৩০-৩৩	বিগ্রহ পূজা অতীব তাৎপর্যপূর্ণ
৭.১৪.৩৯	ত্রেতা-যুগে বিগ্রহ পূজা
৭.১৪.৪০	বিগ্রহ পূজা, ধর্মোপদেশ ও নবদীক্ষিতগণ
৭.১৫.১১	সেরা ধার্মিকও বিগ্রহ পূজা করেন
৮.৪.৬	বিগ্রহ স্পর্শের ফল
৮.১৬.৬০	বিষ্ণুপূজা ও পয়ো-ব্রত সমান
৯.৪.১৮-২০	মহারাজ অম্বরীষ
৯.৪.২৬	বিগ্রহ পূজায় কঠোর আত্মসংযম
৯.৪.৩১-৩২	অম্বরীষের বিগ্রহ পূজা
৯.৬.৮	ভোগ-সমর্পণে অপরাধ
৯.৯.৪২	বিগ্রহ পূজা—আসক্তি প্ররোচনার হেতু
৯.৯.৪৩	ব্রাহ্মণের গুরুত্ব
৯.১৯.১৯	বৃন্দাবনে সঠিক অবসর গ্রহণ
১০.২.১২	বৈষ্ণব অর্চনার সঙ্গে শাক্তপূজার তুলনা
১০.২.৩৫	নিয়ন্ত্রিত বিগ্রহ পূজার ফল
১০.৭.১৩-১৫	ভোগ বিশেষ করে দানাশস্য ও দুগ্ধজাত কিছু দিয়ে প্রস্তুত করা উচিত; চার প্রকারের তপস্যা
১১.২.৪৭	কনিষ্ঠ অধিকারী পূজা; পরম প্রভুর পাঁচ প্রকারের প্রকাশ
১১.৩.৪৮	ভগবানের মূর্তি পূজায় কেউ খুব আকৃষ্ট হয়
১১.৩.৪৯	পূজা পদ্ধতি
১১.৩.৫০-৫১	পূজারম্ভ
১১.৩.৫২-৫৩	শ্রীবিগ্রহের অঙ্গ পূজা
১১.৩.৫৪	পূজারীর ধ্যান
১১.৩.৫৫	বিভিন্ন প্রকাশে ভগবৎ পূজা
১১.২৭	বিগ্রহ পূজায় উদ্ধবের প্রতি ভগবান কৃষ্ণের নির্দেশ

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত

আদি-লীলা

১.১৯	বৃন্দাবনের তিন বিগ্রহ
৩.৫৮	সন্ন্যাসীদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হলেন একমাত্র আরাধ্য বিগ্রহ
৩.৬৬	সকল দেব-দেবীদের কাছে শ্রীচৈতন্যদেবই সর্বাপেক্ষা পূজ্য বিগ্রহ
৪.৯	জড়জগতে আদর্শ বিগ্রহ হলেন শ্রীবিষ্ণু
৫.১৬৮	শ্রীগুণার্ণব মিশ্র শ্রীবিগ্রহের সেবা করেন

অন্ত্য-লীলা

১.১৮২	বিগ্রহ স্মরণ
২.৬১	বিগ্রহকে আহার্য অর্পণ
৩.২২৩	বিগ্রহ পূজায় দানের সদ্ব্যবহার
৪.১২৭	পূজারীদের পবিত্রতা
৪.১৯১	বিগ্রহই স্বয়ং ভগবান
৫.১১৮	উন্নত ভক্ত বিগ্রহকে ভগবান হিসাবে দেখেন
৬.৭৩	বিগ্রহকে আহার্য অর্পণ
৬.১১১	অমৃতের সারবস্তু হল প্রসাদ
৬.১৯৮	ধার্মিক ব্যক্তিগণ নিয়মিত বিগ্রহ পূজা করেন
৬.২৭৬	জড়বাদীদের দ্বারা লোক দেখানো ভক্তি প্রদর্শন
৬.২৯৪	শালগ্রাম ও গোবর্ধন শিলা ভগবানের কলেবর
৬.৩০২	রঘুনাথ দাসের সরল পূজা
১০.৫২	জগন্নাথ মন্দিরে বিজয় বিগ্রহ দেব
১৩.৩৯	গোবর্ধন পাহাড় ও গোপাল বিগ্রহ অভিন্ন
১৩.১২৪	ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সহজাত গুণ বিগ্রহ সদৃশ
১৬.৫১	শ্রীবিগ্রহকে শ্রদ্ধা অর্পণ
১৯.২৬	ভগবান শ্রীচৈতন্যের বিগ্রহ পূজা
২০.১১১	বিগ্রহের মহিমা

গোবর্ধন-শিলা অর্চন

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশানুক্রমে রঘুনাথ দাস গোস্বামী যে গোবর্ধন-শিলার পূজা করেছিলেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* তারই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন :

> *এই বলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রঘুনাথ দাসকে গোবর্ধন শিলা এবং একটি গুঞ্জামালা দিয়ে পুনরায় কৃপা করলেন। পূর্বে, শঙ্করানন্দ সরস্বতী যখন বৃন্দাবন থেকে এসেছিলেন, তখন তিনি সেই গোবর্ধন শিলা এবং গুঞ্জামালা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। সেই গুঞ্জামালা এবং গোবর্ধন শিলা তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে উপহার দিয়েছিলেন। সেই দুটি অপূর্ব বস্তু পেয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণনাম স্মরণের সময় তিনি সেই গুঞ্জামালা গলায় পরতেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই গোবর্ধন শিলা কখনও তাঁর হৃদয়ে ধারণ করতেন, আবার কখনও*

তাঁর নেত্রে ধারণ করতেন, কখনও তিনি নাসায় তার ঘ্রাণ গ্রহণ করতেন এবং কখনও তা তিনি তাঁর শিরে ধারণ করতেন। সেই গোবর্ধন শিলা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চোখের জলে সবসময় সিক্ত থাকত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলতেন, "এই শ্রীকৃষ্ণের কলেবর।" তিন বছর তিনি এইভাবে সেই শিলা এবং মালা নিজের কাছে রেখেছিলেন। তারপর রঘুনাথ দাসের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে তিনি তা তাঁকে দিয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে বলেছিলেন —"এই শিলা শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত বিগ্রহ, পরম আগ্রহে তুমি এর সেবা কর।" শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে বললেন, "তুমি একজন আদর্শ ব্রাহ্মণরূপে, সত্ত্বগুণে, এই শিলার পূজা কর, তাহলে অচিরেই তুমি কৃষ্ণপ্রেমধন লাভ করবে। এক কুঁজো জল আর তুলসী মঞ্জরী দিয়ে যখন শুদ্ধভাবে সেবা করা হয়, সেটি সাত্ত্বিক সেবা। "দুই দিকে দুটি পত্র এবং মাঝখানে কোমল মঞ্জরী, এই প্রকার আটটি মঞ্জরী তুমি শ্রদ্ধা সহকারে নিবেদন করবে।" এইভাবে পূজা করার নির্দেশ দিয়ে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বহস্তে সেই গোবর্ধন শিলা রঘুনাথ দাসকে দিলেন, এবং রঘুনাথ দাস পরম আনন্দে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে সেই শিলার সেবা করতে লাগলেন। স্বরূপ দামোদর গোস্বামী রঘুনাথ দাসকে অর্ধ হস্ত পরিমিত দুটি কাপড়ে টুকরো, একটি পিঁড়ি এবং জল আনার জন্য একটি কুঁজো দিয়েছিলেন। এইভাবে রঘুনাথ দাস গোবর্ধন শিলার পূজা করতে লাগলেন এবং পূজা করার সময় তিনি সেই শিলায় পরমেশ্বর ভগবান সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতে লাগলেন। সেই গোবর্ধন শিলা যা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে স্বহস্তে দান করেছেন, সেই কথা চিন্তা করে রঘুনাথ দাস নিরন্তর প্রেমাপ্লুত হলেন। কেবল জল এবং তুলসী দিয়ে সেবা করে রঘুনাথ দাস গোস্বামীর যে আনন্দ হত, ষোড়শ উপচারে পূজা করেও তত আনন্দ অনুভব করা যায় না। এইভাবে কিছুকাল গোবর্ধন শিলার পূজা করলে, একদিন স্বরূপ দামোদর গোস্বামী তাকে বললেন— "আট কড়ির খাজা সন্দেশ তুমি গোবর্ধন শিলাকে নিবেদন কর। শ্রদ্ধা সহকারে নিবেদন করলে তা অমৃতের মতো হবে।" তখন থেকে রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রতিদিন আট কড়ির খাজা নিবেদন করতে লাগলেন। স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর নির্দেশে গোবিন্দ তা সরবরাহ করতেন। রঘুনাথ দাস গোস্বামী যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছ থেকে সেই শিলা এবং মালা পেয়েছিলেন, তখন তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অভিপ্রায় উপলব্ধি করে, মনে মনে ভেবেছিলেন— "এই

গোবর্ধন শিলা দান করার মাধ্যমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাকে গিরি গোবর্ধনের সন্নিকটে একটি স্থান প্রদান করেছেন এবং এই গুঞ্জামালা দান করার মাধ্যমে তিনি আমাকে শ্রীমতী রাধারাণীর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় প্রদান করেছেন।" অন্তহীন আনন্দে রঘুনাথ দাস গোস্বামীর বাহ্য বিস্মরণ হয়েছিল এবং কায়মনে তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেবায় মগ্ন হয়েছিলেন। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যলীলা ৬/২৮৭-৩০৮)

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যেমন রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে গোবর্ধন গিরি থেকে পূজার নিমিত্ত একটি শিলা দানে আশীর্বাদপুষ্ট করেছিলেন, তেমনি কেউ পূজার কারণে গোবর্ধন শিলা পাবার জন্য গোবর্ধন নিবাসী সাধুর আশীর্বাদ অবশ্যই পাবেন। অননুমতে গোবর্ধন থেকে একটি ক্ষুদ্র নুড়িও গ্রহণ করলে সেই গ্রহণকারী ব্যক্তি বা সেই কাজে জড়িত ব্যক্তিগণের ভয়াবহ পরিণতির কথা সকলেরই জানা। গোবর্ধন পর্বতের কোন স্থানান্তরিত শিলার জন্য আদেশানুসারে প্রস্তরখণ্ডের সম ওজনের সোনা দিয়ে ক্ষতিপূরণ করতে হবে। স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দ বলে যে, এই যুগে এরূপ করা যুক্তিযুক্ত নয়, কারণ কলির ব্যক্তিরূপে অস্তিত্ব সোনার মধ্যে বাস করছে। যাই হোক এরূপ "ক্ষতিপূরণ" তাদের জন্যই নির্দিষ্ট যারা বিনা অনুমতিতে শিলা গ্রহণ করে। গিরি-গোবর্ধনকে আহত করতে অনিচ্ছুক ভক্ত গোবর্ধন শিলার্চনা গ্রহণের পূর্বে অনুমোদিত ব্যক্তিবর্গের আশীর্বাদের জন্য অপেক্ষা করাই পছন্দ করবে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের বর্ণনামতে রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দ্বারা গোবর্ধন শিলা পূজার নির্দিষ্ট ব্যবস্থা খুবই সরল ছিল। যাঁরা সন্ন্যাস-আশ্রমে আছেন তাঁরা তাঁদের ব্যক্তিগত বিগ্রহরূপে গোবর্ধন শিলাকে এইরূপ সহজ সরলভাবে অর্চনা করতে পারেন। আশা করা যায় অন্যান্য আশ্রমের সভ্যগণ চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত কৃষ্ণ আরাধনায় ষোড়শোপচারে পূজা করবেন। গোবর্ধন শিলা অর্চনায়, মূলমন্ত্র হিসাবে গোপাল-মন্ত্রের ব্যবহার করা যেতে পারে। শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন—

যখন সব কিছুই ঠিকঠাক, তখন শ্রীকৃষ্ণ এক মহান দিব্য রূপ ধারণ করে গিরি গোবর্ধন এবং শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন এটা বোঝাতে বৃন্দাবনবাসীদের নিকট ঘোষণা করলেন যে, তিনি নিজেই গোবর্ধন পর্বত। কৃষ্ণ ও গোবর্ধন পর্বতের ব্যক্তিগত পরিচয় এখনও সম্মানিত হয় এবং মহান ভক্তরা গোবর্ধন পর্বত থেকে শিলা নিয়ে এসে মন্দিরে কৃষ্ণবিগ্রহকে পূজা করার মতো হুবহু অনুকরণে পূজা করেন। (কৃষ্ণ গ্রন্থ, 'গোবর্ধন পর্বত পূজা')

শিষ্যের যোগ্যতা ও শিষ্টাচার

বিগ্রহ পূজায় শিক্ষাদান ও নিযুক্ত করা যেতে পারে *হরিভক্তিবিলাসে* এরূপ প্রকৃত শিষ্যের যোগ্যতাবলী নিম্নে প্রদত্ত হল :

- পারমার্থিক গুরুর শ্রীপাদপদ্মে তাকে একান্তভাবে নিয়োজিত হতে হবে।
- তাকে গুরুদেবের প্রতি প্রস্তুত করা ব্রত সমর্থন করতে সম্পূর্ণ সক্ষম হতে হবে।
- তাকে কায়মনোবাক্যে দিবারাত্র প্রভুর সেবায় নিযুক্ত থাকতে হবে।
- তাকে পরম সত্য জানতে আগ্রহী হতে হবে।
- তাকে নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, সত্যবাদী, নম্র ও বিনয়ী, চেহারায় মনোমুগ্ধকর এবং বুদ্ধিমান হতে হবে।
- তাকে গুরুজনদের প্রতি সদ্য ব্রতী বৈষ্ণবদের প্রতি এবং ভগবানের প্রতি যথোপযুক্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে, জড় বিষয়ে তাকে নীরবতা পালন করতে হবে এবং অবশ্যই ইন্দ্রিয়ের ওপর তার নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে।
- পাপ কাজের প্রতি তার কোন আকর্ষণ থাকবে না।

প্রকৃত শিষ্যের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি থাকা উচিত নয় :

- অলস, নোংরা, রুগ্ন, সদা উৎপীড়িত, শোকার্ত, রাগান্বিত, গর্বিত, কামুক বা জড় আকাঙ্ক্ষালোলুপ হওয়া উচিত নয়।
- তাকে উপভোগী মেজাজ দেখানো অনুচিত, মাংসাহার, নেশা, জুয়া বা অবৈধ যৌনসঙ্গ ইত্যাদি পাপপূর্ণ কাজে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়, অসদুপায়ে জীবিকা নির্বাহ করা চলবে না।
- তার অশ্লীল বা রূঢ় ভাষা ব্যবহার করা অন্যের নিকট সমালোচনাকর হওয়া উচিত নয়। কৃপণ, হিংসুক, প্রতারক হওয়াও অনুচিত, অন্যকে দুঃখ দেওয়া বা নিষ্ঠুর কর্মে আসক্ত হওয়া উচিত নয়।
- সে যেমন অজ্ঞ হবে না তেমনি জড় শিক্ষায় গর্বিতও হবে না, অবৈষ্ণবীয় দর্শনের প্রশ্রয় দেওয়া অবিধেয়, তার অতি ভোজন-আসক্ত হওয়া উচিত নয়।

প্রকৃত শিষ্যের পারমার্থিক গুরু সম্পর্কে নিম্নলিখিত শিষ্টাচার অবশ্য পালনীয় :

- পারমার্থিক গুরুদেবের দর্শনে ছিন্নমূল বৃক্ষের মতো তাকে ভূমিতে নিপতিত (দণ্ডবৎ) হতে হবে।
- পারমার্থিক গুরু যখন অগ্রসর হবেন তখন তাঁর সম্মুখে থাকতে হবে এবং যখন তিনি প্রস্থান করবেন তখন তাঁর অনুগমন করতে হবে।

• বিনা অনুমতিতে গুরুদেবের সম্মুখ থেকে তার বিদায় নেওয়া উচিত নয়।

• অমনোযোগিতার সঙ্গে গুরুদেবের নাম উচ্চারণ করা অনুচিত, সর্বদাই শ্রদ্ধার সঙ্গে গুরুর নাম উচ্চারণ করতে হবে।

• গুরুদেবের চলন, কার্যাবলী অথবা কণ্ঠস্বরের অনুকরণ অবশ্যই অনুচিত।

• গুরুদেবের কথা সর্বদা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে ধরে রাখতে হবে। গুরু কর্তৃক শাস্তি পেলেও সেটাকে নির্দয় কাজ বলে ধরা ঠিক নয়।

• গুরু, শাস্ত্র বা ভগবান সম্বন্ধে নিন্দা না শুনে তৎক্ষণাৎ সে স্থান ত্যাগ করা উচিত।

• গুরুদেবের মালা, শয্যা, পাদুকা, আসন, প্রতিবিম্ব অথবা খাবার টেবিল পদদলিত করা অবিধেয়।

• গুরুদেবের সম্মুখে পা ছড়িয়ে বসা যেমন চলবে না, তেমনি তাঁর সম্মুখে, হাই তোলা, হাসা ঠিক নয়। হাসিটি যখন যথোপযুক্ত হবে, অর্থাৎ গুরু যখন মজা করবেন, তখন হাসা নিষিদ্ধ নয়। তখন কারও হাসি নিয়ন্ত্রিত থাকা উচিত নয়। অবশ্য কোন অবস্থাতেই কারও গুরুকে কখনও উপহাস করা অনুচিত। বা অসম্মানজনক কোলাহল করাও অনুচিত কাজ।

• গুরুদেবের সম্মুখে শিষ্যের আসন অথবা বিছানায় বসা উচিত নয়।

• গুরুদেবের সম্মুখে অন্যকে পূজা করা শিষ্যের অনুচিত কাজ।

• গুরুর সম্মুখে দীক্ষাদান [সদ্যব্রতী], শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা বা নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করা শিষ্যের অনুচিত।

• গুরুদেবকে আদেশ না দিয়ে সর্বদা তাঁর আজ্ঞাপালন করা উচিত।

• গুরুদেবের গুরুর প্রতিও তার একইরূপ আচরণ করতে হবে।

• গুরুপত্নী, (এটা অবশ্য গার্হস্থ আশ্রমবাসী গুরুকে নির্দেশ করছে), পুত্র ও গুরুর আত্মীয়-স্বজনদের প্রতিও গুরুর ন্যায় ব্যবহার করতে হবে। শিষ্য গুরুপুত্রের শরীর মার্জন, তার ভুক্তাবশিষ্ট গ্রহণ বা তার পদ প্রক্ষালন করবে না।

মুদ্রা

ভগবানকে সন্তুষ্টকারী হাতের কিছু বিশেষ ভঙ্গিকে মুদ্রা বলে। বিস্তৃত পূজা পর্বে পূজারী ঠিক ঠিক সময়ে মুদ্রা প্রদর্শন করেন। এই সহায়ক পুস্তকের প্রয়োগ অংশে আমরা তা নির্দেশ করেছি।

বিশুদ্ধিকরণ ও রক্ষণ মুদ্রা



১) চক্র-মুদ্রা : অশুভ সূক্ষ্ম প্রভাব দূরীভূত করে অর্পিত দ্রব্যাদি বিশুদ্ধ করে। বাম তালুর উপর দক্ষিণ-তালু স্থাপন করে আঙ্গুলগুলি চাকার পাতির মতো ছড়িয়ে দিতে হবে। শুদ্ধ করণীয় বস্তুর উপর এইভাবে কিছুসময় রাখতে হবে।

২) গালিনী-মুদ্রা : গালিনী-মুদ্রা হল 'ছাঁকনির' মতো—তরল অদৃশ্য বা অননুভূত অপদ্রব্য বা অপবিত্রতা ছেঁকে বিশুদ্ধ করে। উভয় হাতের মাঝের তিনটি আঙুল আঙটার মতো এমনভাবে আটকাতে হবে যাতে দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলি বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা এবং দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা বাম হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি স্পর্শিত হয়। এইভাবে শুদ্ধকরণ যোগ্য দ্রব্যের উপর স্বল্প সময় মুদ্রাকৃত হস্ত ধারণ করে থাকতে হবে।





৩) ধেনু-মুদ্রা : এই মুদ্রা পূজার পাত্রকে অমৃতে রূপান্তরিত করে। বিগ্রহকে বিশেষ-অর্ঘ্যে বা কলসে (পূজার ঘট) মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা আহ্বান কালেও এই মুদ্রার ব্যবহার করা যায়। এই মুদ্রা ভগবানকে তাঁর আনন্দময় সত্তা প্রদর্শনে নিবেদন প্রকাশ করে।

টীকা : ধেনুমুদ্রা অনুশীলন সাপেক্ষ। কাজেই শ্রেষ্ঠ উপায় হল কোন দক্ষ ব্যক্তির নিকট এটা শিক্ষা করা। এটার সহজতর বিকল্প হল সুরভি মুদ্রা : দুহাতের তালু একত্রবদ্ধ এবং আঙুলগুলি সোজা করে বাম হস্তের মধ্যমার অগ্রভাগ দক্ষিণ হস্তের অনামিকার অগ্রভাগের উপর স্থাপন করতে হবে, আবার উভয় হস্তের তর্জনী ও কনিষ্ঠার অগ্রভাগ পরস্পরের উপর স্থাপন করতে হবে। তৎপর দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা বামহস্তের তর্জনী ও মধ্যমার ভিতর দিয়ে এবং বাম হস্তের অনামিকা দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠা ও অনামিকার ভিতর দিয়ে গলিয়ে দিতে হবে।)

ধেনুমুদ্রা বা সুরভি-মুদ্রা প্রদর্শন করে সমর্পিত পাত্রের উপর এবার যুক্তকরের মনিবন্ধ থেকে ধীরে ধীরে ঊর্ধ্ব-অধ গতিতে নাড়াতে হবে।



৪) মৎস্য-মুদ্রা : এই মুদ্রা পূজার দ্রব্যকে আচ্ছাদনের দ্বারা সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে। বামহস্তের তালু দক্ষিণ

হস্তের পৃষ্ঠদেশের উপর রেখে উভয় হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠদ্বয় বৃত্তাকারে সম্মুখপানে সন্তরণের ভঙ্গিতে একবার বা দুবার রক্ষিত বস্তুর উপর চালনা করতে হবে।

আহ্বান মুদ্রা



৫) অঙ্কুশ-মুদ্রা : এই মুদ্রা হাতী নিয়ন্ত্রণকারী অঙ্কুশের প্রতিরূপ। মন্ত্রের দ্বারা পবিত্র নদীসমূহকে জলাধারে আহ্বান করে জলের উপরিভাগকে ডানহাতের মধ্যমা দিয়ে স্পর্শ করতে হবে (নখের দ্বারা জলস্পর্শ পরিহার করতে হবে।) বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কনিষ্ঠ ও অনামিকাকে ধরে থাকবে আর দেখতে হবে তর্জনী যেন মাঝখানে সমকোণে ভগ্ন হয় ও মধ্যমার সঙ্গে লম্বভাবে অবস্থান করে।



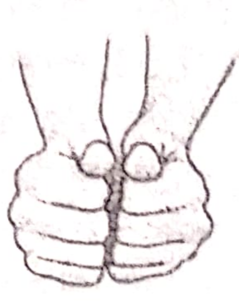
৬) বীজাক্ষর-মুদ্রা : পূজার উপকরণাদিতে বীজাক্ষর, মূলমন্ত্র বা গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ কালে বীজাক্ষর মুদ্রা ব্যবহার করুন। হাত নিচু করে ডান হাতের পৃষ্ঠদেশে বাম হাতের তালু স্থাপন করে গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ কালে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা হাতের করে অক্ষর বা মন্ত্র গণনা করুন।



৭) আবাহনী-মুদ্রা : পূজার সময় ভগবানকে আহ্বান কালে আবাহনী-মুদ্রা ব্যবহার করুন। হাত দুটি সংলগ্ন করে এবং তালু উপরদিকে করে উভয় হাতের অনামিকার দ্বিতীয় করের উপর সেই সেই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ স্থাপন করুন।



৮) স্থাপন-মুদ্রা : কোন নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থানের জন্য ভগবানকে অনুরোধ করতে স্থাপন-মুদ্রার ব্যবহার করুন। আবাহনী-মুদ্রার মতো আপনার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অবস্থান একইভাবে রেখে হাত দুটি উপুড় করে যুক্ত করুন।



৯) সন্নিধাপনী-মুদ্রা : ভগবানের সেবা ও তাঁর সান্নিধ্য পাবার জন্য সন্নিধাপনী মুদ্রার ব্যবহার করুন। উভয় হাতের চারিটি আঙ্গুল মুষ্টিবদ্ধ করে তালুর দিকে একত্রে যুক্ত করে এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠদুটি আপনার থেকে দূরে নির্দেশ করে হাত দুটি একত্রীভূত করে ধরুন।



১০) সন্নিরোধনী-মুদ্রা : পূজা চলাকালীন ভগবানকে অবস্থান করতে সন্নিরোধনী মুদ্রা ব্যবহার করুন। সন্নিধাপনী মুদ্রার ন্যায় হাত দুটি একই অবস্থায় রাখুন। শুধু উভয় বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠকেই মুঠি মধ্যে ঢুকিয়ে দিন।



১১) সম্মুখীকরণ-মুদ্রা : ভগবানকে আপনার সম্মুখবর্তী হবার জন্য অনুরোধ করতে সম্মুখীকরণ-মুদ্রা ব্যবহার করুন। সন্নিরোধনী-মুদ্রার ন্যায় আপনার সকল আঙুল ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠদ্বয় মুষ্ঠিবদ্ধ করে হাতের তালু দুটি উর্ধ্বমুখে রাখুন।



১২) মহা-মুদ্রা : ভগবানের আশীর্বাদের জন্য মহামুদ্রা ব্যবহার করুন। আপনার দক্ষিণ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠকে বাম বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা আঁকড়ে ধরুন এবং অন্যান্য আঙ্গুলগুলি ছড়িয়ে দিন। হাত দুটো এমনভাবে ধরুন যাতে আপনার হাতের তালুদ্বয় আপনার বিপরীত দিকে থাকে।

ন্যাস-মুদ্রাবলী

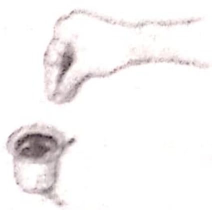
ন্যাস-মুদ্রা হয় কারও নিজের উপর, অথবা বিশেষ অর্ঘ্যে স্থাপিত ভগবানের বিগ্রহের উপর অথবা, স্থাপিত বিগ্রহের উপর (বিগ্রহ স্থাপনের উপর আসন্ন সহায়ক পুস্তিকায় যেভাবে ব্যাখ্যা করা হবে।) প্রতিটি মুদ্রা ন্যাসের দ্বারা রক্ষিত আপনার শরীরের প্রতিটি অংশকে নির্দেশ করছে।

১৩) ন্যাস-মুদ্রা : ন্যাস সম্পাদনের পূর্বে ন্যাস-মুদ্রা প্রদর্শন করুন। আপনার ডান হাতের মধ্যমার অগ্রভাগ, আপনার বাম হাতের তালুর মধ্যস্থলে রাখুন, তারপর মধ্যমাটির দুটি পর্ব এমনভাবে বাঁকা করুন যাতে বাম তালুর উপর সেটা লম্বভাবে অবস্থান করে। তারপর তালুদ্বয়ের ফাঁকা স্থান অবশিষ্ট আঙুল দ্বারা ঢেকে দিন। মুদ্রাটি আপনার বুকের কাছে ধারণ করুন এবং ন্যাসে ব্যবহৃত মন্ত্র (গোপাল মন্ত্র) নীরবে জপ করুন।





১৪) হৃদয়-মুদ্রা : নিজের উপর এই মুদ্রা প্রদর্শনের সময় আপনার ডান হাতের করতল সামান্য কোষের মতো গঠন করে আপনার হৃদয়ের উপর চেপে ধরুন। বিশেষ অর্ঘ্যের কারণে যখন এটা করবেন, তখন আপনার ডান হাত উপুড় করে করপুট দ্বারা পাত্রের উপর ধারণ করুন।



১৫) শিরো-মুদ্রা : এই মুদ্রা কার্যকরী করার সময় আপনার ডান হাতের পাঁচটি আঙ্গুলের অগ্রভাগ একত্রবদ্ধ করে আপনার মস্তকশীর্ষ স্পর্শ করুন। বিশেষ অর্ঘ্যের জন্য, একত্রবদ্ধ আঙুলের অগ্রভাগ পাত্রের উপর ধরুন।



১৬) শিখা-মুদ্রা : এই মুদ্রা প্রয়োগকালে আপনার ডান হাত মুষ্টিবদ্ধ করুন এবং বর্ধিত বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নিচের ঘাড়ের দিকে রেখে আপনার শিখা অঞ্চল স্পর্শ করুন। বিশেষ অর্ঘ্যের জন্য প্রসারিত বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আপনাকে নির্দেশ করে না এমনভাবে মুষ্টিবদ্ধ ডানহাত পাত্রের উপর ধরে রাখুন।



১৭) কবচ-মুদ্রা : এই মুদ্রা ব্যবহার কালে আপনার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠদ্বয় সেই সেই হাতের তালুর মধ্যে গুঁজে আপনার বাম হাতের খোলা চারটি আঙ্গুল দিয়ে আপনার ডান ঊর্ধ্ববাহু এবং ডান হাতের খোলা চারটি আঙুল দ্বারা বাম ঊর্ধ্ববাহু স্পর্শ করুন।

বিশেষ অর্ঘ্যের জন্য উভয় তালু নিম্নমুখী করে এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠদ্বয় তালুর ভেতর গুঁজে ডান মণিবন্ধ ক্রশ চিহ্নের আকারে বাম মণিবন্ধের উপর সমকোণে স্থাপন করে পাত্রের উপর মুদ্রাটি ধারণ করুন।

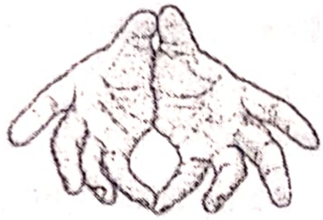


১৮) নেত্র-মুদ্রা : এই মুদ্রায় আপনার মুদিত নেত্রপল্লবদ্বয়কে ডান হাতের তর্জনী ও মধ্যমা দ্বারা স্পর্শ করুন, আপনার অনামিকা ও কনিষ্ঠাকে ভাঁজ করে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ধরে থাকুন। বিশেষ-অর্ঘ্যের কারণে, হাত উপুড় করে এবং হাতের অবস্থান একই রকম রেখে পাত্রের উপর ধরুন।

উপচার-মুদ্রা

ভগবানকে ষোড়শ উপচার প্রদানকালে, অর্পিত উপচার নির্দেশের জন্য আপনি সংশ্লিষ্ট মুদ্রা প্রদর্শন করতে পারেন। মন্ত্রসহ উপচার প্রদানকালে এবং

তৎপর গ্রহণকারী ব্যক্তিত্বকে উপযুক্ত মূল-মন্ত্র দ্বারা সম্বোধন করে সংক্ষেপে প্রতিটি মুদ্রা প্রদর্শন করুন।



১৯) আসন-মুদ্রা : উভয় বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ এবং একইভাবে উভয় কনিষ্ঠার অগ্রভাগ ও উভয় তালুর মূল একত্রে যুক্ত করুন। তারপর বাকী আঙ্গুলগুলি সামান্য ঊর্ধ্বে বিস্তৃত করুন এবং সামান্যভাবে বিগ্রহের দিকে নির্দেশ করুন।



২০) স্বাগত-মুদ্রা : ডানহাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ঐ হাতেরই মধ্যমার দ্বিতীয় কর স্পর্শ করুন, তৎপর আঙ্গুলগুলি যুক্ত করে বাঁকিয়ে আনুন এবং আপনার ডান হাতের করতলটি ঊর্ধ্ব-মুখী করে বিগ্রহের দিকে ধারণ করুন।



২১) পাদ্য-মুদ্রা : যুক্ত হাত দুটি চিৎ করে এবং আঙ্গুলগুলি ঈষৎ বাঁকা করে, আঙ্গুলের অগ্রভাগ শ্রীবিগ্রহের দিকে ধরুন।



২২) অর্ঘ্য-মুদ্রা : পাদ্য-মুদ্রার মতো করে হাতদুটি ধরুন, কিন্তু আপনার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগদ্বয় মধ্যমার ভিতর দিকে দ্বিতীয় করে স্থাপন করুন।



২৩) আচমনীয়-মুদ্রা : (আচমন ও পুনরাচমনের ক্ষেত্রে একই মুদ্রা প্রদর্শিত হয়েছে।) প্রথম তিনটি আঙুল সামান্য বাঁকা করে, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ বিগ্রহের প্রতি নির্দেশ করে এবং কনিষ্ঠা বাঁকা করে তালুতে সংলগ্ন করে, আপনার ডান হাত তুলে ধরুন। এটা সম্ভব না হলে, আপনার কনিষ্ঠাকে তালুতে মুড়ে ধরতে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ব্যবহার করুন, উপবীত-মুদ্রায় যেমনটি করা হয়।



২৪) মধুপর্ক-মুদ্রা : আপনার ডানহাত চিৎ করে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের তলায় অনামিকা চেপে ধরুন। অবশিষ্ট আঙুলগুলি কিছুটা বাঁকা করে বিগ্রহের দিকে নির্দেশ করুন।



২৫) স্থানীয়-মুদ্রা : কনিষ্ঠা ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ বিগ্রহের প্রতি মেলে ধরে এবং বাকী তিনটি আঙ্গুল তালুর ওপর বিস্তৃত করে আপনার ডান হাত তুলে ধরুন।

২৬) বস্ত্র-মুদ্রা : এই মুদ্রা মধুপর্ক মুদ্রার সদৃশ। [২৪নং মুদ্রা দ্রষ্টব্য]



২৭) উপবীত-মুদ্রা : (ষোড়শ উপচারের একটি হিসাবে গণ্য না হলেও, বিগ্রহকে উপবীত প্রদান কালে এই মুদ্রা প্রদর্শিত করা যেতে পারে।) আপনার ডান হাতের তালু ওপর দিকে করে কনিষ্ঠ অঙ্গুলি নীচের দিকে বাঁকিয়ে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ধরুন। এখন প্রথম তিনটি আঙ্গুল সামান্য বাঁকা করুন এবং বিগ্রহের দিকে নির্দেশ করুন।



২৮) আভরণ-মুদ্রা : আপনার ডান হাত চিৎ করে মধ্যমা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের নীচে চেপে ধরুন। তারপর অন্যান্য আঙ্গুল সামান্য বাঁকিয়ে শ্রীবিগ্রহের দিকে নির্দেশ করুন।



২৯) গন্ধ-মুদ্রা : দক্ষিণ হস্তের তালু ঊর্ধ্বদিকে করে ধরুন, তর্জনী, মধ্যমা ও কনিষ্ঠা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের তলায় গুঁজে দিন। অনামিকা সামান্য বাঁকিয়ে বিগ্রহের দিকে নির্দেশ করুন।



৩০) পুষ্প-মুদ্রা : ডান হাতের তর্জনী, অনামিকা ও কনিষ্ঠা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে চেপে ধরে ডান হাতের তালু নিচু করে ধরুন। মধ্যমাটি সামান্য বাঁকিয়ে বিগ্রহের দিকে নির্দেশ করুন।



৩১) ধূপ-মুদ্রা : তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ স্পর্শ করে ডান হাতের তালু ওপর দিকে ধরুন। বাকী আঙ্গুলগুলি কিছুটা বাঁকিয়ে বিগ্রহ নির্দেশ করুন।

৩২) দীপ-মুদ্রা : এই মুদ্রার সঙ্গে ধূপ-মুদ্রার কোন পার্থক্য নেই।



৩৩) গ্রাস-মুদ্রা : ডানহাতের পাঁচটি আঙ্গুলের অগ্রভাগ একত্রে যুক্ত করুন। এখন তালুটি বাঁ দিকে কাত করে হাত দিয়ে সামান্য বৃত্তীয় গতির সৃষ্টি করুন (আহারে উৎসাহের অঙ্গভঙ্গী হিসাবে)।

ভোগার্পণ-মুদ্রা



৩৪) বায়ুবীজ-মুদ্রা, অগ্নিবীজ-মুদ্রা এবং অমৃতবীজ-মুদ্রা : বিশদ পূজায় অতিরিক্ত প্রোক্ষনের দ্বারা ভোগ পবিত্র করতে হবে। উল্লিখিত সকল মুদ্রাই এই প্রোক্ষনের অন্তর্ভুক্ত।

(ক) বায়ুবীজ-মুদ্রা : আপনার ডান হাতের তালু ওপর দিকে রেখে কয়েক বিন্দু জল ধারণের জন্য করতল পাত্রের আকার করুন। গায়ত্রী জপের সময় বীজ-মন্ত্র গণনা করতে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা সকল আঙ্গুলের গ্রন্থিগুলি স্পর্শ করুন। গণনার সময় আপনার বাম হাত দ্বারা ডান হাত আবৃত করুন, বাম হাতের তালু নিম্নমুখী করে ডান হাতের সঙ্গে লম্বভাবে রাখুন।

(খ) অগ্নিবীজ-মুদ্রা : এই মুদ্রা বীজাক্ষর মুদ্রার সমরূপে ৬নং মুদ্রা দ্রষ্টব্য।

(গ) অমৃতবীজ-মুদ্রা : এই মুদ্রাও বীজাক্ষর মুদ্রার সমরূপ। পার্থক্য হল বামহাত নীচে এবং ডান হাত ওপরে রাখতে হবে। গায়ত্রী জপের সময় বাম হাতের ভিতর দিকের গ্রন্থিতে বীজাক্ষর গণনা করতে বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ব্যবহার করুন। ডান হাত দিয়ে বাম হাত আবৃত করুন।

৩৫) পরিশেষণ-মুদ্রা



বিশদ অর্চনায় আপনি ভোগ-নিবেদনের অঙ্গ রূপে পরিশেষণ মুদ্রা সম্পাদন করতে পারেন। ভগবানের আহার গ্রহণের পূর্বে দেহাভ্যন্তরস্থ পাঁচটি সূক্ষ্ম বায়ুকে (প্রাণ) খাদ্য নিবেদনের সঙ্গে জড়িত। প্রতিটি প্রাণবায়ুকে এই সময় একটি একটি করে মুদ্রা প্রদর্শন করতে হবে।

(ক) প্রাণ : ডান হাত নিম্নমুখী করে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা কনিষ্ঠা ও অনামিকার অগ্রভাগ স্পর্শ করে বিগ্রহের দিকে নির্দেশ করুন।

(খ) অপান : প্রাণ-মুদ্রার সমরূপ এই মুদ্রা, পার্থক্য শুধু বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ তর্জনী ও মধ্যমার অগ্রভাগ স্পর্শ করবে।

(গ) ব্যান : এটিও প্রাণ মুদ্রার সদৃশ, এখানে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ মধ্যমা ও অনামিকার অগ্রভাগ স্পর্শ করবে।

(ঘ) উদান : এই মুদ্রা প্রাণ-মুদ্রার সদৃশ হলেও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকার অগ্রভাগ স্পর্শ করবে।

(ঙ) সমান : এই মুদ্রাতে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ অন্য চারটি মুদ্রার অগ্রভাগ স্পর্শ করা ছাড়া অন্য প্রক্রিয়া প্রাণ-মুদ্রার সমরূপ।

কৃষ্ণ-মুদ্রা

রাধাকৃষ্ণের বিশদ অর্চনায় আপনি পাঁচ প্রকার মুদ্রা প্রদর্শন করতে পারেন। প্রভাতী অর্চনার প্রারম্ভে এই মুদ্রাগুলি দেখাতে হয়।

৩৬) শ্রীবৎস-মুদ্রা : উভয় হাতের তালু একত্রে জুড়ে আপনার বুকের ডান পাশে ধরুন এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠদ্বয় আড়াআড়ি ভাবে ধরে তর্জনী দুটি সোজা করে আপনার বিপরীত দিকে নির্দেশ করুন।



৩৭) কৌস্তুভ-মুদ্রা : শ্রীবৎস-মুদ্রার সদৃশ। তর্জনীর পরিবর্তে মধ্যমাদ্বয় সোজা করে আপনার বুকের বাম-দিকে মুষ্টিবদ্ধ জোড়া হাত দুটি ধরুন।



৩৮) বিল্ব-মুদ্রা : আপনার ডান হত দৃঢ়ভাবে মুষ্টিবদ্ধ করুন, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি অন্যান্য আঙ্গুলের মধ্যে ঢোকান এবং আপনার বক্ষস্থলের মাঝখানে মুষ্টিটি ধরুন। এরপর ডানহাতের চারপাশে বাম হাতটি জড়িয়ে ধরুন এবং নীচ থেকে আপনার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি ডান হাতের মুষ্টিবদ্ধ আঙ্গুলের ভিতর ঢুকিয়ে দিন।



৩৯) বনমালা-মুদ্রা : আঙ্গুলগুলি হাল্কাভাবে বাঁকিয়ে প্রতিটি হাতের মধ্যমার অগ্রভাগ দ্বারা সেই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ স্পর্শ করুন। এই অবস্থায় হাতদুটি পরস্পরের সমান্তরালে রেখে আপনার গলায় থাকা ফুলমালাকে নির্দেশ করে এক দুবার ওপর-নীচে সঞ্চালিত করুন।



৪০) বেণু-মুদ্রা : বেণু-বাদনের ভঙ্গীতে হাত দুটি মুখের কাছে এমনভাবে ধরুন যাতে আপনার বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আপনার অধরের কাছে থাকে, বাম কনিষ্ঠার অগ্রভাগ আপনার ডান বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগকে স্পর্শ করে এবং সর্বোপরি আপনার সকল আঙ্গুলই ঈষৎ বাঁকাভাবে অবস্থান করে।



পবিত্রতার ষট্ বিভাজন (ষড়-শুদ্ধি)

বিগ্রহ অর্চনায় পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজন। *হরিভক্তিবিলাসে* ছয় প্রকার পবিত্রতার কথা বলা হয়েছে। এগুলি অবশ্যই পালন করতে হবে :

১) স্থান-শুদ্ধি : পূজার জন্য পবিত্র স্থানের প্রয়োজন। পূজা-স্থান অপবিত্র হলে পূজা ফলপ্রসূ হবে না। সেইজন্য পূজারম্ভের পূর্বে স্থানের পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে অবশ্যই যত্ন নিতে হবে। কাজেই পূজা-স্থলকে শুভলক্ষণযুক্ত দ্রব্যদ্বারা সাজাতে হবে এবং মন্ত্র দ্বারা বিশুদ্ধ করতে হবে। *হরিভক্তিবিলাসে* নির্দেশ দিচ্ছে, *সম্মার্জনলেপনাদিনা বেদিকমণ্ডলনির্মাণাদিনা :* "পূজা স্থানটি যথাযথভাবে পরিষ্কার করুন, গোবর লেপনে বিশুদ্ধ করুন এবং সুন্দর ব্যবস্থার দ্বারা সুসজ্জিত করুন।"

২) দ্রব্য-শুদ্ধি : শাস্ত্র-বিধি অনুসারে নিবেদনীয় সকল দ্রব্যই আঙ্গিকভাবে পবিত্র হতে হবে। আঙ্গিক-শুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হলেই দ্রব্যসমূহকে মন্ত্র ও মুদ্রার দ্বারা বিশুদ্ধকরণ করতে হবে। *হরিভক্তিবিলাসের* নির্দেশ এই যে দ্রব্য-সামগ্রীসমূহকে পবিত্র বারি সিঞ্চনের দ্বারা পবিত্র করতে হবে : *শোধন-প্রোক্ষণাদিনা।*

৩) আত্ম-শুদ্ধি বা দেহের পবিত্রতা : কেউ যাতে ভগবানকে স্পর্শাদির দ্বারা সংক্রামিত করতে না পারে সেজন্য তাঁকে অবশ্যই সঠিক সময়ে ঘুম থেকে উঠে স্নান, বৈষ্ণবীয় অলংকার (তিলক, কণ্ঠী-মালা ও উপবীত) দ্বারা নিজেকে সজ্জিত ও শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করে তাঁর দেহকে পবিত্র করতে হবে। তারপর ভক্ত ভূত-শুদ্ধির মানসিক ধারায় সূক্ষ্ম পবিত্রতা প্রতিষ্ঠা করবেন। অবশেষে, ন্যাস ও মন্ত্রের দ্বারা ভক্ত তাঁর দেহকে কামলালসাদি থেকে মুক্ত করবেন।

৪) চিত্ত-শুদ্ধি : পূজারীর কাছে মন হল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মন অশুদ্ধ হলে অন্যান্য সকল শুদ্ধিকরণ পদ্ধতি অর্থহীন হয়ে পড়ে। বিশুদ্ধিকরণের অন্যান্য পদ্ধতি মনের বিশুদ্ধিকরণের সহায়ক। *হরিভক্তিবিলাস* চিত্ত-শুদ্ধিকে *চিন্তান্তরপরিত্যাগাদিনা* রূপে বর্ণনা করছে, অর্থাৎ কৃষ্ণবিহীন অন্য সকল চিন্তা ত্যাগ করতে বলছে। ভগবানের ধ্যান ও তাঁর মানস পূজার মাধ্যমেই এই বিশুদ্ধিকরণ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

৫) মন্ত্র-শুদ্ধি : গুরুদেব তাঁর শিষ্যকে বিগ্রহপূজার জন্য যে মন্ত্র দান করেন, পঞ্চরাত্রিক-পূজায় তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ভগবানের সান্নিধ্যলাভের শ্রেষ্ঠ উপায় হল শব্দ। ভগবৎ সেবায় মন্ত্রের পূর্ণ শক্তি ব্যবহারে আগ্রহী পূজারীকে অবশ্যই যথার্থ পারমার্থিক গুরুর কাছ থেকে সেইসব মন্ত্র লাভ করতে হবে। মন্ত্রাবলী যদি অপরাধমূলক জপ বা পূজার ফলে অপবিত্রতা দ্বারা আবরিত হয়, তা হলে তাদের ফলও কমে যাবে। অপরাধ পরিহার করে এবং সঠিকভাবে মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা পূজারী মন্ত্রের বিশুদ্ধতা বজায় রাখতে পারেন।

৬) মূর্তি-শুদ্ধি : পূজার পূর্বে পূজারী সুবাসিত জল, সূক্ষ্ম বস্ত্র ও মন্ত্র দ্বারা বিগ্রহকে পরিচ্ছন্ন করবেন।

এই ছয় প্রকার শুদ্ধি নিখুঁতভাবে সম্পাদনের পর পূজারী পূজার বাহ্য উপকরণ সম্প্রদান করতে পারবেন, এবং তাহলেই বিগ্রহ পূজা সফল হবে।

পবিত্রতা-অপবিত্রতা বিচার (শুদ্ধি-বিচার)

বৈদিক সমাজ স্থূল-সূক্ষ্ম উভয় প্রকার পবিত্রতা সম্বন্ধে অতি সজাগ। অপবিত্রতার মান অনুযায়ী এবং পবিত্রকরণ পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা অনুসারে লক্ষ্যবস্তুকে শ্রেণীবিভক্ত করা হয়েছে। একে বলে শুদ্ধি-বিচার—পবিত্রতা বজায় রাখার একটা বোঝাপড়া। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/২১/৭-১৫) উদ্ধবকে যে বহিঃরঙ্গ বর্ণনা দিয়েছেন তা পরবর্তী আদর্শগুলির সারাংশ :

হে ধর্মাত্মা উদ্ধব! কর্মসমূহের সঙ্কোচের জন্যই আমাকর্তৃক দেশকালাদি পদার্থ এবং ব্রীহি প্রভৃতি উপাদেয় রাশির গুণদোষ বিহিত হয়েছে।

দেশের মধ্যে কৃষ্ণসার-রহিত ও ব্রাহ্মণ-ভক্তি শূন্য দেশ এবং কৃষ্ণসারযুক্ত দেশ-মধ্যেও সৌবীর দেশব্যতীত অন্যদেশ, কীকটদেশ, মার্জনাদি সংস্কার শূন্য,ম্লেচ্ছাদিবহুল দেশ ও উষরদেশ অশুচি হয়ে থাকে।

দ্রব্যসম্পত্তি নিবন্ধন অথবা স্বভাবতঃ যে কাল কর্মযোগ্য, তাই তৎকর্মে প্রশস্ত এবং যে-কালে দ্রব্য-সম্পদের অভাব বা রাষ্ট্রবিপ্লবাদি নিবন্ধন কর্ম নিবৃত্ত থাকে অথবা যে-কাল সূতিকা শৌচাদি নিবন্ধন কর্মের অযোগ্য, তাকেই অশুদ্ধ কাল জানবে।

জলাদি দ্রব্যদ্বারাই দ্রব্যান্তরের শুদ্ধি ও মূত্রাদি দ্বারা তার অশুদ্ধি, শুদ্ধাশুদ্ধ সন্দেহ-স্থলে ব্রাহ্মণ-বাক্যে শুদ্ধি অন্যথা অশুদ্ধি, প্রোক্ষণাদি

পুষ্পাদির শুদ্ধি ও আঘ্রাণাদির দ্বারা অশুদ্ধি, দশাহাদি কাল-দ্বারা নতুন জলাশয়াদির শুদ্ধি অন্যথা অশুদ্ধি এবং অন্ত্যজাদিস্পৃষ্ট বৃহদ্ জলাশয়ের শুদ্ধি ও অল্প জলাশয়ের অশুদ্ধি হয়ে থাকে।

সূর্যোপরাগ বা সূতিকান্নাদির শক্তপুরুষের প্রতি অশুদ্ধি, অসমর্থ পুরুষের প্রতি শুদ্ধি, পুত্রজননাদিহলে দশাহাভ্যন্তর স্নানে অশুদ্ধি, তদ্বাহ্যস্নানে শুদ্ধি, জীর্ণমলিনবস্ত্রাদির সমৃদ্ধপুরুষের প্রতি অশুদ্ধি, দরিদ্র পুরুষের প্রতি শুদ্ধি জানবে। এই সকল দ্রব্য-বচনাদি দ্রব্যাশুদ্ধিদ্বারা আত্মার প্রতি যে পাপের সঞ্চার করে, তাও দেশ ও অবস্থা-ভেদেই জানতে হবে।

ধান্য, দারুময় গ্রহ-চমসাদি দ্রব্য, গজদন্তাদি অস্থি, তৈল-ঘৃতাদি রসদ্রব্য, সুবর্ণাদি তৈজস বস্তু, চর্ম এবং পার্থিব ঘটাদি পদার্থ কাল, বায়ু, অগ্নি, মৃত্তিকা ও জল আদির সমষ্টি সংযোগে অথবা প্রত্যেকের দ্বারা বিশুদ্ধি লাভ করে থাকে।

অশুচিপদার্থ-লিপ্ত পীঠ-পাত্র-বস্ত্রাদি যে পরিমাণ তক্ষণ, ক্ষার, অম্ল ও জল সংযোগে গন্ধ ও লেপ পরিত্যাগ করে স্বীয় রূপ প্রাপ্ত হয়, সেই বস্তুর সে-পরিমাণ তক্ষণাদি কর্মই শোধকরূপে বিহিত হয়েছে। স্নান, দান, তপস্যা, অবস্থা, শক্তি, সংস্কার, কর্ম এবং আমার স্মরণ দ্বারা আত্মার শুদ্ধি লাভ হয় এবং দ্বিজ পুরুষ শুদ্ধ হয়ে সর্বকর্মের আচরণ করে থাকেন।

সদ্‌গুরু-মুখ থেকে যথাযথ পরিজ্ঞান দ্বারা মন্ত্রের শুদ্ধি, আমার প্রতি অর্পণ-দ্বারা কর্ম-শুদ্ধি এবং শুদ্ধ দেশ, কাল, দ্রব্য, কর্তা, মন্ত্র ও কর্মদ্বারা ধর্ম সম্পন্ন হয়, এদের বিপর্যয়ই অধর্ম-হেতু জানবে।

শুদ্ধি-বিচার সম্পর্কে হরিভক্তিবিলাসে আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আছে। নিচে সেই সব বর্ণনার সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হল :

আত্ম-অশুদ্ধি

স্পর্শদ্বারা দূষিত হওয়ার জন্য পূজারীকে অবশ্যই অশুদ্ধ দ্রব্য যেমন দেহ-রন্ধ্র, কেশ, নিম্নাঙ্গ, নিম্নাঙ্গ-আচ্ছাদনকারী বস্ত্র, পদ, মেঝে বা যে কোন অশুদ্ধ-দ্রব্য স্পর্শ করার বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। কেউ যখন সতেজ দ্রব্য অর্পণ করতে যায় তখন, নিবেদিত দ্রব্যনিচয় অশুদ্ধ বলে বিবেচিত হয়। কাজেই নিবেদিত অর্ঘ্য স্পর্শ করা পরিহারের বিষয়ে পূজারীকে অবশ্যই সজাগ থাকতে হবে।

মনুর মতে দেহ থেকে ক্ষরিত অপবিত্রতা (মল) বারো প্রকার। প্রথম ছয় প্রকার অপবিত্রতার সংস্পর্শে আসার পর মাটি (বা সাবান) ও জল দিয়ে দেহ পরিষ্কার করে নিজেকে অবশ্যই বিশুদ্ধ করতে হবে। এই ছয় প্রকার অপবিত্রতা হল : মেদ, বীর্য, শোণিত, মজ্জা, মূত্র ও মল।

শুধু জলই পরবর্তী ছয় প্রকার অপবিত্রতা থেকে কাউকে বিশুদ্ধ করতে পারে। এই অপবিত্রতাগুলি হল : কফ, কাশি, অশ্রু, ঘাম, কর্ণমল ও নেত্রমল।

অন্যান্য সংক্রমণকারী শক্তিগুলি হল সুরা, ইতর প্রাণী যেমন, শূকর, গর্দভ, কুকুর ও কাক, নিম্ন-শ্রেণীর লোক (চণ্ডাল ও ম্লেচ্ছ), কেশ, নখ, হাড়, মৃতদেহ (মানুষ বা পশু), শ্মশানের ধোঁয়া, ঋতুমতী মহিলা, ভোজন, নিদ্রা, যৌনতা, মলমূত্র ত্যাগ, পাপপূর্ণ কর্ম, উচ্ছিষ্ট (ভুক্তাবশেষ), এবং নিকট আত্মীয়ের জন্ম বা মৃত্যু।

ছোঁয়াচে রোগও সংক্রমণকারী। একজিমা জাতীয় চর্ম-রোগে ভোগা কোন ব্যক্তির রান্নাঘরে প্রবেশ করা বা বিগ্রহ-পূজা করা উচিত নয়। কারও কোন ক্ষত বা আঘাত যদি পূজার উপকরণ বা শ্রীবিগ্রহকে সংক্রমিত করতে পারে, তবে সেই ব্যক্তিকে রান্না বা পূজার কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। শ্বসন জনিত রোগাক্রান্ত কোন ব্যক্তির রন্ধনগৃহে প্রবেশ করা উচিত নয়।

দেহ-শুদ্ধি

জল ও মাটি (বা সাবান) ব্যবহার করে, শয্যা ত্যাগের পর ভক্ত বুরুশ দ্বারা দন্ত মঞ্জন করে এবং নিজেকে জলে ডুবিয়ে রেখে দেহ ও দেহরন্ধ্র পরিষ্কার করবেন।

যখন নাভীর নিম্নাঙ্গ ও পুরোবাহু মদ্য বা প্রথম ছয় প্রকার শারীরী অপবিত্রতা দ্বারা সংক্রামিত হয়, তখন দেহের সেই সংক্রামিত অঞ্চল মাটি (বা সাবান) ও জলের দ্বারা বিশুদ্ধ করে নেওয়া উচিত।

আবার যদি দেহের উর্ধ্বাঙ্গ সংক্রামিত হয়, তখন সারা শরীর মাটি (বা সাবান) ও জলের দ্বারা বিশুদ্ধ করে নিতে হবে এবং তৎপরে পূর্ণ অবগাহন করতে হবে।

যৌন মিলনের পর, দুঃস্বপ্ন দেখার পর, ক্ষৌরকর্ম, বমন, কোষ্ঠপরিষ্করণ বা মৃতদেহ স্পর্শের পর, ঋতুস্নাতা নারী, চণ্ডাল অথবা মৃত পশু বা এর মেদ বা হাড় স্পর্শের পর স্নান করে নিজেকে বিশুদ্ধ করতে হবে।

ঋতুমতী নারী* ঋতুচক্রের চতুর্থ দিনে, স্নান করে নিজেকে শুদ্ধ করবে। একজন মন্দমনের মহিলা ঋতুস্নানের দ্বারাই বিশুদ্ধ হয়। কাশি বা হাঁচির পর আচমন করতে হয়। এছাড়াও আহার, নিদ্রা, পান, স্নান, সজ্জা, নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ, অথবা রাস্তায় হাঁটা, মূত্র ও মল ত্যাগের পর এবং চণ্ডাল ও ম্লেচ্ছদের সঙ্গে কথা বলার পর আচমন করা বিধেয়।

ভোজন, শাস্ত্র অধ্যয়ন বা যে কোন ধর্মীয় কাজ সম্পাদনের পূর্বেও আচমন করা কর্তব্য।

জ্ঞানী ব্যক্তি ধৈর্য, বদান্যতা, জপ ও তপশ্চর্যা দ্বারা পাপ মুক্ত হয়ে নিজেকে বিশুদ্ধ করেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করে ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ হন।

সত্যের পথ অনুসরণের সিদ্ধান্ত দ্বারা ভক্ত তাঁর অনিয়ন্ত্রিত মনের হাত থেকে মুক্ত হয়ে নিজেকে বিশুদ্ধ করেন।

ভক্ত জ্ঞান ও তপশ্চর্যার দ্বারা দেহ-বোধ-মুক্ত হয়ে নিজেকে বিশুদ্ধ করেন। তিনি চিন্ময়-শিক্ষা গ্রহণের দ্বারা কারও কোন প্রভেদ না করে নিজের ক্ষমতাকে বিশুদ্ধ করেন।

চিত্ত-শুদ্ধি

কারও চিত্ত প্রথমে বৈষ্ণব দীক্ষা দ্বারা শুদ্ধ হয়, এর দ্বারাই ভগবানকে পূজার জন্য কেউ বৈষ্ণব মন্ত্র গ্রহণ করে, তারপর কারও নিত্য সাধনা ও বৈষ্ণব আচার (সঠিক বৈষ্ণব আচরণ) সম্পাদনের দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি হয়। চিত্ত-শুদ্ধি অধিক পরিমাণে দেহ-শুদ্ধির সঙ্গে পরস্পর সম্পর্কিত। *বিষ্ণু-স্মৃতিতে* সংক্রামিত দেহ ও মনকে শুদ্ধি করণ পরিচালিকা শক্তির তালিকা দেওয়া আছে। সেগুলি হল চিন্ময় জ্ঞান, তপশ্চর্যা, কিছু বিধিবদ্ধ কার্যক্রম (যেমন, সন্ধ্যায় গায়ত্রী জপ), অগ্নি, কিছু ভোজ্যবস্তু (যেমন, পঞ্চ-গব্য), মাটি, জল, গোবর, বায়ু, সূর্য, কাল (সময়), এবং রান্না করা দানাশস্য।

---

* কোন নারীর মাসিক কাল তিন দিনের বেশি স্থায়ী হলে, ঐ সময়কালে সেই নারীকে বিগ্রহ স্পর্শ থেকে বিরত থাকতে হবে। অথবা ঐ সময়কাল প্রকৃতই উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিগ্রহ পূজার সঙ্গে সম্পর্কিত কোন কাজই তার করা উচিত নয়। এই নিষেধের অন্তত এইটুকুই কারণ যে, ঋতুস্নানজনিত সংক্রমণ মলত্যাগের পর স্নান না করার সামিল। শ্রীল প্রভুপাদ একটি চিঠিতে লিখেছেন যে স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে এই রজঃস্রাব কালীন সময়ে অবাধে বিগ্রহ পূজা চালিয়ে যাবার এটা একটা ব্যতিক্রমী নিয়ম হিসাবে ধরা যেতে পারে। কিন্তু রজস্বলা নারীর পক্ষে বিগ্রহপূজা না করাই সবচেয়ে ভাল। এই অনুমতিকে ব্যতিক্রম হিসাবেই বুঝতে হবে, অথবা এই সময়ে গৃহদেবতার পূজার ক্ষেত্রে এটা চলতে পারে। মন্দির পরিচালকবৃন্দেরা এই সব অসুবিধা কমানোর জন্য নারী ভক্তের চেয়ে পুরুষ ভক্তদেরই মন্দিরে বিগ্রহপূজা কার্যে নিয়োগে উৎসাহী।

এগুলির মধ্যে খাদ্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। কেউ যদি বিশুদ্ধ খাদ্য খায় তবে সে বিশুদ্ধ হয়ে যায়। আর যদি দূষিত খাদ্য খায়, তবে সে দূষিত হয়। সুতরাং তাকে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে যাতে সব সময়ই সে বিশুদ্ধ খাদ্য গ্রহণ করতে পারে।

যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার ফলে আহার্য-দ্রব্যসমূহ শুদ্ধ হয় এবং তা আহার করার ফলে জীবের সত্তা শুদ্ধ হয়, সত্তা শুদ্ধ হবার ফলে স্মৃতি শুদ্ধ হয় এবং তখন সে মোক্ষলাভের পথ খুঁজে পায়। এইসব একত্রে যুক্ত হয়ে কৃষ্ণভাবনামৃতে পৌঁছে দেয়। আজকের দিনের সমাজে এটারই খুব প্রয়োজন। (ভঃ গীঃ ৩/১১ তাৎপর্য)

বিশুদ্ধ বস্তুসমূহ

নিম্নোল্লেখিত বস্তুগুলির সংস্পর্শে এলে কোন জীবের শুদ্ধ হবার প্রয়োজন নেই, কারণ সেগুলি শুদ্ধ বলে বিবেচিত হয়—বাজারে বিক্রয়ার্থ বস্তু, ভিক্ষা-লব্ধ সামগ্রী, ছাগ অথবা

ঘোড়ার মুখ, নকুল, গাভী (গাভীর মুখ ব্যতীত, এটা অশুদ্ধ), হাতী, ঘোড়া, মৌমাছি, দুগ্ধপানরত গো-বৎস, গো-মূত্র, গোবর, দুধ, দই, ঘি ও রোচনা, ভাজা বা ঝলসানো খাদ্য (মাছ, মাংস ও ডিম ব্যতীত), কারিগরের হাত, যেমন কুম্ভকার, সূর্য বা চন্দ্রকিরণ, অগ্নি, বায়ু, শিশির বা চলমান জল, বৃক্ষছায়া, কুশ ঘাস, মধু, ফল, বা নির্যাস, অথবা নির্ভরশীল কোন ব্যক্তির দ্বারা প্রশংসিত কোন বস্তু শুদ্ধ বলে বিবেচিত।

ভগবৎ-প্রসাদ শুদ্ধ বলে বৈষ্ণবেরা সম্ভব হলে শুধু ভগবৎ-প্রসাদ গ্রহণেই যত্নবান হন। প্রসাদ শুদ্ধ বলে প্রসাদ গ্রহণের পর কোন ভক্তের বিগ্রহ পূজার পূর্বে স্নানের কোন প্রয়োজন নেই।* প্রসাদ গ্রহণের সময় ভক্ত তাঁর হাত দ্বারা বা কোন বাসন যেমন পেয়ালা বা চামচের দ্বারা (উদাহরণ হিসাবে, যখন মহা-প্রসাদের সামান্য অংশ গ্রহণ করেন) তাঁর মুখ-গহ্বর স্পর্শ করেন না। তারপর বিগ্রহ পূজার পূর্বে তাঁকে তাঁর পোশাক পরিবর্তন করতে হয় না। যাইহোক আহার গ্রহণের সময় যদি তাঁর হাত মুখ-গহ্বর স্পর্শ করে তবে তাঁকে বিগ্রহ পূজার সময় অবশ্যই পরিচ্ছন্ন বস্ত্র পরিধান করতে হবে।

* যাই হোক পূজারী অবশ্যই ভালভাবে জল দিয়ে তাঁর হাত-পা ও মুখ ধোবেন। তারপর তিনি পূর্ণ আচমন সম্পন্ন করবেন। তিনি যদি পরে স্নান না করেন তবে আর তাঁর দাঁত পরিষ্কারের প্রয়োজন নেই। বিগ্রহ পূজার পূর্বে কিছু আহার না করাই সবচেয়ে ভাল, কারণ কেউ উদ্গিরণের দ্বারা ভগবানকে আহত করতে পারে। ভরা-পেটেও সেবায় সঠিকভাবে মনোনিবেশ করা যায় না। বিগ্রহ কক্ষে প্রত্যক্ষভাবে সেবাকার্য সম্পাদনে পূর্ণ মনোসংযোগের দরকার। নিয়ম-সর্বস্ব সেবা নয়, কারণ পূজারীকে সেখানে ভগবানের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি সম্বন্ধে সজাগ থাকতে হয়।

দ্রব্য-শুদ্ধি

কোন দ্রব্য যদি পূর্ব-প্রদত্ত অশুদ্ধ দ্রব্যের সংস্পর্শে আসে তবে তা অশুদ্ধতা দ্বারা সংক্রামিত হয়। কোন দ্রব্য যখন দেহগত প্রথম ছয়টি অশুদ্ধ বস্তুর সংস্পর্শে আসে তখন গুরুতর দূষণ ঘটে অথবা যদি কখনও এই দ্রব্য অতি-দূষিত বস্তু যেমন মদ আদির স্পর্শ পায় তখনও এর ব্যতিক্রম হয় না। পূজার সময় অনিবেদিত বস্তু স্পর্শ করলে, পঞ্চ-পাত্র থেকে জল নিয়ে সামান্য-অর্ঘ্য সম্পাদন দ্বারা পূজারীকে তাঁর হস্ত-শুদ্ধি করতে হয়।

অশুদ্ধ বিবেচিত বাম হস্তের দ্বারা স্নানরত বিগ্রহকে সরাসরি স্পর্শ করা উচিত নয়। (বিগ্রহটি ধাতু নির্মিত হলে, পালিশের সময়ে পূজারী বিগ্রহটিকে বাম হস্তে ধৃত বস্ত্র দ্বারা ধরে থাকতে বা স্পর্শ করতে পারেন।)

বিভিন্নভাবে দ্রব্যসকল দূষণ মুক্ত হতে পারে। এটা দ্রব্যের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে। গুরুতর দূষণের ক্ষেত্রে, লৌহ নির্মিত অথবা কোন সমতুল্য ধাতু নির্মিত দ্রব্য আগুনের দ্বারা শুদ্ধ হয় (বস্তুটি গরম হয়ে লাল না হওয়া পর্যন্ত), মণি, রত্ন ও শঙ্খ দূষিত হলে সাত রাত মাটিতে পুঁতে রাখতে হয়, পশুশৃঙ্গ, গজদন্ত ও কচ্ছপের খোলার তৈরি কোন জিনিস দূষিত হলে উপরিভাগের রেখাদি ঘর্ষণের দ্বারা এবং কাপড়ের দূষিত অংশ বাদ দিয়ে দ্রব্য শুদ্ধি করা হয়। কাঠের তৈরি দ্রব্য বা মাটির পাত্র দূষিত হলে তা ছুড়ে ফেলে দিতে হয়।

অশুদ্ধি দ্রব্যের সংস্পর্শে যেমন, খাদ্যাবশিষ্টের দ্বারা কোন দ্রব্য সামান্য দূষিত হলে নিম্নলিখিত উপায়ে তাকে শুদ্ধ করতে হবে : স্বর্ণ, রৌপ্য, শঙ্খ, মণি, রত্ন ও চামচ জলের দ্বারা শুদ্ধ করা হয়, যজ্ঞ-পাত্র যেমন স্রুক্ ও স্রুব (কাঠের হাতা), গরম জলে ধুয়ে, অন্য যজ্ঞ-পাত্র কুশঘাস দ্বারা ঘষে, জল দিয়ে ধুয়ে শুদ্ধ করতে হবে, আসন, শয্যা এবং যান জলের দ্বারা, এবং শস্যদানা, মৃগচর্ম, বস্ত্র,* সূত্র, ক্ষৌম বস্ত্র, ফলাদি, পুষ্প, তৃণ ও পত্র যদি অতিরিক্ত পরিমাণে দূষিত হয় তবে জলে ধৌত করে, বা যদি দূষণের পরিমাণ লঘু হয় তবে শুধু জল সিঞ্চনের দ্বারা শুচি করতে হবে।

আমরা স্বল্প দূষিত দ্রব্যের শুদ্ধিকরণ পদ্ধতির আলোচনা করছি : কম্বলাদি ক্ষার বা রীঠা ফলের দ্বারা, রেশমী বস্ত্র লোনা মাটির দ্বারা, ক্ষৌমবস্ত্র শ্বেত সরিষা চূর্ণের দ্বারা, সুতি বস্ত্র ক্ষার ও জলের দ্বারা ধুয়ে আলো-বাতাসে শুকিয়ে শুদ্ধ করা হয়। লৌহ ও কাংস্য ভস্মের দ্বারা টিন, তামা ও সীসা তেঁতুল ও জলের দ্বারা শুদ্ধ করা হয়। কাষ্ঠ ও গৃহতল ঘষে এবং তরল বস্তু

---

* ধোবী (পেশাগত ধোপা) দ্বারা কাচা কাপড় শুচি বলে বিবেচিত হয় না, এই বস্ত্র পূজারী বা বিগ্রহের ভোগ রন্ধনকারীর পরিধান করা উচিত নয়। শুষ্ক-ধৌতকরণ পদ্ধতিও শুচি নয়, কারণ এই পদ্ধতিতে সবচেয়ে অপবিত্র বস্তু অ্যাল্‌কোহলের ব্যবহার করা হয়।

নিঙড়ে জল বার করে দিয়ে শুদ্ধ করা হয়, লাউখোলা বা নারকেল শোধন করা হয় গো-পুচ্ছের বুরুশ দিয়ে ঘর্ষণ করে। চকচকে জেল্লাদার মাটির পাত্র শুধু-জল দ্বারা এবং বিভিন্ন প্রকারের অন্য দ্রব্য শুধু জল সিঞ্চন করেই শুদ্ধ করা হয়। অপক্ক চালের খারাপ অংশ এবং রন্ধন করা চালের অশুচি অংশ বর্জন, গায়ত্রী জপ এবং জলের সঙ্গে চাল ছিটিয়ে বিশুদ্ধ করা হয়। সম্মার্জন এবং গোময় ও জল দ্বারা বিলেপন, গোমূত্রাদি সেচন, দহন, গরুর ক্ষুর মাড়ান, সময়ের ব্যবধানে খননের দ্বারা ভূমি-শুদ্ধি হয়। নৌকা, পথ, তৃণ ও ইটের তৈরী বাড়ি জল ও বায়ুর দ্বারা পরিশুদ্ধ হয়। কারও স্নানের বা বিগ্রহ পূজার জল শুদ্ধ হয় বহমান, স্বচ্ছ, সুমিষ্ট ও সুবাসিত জলের দ্বারা। পছন্দের ক্রম অনুসারে নিম্নোল্লেখিত উৎস থেকে জল সংগ্রহ করা উচিত : গঙ্গা বা যমুনা, অন্যান্য তীর্থক্ষেত্র, যে নদী সরাসরি সমুদ্রে পড়েছে (যেটা কোন উপনদী নয়), উপনদী সম্বলিত নদী, প্রাকৃতিক ঝর্ণা, হ্রদ, জলাশয়, মনুষ্যকৃত বিশাল জলাধার, মনুষ্যকৃত ক্ষুদ্র জলাধার, কূপ ও পাত্র।

মন্ত্রের প্রতি সংক্ষিপ্ত আভাস

উপাসনার বিভিন্ন পর্যায়ে বিগ্রহ-পূজাকালে বিভিন্ন প্রকার মন্ত্রের প্রয়োগ করা হয়। শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে এই সকল মন্ত্র হল নামাত্মক মন্ত্র : ঈশ্বরের পবিত্র নামই হল এই সব মন্ত্রের মূল। শেষ পর্যন্ত সকল উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রেই এই পবিত্র নামই যথেষ্ট। কিন্তু আমাদের সাহায্য করতে পবিত্র নাম জপের স্তরে এসে বিগ্রহ পূজা পদ্ধতির মধ্যে এই নামাত্মক-মন্ত্রই উপযোগী।

নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলি হল বিগ্রহ পূজায় ব্যবহৃত প্রাথমিক পর্যায়ের মন্ত্র :

১) ধ্যান-মন্ত্র : ভক্তের মনে ভগবানের আকৃতি, কার্যাবলী, পার্ষদ ও ধামের মিনতিপূর্ণ আহ্বানে ব্যবহৃত হয়।

২) বীজ-মন্ত্র : দ্রব্য-শুদ্ধি ও ধ্যান কার্যে ব্যবহৃত হয়।

৩) মূল-মন্ত্র : বিগ্রহের অপরিহার্য উপাদান হওয়ায় পূজার সকল দ্রব্য অর্পণ কালে ভগবানকে আহ্বানের উপায়রূপে আবৃত্তি করা হয়।

৪) স্তুতি ও স্তোত্র : (প্রার্থনা ও মহিমা) পূজা শেষে ভগবানের নামের মহিমা, আকৃতি, গুণাবলী ও লীলা কীর্তন করা হয়।

৫) প্রণাম মন্ত্র : পূজাশেষে ভগবানকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের সময় প্রণাম-মন্ত্র ব্যবহার করা হয়।

৬) গায়ত্রী-মন্ত্র : ভগবানের পূজা, সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন এই তিনটি আদর্শকে মিনতি পূর্বক আহ্বানকালে ব্যবহার করা হয়।

পারমার্থিক গুরু কর্তৃক মন্ত্রদান (গুরু-দত্ত-মন্ত্র)

পারমার্থিক গুরুর মুখ থেকে মন্ত্র যখন শিষ্যপরম্পরায় শ্রুত হয় তখনই মন্ত্রের শক্তি প্রকাশিত হয়। পঞ্চরাত্রিক প্রবর্তন কালে গুরু শিষ্যকে পঞ্চরাত্রিক অনুমোদিত এবং শিষ্যপরম্পরায় অনুবর্তিত মন্ত্রদান করেন। *পদ্মপুরাণ* বলছেন যে-মন্ত্র গুরু পরম্পরার ঐতিহ্যগতভাবে আসে না, সেই মন্ত্র আকাঙ্ক্ষিত ফলদায়ী হয় না।

> *সদ্‌গুরুর কাছ থেকেই সমস্ত মন্ত্র গ্রহণ করতে হয়, তা না হলে সেই মন্ত্র ফলপ্রসূ হয় না। (শ্রীমদ্ভাগবত ৬/৮/৪২ তাৎপর্য)*

শাস্ত্রমাধ্যমে প্রকাশিত, গুরু-প্রদত্ত এই মন্ত্র শ্রীবিগ্রহ থেকে অভিন্ন। গুরু-মন্ত্র শিষ্য কাউকে প্রকাশ করে না।

গুরু-প্রদত্ত মন্ত্রের বিষয় বা দেবতাগণ কোনো সম্প্রদায়ের আদর্শ পূজনীয় বিগ্রহ। পঞ্চরাত্রিক-বিধি* অনুসারে এই সকল মন্ত্র বিগ্রহের উপাসনা কালে শিষ্য ব্যবহার করে থাকে।

বীজাক্ষর ও মূল-মন্ত্র

পঞ্চরাত্রিক পূজার একটি তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল, বিশেষ শক্তি ও বিগ্রহকে চিহ্নিত করতে বীজাক্ষরের ব্যবহার। *নারদ-পঞ্চরাত্র* ব্যাখ্যা করছে যে বীজাক্ষর হল তেমন মৌলিক শব্দাংশ যার বীজ উচ্চারণকারী কোন ব্যক্তির ভিতর-বাইরে শক্তি উৎপাদনকারী বিশেষ ক্ষমতা আছে।

সংস্কৃত বর্ণমালার ধ্বনি হল চিন্ময় প্রতিরূপের প্রতিফলন যা সুপ্ত-অবস্থায় মায়াবদ্ধ জীবের মধ্যে অনুরণিত হচ্ছে। এই বর্ণমালার প্রতিটি ধ্বনিরই এক বিশেষ ধরনের শক্তি আছে। এই সহজতম ধ্বনির সমন্বয়েই বীজের সৃষ্টি যার আরও বিশেষ গুণ আছে এবং পরিমাণগতভাবে যা কোন বিশেষ চিন্ময় বিগ্রহের সমান। কিছু আদর্শ বীজের উল্লেখ করা হচ্ছে : ওঁ হল সৎ-*বীজ*, যা চিরস্থায়ীত্বের

---

* শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর গুরুদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করে মূল-মন্ত্র ও গায়ত্রী-মন্ত্র সহ গুরুদেব, শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু এবং শ্রীকৃষ্ণের পূজার জন্য পঞ্চরাত্রিক প্রবর্তন করেছেন। অন্যান্য বিগ্রহ-পূজায় যেমন, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এবং শ্রীরামচন্দ্র, এই পুস্তকের ১৬২ নং পৃষ্ঠায় প্রদত্ত কোন ব্যক্তির নিজ গুরুদেব অথবা তাঁর অনুমোদিত কোন প্রতিনিধির নিকট থেকে শ্রুত অন্যান্য মূল-মন্ত্র ব্যবহৃত হতে পারে। শ্রীল প্রভুপাদ-প্রদত্ত গায়ত্রী-মন্ত্র সকল বিগ্রহ-পূজার ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যায়। উদাহরণ হিসাবে নিত্যানন্দ প্রভুর জন্য (বা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্যান্য পার্ষদবর্গ) ভক্ত ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সম্প্রসারিত রূপের কোন বিশেষ বিগ্রহের চিন্তা করে গৌর-গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতে পারেন। আবার কোন বিশেষ বিগ্রহকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সম্প্রসারিতরূপ হিসাবে ভাবনা করে শ্রীরামচন্দ্র বা শ্রীনৃসিংহদেবের জন্য কাম-গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতে পারেন।

শক্তিকে আহ্বান করে। *ঐং*, *হ্রীং* ও *শ্রীং*-এর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে চিৎ, বা জ্ঞান, শক্তিকে আহ্বান করে। *ক্লীং* আনন্দ বা পরম সুখ আহ্বান করে, এটা সকল কামনা পূরণ করে এবং এই জন্য একে বলে কাম-বীজ।

বীজ এবং বীজের সংমিশ্রণ সেটা একটিই হোক বা বহুই হোক বা বিগ্রহের নামের সংমিশ্রণই হোক—তা মূল মন্ত্র অথবা বিগ্রহের ধ্বনি-প্রতিনিধির সৃষ্টি করে। এই মূল-মন্ত্রাবলী পূজিত বিগ্রহের থেকে পৃথক হওয়ায়, সেই বিগ্রহসকলের প্রতি মন স্থির করতে ধ্যানকালীন সময়ে জপ করা হয়। দ্রব্য-শুদ্ধির জন্যও মূল-মন্ত্রের ব্যবহার করা হয়, যাতে ভগবানের সেবা, ভগবানকে তৈরী করা আসনে আনয়ন করা এবং ভগবানের সেবার জন্য পূজা-উপচার সমর্পণ করা যায়।

মূল-মন্ত্র এবং উপচার নাম সমূহ

চতুর্থ অধ্যায়ে ১৬২-১৬৫ পৃষ্ঠায় মূল মন্ত্র এবং উপচার নাম সমূহ বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

গায়ত্রী মন্ত্র

প্রাচীন বৈদিক প্রথা মন্ত্রজপের বিধান দিয়েছে। এই বিধানে মন্ত্র জপ শুরু করতে হবে '*ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ* (ব্রহ্ম-গায়ত্রী) দ্বারা বা, গায়ত্রী-জপ (সন্ধ্যা বন্দনাও বলা হয়) হল উচ্চবর্ণের জন্য অন্যতম সাধনা। পঞ্চরাত্রিক সাধনার প্রস্তাবনায়, গায়ত্রীমন্ত্র কোন নির্দিষ্ট বিগ্রহের ধ্যানের জন্যও প্রবর্তিত হয়েছিল। আমরা প্রতি সকাল, দুপুর ও বিকালে ব্রহ্ম-গায়ত্রী ও পঞ্চরাত্রিক গায়ত্রী মন্ত্র (এবং গুরু-প্রদত্ত মূল-মন্ত্র) প্রতিটি মন্ত্রই দশবার করে জপ করি।

পঞ্চরাত্রিক উপাসনায় ব্যবহৃত গায়ত্রী মন্ত্রে ধ্যানের তিনটি স্তর আছে : সম্বন্ধ (সম্পর্ক), ভগবানের স্বীকৃতি (বিদ্) দ্বারা, অভিধেয় (পদ্ধতি) বা ভগবানের উপাসনা (ধী) যার দ্বারা কেউ প্রেমের বৃদ্ধি ঘটাতে পারে, এবং প্রয়োজন (ফল) বা প্রেম, যা ভক্তকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভগবানের প্রতি অনুপ্রাণিত (প্রচোদয়েৎ) করে।

উপাসনা শেষে বিগ্রহের মূল-মন্ত্রের সঙ্গে কোন নির্দিষ্ট বিগ্রহের জন্য উপযুক্ত গায়ত্রীমন্ত্র জপ হিসাবে কীর্তন করা হয়। মূল-মন্ত্র ও গায়ত্রীমন্ত্র চিন্ময় ধ্বনি হওয়ার জন্য যখন কোন উন্নত ও উপলব্ধ ভক্তদ্বারা উচ্চারিত হয়, তখন এই মন্ত্রগুলি অতীব শক্তিশালী হয়। কেউ যদি উপলব্ধির জন্য এই মন্ত্র কোন উপলব্ধ আত্মার নির্দেশনায় বিশ্বাস ও বিশুদ্ধতার (অপরাধ শূন্যতা) সঙ্গে উচ্চারণ করে, তবে তার মধ্যে পূর্ণ শক্তি জাগরিত হয়। মূলমন্ত্র ও গায়ত্রীমন্ত্র জপ বিগ্রহের অপার্থিব রূপের উপলব্ধির প্রতি চালিত করে।

ভক্তিপূর্ণ সেবায় একদিনের প্রস্তুতি

সেবা-প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত বিশ্রাম গ্রহণ

অতি প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করে উদ্দীপনার সঙ্গে ভগবানের সেবাকার্য শুরু করতে হলে নিদ্রা সম্পর্কে আপনাকে কতিপয় নিয়ম পালন করতে হবে।

সময়মতো উঠতে হলে আপনাকে কোন নির্ভরযোগ্য এ্যালার্ম ঘড়ি বা কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তির প্রয়োজন।

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বলা হয়েছে মধ্যরাত্রির পূর্বসময়কালীন নিদ্রা খুবই উপকারী। অতএব, যত শীঘ্র যদি কেউ বিশ্রাম নেয়, তার স্বাস্থ্যের পক্ষে ততই উপকার। বিশ্রামের পূর্বে ভারী খাবার পরিহার করা কর্তব্য। এতে স্বপ্নদর্শনের সংখ্যা বেড়ে যায় এবং ঘুমেরও ঘাটতি হয়। রাত্রিতে খাদ্যহজমের গতিও খুবই কম।

মনোস্তাত্ত্বিক ও শারীরিক কারণে বিশ্রামের পূর্বে মল-মূত্রাদি ত্যাগ করতে হবে। ঠাণ্ডা জল দিয়ে হাত-মুখ ধোবেন। তারপর পা ধোবেন, আর সেটা ঐ ঠাণ্ডা জলেই। এরপর সেগুলি শুকাতে হবে। দিনের বেলায় আপনি হয়তো সব সময় সচেতনভাবে আপনার সেবা ও তার ফল ভগবানকে সমর্পণ করেন না। কাজেই বিশ্রামের পূর্বে আপনি সচেতনভাবে আপনার দিনের কার্যাবলী নিচে উল্লেখিত প্রার্থনার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করতে পারেন :

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা
বুদ্ধাত্মনা বানুস্মৃতা-স্বভাবাৎ ।
করোমি যদ্ যৎ সকলং পরস্মৈ
নারায়ণায়েতি সমর্পয়ামি ॥

আমি আমার শরীর দ্বারা যা কিছু সম্পন্ন করেছি, বাক্যের দ্বারা যা কিছু বলেছি, মনের দ্বারা যা কিছু চিন্তা করেছি, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যা কিছু অনুভব করেছি, অথবা বুদ্ধির দ্বারা যা কিছু উপলব্ধি করেছি, সে সমস্তই আমি পরম পুরুষ নারায়ণকে উৎসর্গ করেছি।

সেদিন আপনার কৃত ত্রুটিগুলি সংশোধন মানসে ভগবানের রূপের ধ্যান করুন এবং তাঁর নাম বিশেষ করে মাধব ও পদ্মনাভের (যথাক্রমে সন্ধ্যা এবং রাত্রির প্রথম ও দ্বিতীয় যামের রক্ষাকারী দেবতা) নাম জপ করুন। অধিকন্তু আপনার নিয়মিত উপাসনা করা বিগ্রহ সমূহের রূপ ও ধ্যান করুন।

প্রণামস্তুতি জপ করে আপনার গুরুদেবের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করুন এবং ভক্তিপূর্ণ সেবাকার্য অনুবৃত্তি করতে তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করুন।

শ্রীল প্রভুপাদ বিশ্রাম গ্রহণের পূর্বে কৃষ্ণ বিষয়ক গ্রন্থ পাঠেরও সুপারিশ করেছেন। এতে কৃষ্ণের লীলা সম্বন্ধে কল্পনা করতে সুবিধা হয়।

নিদ্রাকালে পূর্ব বা দক্ষিণদিকে মাথা রেখে শুতে হয়, কারণ পূর্ব-শিয়রে শয়ন করলে জ্ঞানের উন্মেষ হয় দক্ষিণ শিয়রে শুলে দীর্ঘ জীবন ও বল লাভ হয়। পশ্চিম ও উত্তর শিয়রে শয়ন পরিহার করা উচিত। পশ্চিমদিকে মাথা রেখে শুলে দুশ্চিন্তা হয় এবং উত্তর-শিয়রে শুলে অকাল মৃত্যু ঘটতে পারে।

বাঁ কাতে শোয়া সবচেয়ে ভাল, কারণ এতে হজমের সহায়ক হয়। কখনই উপুড় হয়ে শোওয়া উচিত নয়।

অধিক নিদ্রা বা স্বল্প নিদ্রা পরিহারে সচেষ্ট হবেন, অথবা দিবা নিদ্রা (সম্ভব হলে) বর্জন করুন। ত্রি-সন্ধ্যাতেও (সূর্যোদয়, দ্বিপ্রহর ও সূর্যাস্ত) নিদ্রা যাওয়া উচিত নয়। কারণ এই সময়গুলি ধ্যান ও উপাসনার জন্য খুবই উপযোগী। শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন :

> *প্রতিদিন ছ'ঘণ্টার বেশি কারও ঘুমানো উচিত নয়। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যে ব্যক্তি ছ'ঘণ্টারও বেশি সময় ঘুমিয়ে কাটায় সে অবধারিতভাবে তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত। যে মানুষ তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন সে স্বভাবতই অলস এবং অত্যধিক নিদ্রাতুর। এমন মানুষ যোগচর্চা করতে পারে না। (ভগবদ্গীতা ৬/১৬ তাৎপর্য)*

শরীর অসুস্থ না হলে কারও রাত্রিতে ছ'ঘণ্টার বেশি সময়, বা একটানা ঘুমানো উচিত নয়। অধিক বিশ্রামের প্রয়োজন হলে, কেউ দিনের বেলায় সামান্য ঘুমিয়ে নিতে পারেন।*

তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনাকে হ্রাস করতে একা ঘরে ঘুমানো পরিহার করতে হবে এবং কখনই নগ্ন হয়ে শয়ন করা উচিত নয়। শ্রদ্ধাবশত দিনের বেলায় পিপুল গাছের নীচে এবং রাত্রিতে গোশালায় শয়ন করা উচিত নয়। মাথায় বা শরীরে তেল দিয়ে শয়ন করা অপরিচ্ছন্নতা।

---

* যে পূজারীর উত্তর-সন্ধ্যা ও প্রাক্ প্রত্যূষেও সেবাকার্য আছে তাঁর সাধারণতঃ দিনের বেলায় অধিক বিশ্রামের প্রয়োজন। আদর্শগতভাবে, পূজারীদের জন্য অন্যান্য আশ্রম থেকে পৃথক্ বসবাসের ঘর থাকা উচিত। পূজার উন্নতমান বজায় রাখার জন্য পূজারীগণের শান্তিপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে বাস করা উচিত। সে স্থান যেন তাঁরা পরিচ্ছন্ন ও বিক্ষেপহীনতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত রাখতে পারেন। তাঁদের স্নানাগারের সুবিধা অন্যদের থেকে পৃথক্ হলে সেটাই হবে সবচেয়ে ভাল। এমন কি পূজারীদের কাপড় অন্যদের কাপড়ের সঙ্গে শুকোতে দেওয়া অনুচিত, কারণ অপরিচ্ছন্ন কেউ তা ছুঁয়ে ফেলতে পারে। সম্ভব হলে পূজারীদের আশ্রম বিগ্রহ-কক্ষের নিকটে হওয়া উচিত, কারণ তাঁদের একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল বিগ্রহদের কোনরূপ আক্রমণ থেকে রক্ষা করা।

দুঃস্বপ্ন ব্যর্থ করা

দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠে হরেকৃষ্ণ জপ করার পর গোবিন্দ, নারায়ণ, শ্রীধর, পুরুষোত্তম, বামন, শার্ঙ্গধর, খড়্গধারী এবং নৃসিংহ আদি পবিত্র নাম সমূহও জপ করতে পারেন। *হরিভক্তিবিলাস*ও বিভিন্ন শ্লোকের সুপারিশ করেছে যেগুলি কেউ আবৃত্তি করে দুঃস্বপ্নকে ব্যর্থ করতে পারেন (এই গ্রন্থেই একটি শ্লোক উল্লিখিত হয়েছে) শুকদেব গোস্বামী গজেন্দ্র-মোক্ষণ লীলা কোন বিকৃত না করে যথাযথভাবে কীর্তন করে দুঃস্বপ্নের নিবৃত্তি সাধনের সুপারিশ করেছেন। (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৮/৪/১৫)

মলমূত্র ত্যাগ ও শৌচ

এই সব ক্রিয়াকলাপের নিয়মাবলীর সারাংশ নিম্নে দেওয়া হল। *হরিভক্তিবিলাস* থেকে এই নিয়মগুলি সংগৃহীত হয়েছে। এই বিষয়ে উক্ত গ্রন্থটি *কাত্যায়নস্মৃতি, মনুস্মৃতি, বরাহ পুরাণ, ব্যাস-স্মৃতি, কূর্ম-পুরাণ* এবং *কাশী-খণ্ড* থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছে।*

কারণ এই সহায়ক পুস্তকে আমরা পঞ্চরাত্র-শাস্ত্র অনুসরণ করছি। এই শাস্ত্র বিশেষ করে নারীদের প্রাতঃ-স্মৃতি-কৃত্য (নিয়ন্ত্রিত প্রাতঃকৃত্যাদি) সম্বন্ধে কদাচিৎ পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশ দান করে। এই বিষয়ে প্রকাশিতব্য পরিশিষ্টে নারীদের প্রয়োজনের উল্লেখ করা যেতে পারে।

মল-মূত্র ত্যাগের নিয়মাবলী :

● বাইরে মল-মূত্র ত্যাগ করলে আরম্ভের আগে ঘাস, পাতা বা পাথর দিয়ে মাটি ঢেকে নিতে হবে। এটা ধরিত্রী মাতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন। নম্রতা প্রদর্শনের ভঙ্গি হিসাবে এক টুকরো কাপড় দিয়ে মাথাটাও ঢাকতে হবে।

বাড়ির ভিতর বা বাইরে শুচিতা পালনের ক্ষেত্রে নিচের নিয়মগুলি প্রযোজ্য :

---

* প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে, ভগবানের ভক্ত তাঁর জড় দেহের এমনভাবে যত্ন করেন যাতে তিনি দেহ-মনের দিক থেকে সামান্যতম সম্ভাব্য বাধাসহ ভগবানের সেবা করতে পারেন। পঞ্চরাত্র-শাস্ত্র (এবং সেই বিষয়ের জন্য সমগ্র বৈদিক সাহিত্য) এই উদ্দেশ্যে অসংখ্য নির্দেশ দান করছে। এখানে অনেক নিয়ম সরাসরি অনুসরণ করা সহজ মনে হলেও অন্য কিছু নিয়ম অনুসরণ করা কঠিন হতে পারে, এবং কিছু নিয়ম আছে যা প্রয়োগ করা বা কার্যকর করা অসম্ভবও হতে পারে।' যাই হোক' সকল ক্ষেত্রেই শুচিতা ও নিয়ামনের প্রাথমিক নীতি-নিয়ম মেনে চলতে হবে।

● বাথরুমে ব্যবহৃত জুতা বা চপ্পল শুধু বাথরুমেই ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু আসলে মল-মূত্র ত্যাগের সময় কোন পাদুকা ব্যবহার করা যাবে না।

● মল-মূত্র ত্যাগের সময় পিছনের কচ্ছ (কাছা) খুলে নিতে হবে। (কচ্ছ হল কৌপিন বা ধুতির যে অংশ এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়।) পাশ্চাত্য পোশাক পরা থাকলে এই নিয়ম কার্যকর হবে না।

● অন্ততপক্ষে ডান কানে* দুপ্যাঁচ উপবীত (গায়ত্রী সূত্র) জড়াতে হবে। অন্যথায় উপবীত অপবিত্র হবে এবং এটার পরিবর্তন করতে হবে।**

● স্বাস্থ্যের কারণে মল বা মূত্র ত্যাগের সময় উবু হয়ে বসাই সব থেকে ভাল।

● দাঁড়িয়ে, হাঁটা অবস্থায় অথবা স্নানের সময় প্রস্রাব করা উচিত নয়।

● মল-মূত্র ত্যাগের সময় কথা বলা, হাইতোলা বা হাঁচি দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

● যথাশীঘ্র কাজ শেষ করে, নিজেকে পরিচ্ছন্ন করে স্থান ত্যাগ করতে হবে।

মল-মূত্র ত্যাগের নিষিদ্ধ স্থান সমূহ

উন্মুক্ত স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করলে উপযুক্ত স্থান নির্ণয়ের জন্য শ্রদ্ধা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কিছু বিধিনিষেধ পালন করতে হবে। মল-মূত্র ত্যাগের জন্য পরিহর্তব্য স্থানগুলি হল : আবাদী জমি, শস্যক্ষেত্র, গোচারণ ভূমি, বড় রাস্তা বা পথ, নদী বা পুকুরের পাড়, জলের ভিতর, জনসমাগমের স্থান, অথবা কোন অন্ধকার জায়গা, অথবা কোন অগ্নিজনিত ভস্মস্তূপ, কোন পবিত্র স্থান, কোন মন্দির, শ্মশান-ঘাট, প্রাণী বসবাসকারী কোন গর্ত, বা কোন উই-ঢিবি। তদ্রূপ, কোন

---

* শরীরের অন্যান্য অঙ্গ যখন অপবিত্র হয়, ডান কানই তখন বিশুদ্ধ থাকে, কারণ ডান কানেই সকল তীর্থের অধিষ্ঠান।

** উপবীত পরিবর্তনের কারণ : উপবীতের এক তার সুতাও যদি ছিঁড়ে যায়, যদি গিট খুলে যায়, কেউ যদি অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় যোগ দেয়, কেউ যদি সদ্য প্রসূতিকে অথবা ঋতুস্নাতা নারীকে স্পর্শ করে এবং সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণের পর। এই সকল ক্ষেত্রে নতুন উপবীত ধারণের পূর্বে স্নান করে নতুন বস্ত্র পরিধান করতে হবে। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন যে, প্রতি পূর্ণিমায় বা সুতা ছিঁড়ে গেলেই ভক্তকে উপবীত পরিবর্তন করতে হবে। পুরানো উপবীত পরিবর্তন ও নতুন উপবীত ধারণের সময় পুরানো ও নতুন উভয় উপবীতই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে জড়িয়ে গায়ত্রী জপ করতে হবে। তারপর দেহ থেকে পুরানো উপবীত সরিয়ে ফেলতে হবে—মাথার ওপর দিয়ে তুলে নয়, বরং কেটে ফেলে (শ্রীল প্রভুপাদ যা করতেন) অথবা নীচের দিকে নামিয়ে পায়ের তলা দিয়ে বার করতে হবে। পুরানো যজ্ঞসূত্র কোন নদীতে, সরোবরে বা সমুদ্রে নিক্ষেপ করেও রেহাই পাওয়া যেতে পারে।

ব্যক্তি বা বৃক্ষের ছায়াকেও সম্মান করতে হবে। কারণ, স্থূল দেহের ছায়ার অভ্যন্তরে কোন সূক্ষ্মদেহ বৃদ্ধিলাভ করে।

মল-মূত্র ত্যাগের পর শোধন (শৌচ)

শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন :

এইভাবে, ব্রাহ্মণের নাম হল শুচি অথবা পরিচ্ছন্ন ব্যক্তি। প্রসাধন কক্ষ জল দ্বারা ধুয়ে হাত-পা সাবান দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। তারপর পদযুগল, মুখমণ্ডল ও মুখগহ্বর ধৌত করতে হবে। [শ্রীল প্রভুপাদের চিঠি ৮ জুলাই ১৯৭১ থেকে]

দেহের গোপন অংশ পরিষ্কার করুন (জল ও বাঁ হাতের ব্যবহার দ্বারা) তারপর দুটি হাতই সাবান দ্বারা পরিষ্কার করুন। মল বা মূত্র ত্যাগের পরই এটা প্রযোজ্য। মল ত্যাগের পর পায়ুও সাবান দ্বারা ধুতে হবে, বা উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ করলে মাটি ব্যবহার করতে হবে।

মলত্যাগের সময় শৌচকার্যের জন্য ব্যবহৃত জলপাত্র স্পর্শ করা যাবে না। স্পর্শ করলে সেই জলও অপবিত্র হয়ে যাবে। জলপাত্রটি ধাতু নির্মিত হলে, এটাকে পরিষ্কার মাটি দিয়ে মেজে শুদ্ধ করে নেওয়া যেতে পারে এবং অন্য কাজেও ব্যবহার করা যেতে পারে (উদাহরণ হিসাবে, স্নানকার্য)। এইভাবে যদি পাত্রটি শুদ্ধ করা না হয়, তবে স্নানের সময়ে বা স্নানের পরে এটাকে স্পর্শ করা যাবে না। স্পর্শ করা হলে আপনার দেহ পুনরায় অপবিত্র হবে। পাত্রটি অন্য পদার্থে তৈরী হলে সঠিকভাবে পরিষ্কার করা যাবে না, সেইজন্য শৌচকার্যের পরে একে স্পর্শ করা উচিত নয় (স্নানকার্যে ব্যবহার তো দূরের কথা)। শৌচকার্য সমাধা করার পর জল দিয়ে হাত-পা সম্পূর্ণরূপে ধৌত করে হাল্কাভাবে জল দিয়ে মুখমণ্ডল ধুয়ে ফেলবেন। এরপরই অবশেষে কান থেকে উপবীত ছাড়িয়ে নেবেন।

দন্ত মঞ্জন (দন্ত-ধাবন)

প্রত্যূষে স্নানের পূর্বে দাঁত-মুখ অবশ্যই পরিষ্কার করতে হবে, না হলে জপ-কীর্তন, বিগ্রহপূজা, যজ্ঞানুষ্ঠান বা অন্য কোন আধ্যাত্মিক আচার অনুষ্ঠান করা যাবে না। অপরিচ্ছন্ন দাঁতে আচমন করলে অপবিত্র থাকতে হবে। স্নানের পূর্বে অবশ্যই দন্ত-ধাবন করতে হবে, কারণ দাঁত-মুখ পরিষ্কার করার সময় মুখ থেকে লালা পড়ে শরীর ও কাপড়-চোপড় অপবিত্র হয়। কখনও স্নানকালে, বা মল-মূত্র

ত্যাগের সময় দাঁত ব্রাশ করতে নেই। দন্ত-ধাবনের জন্য গাছের ডাল* ব্যবহার করলে দিনে একবার বা দুবারের বেশি দাঁত ব্রাশ করা উচিত নয়। সকাল-সন্ধ্যায় স্নানের পূর্বে দন্ত-ধাবন করতে হয়। কারণ গাছের ডাল দিয়ে বারবার দাঁত ব্রাশ করলে দাঁত ক্ষয় হয়। আহারের পর শুধু জল দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করা সব থেকে ভাল। *হরিভক্তিবিলাসে* আহারের পর ঘোলবার জল দিয়ে মুখ ধোয়ার বিধান দেওয়া আছে। (এভাবে করলে খাবার পর মুখ যথেষ্টভাবেই পরিষ্কৃত হয়, ব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজা তখন অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। প্রতিবার আহারের পর দাঁত ব্রাশ করলে, প্রতিবারই স্নান করা উচিত। কিন্তু আহারের পর স্নান খুবই অস্বাস্থ্যকর, কারণ এটা শরীরকে ঠাণ্ডা করে এবং হজমে বাধা দেয়।) আলতোভাবে মুখ ধোওয়ার পর জিভ চেঁছে পরিষ্কার করলে স্নানের দরকার হয় না।

দন্ত-মঞ্জনের পদ্ধতি

জল দিয়ে বারোবার** মুখ ধুতে হবে। ব্রাশ বা গাছের ডাল ধুয়ে সরু দিকটি চিবিয়ে নিতে হবে। দাঁত ব্রাশ করতে করতেই মনকে বিশুদ্ধ ও অটল রাখতে নীরবে জপ-কীর্তন করতে হবে। দাঁত পরিষ্কার হবার পর, হয় ধাতু নির্মিত জিভ-ছোলা দিয়ে না হয় ঐ ডালটি চিড়ে মাঝখানে বাঁকিয়ে নিয়ে জিভ পরিষ্কার করতে হবে। তারপর পুনরায় জল দিয়ে আলতোভাবে বারবার মুখ ধুতে হবে। দাঁত ব্রাশ করা ও মুখ ধোয়ার সময় তর্জনীবাদে ডান হাতের সব আঙ্গুলই মুখে ঢুকতে পারে, বাঁ হাতের আঙ্গুল মুখে ঢোকান উচিত নয়।

যদিও মাসের কোন কোন দিন গাছের অপেক্ষাকৃত নরম ডাল দিয়ে দাঁত মাজা সাধারণতঃ নিষিদ্ধ (যেহেতু দুর্বল শরীরে মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়া বেড়ে

---

* বৈদিক পরম্পরা অনুসারে কোন বিশেষ গাছের ডাল বা পাতা দন্ত-ধাবনের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে, কারণ এতে পরিচ্ছন্নতার প্রাকৃতিক শক্তি আছে যা কিনা দাঁত ও মাড়িকে সুস্থ রাখে। বলা হয়ে থাকে যে কোন ব্যক্তি যদি সাদা রস নির্গমনকারী কোন গাছের ডাল দিয়ে দাঁত ব্রাশ করে তবে সে দীর্ঘ জীবন লাভ করে। তেতো ডাল দিয়ে দাঁত ব্রাশ করলে ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়, কটুস্বাদের ডাল দিয়ে দাঁত মাজলে শক্তি হয় এবং কোষ্ঠবদ্ধকারী শাখায় দাঁত মাজলে আরামদায়ক জীবন লাভ হয়। (উচ্চ দূষণ-প্রতিষেধমূলক নিমের ডালের ব্যবহার খুবই সাধারণ।) ডালটির ব্যাস হওয়া উচিত মাঝের বা কড়ে আঙ্গুলের সমান, দৈর্ঘ্য বারো আঙ্গুল (মাপটি হবে যার যার নিজের আঙ্গুলের সমান) এবং বাকল অক্ষত থাকতে হবে। পলাশ, বট অথবা পিপুল গাছের ডাল দিয়ে কারও দাঁত মাজা উচিত নয়, কারণ এই সকল গাছ পূজার্হ। মালতী, বিল্ব, করবী, অর্ক, খধির ও আম গাছের ডাল দিয়ে দাঁত মাজা পরিহার করা উচিত। (পাশ্চাত্য দেশে থাকাকালীন শ্রীল প্রভুপাদ প্রায়ই ইউক্যালিপটাস গাছের ডাল দিয়ে দাঁত মাজতেন।)

** শাস্ত্রে মুখ ধোওয়ার নির্দিষ্ট সংখ্যকবারের উল্লেখ আছে, কিন্তু আসল বিষয় কতবার মুখ ধোওয়া হল তা নয়, আসল বিষয় হল সম্পূর্ণরূপে ভালভাবে মুখ ধোওয়া।

যেতে পারে) কিন্তু বৈষ্ণবগণের তাদের আরাধ্য বিগ্রহের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ এই নিষিদ্ধ দিনগুলি না মেনে দৈনিক দাঁত মাজা উচিত। (যেই দিনগুলিতে গাছের অপেক্ষাকৃত নরম ডাল দিয়ে দাঁত মাজা নিষেধ, সেই দিনগুলিতে কোন কোন ভক্ত গাছের অপেক্ষাকৃত নরম ডালের পরিবর্তে একধরনের পাতা বা নরম ঘাস ব্যবহার করে থাকেন।)

আজকাল সাধারণতঃ কৃত্রিম দাঁত মাজার ব্রাশ ও টুথপেষ্ট ব্যবহৃত হয়ে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই, এক্ষেত্রে এইসব নিয়মসমূহের কোন কোনটি খাটে না। ব্যবহৃত দাঁত মাজার ব্রাশ নিয়মিত পাল্টানো উচিত।

মন্ত্র-স্নান

গায়ত্রী জপ ও এইরূপ পবিত্র কর্ম এবং যে অবস্থায় বরুণ-স্নান অসম্ভব (রন্ধন ও বিগ্রহ পূজার সময় বরুণ স্নানের বিকল্প হিসাবে বিবেচিত হয় না) তার পূর্বে মন্ত্র-স্নান সমাধা করা যেতে পারে।

ওঁ আপো হি স্থা ময়োভুবঃ (মস্তকোপরি জল-সিঞ্চন)
তান উর্জে দধাতন "
মহে রণায় চক্ষসে "
যো বঃ শিবতমো রসঃ "
তস্য ভাজয়তেহ নঃ "
উশতীরিব মাতবঃ "
তস্মা অরঙ্গমাম বঃ "
যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ (জানুর ওপর বারি সিঞ্চন)
আপো জনয়থা চ নঃ (মস্তকোপরি বারি সিঞ্চন)
ওং ভূর্ভুবস সুবঃ

হে বারি, তুমি সকল জীবের আনন্দ দাতা
আমাদের শক্তির জন্য, জল দাও
মহানন্দের জন্য, ভগবানকে দেখার জন্য।
কৃপা করে আমাদের মাঝে বিতরণ কর
তোমার লালনকারী উপাদান
যেমন মা তার সন্তানকে দান করে।
সাহায্যের জন্য তোমার কাছে আমাদের আসতে দাও,
যেহেতু তুমি হলে ভগবানের বাসস্থান।
হে বারি, ভগবানকে আমাদের প্রদান কর।

খাদ্য তালিকা প্রস্তুতের কিছু সাধারণ প্রণালী

বাঙালীর ঐতিহ্যগত রন্ধন প্রণালী অনুযায়ী কোন দিনের বিশেষ কটি নৈবেদ্য নিবেদনের জন্য খাদ্যের উপযুক্ত মিশ্রণের কতিপয় নির্দেশাবলী।

প্রাতঃরাশ (প্রাতর্ভোগ)

ঈষৎ নোনতা খাবার : পকৌড়া, কচুরি বা সমোসা—প্রতিটির সঙ্গে চাটনী, অথবা পকৌড়া, কচুরি বা লুচি—প্রত্যেকটির সঙ্গেই সব্জী বা ডালজাত কিছু, সামান্য ভেজা ছোটমটর সব্জীর মতো বা কাঁচা মটর সব্জী (শুকনো কিছুর সঙ্গে সব সময়ই অনুরূপ ঝোলা সব্জী পরিবেশন করতে হবে), অথবা দই বা কড়ির সঙ্গে খিচুরি। এর সঙ্গে যুক্ত হতে পারে পকৌড়া ও ভাজা পপদম, বা দইয়ের সঙ্গে ভাজী (আলু বা অন্য নিরামিষ ভাজী) পত্র-শূন্য নিরামিষ স্যালাড, যেমন, টোম্যাটো, শসা বা মূলোর স্যালাডও নিবেদন করা যেতে পারে। এমন কি (জারিত ফল বা সব্জী), টাটকা আদা, লেবু এবং লবণ।

ফলাদি : ঋতু অনুযায়ী—টাটকা ফল, শুকনো ফল।

মিঠাই : দুধ এবং অথবা শস্যদানার মিঠাই।

দুগ্ধ : ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় গরম দুধ, গরম আবহাওয়ায় মাখন-দুধ বা সামান্য গন্ধযুক্ত পানীয় (সরবৎ)।

মধ্যাহ্ন ভোজ (রাজ-ভোগ)

টীকা : বিগ্রহদের ভোগ নিবেদনের সময় একইসঙ্গে ভগবানের থালায় ভোগ নিবেদন করলেও তালিকাবদ্ধ পদগুলি ক্রম অনুসারে পরিবেশন করতে হবে। পরিবেশনের এই ক্রম প্রসাদ বিতরণের সময়ও লক্ষ্য করতে হবে।

১) স্যালাড
২) অন্ন (পুরোপুরি সাদা) ও চাপাটী (স্যালাডের পর পরিবেশন করতে হবে)
৩) তিক্ত সব্জী (করলা, তিতা শাক)
৪) সাধারণ (তিতা নয় এমন) শাক
৫) ডাল ও ভাজী (পকৌড়া বা ভাজী, সম্ভব হলে চাটনী সহ)
৬) শুষ্ক, মসলা দিয়ে নেড়েচেড়ে ভাজা সব্জী (চচ্চরী)
৭) সাধারণ সব্জী (সামান্য স্যস্ সহযোগে)
৮) সিক্ত সব্জী (ঝোল সব্জী)
৯) প্রচুর তেল মসলা যুক্ত সব্জী (গরম মসলা সহ)
১০) দই, রাইতা

১১) চাটনী
১২) মিঠাই

অপরাহ্ন (বৈকালিক ভোগ)

ফলাদি, মিঠাই, পিষ্টক, পানীয়

সন্ধ্যা ও রাত্রি কালীন ভোগ

সন্ধ্যা ও রাত্রিকালীন ভোগ নিবেদনের ক্ষেত্রে তিন প্রকার পৃথক পদ্ধতি অনুসৃত হয়

১) সন্ধ্যায় ভোগ — লঘু (অপরাহ্ন ভোগের মতো), রাত্রি — গুরু আহার।
২) সান্ধ্যভোগ — গুরু আহার, নৈশভোগ — হাল্কা আহার।
৩) সান্ধ্য — গুরু আহার, নৈশ — গুরু আহার।

নিম্ন লিখিত উপাদানগুলি পূর্ণ সান্ধ্যভোজনের অন্তর্ভুক্ত :

১) পুরী, পরোটা, বা কচুরি
২) ডাল (সামান্য ঘন)
৩) অন্ন (সম্ভবমতো, কিন্তু কোন প্রয়োজন নেই)
৪) ভাজী (পকোড়ার অগ্রাধিকার)
৫) সব্‌জী (দুই রকমের অগ্রাধিকার, মধ্যম পরিমাণ থেকে বেশি পরিমাণ — কোন পনির নয়)
৬) মিঠাই
৭) দুধ (সম্ভব হলে নির্দিষ্ট কিছু ফল, যেমন কলা বা আম)

সন্ধ্যায় বা রাত্রিতে কোন তিতা-সবজী বা শাক নিবেদন করা হবে না এবং কলার চাটনীর মতো মিষ্টি চাটনী ছাড়া অন্য কোন চাটনী এই সময় দেওয়া হবে না (তাও কিন্তু সন্ধ্যায়, রাত্রিতে নয়। যদি সন্ধ্যাকালীন ভোজটি গুরু আহার হয় এবং রাত্রিকালীন ভোজটি লঘু আহার হয়, তবে রাত্রিকালীন আহারে গরম দুধ, মিঠাই, পুরী (বা লুচি), এবং হাল্কা সবজী অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে।

শ্রীল প্রভুপাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ ১৮৯৬ সালে কলকাতায় আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল গৌরমোহন দে এবং মাতার নাম ছিল রজনী দেবী। ১৯২২ সালে কলকাতায় তিনি তাঁর গুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের সাক্ষাৎ লাভ করেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ছিলেন ভক্তিমার্গের একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত এবং ৬৪টি গৌড়ীয় মঠের (বৈদিক সংঘ) প্রতিষ্ঠাতা। তিনি এই বুদ্ধিদীপ্ত, তেজস্বী ও শিক্ষিত যুবকটিকে বৈদিক জ্ঞান প্রচারের কাজে জীবন উৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ এগারো বছর ধরে তাঁর আনুগত্যে বৈদিক শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং পরে ১৯৩৩ সালে এলাহাবাদে তাঁর কাছে দীক্ষা প্রাপ্ত হন।

১৯২২ সালেই শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল প্রভুপাদকে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে বৈদিক জ্ঞান প্রচার করতে নির্দেশ দেন। পরবর্তীকালে শ্রীল প্রভুপাদ *শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার* ভাষ্য লিখে গৌড়ীয় মঠের প্রচারের কাজে সহায়তা করেছিলেন। ১৯৪৪ সালে তিনি এককভাবে একটি ইংরেজী পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন। এমন কি তিনি নিজ হাতে পত্রিকাটি বিতরণও করতেন। পত্রিকাটি এখনও সারা পৃথিবীতে তাঁর শিষ্যবৃন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হচ্ছে।

১৯৪৭ সালে শ্রীল প্রভুপাদের দার্শনিক জ্ঞান ও ভক্তির উৎকর্ষতার স্বীকৃতিরূপে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজ তাঁকে 'ভক্তিবেদান্ত' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৫০ সালে তাঁর ৫৪ বছর বয়সে শ্রীল প্রভুপাদ সংসার-জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে চার বছর পর বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করেন এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন, প্রচার ও গ্রন্থ-রচনার কাজে মনোনিবেশ করেন। তিনি বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধা-দামোদর মন্দিরে বসবাস করতে থাকেন এবং অতি সাধারণভাবে জীবন যাপন করতে শুরু করেন। ১৯৫৯ সালে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। শ্রীশ্রীরাধা-দামোদর মন্দিরেই শ্রীল প্রভুপাদের শ্রেষ্ঠ অবদানের সূত্রপাত হয়। এখানে বসেই তিনি *শ্রীমদ্ভাগবতের* ভাষ্যসহ আঠারো হাজার শ্লোকের অনুবাদ করেন এবং *অন্য লোকে সুগম যাত্রা* নামক গ্রন্থটি রচনা করেন।

১৯৬৫ সালে ৭০ বছর বয়সে তিনি সম্পূর্ণ কপর্দকহীন অবস্থায় আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরে পৌঁছান। প্রায় এক বছর ধরে কঠোর পরিশ্রম করার পর তিনি ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠা করেন আন্তর্জাতিক

কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ বা ইস্‌কন। তাঁর সযত্ন নির্দেশনায় এক দশকের মধ্যে গড়ে ওঠে বিশ্বব্যাপী শতাধিক আশ্রম, বিদ্যালয়, মন্দির ও পল্লী-আশ্রম।

১৯৭৪ সালে শ্রীল প্রভুপাদ পশ্চিম ভার্জিনিয়ার পার্বত্য-ভূমিতে গড়ে তোলেন নব বৃন্দাবন, যা হল বৈদিক সমাজের প্রতীক। এই সফলতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর শিষ্যবৃন্দ পরবর্তীকালে ইউরোপ ও আমেরিকায় আরও অনেক পল্লী-আশ্রম গড়ে তোলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের অনবদ্য অবদান হচ্ছে তাঁর গ্রন্থাবলী। তাঁর রচনাশৈলী গাম্ভীর্যপূর্ণ ও প্রাঞ্জল এবং শাস্ত্রানুমোদিত। সেই কারণে বিদগ্ধ সমাজে তাঁর রচনাবলী অতীব সমাদৃত এবং বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে আজ সেগুলি পাঠ্যরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। বৈদিক দর্শনের এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ করেছেন তাঁরই প্রতিষ্ঠিত বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ গ্রন্থ-প্রকাশনী সংস্থা 'ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট।' শ্রীল প্রভুপাদ *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের* সপ্তদশ খণ্ডের তাৎপর্য সহ ইংরেজী অনুবাদ আঠার মাসে সম্পূর্ণ করেছিলেন।

১৯৭২ সালে আমেরিকার ডালাসে গুরুকুল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রীল প্রভুপাদ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বৈদিক শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রচলন করেন। ১৯৭২ সালে মাত্র তিনজন ছাত্র নিয়ে এই গুরুকুলের সূত্রপাত হয় এবং আজ সারা পৃথিবীর ১৫ টি গুরুকুল বিদ্যালয়ে ছাত্রের সংখ্যা প্রায় উনিশ শত।

পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদ সংস্থার মূল কেন্দ্রটি স্থাপন করেন ১৯৭২ সালে। এখানেই বৈদিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি অনুশীলনের জন্য একটি বর্ণাশ্রম মহাবিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনাও তিনি দিয়ে গিয়েছেন। শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশে বৈদিক ভাবধারার উপর প্রতিষ্ঠিত এই রকম আর একটি আশ্রম গড়ে উঠেছে বৃন্দাবনের শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-বলরাম মন্দিরে, যেখানে আজ দেশ-দেশান্তর থেকে আগত বহু পরমার্থী বৈদিক সংস্কৃতির অনুশীলন করছেন।

১৯৭৭ সালের ১৪ই নভেম্বর এই ধরাধাম থেকে অপ্রকট হওয়ার পূর্বে শ্রীল প্রভুপাদ সমগ্র জগতের কাছে ভগবানের বাণী পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাঁর বৃদ্ধাবস্থাতেও সমগ্র পৃথিবী চোদ্দবার পরিক্রমা করেন। মানুষের মঙ্গলার্থে এই প্রচারসূচীর পূর্ণতা সাধন করেও তিনি বৈদিক দর্শন, সাহিত্য, ধর্ম ও সংস্কৃতি সমন্বিত বহু গ্রন্থাবলী রচনা করে গেছেন, যার মাধ্যমে এই জগতের মানুষ পূর্ণ আনন্দময় এক দিব্য জগতের সন্ধান লাভ করবে।

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সূচনা করার অব্যবহিত পরেই শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর ক্রমবর্ধমান পারমার্থিক প্রতিষ্ঠানের এক অপরিহার্য অঙ্গরূপে শ্রীবিগ্রহ উপাসনার বিধি-নিয়মের প্রকাশ করেন। ঠিক যেমন শ্রীকৃষ্ণের বাণী তথা শাস্ত্রের বাণীকে অবিকৃত রেখে তিনি যথাযথভাবে উপস্থাপন করেছেন, তেমনই শ্রীবিগ্রহ পূজার প্রণালীও শাস্ত্রীয় বিধি-নিয়মের অনুকূলে চিরাচরিত প্রথায় অবিকৃতভাবে প্রকাশ করেছেন। তিনি শ্রীবিগ্রহ পূজাকে কৃষ্ণভাবনামৃতের মূল নীতি — প্রত্যেককে কৃষ্ণভক্তি দান করার একটি মাধ্যম হিসাবে দেখেছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ চেয়েছিলেন যে, শ্রীবিগ্রহ অর্চনের ক্ষেত্রে ইস্‌কন যেন আদর্শ বিধি-নিয়ম অনুসরণ করে। তিনি বিশেষভাবে চেয়েছিলেন যে, বিগ্রহ পূজার্চনার ক্ষেত্রে ইস্‌কনে যেন খুব উন্নত মান অবলম্বন করা হয় এবং তার উৎকর্ষতা যেন ক্রমেই অধিক থেকে অধিকতর রূপে বৃদ্ধি পায়; কোনভাবেই যেন তা হ্রাস না পায়। তার ফলে শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হবেন এবং কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন বর্ধিত হতে থাকবে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে গোস্বামীগণ শ্রীবিগ্রহ পূজার্চনার যে বিধান দিয়ে গিয়েছেন, শ্রীল প্রভুপাদ ইস্‌কনে সেটিরই প্রয়োগ করেছেন। এটি 'পাঞ্চরাত্রিক' পূজাবিধি নামে খ্যাত। তিনি বলেছেন যে, এই পঞ্চরাত্র বিধি জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সমস্ত বৈষ্ণবদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। শ্রীবিগ্রহ পূজার্চনার জন্য পাঞ্চরাত্রিক বিধিই হচ্ছে সবচাইতে প্রামাণিক এবং ব্যবহারিক; কলহের যুগ এই কলিযুগের জন্য তা অত্যন্ত উপযোগী। আধুনিক যুগের জন্য এই বিধি বেদান্তের থেকেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা শ্রীবিগ্রহ অর্চনের ক্ষেত্রে কখনই স্মার্ত ব্রাহ্মণদের কর্মকাণ্ডীয় পন্থার অনুসরণ করেন না। তাই শ্রীল সনাতন গোস্বামীপাদ তাঁদের জন্য শুদ্ধ শাস্ত্রীয় বিধি-বিধান অনুসারে 'হরিভক্তিবিলাস' নামক গ্রন্থখানি প্রণয়ন করেছেন। আর শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ তাঁর 'ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু' গ্রন্থে চৌষট্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গ তথা ভক্তিমূলক ক্রিয়াকলাপের বিধি রচনা করে গিয়েছেন, যাতে ভগবানের সেবায় সাধন-ভক্তি অনুশীলনের প্রারম্ভিক পর্যায়ে ভক্ত তার ইন্দ্রিয়সমূহ নিয়োজিত করতে পারে। এই চৌষট্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে আবার তিনি পাঁচটিকে প্রধানতম রূপে বিবেচনা করেছেন। সেগুলি হলো, ১) শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ, ২) ভক্ত-সঙ্গ, ৩) মথুরা আদি ভগবদ্ধামে বাস, ৪) ভগবানের পবিত্র নাম জপ, ৫) গভীর বিশ্বাস সহকারে ভগবানের বিগ্রহ-স্বরূপের সেবা। বস্তুত, এই একটি মাত্র বিষয় — শ্রীবিগ্রহ অর্চন, তাকেই চৌষট্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গ তথা সাধনাঙ্গে বিস্তারিত করা হয়েছে। সুতরাং, ভক্তি জীবনে শ্রীবিগ্রহ অর্চনের এই অপরিসীম গুরুত্বের কথা বিবেচনা করেই অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে শাস্ত্র ও মহাজনগণের সিদ্ধান্তের অনুকূলে "পঞ্চরাত্র-প্রদীপ" নামক এই গ্রন্থটি প্রণয়ন করা হয়েছে, যাতে বৈষ্ণব ভক্ত তথা সাধক কুল তার আশ্রয় গ্রহণ করে পারমার্থিক জীবনে প্রভূত উন্নতি সাধন করতে পারেন।

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট

ISBN 978-93-86956-37-8

90000 >

9 789386 956378